স্যার আর্থার কোনান ডায়ালের

শার্লক হোমস রচনা সমগ্র



অনুবাদ

নচিকেতা ঘোষ

যামিনী প্রকাশালয় ॥ ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলি-৯

Complete works of
Sir Arthur Conan Doyle
on Holmes
SHIRLOCK HOLMES
RACHANA SAMAGRA
Retold by
Nachiketa Ghosh

প্রকাশক :
শ্যামাপদ সরকার
কামিনী প্রকাশালয়
৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ : পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

রেখাচিত্র : বিদ্যা অশোক

মুদ্রক :
পারিজাত প্রিন্টার্স
৭, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন
কোলকাতা-৬৭

ডাঃ ডি. এন. রায়

এম. এ., বি-এড, বি. এম. এস., পি-এইচ ডি (হোমিও)

—অগ্রজপ্রতিমেষু

দাদা,

চরম দুঃখের দিনে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় যখন বাবাইসোনাকে বাঁচাবার জন্য অসহায় উদ্‌ভ্রান্ত, ভাগ্যের ওপর নির্ভর করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না, সেই দুঃসময়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত আপনাকে পাশে পেয়েছিলাম। বাবাইসোনার স্মৃতি অবিস্মরণীয়, আপনার ঋণও অপরিশোধ্য। সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ করে আজ এ বই আপনার হাতে তুলে দিলাম।

স্যার অর্থার কোন্যান ডায়ালের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি শার্লক হোমস চরিত্র। বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই শার্লক হোমসের কীর্তি-কাহিনী অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। একশ বছর অতিক্রম করে এসেও জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে শার্লক হোমসের গল্প আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে শার্লক হোমস ও তাঁর অপরাধ-তদন্তের কীর্তিকলাপ যে কতটা সমাদৃত, তার আভাস ইতিপূর্বে ছোটখাট কয়েকটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেই উপলব্ধি করতে পেরেছি। বৃহত্তর পাঠকসমাজের চাহিদা বিবেচনা করেই এবারে শার্লক হোমসকে নিয়ে লেখা সমস্ত গল্প একটি অখণ্ড অবয়বে পরিবেশন করবার উদ্যোগ নেওয়া হল।

আশা করছি, আমাদের এই প্রয়াস পাঠক-সম্প্রদায়ের সমাদর লাভ করবে।

অতি সম্প্রতি ছাপার কাগজ, ছাপা ও আনুষঙ্গিক সকল কিছুর অভাবিত মূল্যবৃদ্ধি পুস্তক ব্যবসায়কে খুবই বিব্রত করেছে। প্রতি পদক্ষেপেই পাঠক সমাজের সীমিত ক্রয় ক্ষমতার কথা চিন্তা করতে হচ্ছে।

বিপুলায়তন এই গ্রন্থ প্রকাশ করতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেতে হয়েছে। তথাপি, আনন্দের সঙ্গেই বলতে পারছি, বিশ্বজয়ী অপরাধ-বিজ্ঞানী এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী গোয়েন্দা শার্লক হোমসকে ঘরে নেবার উদ্দেশ্যে আমাদের এই গ্রন্থের জন্য পাঠকদের সবচেয়ে কম ব্যয়ভার বহন করতে হবে।

যাঁদের জন্য এই শ্রমসাধ্য কৃচ্ছ্রতার সাধনা, তাঁরা সন্তুষ্ট হলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

শ্যামাপদ সরকার

শার্লক হোমসের স্রষ্টা স্যার আর্থার কোন্যান ডায়ালের জন্ম এডিনবরায়, ১৮৫৯ সালে। ১৮৭৬ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারী পড়বার সময় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে ডঃ জোশেফ বেল-এর। সুদক্ষ শল্যচিকিৎসক এই মানুষটির নির্ভুল ক্ষমতা ছিল রোগ নির্ণয়ের।

কেবল তাই নয়, সামান্য লক্ষণ থেকেই তিনি মানুষের জীবন ও জীবিকার ইতিহাস নির্ণয় করতে পারতেন।

ডাঃ বেল-এর বৈজ্ঞানিক যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিকেই পরবর্তী জীবনে প্রখর ও প্রসারিত করেছেন ডায়াল তাঁর সাহিত্যে—শার্লক হোমস চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ডায়ালের এই অসামান্য চরিত্র জীবন-মরণের সীমানা অতিক্রম করে এক শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে কিংবদন্তী। সাহিত্যকে ছাড়িয়ে সাহিত্যের চরিত্র বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছে। বিস্ময়কর বুদ্ধির অধিকারী গোয়েন্দা শার্লক হোমসের বিপুল জনপ্রিয়তার আড়ালে চাপা পড়ে গেছেন স্রষ্টা স্বয়ং।

হোমস এবং তাঁর সহকারী ওয়াটসন সত্যিকারের রক্ত-মাংসের মানুষ ছিলেন এটা প্রামাণ্য সত্য হিসেবে ধরে নিয়ে হোমসের জীবনের শিক্ষাদীক্ষা, কর্মকৃতিত্ব ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে রীতিমত গবেষণা হয়েছে, অসংখ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ লেখা হয়েছে।

হোমসের চেহারা, স্বভাব, চরিত্রের নির্ভুল খুঁটিনাটি এবং অসামান্য ব্যক্তিত্ব, ব্যর্থতা ও বেদনার চালচিত্র প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে এই সকল রচনার মাধ্যমে।

তাঁদের সময়ের লণ্ডন, বেকার স্ট্রিটের বাসস্থান, অ্যাপার্টমেন্ট, আসবাবপত্র, ব্যবহৃত জিনিসপত্র, এমন কি পোর্টেট পর্যন্ত আঁকা হয়েছে।

পাঠকদের জ্ঞানে বিশ্বাসে ভালবাসায় হোমস এতই জীবন্ত যে এখনো তাঁর নামে ২২১বি বেকার স্ট্রীটের ঠিকানায় সপ্তাহে গড়ে চল্লিশখানা করে চিঠি আসে।

কাগজে হোমসের নামের আগে প্রয়াত শব্দ ব্যবহৃত হলে ঝুরি ঝুরি প্রতিবাদপত্র আসে।

বস্তুত, হোমস সত্যিকারের চরিত্র না হয়েও পৃথিবীর হোমস-অনুরাগী মানুষের কাছে হয়ে উঠেছেন জীবন্ত অস্তিত্বেরও অধিক একটি ভাবমূর্তি।

হোমসকে নিয়ে নানাদেশে গড়ে উঠেছে হোমস চর্চার কেন্দ্র শার্লকিয়ান সোসাইটি। এই সকল কেন্দ্রের গঠনমূলক আলোচনা এবং সক্রিয় অধিবেশন একশ বছর অতিক্রান্ত হবার পরও হোমসকে জীবন্ত করে রেখেছে।

হোমসের কিংবদন্তীতুল্য কাহিনীগুলো যে কেবলমাত্র অনুবাদকর্মের মাধ্যমেই দেশে দেশান্তরে প্রচার লাভ করেছে তা নয়। মঞ্চ-চলচ্চিত্র দূরদর্শন বেতার প্রভৃতির মাধ্যমে সেগুলির আঙ্গিক রূপান্তর এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

শার্লক হোমসের গল্প অবলম্বনে এ পর্যন্ত দুশোরও অধিক চলচ্চিত্র ও টেলিফিল্ম নির্মিত হয়েছে, উল্লেখযোগ্য নাটক হয়েছে প্রায় চল্লিশটি।

অতি সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে ডিজনি কার্টুন ফিল্ম বেসিল দি মাউস ডিটেকটিভ্ নামে।

ডায়ালের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে এশিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থায়। সারা বিশ্বের পুলিশী তদন্ত ধারায় এনেছে পরিবর্তন। চীন মিশরে গোয়েন্দা পাঠক্রমে অবশ্যপাঠ্য এই গল্পগুলি।

এইভাবে শতবর্ষ অতিক্রম করে এসেও রহস্যভেদী শার্লক হোমস আজও হয়ে আছেন জীবন্ত সত্য—সমান জনপ্রিয়।

বাঙ্গালী পাঠক মহলেও শার্লক হোমসের জনপ্রিয়তা অপরিসীম। তাঁদের চাহিদার কথা বিবেচনা করেই শার্লককে নিয়ে লেখা ডায়ালের সমস্ত রচনা একত্রবদ্ধ করে এই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হল। এ-বিষয়ে প্রকাশকের আন্তরিক আগ্রহ ও সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। সবশেষে, এ লেখা পাঠকদের ভাল লাগলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

নচিকেতা ঘোষ

সূচীপত্র

সূচীপত্র

স্যার আর্থার কোন্যান ডায়াল তাঁর 'হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিলস' উপন্যাসটি লিখেছিলেন ডার্টমুরের প্রচলিত অশরীরী হাউন্ডের কিংবদন্তী অবলম্বনে। রোমহর্ষক সত্য ঘটনাই ছিল এই কিংবদন্তীর উৎস।

বাস্কারভিলস-এর অশরীরী হাউন্ড

ডার্টমুরের গা ছমছম-করা বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে অশরীরী হাউন্ডের কবলে পড়েছিলেন এক মহিলা।

অপরিসীম আতঙ্কে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও শেষ পর্যন্ত প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন তিনি।

নিজের সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার বিবরণ মহিলা যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, নিচে তাই হুবহু তুলে দেওয়া হল ঃ

ডার্টমুরের জলাভূমির প্রেত-হাউন্ডের গল্প আমার শোনা ছিল।

অন্যান্য অনেক কিংবদন্তীর মত গল্পটাকে নিছক গল্প বলেই ধরে নিয়েছিলাম আমি।

সে-কারণে এক রকম ভয়-ভীতিশূন্য মন নিয়েই চ্যাগফোর্ড থেকে হেঁটে রওনা হয়েছিলাম জলার মাঝামাঝি ক্র্যানমিয়ার পুলের দিকে।

আমি শুনেছিলাম, জলার পচা পাঁক আর পচা আগাছার কাদা-ভর্তি বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল জনমানবহীন এক নিস্তব্ধ প্রান্তর। কোনদিক থেকে কোন শব্দ এখানে এসে পৌঁছায় না।

মাঝে মাঝে কেবল মাথার ওপরে দু-একটা পাখিকে বিক্ষিপ্তভাবে উড়ে যেতে দেখা যায়।

এখানে পায়ের তলায় পচা কাদার বুক চিড়ে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে কালো জলের ধারা—নিঃশব্দে।

এই নিস্তব্ধতার রাজত্বে একমাত্র যে শব্দ কানে বাজে তা হল, বাতাসের সোঁ সোঁ চাপা গজরানি।

পচা পাঁকে পা ডুবিয়ে চলতে গেলে এই গা ছমছম-করা পরিবেশে নিজের পায়ের ছপাৎ ছপাৎ শব্দই বুকে কাঁপন ধরায়।

শব্দহীনতার রাজ্যে মাথার ওপরে আকাশে বাতাসে ভর করে উড়ে যায় ধূসর মেঘ।

হঠাৎ কখনো ঝপ ঝপ শব্দ তুলে হাল্কা বৃষ্টি জলার বুক ভেদ করে ধেয়ে যায় দূরে—বহু দূরে।

কখনো গাঢ় কুয়াশা অকস্মাৎ ঢেকে দেয় দু' হাত দূরের দৃশ্যও।

এমনি রহস্যঘেরা শ্বাসরোধী পৈশাচিক পরিবেশে অকস্মাৎ নিঃশব্দে শিকারের পেছনে ধেয়ে আসে অশরীরী হাউন্ডের দল।

কোথা থেকে এদের আবির্ভাব হয় তা কেউ জানে না।

শিকারের পেছন ছেড়ে অকস্মাৎ আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় তা-ও কেউ বলতে পারে না।

এই প্রেত-হাউন্ডের মাথা নেই। তাই মুখ জিভও নেই। তাই আওয়াজ করতে পারে না।

আবছা কুয়াশায় দেখা যায় অতিকায় কালো মূর্তির ঘাড়ের কাছে নীলচে আগুনের লকলকে শিখা।

পচা আগাছার কাদা আর পাঁকের ওপর ভারী ভারী পা ফেলে এরা ধাওয়া করে কিন্তু কোন শব্দ শোনা যায় না।

এই অঞ্চলে অশরীরী হাউন্ডের নাম 'উইজ হাউন্ড।' অধিবাসীদের কাছে এক মূর্তিমান আতঙ্ক।

উইজ হাউন্ডের গল্পটা মনে রেখেই এক রোদ-ঝলমল দিনে পা বাড়ালাম জলার বুকে।

খিদে মেটাবার জন্য চ্যাগফোর্ড মার্কেট থেকে কিছু প্যাস্ট্রি কিনে সঙ্গে নিয়ে নিলাম।

এছাড়া সঙ্গে রেখেছি জলার একটা নক্সা আর একটা কম্পাস। কাজেই কোন ভাবেই জলার বুকে দিগ্‌ভ্রান্ত হবার আশঙ্কা ছিল না।

ব্যাপারটা নিজে যাচাই করব বলে সঙ্গী হিসেবে কাউকে নেওয়া বাহুল্য মনে হয়েছে।

গিডলি থেকে কাদায় নেমে হাঁটতে শুরু করেছি।

পাথুরে চত্বর ভেঙ্গে প্রথমে গেলাম থির্লস্টোন 'টর'-এর দিকে।

এবড়ো-খেবড়ো, কর্কশ, কালো পাথরের পাহাড়।

এসব পাথুরে পাহাড়কে এ অঞ্চলে বলে 'টর'। ডার্টমুর ছাড়া 'টর' অন্য কোথাও দেখা যায় না।

থির্লস্টোন টর-এর খিলানগুলোর ধার ক্ষয়ে ছুরির ফলার মত ধার হয়ে গেছে।

মনে হয় যেন আস্ত একটা সমুদ্র বয়ে গেছে এর ওপর দিয়ে।

গাছপালাহীন পাহাড়ের চোখা কর্কশ পাথরের খাড়াই বেয়ে সতর্কভাবে ধীরে ধীরে উঠে গেলাম ওপরে।

থির্লস্টোনের এই চূড়া থেকে পুবদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল ধূ ধূ মাঠ আর আগাছার জঙ্গল।

দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে আবছাভাবে আভাস পাওয়া যায় হ্যালডন হিলের চূড়ার ওপরের টাওয়ার।

বিস্তীর্ণ এই প্রান্তরে কোন জীবিত প্রাণীর আভাস কোথাও চোখে পড়ে না।

সীমাহীন এই বিস্তার বুকে অজানতেই কাঁপন ধরায়।

থির্লস্টোন থেকে এক সময় নেমে এলাম।

কাদায় পা দিতেই যেন দিগন্তব্যাপী খাঁ খাঁ শূন্যতা ছুটে এসে আঁকড়ে ধরল।

দৃষ্টিসীমার মধ্যে প্রাণের চিহ্ন নেই কোথাও। নির্জন জলার বুক ভেঙ্গে চলেছি আমি একা।

ঘাসের চাবড়া দেখে দেখে সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে।

লাফাতে হচ্ছে ঘনঘন। পা ফসকালেই মৃত্যু নিশ্চিত।

পচা আগাছা আর নরম কাদায় তলিয়ে যেতে হবে।

সহসা দেখলাম মাথার ওপরের হাসি-মুখ আকাশের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে।

থির্লস্টোন টর-এর উপত্যকা পার হয়ে আমি হ্যাংগিং স্টোন হিলের দিকে এগুচ্ছি।

এমনি সময়ে চোখে পড়ল রাশি রাশি ধূসর মেঘ ছেয়ে ফেলেছে ওপরের আকাশ।

হাওয়ায় অদ্ভুত একটা গোঙানির শব্দের মত অস্পষ্ট সাঁই সাঁই আওয়াজ।

মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই পশ্চিমের এলোমেলো হাওয়ায় ভর করে ধেয়ে এলো বৃষ্টির ঝাঁক।

বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা ছপ ছপ শব্দে আমার চারপাশে কাছে—দূরে—আছড়ে পড়ল চোখে মুখে।

বৃষ্টির পেছন পেছনই নেমে এল কুয়াশা আর নিচু মেঘ।

মেঘ, বৃষ্টিধারা আর কুয়াশার আস্তরণে ঢেকে গেল চারপাশ। কিন্তু আমি থমকালাম না বা দ্বিধাগ্রস্ত হলাম না। এই আকস্মিক দুর্যোগ মাথায় নিয়েই কোনমতে এগিয়ে চললাম।

কম্পাসটা তুলে নিয়েছি চোখের ওপরে।

সামনেই ক্র্যানমিয়ার আর ওয়েস্ট ওকমন্ট নদী।

নদীর কিনারা ধরে বরাবর এগিয়ে গেলে পৌঁছে যাওয়া যাবে কর্দম-ভূমির উত্তর প্রান্তে সৈন্য চলাচলের রাস্তায়।

কম্পাসের কাঁটায় চোখ ধরে রেখে লাফিয়ে লাফিয়ে পচা ঘাসের চাবড়া আর কর্দম ডিঙোচ্ছি।

ঘন ঘন মুছতে হচ্ছে কম্পাসের ঢাকনা-কাচ।

এই সময়ে দিকভ্রম হলে কোন দিকে চলে যাব তার ঠিক নেই।

ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়েও কাদার শেষ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নিবিষ্ট হয়ে কম্পাসের দিকনির্দেশ অনুসরণ করে চলেছি।

আচম্বিতে মনে হল, কিছু যেন আসছে পেছন পেছন—বিজন প্রান্তরে আমি আর একা নই।

কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই গা-ছমছম-করা একটা শিরশিরানি ভাব পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

পেছনে ঘুরে তাকাবার প্রবল ইচ্ছাটাকে অনেক কষ্টে দমন করে রাখলাম।

অকারণ দুর্বলতা ভেবে প্রথমে আমল দিলাম না। অন্যমনস্ক থাকবার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু বেশিক্ষণ চিন্তাটাকে এড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না।

কেবলই মনে হ'তে লাগল নিঃশব্দ পায়ে কারা যেন আমার পায়ের ছাপ ধরে এগিয়ে আসছে ক্রমাগত।

নিবিড় ভাবে উপলব্ধি হল সমস্ত সত্তা জুড়ে যেন আচ্ছন্নতার একটা অদৃশ্য জাল আমাকে ঢেকে ফেলছে।

একটা হিম-শীতল আবেশ যেন— কেমন দুর্বোধ্য।

নিজের অজান্তেই এক সময় পেছনে ফিরে তাকালাম। আবছাভাবে চোখে পড়ল কাদা আর খোলা প্রান্তর। আমার চারপাশ ঘিরে বৃষ্টি আর কুয়াশার ঘোলাটে যবনিকা।

এর মধ্যেই এক জায়গায় পাথরের মত কি যেন নজরে পড়ল। অথচ সেখানে পাথর থাকার কথা নয়।

চোখের ভ্রম ভেবে বুকে সাহস ফিরিয়ে আনলাম। এগিয়ে চললাম সামনের দিকে।

ঘন ঘন লাফিয়ে পা ফেলছি এক ঘাসের চাবড়া থেকে আর এক ঘাসের চাবড়ায়।

বেশি দূর এগুতে পারিনি। সহসা অকারণে বুকের ভেতরে কেমন দম আটকানো কাঁপুনি হল।

সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে উঠল।

আর-একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতে হল।

বৃষ্টি আর কুয়াশা সত্ত্বেও এবারে আর চোখের ভুল হল না।

অস্পষ্ট দেখতে পেলাম, তিনটে গাঢ় বর্ণের সচল বস্তু আমার অনেকটাই কাছে চলে এসেছে।

এবারে আর নিজেকে ধরে রাখা সম্ভব হল না।

নিমেষের মধ্যে বিচার-বুদ্ধি গুলিয়ে গেল। আতঙ্কে তালু শুকিয়ে উঠল।

অদৃশ্যে থেকে কেউ যেন আমায় সামনে ঠেলে দিল।

প্রাণের ভয়ে ছুটতে শুরু করলাম।

মনে পড়ে গেল উইজ হাইন্ডের কথা। নিশ্চিত এরাই পেছন নিয়েছে। এরাও চায় আমি দৌড়ে চলি।

আমি ছুটব আর তারা নিঃশব্দে ধাওয়া করে আসতে থাকবে বাতাসে ভর করে।

পচা কালো কাদায় তাদের পায়ের ছাপ পড়বে না।

জলে পা ফেলার ছপ ছপ শব্দ হবে না।

বাতাসে নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাবে না।

আমি জানি, ধাওয়া করে এলেও আমাকে ওরা ধরতে চায় না, ক্ষতিও করতে চায় না।

ওরা চায় প্রাণের ভয়ে আমি যেন এভাবেই দৌড়ে দৌড়ে দিশাহারা হয়ে পড়ি, এতেই তাদের আনন্দ।

এভাবে ছুটে এক সময় কাদার পচা নরম পাঁকের গর্তে পা ফসকে পড়ে আমি তলিয়ে যাব।

জলার বুকের নরম পাঁকের গর্তগুলোকে এ অঞ্চলে বলে 'ফেদার বেড'। রসিকতা করেই যেন এই নামকরণ করা হয়েছে—পাখির নরম পালকের মতই মোলায়েম এই পাঁক।

একেবারে মরণ-ফাঁদ। পা পড়লে আর তুলে আনা যায় না—পলকের মধ্যে সব চিহ্ন তলিয়ে যায় পাঁকের তলায়।

ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতে লাগলাম আমি। আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে ওরা যা চায় তা না করে যেন পারছিলাম না।

আমার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি যেন ওরাই নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল।

বৃষ্টি আর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ঘন কালো ক্ষুদে ক্ষুদে স্তূপ তাড়া করে এল পেছন পেছন নিঃশব্দে।

ছুটে চলেছি হাওয়ার বিপরীত দিকে।

হাওয়ার ঝাপটা আছড়ে পড়ছে মুখে।

ছুঁচের মত বিঁধছে বৃষ্টির ফলা। পরিপূর্ণ দৃষ্টি ফেলতে পারছি না সামনে।

জল-কাদা ছিটকে উঠছে পেছনে, পিঠে—

সমস্ত কিছু অগ্রাহ্য করে প্রাণপণে ছুটছি—কেবলি ছুটছি।

বৃষ্টি আর কুয়াশার পর্দায় সামনেটা ঝাপসা। ক্র্যানমিয়ারের আশপাশের উঁচ টরগুলো পর্যন্ত চোখে পড়ছে না।

দিকদিশা এখনো হারিয়ে ফেলিনি। কিন্তু দিক ঠিক করবার জন্য যে কম্পা দেখব তার উপায় নেই।

তাহলে দৌড় বন্ধ করে দাঁড়াতে হয়।

কিন্তু তা তো পারছি না—অন্ধকার স্তূপের মত হাউন্ডগুলো সমান বেগে পেছনে তাড়া করে আসছে।

ছোটার গতি অব্যাহত রেখেই মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে এদের দিকেই নজরটা ফেলতে হচ্ছে।

ইতিমধ্যে ছায়ারা সংখ্যায় বেড়েছে।

সমান পদক্ষেপে মনে হল গোটা দশ বারো কালো মূর্তি এগিয়ে আসছে, সামনে অভিন্ন লক্ষ্যে।

ছুটতে ছুটতে আতঙ্ক অনেকটাই কেমন থিতিয়ে এল।

ক্রমেই সহজ বুদ্ধি ফিরে পেতে লাগলাম।

বুঝতে পারলাম পরিত্রাণের একটা পথ করা দরকার।

যেভাবেই হোক, এই পাঁকের গ্রাসে পড়ব না।

ক্রমাগত ভাবছি আর ছুটছি।

সহসা মনে পড়ল, ডাইনে মোড় নিয়ে উত্তরে ছুটলেই মিলিটারী রাস্তায় গিয়ে ওঠা যাবে।

একবার রাস্তায় গিয়ে পৌঁছতে পারলে মূর্তিমান পিশাচগুলো আর আমাকে কাদায় ডুবিয়ে মারতে পারবে না।

প্রাণ নিয়ে লোকালয়ে ফিরে যেতে পারব।

মতলবটা মাথায় খেলবার সঙ্গে সঙ্গেই ডান দিকে মোড় নিলাম। সাহসও ফিরে পেলাম যেন অনেকটা।

কিন্তু ক্র্যানমিয়ারের দিকে ছুটতে গিয়েও বেশি দূর এগুতে পারলাম না। আমাকে রুখে দিল কালান্তক হাউন্ডের দল।

কী করে তারা আমার মতলব বুঝে ফেলে চোখের পলকে আমার পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে দৌড়ে চলল সামনে সামনে।

এভাবে ছুটেই তারা আমার সামনে এগুবার পথ আটকে দিল।

ওরা এখন আমার ডাইনে, বাঁয়ে আর সামনে— ছোটার পথের ওপর জুড়ে। বাধ্য হয়ে আমাকে মিলিটারী রাস্তায় পৌঁছানোর আশা বিসর্জন দিতে হল। আগে যে দিকে ছুটছিলাম সেই দিকেই ছুটতে হল।

আতঙ্ক ফের চেপে বসতে লাগল বুকে।

এরা আমার ঘাড়ে পড়বে না। আমাকে বাদার কাদায়ই ডুবিয়ে মারবার অবিচল মতলব নিয়ে পেছনে লেগে আছে।

ই একথা মনে হতে লাগল ততই বুদ্ধি গুলিয়ে যেতে লাগল।

মহাভয়ঙ্কর পিশাচ-হাউন্ডদের খপ্পর থেকে আর বুঝি এবারে পরিত্রাণ পাওয়া গেল না।

আমাকে নিয়ে নিষ্ঠুর কৌতুকে মরণ-খেলায় মেতে উঠেছে এরা।

ছুটতে ছুটতে কি করে যে ক্র্যানমিয়ারের দিকেই ছিটকে গিয়েছিলাম নিজেও বুঝতে পারিনি।

সহসা পা হড়কে গেল। সামলাতে পারলাম না। হুড়মুড় করে গিয়ে পড়লাম একটা গভীর গর্তের মধ্যে।

জল সামান্য ছিল তাই রক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম।

চোখ পড়ল একটা পোস্টবক্স আর এবড়ো-খেবড়ো পাথরের খাঁজে ভিজিটর্স বুক-এর ওপরে।

এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর মত অবস্থা নয় তখন আমার।

হাউন্ডগুলো ততক্ষণে দৌড়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে গর্তের কিনারা ধরে।

মাথা থাকলে বুঝতে পারা যেত, বাতাসের দিকে নাক তুলে ওরা গন্ধ ধরবার চেষ্টা করছে।

সেই মুহূর্তে যেন আমার দুর্ভাগ্যের মেঘ সরে গেল। আচমকা বাতাসের মোড় ঘুরে গেল।

বইতে লাগল পশ্চিম থেকে উত্তরে।

পলকের মধ্যে পাল্টে গেল বৃষ্টির গতি, সেই সঙ্গে সরে গেল আকাশের ধূসর মেঘের যবনিকা।

মেঘের আড়াল সরে যেতে ঝলমলিয়ে উঠল উজ্জ্বল সূর্য। বৃষ্টিধোওয়া পাথর আর পাহাড়ে পাহাড়ে ঝিকমিকিয়ে উঠল নরম রোদ।

গর্তের কিনার বরাবর একে একে এসে সার দিয়ে দাঁড়ানো হাউন্ডগুলো নিমেষের মধ্যে ঘুরে দাঁড়ালো।

দাঁড়িয়ে—পলক পড়বার সময়টুকু কেবল, তাদের আর দেখা গেল না।

বাতাসের মধ্যে যেন মিলিয়ে গেল।

নিস্তব্ধ নির্জন চরাচরে এবারে আমি ছাড়া কেউ কোথাও নেই। ভয়ের বাধা অপসারিত।

আমার আর যেদিকে খুশি যেতে বাধা নেই।

ছোট্ট নদী ওয়েস্ট ওকমন্টের নিঃশব্দ ধারা পেয়ে গেলাম গর্ত থেকে ওপরে উঠে এসে।

পাড় ধরে কিছুদূর এগিয়েই পেয়ে গেলাম মিলিটারী রোড। এই পথেই অতি শীঘ্র পৌঁছে যেতে পারব ওকহাম্পটনে।

সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে এবারে পেছনে ফিরে তাকালাম। ইয়েস্ টর-এর পেছনে সূর্য আড়াল নিতে শুরু করেছে।

পাহাড়ের পাথরের খাঁজে খাঁজে ডেলা ডেলা ছায়ার দল মনে হল যেন ওৎ পেতে রয়েছে।

ভয় হল, আড়াল ছেড়ে কখন আবার লাফিয়ে তাড়া করে আসে।

আর দাঁড়িয়ে থাকতে ভরসা হল না।

পা চালিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

না, মিলিটারী রোডে উঠে আসার পর অশরীরী ছায়ার দল আর তাড়া করে আসেনি।

নির্বিঘ্নেই এক সময় পৌঁছে গেলাম ওকহাম্পটনে।

এর পর থেকে শপথ করেছি, রোদ ঝলমলে দিন হলেও কখনো আর ডার্টমুরের প্রেত-জলায় পা দেব না।

—ক্যাথলীন হান্ট

এ স্টাডি ইন স্কারলেট



শার্লক হোমসের সঙ্গে আমার পরিচয় নিতান্তই আকস্মিক ভাবে, লন্ডনে, অদ্ভুত এক পরিস্থিতির মধ্যে। আর, প্রথম পরিচয়ের সময় থেকেই বিচিত্র চরিত্রের এই মানুষটি আমার বিস্ময় ও কৌতূহল জাগ্রত করে।

সরকারী ব্যবস্থা অনুযায়ী আমি তখন ন'মাসের বিশ্রাম লাভের অবসর পেয়েছি। ১৮৭৮-এ ডাক্তারী পাশ করেই সেনাবিভাগে সহকারী সার্জনের কাজে যোগদান করি। অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে আফগান ফ্রন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আমাকে।

সেখানে ডিউটিরত অবস্থায় কাঁধে বিদ্ধ হয় ডিজেল বুলেট। আহত শরীর চিকিৎসার জন্য চলে আসতে হয় পেশোয়ার হাসপাতালে।

কিছুদিন পরে সেরে উঠলাম বটে, শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। মেডিক্যাল বোর্ডের সুপারিশে শেষে আমার এই বিশ্রামের ব্যবস্থা।

সরকারী ভাতা সর্বসাকুল্যে দৈনিক সাড়ে এগার শিলিং।

লন্ডনের হোটেলে ওই টাকায় কুলিয়ে ওঠা অসম্ভব, তাই সস্তায় থাকা খাওয়ার একটা ব্যবস্থা কি করা যায়, হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগলাম।

একদিন ক্রাইটেরিয়ন বার থেকে বেরুচ্ছি, এমন সময় আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে গেল পুরনো এক বন্ধুর সঙ্গে।

স্ট্যামফোর্ড—একসময় ছিল আমারই সহযোগী ড্রেসার। দীর্ঘদিন পর সাক্ষাৎ— দুজনেই খুশি হলাম।

লন্ডনের মত নির্বান্ধব জায়গায় পুরনো বন্ধুটিকে পেয়ে আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। তখুনি স্ট্যামফোর্ডকে নিয়ে ছ্যাকরা গাড়িতে চাপলাম। একত্রে লাঞ্চ করব বলে হলবর্ন রওনা হলাম।

পরস্পরের সুখ-দুঃখের কাহিনী বিনিময় হল গাড়ীতেই। হোটেলে পৌঁছে খাবার টেবিলে আমার বর্তমান সমস্যার কথাটা খুলে জানালাম স্ট্যামফোর্ডকে।

খেতে খেতে মৃদু হেসে স্ট্যামফোর্ড বলল, থাকা-খাওয়ার খরচের আধাআধি বখরায় থাকবার মত সঙ্গীর কথা আজই একজন বলছিল আমাকে। আমাদের হাসপাতালের কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে কাজ করে। তবে, তার সঙ্গে কতটা মানিয়ে চলতে পারবে সেটাই হল কথা।

—কেন, না পারবার কি আছে—দুজনেই যখন একা।

স্ট্যামফোর্ড হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—শার্লক হোমসকে জানলে ওকথা তুমি বলতে না। না, না, তার সম্পর্কে খারাপ কিছু ইঙ্গিত আমি করছি না। এমনিতে লোক ভাল—তাছাড়া অ্যানাটমি, কেমিস্ট্রিতে জ্ঞান অগাধ।

—তা একজন মেডিক্যাল স্টুডেন্টের পক্ষে—

আমার কথা শেষ হবার আগেই স্ট্যামফোর্ড বলে উঠল, আরে না না, তবে আর বলছি কি। ধরাবাঁধা মেডিক্যাল ক্লাশ ও করেনি কখনো। ওটাইতো হলো আসল মুসকিলের ব্যাপার। ও যে কি চায় সেটাই বুঝতে পারলাম না আজ পর্যন্ত। এলোমেলো উদ্ভট যত বিষয় নিয়ে পড়ে আছে সারাক্ষণ। বাইরের বিষয়ে জ্ঞান বিস্তর।

—বাঃ চমৎকার—এমন সঙ্গীই তো আমার দরকার। পড়াশুনো করবে, কথা কম বলবে—মানুষ হবে শান্ত শিষ্ট—

—ওসব দিকে কোন ত্রুটি নেই—মুড থাকলে, অমন মানুষের তুলনা হয় না। কিন্তু তবুও বলব ভাই দুজনেরই যখন দরকার—যোগাযোগ না হয় আমিই করে দিচ্ছি—কিন্তু বনিবনা না হলে পরে যেন আমাকে কথা শুনিয়ো না।

কথাটায় আমার কেমন খটকা লাগল। জিজ্ঞেস করলাম—তুমি মনে হচ্ছে কিছু চেপে যাচ্ছ—এমন একটা সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছি না সহজে—আমাকে একটু খুলে বলতো ভদ্রলোকের ব্যাপারটা।

স্ট্যামফোর্ড হেসে বলল, না না, ওভাবে বলবার মত কিছু নয়। আসলে কোন একটা কিছু একবার মাথায় ঢুকলে সহজে নামতে চায় না। সবসময় সবকিছুর

পেছনে কেবল যুক্তি খুঁজে বেড়াবে। জানার আগ্রহ এত বেশি যে মাঝে মাঝে তা খুব বিপজ্জনক আকার ধারণ করে। ওটাই আমার ভয়।

—কি রকম বলতো—

—কি রকম শুনবে? ধর তুমি তার বন্ধু মানুষ—দেখা করতে গেছ, এমন সময় চামড়ার ওপরে প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্য বলা নেই কওয়া নেই দুম করে হয়তো তোমার গায়ের ওপরই ভেজিটেবল অ্যালকালয়েড চিমটি কেটে বসিয়ে দিল।

নিজের চামড়ার ওপরে তো অমন এক্সপেরিমেন্ট ওর চলছে আখচার। আরও শুনবে, ছাত্রদের ডিসেকটিং রুমে গিয়ে একবার, কিছুই না, মৃতদেহে প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্য দমাদম মড়ার গায়ে লাঠি চালাতে শুরু করল। এদিকে কিন্তু নিজে মেডিক্যাল স্টুডেন্ট না।

যাকগে বাপু—ওর ফিরিস্তি শোনাতে গেলে শেষ হবে না। চল আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। নিজের বন্ধু নিজেই যাচাই করে নাও।

খাওয়া শেষ করে তখুনি গাড়ি চাপলাম। দুই বন্ধুতে উপস্থিত হলাম হাসপাতালের কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীর সামনে।

চারদিকে থরে থরে সাজানো অসংখ্য শিশিবোতল। নানারকম পরীক্ষার রকমারী যন্ত্রপাতি।

একজনই মাত্র মানুষ ঘরে—এক কোণে টেবিলের ওপর বসে কি কাজ করছে। আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে তাকাল। কাছে গিয়ে পৌঁছুবার আগেই হাতে একটা টেস্টটিউব উঁচিয়ে ধরে এগিয়ে এসে সহর্ষে বলে উঠল—হিমোগ্লোবিনের সংস্পর্শে দেখুন কেমন থিতিয়ে গেছে। এত দিনে ঠিক পেয়ে গেছি।

সাগ্রহে মানুষটির দিকে তাকালাম। আত্মমগ্ন মানুষটি কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নেই।

স্ট্যামফোর্ড আলাপ করিয়ে দিল আমাদের—ডক্টর ওয়াটসন, মিঃ শার্লক হোমস।

শক্ত হাতে আমার সঙ্গে করমর্দন করে ভদ্রলোক হাসিমুখে বলে উঠল—আফগানিস্থানে ছিলেন দেখছি।

—আপনি জানলেন কি করে? জিজ্ঞেস করলাম অবাক হয়ে। তখনো বুঝতে পারিনি—আমার অবাক হবার পালা সবে শুরু হল।

হোমস্ পরক্ষণেই আবার তার নবতর আবিষ্কারের প্রসঙ্গে ফিরে গেল। বারবার বোঝাতে লাগল, রক্তের দাগ প্রমাণ করবার এমন শাস্ত্রসম্মত ফলিতপদ্ধতি দ্বিতীয়টি নেই।

কথা বলতে বলতে নতুন পরিচয়ের সৌজন্যের কথা বেমালুম উপেক্ষা করে

আমাকে টেনে টেবিলের সামনে নিয়ে গেল। বলল—তাকিয়ে একবার দেখলেই বুঝতে পারবেন। টাটকা রক্ত না হলে—

বলতে বলতে অবলীলাক্রমে নিজের আঙুলে লম্বা একটি বডকিন পটাং করে ফুটিয়ে দিল। পলকের মধ্যে রক্ত টেনে নিয়ে মেডিক্যাল জারের জলে মিশিয়ে দিল।

—এবারে দেখুন—এক লিটার জলে একফোঁটা মাত্র রক্ত—দেখতে স্বাভাবিক জলের মতই। কিন্তু—

বলতে বলতে কয়েক টুকরো সাদা কৃস্ট্যাল ছুঁড়ে দিল জলে, তারপর ঢালল কয়েক ফোঁটা স্বচ্ছ তরল পদার্থ।

হোমস্ চকচকে চোখে তাকাল আমার মুখের দিকে। আমি জারের দিকে তাকালাম। ম্যাটমেটে মেহগনী রঙ হয়ে গেল জলটার আর সামান্য পরিমাণ বাদামী ধুলো থিতিয়ে পড়ল একেবারে তলায়।

আমার চোখে সপ্রশংস দৃষ্টি লক্ষ্য করে উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল, অপূর্ব—চোখের সামনেই তো দেখলেন। অপূর্ব! হিমোগ্লোবিনের সংস্পর্শে এলে থিতিয়ে যাওয়ার মত এই একটা কেমিক্যালই আমি পেয়েছি। সেকেলে গুয়াইকাম টেস্ট কিংবা মাইক্রোস্কোপের তলায় রক্ত কণিকা রেখে যা পাওয়া যাবে না, এই টেস্টে সহজে তা পাওয়া যাবে। রক্ত বাসি না টাটকা সহজেই তা বলে দেওয়া যাবে।

—খুবই ফলপ্রসূ টেস্ট সন্দেহ নেই। বললাম আমি।

—ক্রিমিন্যাল কেসে একটা পয়েন্টের ওপরেই অনেক কিছু নির্ভর করে। আসলে খুনিকে সন্দেহ হলেও প্রমাণের অভাবে ধরা যায় না। জামাকাপড় পরীক্ষা করে দাগও হয়তো পাওয়া যায়—কিন্তু সে দাগ রক্তের না, কাদার বা অন্য কিছুর তা বার করতে কালঘাম ছুটে যায় এক্সপার্টদের। এখন থেকে এই সমস্যার সমাধান করবে আমার 'শার্লক হোমস্ টেস্ট'। রক্তের দাগ প্রমাণ করবার একেবারে অমোঘ পদ্ধতি।

বলতে বলতে খানিকক্ষণ থেমে নিজের মনেই যেন আত্মপ্রসাদের তৃপ্তিটুকু উপভোগ করল অদ্ভুত মানুষটি। বলতে লাগল—গত বছর ফ্রাঙ্কফুর্টে ভন বিসচফের মামলায় এ টেস্ট কাজে লাগাতে পারলে বিসচফ ফাঁসি আটকাতে পারত না। তাছাড়া ধর ব্রাডফোর্ডের ম্যাসন, কুখ্যাত মুলার, নিউ অর্লিয়েন্সের স্যামসন মঁপেলিয়রের লেফেডার—এমনি কেবল দুটো পাঁচটা নয়—অসংখ্য মামলার কথা বলতে পারি—প্রতিটি কেসেই আসল তথ্য ফাঁস করে দিতে পারত এই টেস্ট।

অবাক হয়ে শুনছিলাম ভদ্রলোকের কথা আর দেখছিলাম শিশুসুলভ উচ্ছ্বাস।

হাসপাতালের কেমিক্যাল ল্যাবরেটরির টেস্টটিউবের সামনে বসে ভদ্রলোক দিব্যি আউড়ে গেল অজস্র খুনের মামলার কথা।

এর মধ্যেই নিজের দিকে মন দিয়েছে দেখলাম। আঙুলের ক্ষতস্থানে স্টিকিং প্লাস্টার লাগাচ্ছে। চোখে পড়ল, আরো বেশ কয়েক জায়গায় অমনি স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো—অ্যাসিডেও বিবর্ণ হয়ে গেছে কয়েক জায়গা। হাতটাই যেন একটা জীবন্ত ব্যানার।

—তুমি একটা ভাল ঘর পেয়েছিলে বলেছিলে, ভাগাভাগি করে থাকবার মত সঙ্গী খুঁজছিলে—ডক্টর ওয়াটসনকে নিয়ে এলাম সেজন্য।

স্ট্যামফোর্ড কাজের প্রসঙ্গ উত্থাপন করল।

—হ্যাঁ দুজনের পক্ষে উপযুক্ত একটা বাড়ি দেখে রেখেছি বেকার স্ট্রীটের ওপরে। কিন্তু তামাকের গন্ধ আপনার অপছন্দ না তো?

—মোটেই না—আমি নিজেও শিপ ব্রান্ড স্মোক করি।

—উত্তম। তবে কি জানেন, একসঙ্গে থাকতে হলে পরস্পরের বদখেয়ালগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা ভাল। আমি যেমন, কেমিক্যাল নিয়ে থাকতে ভালবাসি, মাঝেমধ্যে এক্সপেরিমেন্টও করি। তাছাড়া ধরুন—দাঁড়ান একটু ভেবে নিই—মাঝে মাঝে মুখে ছিপি এঁটে গুম হয়ে বসে থাকি—মুখ ভার করেছি ভেবে তখন যেন অস্থির হয়ে পড়বেন না। দু'চারদিন একলা থাকতে দেবেন—দেখবেন ঠিক হয়ে যাব। এবারে আপনার খারাপ দিকগুলোর কথা শোনা যাক—

বলে অদ্ভুত ভাবে তাকাল আমার দিকে। কথার ধরনে আমার হাসিই পাচ্ছিল। তরল কণ্ঠে বললাম—আমার? তা ঝগড়াঝাটি চেঁচামেচি একদম বরদাস্ত হয় না। ভীষণ কুঁড়ে, ঘুম আসে না বলে মাঝ রাতে উঠে বসে থাকতে হয় মাঝে মাঝে। তাছাড়া—হেসে উঠে বললাম, একটা বুলডগের পোষা বাচ্চা রয়েছে আমার।

—সর্বনাশ—আমার যে আবার বেহালা বাজাবার বদ অভ্যাস রয়েছে—চেঁচামেচির মধ্যে ওটাকেও—

—আনাড়ি হাত না হলে ভয়ের কিছু নেই।

—চমৎকার। তাহলে আর বাধা কোথায়—দু'জনে মিলে দিব্যি সময় কেটে যাবে—কিন্তু ঘরটাতো আপনার একবার দেখা দরকার। কাল দুপুরে এখানেই চলে আসুন।

করমর্দন করে হোমস্ আবার তার কেমিক্যালের জগতে ফিরে গেল। আমি আর স্ট্যামফোর্ড ফিরে চললাম হোটেলের দিকে।

মাথার ভেতরে গেঁথে ছিল এতক্ষণ যে কথাটা, হেঁটে চলতে চলতে এবারে স্ট্যামফোর্ডকে তা না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

—মিঃ হোমস্ কী করে বুঝলেন বলতো—আমার আফগানিস্থান ঘুরে আসার কথাটা।

মুখময় অদ্ভুত হাসি ছড়িয়ে দিয়ে স্ট্যামফোর্ড বলল—সবে তো শুরু। ওরকম অনেক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য তুমি ওর মধ্যে দেখতে পাবে। কি করে যে অচেনা মানুষের হাঁড়ির খবর পর্যন্ত বলে দেয়—অনেকের কাছেই এ এক রহস্য। দু'চারদিন কাটালেই বুঝতে পারবে তুমিও—তোমার ভেতর পর্যন্ত ওর দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু ওর ভাবনা চিন্তা কাজ—কোন কিছুরই হদিশ তুমি পাবে না। শার্লক হোমস্ এক জীবন্ত রহস্য। ঠিক আছে আজ চলি।

২২১ বি, বেকার স্ট্রীটের বাসাবাড়ি খুবই পছন্দ হয়ে গেল আমার। সাকুল্যে তিনখানা বেশ বড়সর আলোহাওয়াযুক্ত ঘর। আসবাব দিয়ে সাজানো। খরচ দুজনেরই সাধ্যের মধ্যে। হোটেল ছেড়ে জিনিসপত্র নিয়ে সেদিনই চলে এলাম। গোটা কয়েক বাক্স আর পোর্টমেন্টো নিয়ে পরদিন সকালে এল হোমস্।

দিন দুয়েকের মধ্যেই গোছগাছ করে থিতু হয়ে বসলাম।

শার্লক হোমসের সঙ্গে বেকার স্ট্রীটের জীবন শুরু হল আমার!

দু'-চার দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম সঙ্গী হিসেবে মানুষটি আদর্শ। পরিচ্ছন্ন জীবন। আর প্রকৃতিও খুব শান্ত। প্রতিদিনের জীবন প্রায় নিয়মে বাঁধা।

সকালে আমার আগেই তার ঘুম ভাঙ্গে, ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে যায়। রাত দশটার মধ্যেই বিছানায় চলে যায়।

দিনটা তার কাটে কখনো কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতে, কখনো ডিসেকটিং রুমে—কখনো স্রেফ টোটো করে ঘুরে ঘুরে।

মাঝে মধ্যেই কেমন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত হয়ে পড়ে। সেই সময় মুখে কথা ফোটে না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বসবার ঘরের সোফায় স্ট্যাচুর মত নিশ্চল হয়ে বসে থাকে।

একটার পর একটা দিন কাটে, হোমস্ সম্পর্কে আমার আগ্রহও বাড়তে থাকে। অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই মানুষটার জীবনের লক্ষ্য খুঁজে বার করতে পারিনি। জিজ্ঞেস করলে কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না তার কাছে।

স্ট্যামফোর্ডের কথায় হোমসের জীবন-রহস্য সম্পর্কে যে কৌতূহল জেগেছিল, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দিনে দিনে এমন হল যে তাকে নিয়েই মন নিজের অজান্তেই যেন গবেষণায় নিমগ্ন হল।

নিজে সে পদ্ধতিগতভাবে পড়াশুনা করে কোন প্রকার ডিগ্রি অর্জনের পক্ষপাতী নয়। কিন্তু যে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে ওর আগ্রহ লক্ষ্য করেছি, সে-সব বিষয়ে তার জ্ঞান এত গভীর আর ব্যাপক যে, তাক লেগে যাবার মত।

সব দেখে শুনে এটুকু বুঝতে পেরেছি—মানুষটার জীবনে নির্দিষ্ট কোন গূঢ় লক্ষ্য রয়েছে।

আর তার জন্যই দীর্ঘ টানা পরিশ্রমে নিজেকে এভাবে তৈরি করেছে। সাধারণ খেয়ালের বশে জ্ঞানের ভাণ্ডার সে সমৃদ্ধ করেনি।

তবু আরেকটা দিকও আছে। বিভিন্ন বিষয়ে বিপুল জ্ঞানের অধিকারী এই শার্লক হোমসের অজ্ঞানতার বিষয়টাও রীতিমত আঁতকে ওঠার মত।

সমসাময়িক দর্শন সাহিত্য আর রাজনীতির কোন খবরই সে রাখে না। অকপটে স্বীকার করে টমাস কারলাইল, কিংবা কোপারনিকাসের নাম সে আগে শোনেনি।

সবচেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার হল, পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, এই অতি সাধারণ তত্ত্বটাও তার অজানা। ঠিক সমান ভাবে অজানা—সৌরমণ্ডলের গ্রহের সংখ্যা ও তাদের নাম।

রীতিমত আঁতকে উঠবার মত ব্যাপার।

আমার অবস্থা দেখে হোমস্ হেসে উঠে একদিন বলেছিল, দেখ, মানুষের মগজটা একটা খালি কুঠরি বিশেষ। বুদ্ধিমানরা সেই কুঠরি প্রয়োজনমত আসবাব দিয়ে সাজিয়ে রাখে। বোকার দলই যা-নয়-তাই এনে ঠেসে গুদাম ঘর করে তোলে। আমার কাজের দিক থেকে যা অকাজের তার খবর রেখে লাভটা কি। অকারণে মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করা ছাড়া তো কিছু নয়।

জানা ও অজানার বিষয়ে হোমসের উত্তরটা মাথায় রেখে খেয়ালের বশে একদিন কাগজ কলম নিয়ে বসলাম।

তারপর হোমস্ সম্পর্কে একটা হিসাব এ ভাবে খাড়া করলাম ঃ

সাহিত্যজ্ঞান—শূন্য।

তবে বর্তমান শতাব্দীর যতরকমের অত্যাশ্চর্য রহস্যময় কথা ও কাহিনী, যাবতীয় কণ্ঠস্থ।

দর্শনজ্ঞান—শূন্যের কোঠায়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানেও তদ্রূপ।

রাজনীতি বিষয়ে জ্ঞান—নামমাত্র।

উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে—মোটামুটি খবরাখবর রাখে। বেলেডোনা, আফিং আর বিষবিজ্ঞানে জ্ঞান অসাধারণ।

ভূ-তত্ত্ববিষয়ে—বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বাস্তব জ্ঞান রয়েছে। মাটির চেহারা দেখেই কোনটা কি মাটি বলে দিতে পারে। লন্ডন শহরের কোন অংশে কোন মাটি পাওয়া যায় তা তার নখদর্পণে।

রসায়নবিদ্যায় সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী।

শারীরবিদ্যায় জ্ঞানও ছাড়া ছাড়া তবে নির্ভুল।

বেহালা ভাল বাজায়।

তবে ওই বাজানোটাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আমি যখন শুনতে চেয়েছি—ভাল ভাল সুর বাজিয়ে শুনিয়েছে। সে-সব রীতিমত কঠিন সুর। কিন্তু নিজে যখন বেহালা নিয়ে বসে তখন কোন সুরের তোয়াক্কা না করেই এলোমেলো ভাবে ছড় টেনে যায়।

তরবারি খেলা, লাঠি আর মুষ্টিযুদ্ধে রীতিমত দক্ষতা রয়েছে।

বৃটিশ আইন সম্পর্কে জ্ঞান অতি স্বচ্ছ।

পরের পর এভাবে ফর্দ করে গিয়ে মনে হল, নিরর্থক—এভাবে জ্ঞানের পরিমাণ নিরূপণ করে একটা মানুষের জীবনের লক্ষ্য আবিষ্কার করার চেষ্টা পণ্ডশ্রম ছাড়া কিছু নয়। বিরক্তির সঙ্গে কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

হপ্তা কয়েক কাটতে না কাটতেই আর একটা ব্যাপার নজরে এল। বুঝতে পারলাম, বন্ধুটি আমার মত নির্বান্ধব নয়। বাইরের লোকজন বাড়ি বয়ে তার সঙ্গে রীতিমত দেখাশোনা করতে আসে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে তার পরিচিতি চোখে পড়বার মত।

বেঁটে চেহারার একটা লোক, লেসট্রেড নাম, প্রায়ই আসে। লোকটার মুখ অনেকটা ইঁদুরের মত, গায়ের রঙ ফিকে বাদামী—হপ্তায় তিন চারবার করে আসে।

একদিন সকালে সুবেশা এক তরুণী এল, প্রায় একঘণ্টা কাটিয়ে গেল হোমসের সঙ্গে।

সেইদিনই বিকেলের দিকে এল আধবুড়ো একটা লোক। মাথার চুল সব সাদা, ইহুদী ফেরীওয়ালার মত নোংরা পোশাক গায়ে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আলুথালু বেশে ঘরে ঢুকলেন এক প্রৌঢ়া। মখমল ইউনিফর্ম পরা রেলের একজন কুলিকেও আসতে দেখলাম একদিন।

এই লোকগুলো এলেই হোমস্ তাদের সঙ্গে বসবার ঘরে বসেই নিভৃতে কথা বলতে চাইত। বাধ্য হয়ে আমাকে শোবার ঘরে চলে যেতে হত। হোমস্ অবশ্য প্রতিবারেই আমার অসুবিধার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিত। বলত, কি করব বল, এঁরা আমার মক্কেল, বসবার ঘরেই বসতে হয় এদের নিয়ে।

বাড়িতে মক্কেলের যাতায়াত, তাহলে ব্যবসা একটা কিছু আছে বুঝতে পারলাম। কিন্তু কি ধরনের ব্যবসা? জানবার জন্য ভেতরটা আঁকুপাকু করলেও জিজ্ঞেস করতে পারছিলাম না। বিরক্তও হচ্ছিলাম ভেবে, কি এমন কারণ থাকতে পারে, যার জন্য নিজে যেচে ব্যবসায়ের কথাটা আমাকে বলতে পারে না?

শেষ পর্যন্ত আমাকে আর মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে হল না, নিজে থেকেই

সরাসরি বলে বসল একদিন।

সেদিন একটু আগেই ঘুম থেকে উঠেছিলাম। দু'জন একসঙ্গেই প্রাতরাশের টেবিলে বসেছি। একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। একটা প্রবন্ধের শিরোনামের তলায় পেনসিলের টানা দাগ দেখে সাগ্রহে চোখ বোলালাম লেখাটায়।

দেখলাম অদ্ভুত কিছু সিদ্ধান্তের কথা ব্যক্ত করেছেন লেখক। তার মতে, যথাযথ পর্যবেক্ষণের অভাবে চোখ থেকেও আমরা অনেক কিছু দেখতে পাই না, জানতে পারি না। পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সামান্য বস্তু থেকেও অসাধারণ অনেক কিছু জানা যায়।

যে কোন মানুষের মুহূর্তের ভাব প্রকাশ দেখেই লেখক তার মনের চিন্তা ভাবনা ধরে ফেলতে পারেন। পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণে অভ্যস্ত যে কেউ কোন মানুষের চোখের দৃষ্টি, মুখের ভাব দেখে তার মনের গভীরের চিন্তার কথা বলে দিতে পারে।

বস্তুতঃ যুক্তি ও বিশ্লেষণ—একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি যা দিয়ে নির্ভুল সিদ্ধান্ত লাভ করা যায়। দীর্ঘ অধ্যবসায় ও চর্চার ফলেই এই ক্ষমতা লাভ করা সম্ভব।

একজন মানুষের আঙুলের নখ, কোটের বা শার্টের হাতা, বুটজুতো, প্যান্টের হাঁটু, তর্জনী বা বুড়ো আঙুলের কড়া, চোখ মুখের চাউনি, ইত্যাদি দেখেই অভ্রান্ত ভাবে তার জীবিকা বলে দেওয়া যায়।

হোমস্ যে লেখাটা পড়েছে পেন্সিলের দাগ দেখেই তা বুঝেছি। কিন্তু এমন উদ্ভট বিষয়বস্তুর অবান্তর ও অবাস্তব বিশ্লেষণ কি করে নিঃশব্দে হজম করল বুঝতে পারছি না।

লেখক যথেষ্ট যুক্তি সহকারে তার বক্তব্য বোঝাবার চেষ্টা করেছেন ঠিকই কিন্তু বক্ষ্যমান বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি অতি মাত্রায় অতিরঞ্জিত। কোন মানে হয় না এভাবে সময় নষ্ট করবার। বিরক্তির সঙ্গে ম্যাগাজিনখানা টেবিলে নামিয়ে রাখলাম।

—একরকম অজ্ঞাতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—যত সব। রাবিশ!

—কেন, হল কি। যেন চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল হোমস্।

—লেখাটা তো পড়েছো দেখলাম, মুখ আর চেহারা দেখে কার কি পেশা নাকি বলে দিতে পারেন লেখক। যত্তসব বুজরুকি। এমন অবাস্তব লেখা ছাপা হয় কি করে?

হোমস্ মৃদু হেসে বলল—লেখাটা অবাস্তব মোটেই নয়—তাছাড়া ওটা আমার লেখা। বিষয়টা পর্যবেক্ষণ আর অনুমান—তারপর অবরোহ মূলক বিশ্লেষণের

মাধ্যমে সিদ্ধান্ত—থিওরিটা অবাস্তব মনে হলেও অতিশয় বাস্তব। বিষয়টার ওপর রীতিমত আমার রুজিরোজগার নির্ভরশীল।

—কী রকম বলতো।

—তুমি জান না হয়তো, আমার একটা পেশা আছে। আমি কনসাল্টিং ডিটেকটিভ। পৃথিবীতে আমি ছাড়া এ পেশায় আর কেউ আছে বলে এখনো পর্যন্ত জানি না। লন্ডন শহরে, তুমি নিশ্চয় জান, অনেক প্রাইভেট ডিটেকটিভ আছে, সরকারী ডিটেকটিভ তো রয়েইছে। এরা যখন নিজেদের কেস নিয়ে হালে পানি পায় না, তখন সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে আমার কাছে হাজির হয়। আমি অপরাধ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমার বিদ্যে-বুদ্ধির জোরে ঘটনাগুলো পরপর সাজিয়ে তাদের ঠিক পথের সন্ধান দেখিয়ে দিই।

সব অপরাধের মধ্যেই একটা মিল আছে। অপরাধের ইতিহাস মাথায় থাকলে নতুন অপরাধের রহস্য উন্মোচন করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। লেসট্রেডকে তো তুমি দেখেছো, সম্প্রতি একটা জালিয়াতি কেসে খুবই নাস্তানাবুদ হয়েছে। এত ঘন ঘন সেকারণেই আসা।

হোমসের জীবনের লক্ষ্য, তার পেশা ইত্যাদি নিয়ে আমার আগ্রহ বা কৌতূহল যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা যে এই পর্যায়ের ভাবতে পারিনি। তার অসাধারণ প্রকৃতি ও চালচলনের একটা সামঞ্জস্য যেন পাচ্ছি এতক্ষণে। বললাম, এই যে এত সব লোক আসে—সকলেই কি সমস্যা নিয়ে হাজির হয়?

—সকলেই। প্রাইভেট তদন্ত সংস্থা এদের পাঠায়। আমি ওদের কথা শুনে আমার মন্তব্য প্রকাশ করি। ওদের সমস্যার সমাধান হয়ে যায়—আমার দক্ষিণা আমি পেয়ে যাই।

—তার মানে, অকুস্থলে গিয়ে দেখে শুনে অন্য লোকে যা জানতে পারে না, ঘরে বসে তুমি তা জানতে পার?

—পারি বৈকি। বলতে পার এ ব্যাপারে আমার একটা সহজাত ক্ষমতা আছে, যা অন্য কারুর নেই। তাছাড়া অনেক রকম বিশেষ জ্ঞান আমার আছে। এইসব জ্ঞানের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ ও অবরোহ প্রণালীর বিশ্লেষণ প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান আমি পেয়ে যাই।

এই কথাগুলোই আমি প্রবন্ধে লিখেছি। একটা প্রয়োগ না দেখালে ঠিক ধাঁধাঁ কাটবে না তোমার বুঝতে পারছি। প্রথম সাক্ষাতেই তোমাকে বলেছিলাম, আফগানিস্থান ঘুরে এসেছ, নিশ্চয় মনে আছে? শুনে অবাক হয়েছিলে তুমি।

—তা হয়েছিলাম।

—সেদিনই তোমাকে প্রথম দেখি, সুতরাং কারো কাছে শুনবার কথা নয়। কিন্তু আমি জানতাম তুমি আফগানিস্থান ঘুরে এসেছ।

দীর্ঘদিনের অভ্যাস আর চর্চার ফলে পর পর চিন্তাগুলো মাথায় হাজির হয়েছিল আর পলকের মধ্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম।

এবারে আমার ধারাবাহিক চিন্তা ও যুক্তিগুলো শোন। তোমার দিকে তাকিয়েই দেখলাম, চেহারা ডাক্তারের মত, কিন্তু হাবভাব মিলিটারীর। আর্মি ডাক্তার—একটা পরিচয় বেরুলো।

গায়ের চামড়া পুড়ে স্বাভাবিক রঙ হারিয়েছে—কব্জি বেশ ফর্সা—বুঝলাম, বিষুবরেখা বরাবর কোন জায়গায় তুমি ছিলে।

চোখ মুখ খুব উদ্‌ভ্রান্ত, শীর্ণ দুর্বলতা যুক্ত—অর্থাৎ প্রচণ্ড কষ্টের ছাপ। বাঁ হাতটা অস্বাভাবিক ভঙ্গিমায় আড়ষ্টভাবে উঁচু করা ছিল—জখমের প্রমাণ।

এবারে সমাধান টানলাম এ ভাবে—বিষুবরেখা বরাবর কোন্ অঞ্চলে থাকলে একজন মিলিটারি ডাক্তারের এত কষ্ট সহ্য করা এবং হাত জখম হওয়া সম্ভব? অবশ্যই আফগানিস্থানের রণাঙ্গণে।

এতগুলো পয়েন্টের কথা বলতে সময় লাগল অনেক—কিন্তু সেকেন্ডের মধ্যেই পর্যবেক্ষণের ফলাফলে বিশ্লিষ্ট হয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম, এবং মন্তব্য করেছিলাম তুমি আফগান ফেরত।

হেসে উঠে বললাম, এ যে দেখছি, গল্পের গোয়েন্দার বাস্তব সংস্করণ। এডগার অ্যালান পো'র দুঁপির বা গ্যাবোরিয়'র লেকক-এর মত।

মুখে হাসি ধরে রেখেই শ্লেষের সুরে বলল হোমস্, তোমার প্রিয় গোয়েন্দাদের সঙ্গে আমার তুলনা করছ নিশ্চয় প্রশংসাচ্ছলে। কিন্তু আমার মনে হয় এই দু'জনই অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর গোয়েন্দা। এনার্জি ছাড়া এদের নিজস্ব আর কোন ক্ষমতাই নেই। সুষ্ঠু তদন্তের প্রাথমিক শিক্ষাটুকুই এদের কারো নেই।

কথা বলতে বলতে হোমসের আত্মপ্রত্যয়ের সুর ক্রমশঃই যেন অস্বাভাবিক দৃঢ় হয়ে উঠল। বলল, শুনে আমাকে ভুল বুঝো না যেন। গোয়েন্দাগিরিতে আমার মত পড়াশুনো আর প্রতিভা—বর্তমানে আর কারো মধ্যে পাবে না। অতীতেও কারো ছিল না।

কিন্তু এত সব দুর্লভ ক্ষমতা পেয়েও কোন লাভ হল না। এখন আর তেমন ক্রাইমও নেই—ক্রিমিন্যালও নেই যে মাথা খাটাবার সুযোগ পাব। এখনকার ক্রাইম এতই স্বচ্ছ আর মোটিভ এতই স্পষ্ট যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের যে কোন আনাড়ি অফিসারও অনায়াসে রহস্যের সমাধান করে ফেলতে পারে।

এতক্ষণ যদিও ধৈর্য ধরে শোনা যাচ্ছিল, এবারে অধৈর্য হয়ে উঠলাম। এমন আত্মপ্রশংসা আর দম্ভোক্তি কতক্ষণ শুনতে ভাল লাগে!

কি করে অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যায় ভাবছি, এমন সময় নজরে পড়ল নিচের রাস্তায় উল্টোদিকে একটা লোক বাড়ির নাম্বার দেখতে দেখতে যাচ্ছে।

হাতে একটা নীল রঙের বড় খাম। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ চেহারা, পোশাকেও সাদাসিধে। হোমসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, লোকটাকে দেখো—মনে হয় কোন ঠিকানা খুঁজছে।

—কে, রিটায়ার্ড জাহাজী সার্জেন্টটির কথা বলছ?

উঃ। আবার চালিয়াতি! রাগে বিরক্তিতে চুপ করে রইলাম।

এই সময়ে নিচে দরজায় টোকা পড়ল। পরক্ষণেই গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর—তারপর ভারী পদশব্দে কেউ যেন ওপরে উঠে আসছে।

চিঠি হাতে রাস্তার সেই লোক।

আমি নড়েচড়ে বসলাম। এবারে পরীক্ষাটা হাতে-নাতে হয়ে যাবে। একেবারে মোক্ষম সুযোগ।

লোকটা ঘরে ঢুকে লম্বা খামখানা হোমসের দিকে বাড়িয়ে দিল—মিঃ শার্লক হোমসের চিঠি।

সঙ্গে সঙ্গে নম্র গলায় আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওহে, কী কাজ কর তুমি?

—আজ্ঞে দরোয়ানি। উর্দিটা রেখে এসেছি।

হোমসের দিকে এক পলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম, আগে কিছু করতে?

—রয়াল মেরিন লাইট ইনফ্যান্ট্রিতে ছিলাম। সার্জেন্ট। বলতে বলতে বুট ঠুকে স্যালুট করে বিদায় নিল জাহাজী সার্জেন্ট।

আমি থ' হয়ে রইলাম।

বন্ধুবরের পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ-থিওরির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে ধন্দ খানিকটা কাটল, মুগ্ধ শ্রদ্ধায় ফিরে তাকালাম হোমসের দিকে। ততক্ষণে চিঠি পড়া শেষ হয়েছে তার, তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছে। জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, বুঝলে কী করে বল তো?

ভ্রূ কুঞ্চিত হল হোমসের কথাটা কানে যেতে। পরক্ষণেই স্মিত হেসে বলল, তলিয়ে যাচ্ছিলাম, বল কি বলছিলে?

—লোকটা জাহাজের রিটায়ার করা সার্জেন্ট বুঝলে কি করে? আমি তো বুঝতে পারলাম না।

—অ। এ-ও সেই পর্যবেক্ষণ আর বিশ্লেষণ। শোন তবে, লোকটা যখন রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্নভাবে বাড়ির নম্বর দেখছিল, তখনই তার হাতের উল্টো দিকের উল্কি চিহ্নটা চোখে পড়েছিল। নীল রঙের বিরাট একটা নোঙর।

গালপাট্টা জোড়াও জাহাজী নাবিকের মত—চলাফেরা হাবভাবে মিলিটারী ধাঁচ—এভাবে পাওয়া গেল জাহাজ আর সমুদ্র।

চলা ফেরায় কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভাব—চলেও মাথা বেঁকিয়ে—ছড়ি দুলিয়ে চলার

কায়দায়। মুখভাব থেকে পাওয়া গেল দৃঢ় সংকল্পের ছাপ—এদিকে মধ্য বয়স্ক। সব মিলিয়ে যা পেলাম তাই বলেছি—

—অদ্ভুত—সত্যই অদ্ভুত।

সপ্রশংস অভিব্যক্তি শুনে খুশি হল হোমস্। মুখভাব দেখেই বুঝতে পারলাম। সদ্য পাওয়া চিঠিটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, পড়—পড়ে দেখ। ক্রিমিন্যালের অভাব হয়েছে বলে দুঃখ করেছিলাম তো—শোনা যাক চিঠিটা, জোরে পড়।

চিঠিটা পড়ে শোনালাম হোমসকে ঃ

প্রিয় মিঃ শার্লক হোমস,

আপনার সাহায্য প্রার্থনা করে এই চিঠি লিখছি। কাল রাতে লরিস্টন গার্ডেন্সের ৩নং বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। বাড়িটা খালিই পড়ে ছিল। রাত দুটোয় বিটের কনস্টেবল আলো দেখতে পেয়ে বাড়িতে ঢোকে। দরজা খোলাই ছিল, আসবাবহীন ঘরের মেঝেয় পড়েছিল সুবেশ এক ব্যক্তির মৃতদেহ। পকেটের কার্ড থেকে নাম জানা যায়—এনক জে. ড্রেম্বার; ক্লীভল্যান্ড, ওহিও, যুক্তরাষ্ট্র। ঘরে রক্তের দাগ রয়েছে, কিন্তু মৃতদেহের গায়ে কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় নি। লোকটা এখানে কি করে এল, মারা গেল কিভাবে তার কোন চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না। গোটা ব্যাপারটাই রহস্যাবৃত। ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছি না। আমি অপেক্ষা করছি, বারোটার আগে দয়া করে আসবার চেষ্টা করবেন। আপনি না আসা পর্যন্ত ঘরের কিছুই নড়াচড়া করা হবে না। সাক্ষাতেই বিশদ বিবরণ জানাব।

—আপনার বিশ্বস্ত
টোবিয়াস গ্রেগসন

—সাংঘাতিক চিঠি। পড়া শেষ করে আতঙ্কমিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকালাম হোমসের দিকে।

হোমস স্মিত হেসে শান্ত স্বরে বলল, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাদের মধ্যে দুজনই স্মার্ট ডিটেকটিভ আছেন—একজন লেসট্রেড আর অন্যজন এই গ্রেগসন। দুজনেই চটপটে উৎসাহী—কিন্তু চিন্তা ভাবনায় খুবই গতানুগতিক। আবার দুজনের রেষারেষিও উপভোগ করবার মত। সুযোগ পেলেই আড়ালে একজন আর একজনের পিণ্ডি চটকায়। এ কেসে দুজন মাথা গলালে রগড় জমবে ভাল।

এমন একটা কেসে হোমসের সঙ্গী হবার আগ্রহ বোধ করলাম। বললাম—আর দেরি করছ কেন, চল, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, আমার সাহায্য প্রার্থনা করেছে বটে গ্রেগসন। কিন্তু ব্যাপার স্যাপার জানি বলে খুব একটা আগ্রহ বোধ করছি না। কি লাভ গিয়ে—রহস্যের

সমাধান হয়তো করবো আমি, কৃতিত্বটা নেবে সরকারী গোয়েন্দা গ্রেগসন আর লেসট্রেড। এ সব জটিল ব্যাপারে গ্রেগসন আমাকে গুরু বলে স্বীকার করে বটে কিন্তু প্রকাশ্যে কখনো আমাকে উঁচু স্থান দেবে না। যাইহোক, কৌতূহল যখন তোমারও জেগেছে চল যাওয়া যাক।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই দু'চাকার ঘোড়ার গাড়িতে দুজনে রওনা হলাম।

রাতের কুয়াশা তখনো বাড়ির মাথায় মাথায় চেপে আছে। আকাশও মেঘাচ্ছন্ন। গতরাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে—সেই রেশ এখনো কাটেনি।

অদ্ভুত চরিত্র হোমসের। গাড়িতে যেতে যেতে যে কাজে যাচ্ছে সে সম্পর্কে একটা কথাও উচ্চারণ করল না। সারা রাস্তাটা নানান বেহালার গুণাগুণ বর্ণনা করে গেল।

আমার বিস্মিত জিজ্ঞাসা শুনে হেসে জবাব দিল—ভাবনার উপাদান সাক্ষ্যপ্রমাণ হাতে না আসা পর্যন্ত মাথা ঘামানো উচিত নয়। সিদ্ধান্ত একপেশে হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে।

গাড়ি এসে থামল ৩নং লরিস্টন গার্ডেনসের বাড়ির সামনে। রাস্তা থেকে একটু ভেতরে পরপর চারখানা বাড়ি।

শেষের দিকের দুখানায়—৩নং এবং ৪নং বাড়িতে লোক থাকে না। কাচের জানালায় ঝুলছে টু লেট নোটিশ।

রাস্তা আর বাড়ির মাঝে আগাছা ভরা বাগান। বাগানের কাঁকড় বিছানো রাস্তা হলদেটে কাদায় প্যাচপেচে, তিন ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একজন কনস্টেবল—তাকে ঘিরে কৌতূহলী লোকের জটলা।

গাড়ি থেকে নেমেই কিন্তু হোমস্ সরাসরি বাড়ির ভেতরে ঢুকল না। নিরুদ্বিগ্ন ভাবে ফুটপাতে পায়চারি করতে লাগল।

বুঝলাম—পর্যবেক্ষণ চলছে তার। নিজেকে জাহির করবার ভাবও কি কাজ করছে না সেই সঙ্গে! মনে মনে হাসলাম আমি। লক্ষ্য করতে লাগলাম ওর কাণ্ডকারখানা।

পর্যবেক্ষণ শেষ করে বন্ধুবর খানিক পরেই রাস্তার কিনারের ঘাসের ওপর দিয়ে বাড়ির দিকে এগুতে লাগল। কিন্তু চোখ ধরে রাখল রাস্তার ওপর।

কর্দমাক্ত পথে অজস্র পায়ের ছাপ। পুলিশের যাতায়াতের চিহ্ন নিশ্চয়ই। এর মধ্যে হোমস্ কি খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই জানে।

চলতে চলতে দুবার থামল—হাসল—তারপর অস্ফুটে আপন মনে চেঁচিয়ে উঠল। উৎফুল্ল হবার মত কিছু পেয়েছে নিশ্চয়ই—যা আমার চোখে পড়েনি।

দোরগোড়াতেই দেখা হল দীর্ঘকায় সাদামুখো গ্রেগসনের সঙ্গে। হাতে একটা

নোট বই।

এগিয়ে এসে হোমসের করমর্দন করে গদগদ কণ্ঠে বলে উঠল—কৃতার্থ হলাম। সবই যেমনকার তেমন রেখে দিয়েছি আপনার জন্য।

—কিন্তু রাস্তাটার হাল কি হয়েছে দেখেছ? লেসট্রেড কোথায়?

—ভেতরেই আছে।

—বাঃ বাঘা গোয়েন্দা দুজনেই তো হাজির রয়েছ দেখছি—আমাকে ডেকেছ বৃথাই। বলতে বলতে আমার দিকে ভুরু তুলে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি ফেলল হোমস।

গ্রেগসন প্রসন্ন হেসে বলল, ঠিক ঠিক সবই করেছি—কিন্তু কেসটা বড্ড গোলমেলে।

—তোমরা দুজনেই কি ঘোড়ার গাড়িতে চেপে এসেছ?

—আজ্ঞে না।

বলতে বলতে হোমস বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকল। পেছনে পেছনে চলল গ্রেগসন।

লম্বা করিডোরের শেষপ্রান্তে একটা ঘরে ঘটেছে ঘটনাটা। হোমসের পেছনে পেছনে আমিও গিয়ে ঢুকলাম ঘরে।

চৌকোণা বেশ বড়সর ঘর। আসবাবহীন। লাল রং-এর কাগজে মোড়া দেওয়াল। মাঝে মাঝে ছিঁড়ে গিয়ে ঝুলছে—ফাঁক দিয়ে হলদে পলস্তারা চোখে পড়ছে।

দরজার উল্টোদিকে ফায়ার প্লেস, নকল সাদা পাথর দিয়ে চারদিক বাঁধানো। এরই ওপরে একপাশে বসানো লাল গালার মোমবাতির অংশ। ঘরে একটিমাত্র জানালা নোংরায় ঢাকা—ঘরেও সর্বত্র ধূলির পলস্তারা।

মেঝের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে নিশ্চল একটা দেহ। চোখ খোলা দেখে মনে হয় যেন কড়ি কাঠের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

গোড়া থেকেই খুঁটিয়ে সব দেখতে শুরু করলাম। সেইভাবেই মৃতদেহের দিকে তাকালাম।

বয়স পঁয়তাল্লিশের মধ্যে, চওড়া কাঁধ, মাথায় কোঁকড়ানো খাটো চুল, গালে মোটা শক্ত দাড়ি, পরনে ভারী কাপড়ের ফ্রক কোট আর ওয়েস্ট কোট, হাল্কা রঙের ট্রাউজার্স।

কলার কাফ বেশ পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটি। বুরুশকরা টপ হ্যাটটা দেহের পাশে মেঝের ওপর বসানো। দুই বাহু দু পাশে ছড়ানো, হাত মুষ্টিবদ্ধ। যেন মৃত্যুর আগে তীব্র যন্ত্রণা সয়েছে। বিকৃত বিভীষিকাময় মুখে সে ছাপ স্পষ্ট।

রণাঙ্গণে মৃত্যুর অনেক রূপ আমি দেখেছি—কিন্তু এমন ভয়াবহ মৃত্যুদৃশ্য

আগে কখনো দেখিনি।

ক্ষীণবপু লেসট্রেড এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল আমাদের দুজনকেই। হোমস্ জিজ্ঞেস করল, সূত্রটুত্র কিছু উদ্ধার করতে পারলে?

—কিছুই না, বড্ড গোলমেলে—

মৃতদেহের পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল হোমস্, খুঁটিয়ে দেখে বলল, চারপাশে রক্তের দাগ রয়েছে দেখছি।

—শরীরে কিন্তু কোথাও চোট নেই—ভাল করে দেখেছি। দুই ডিটেকটিভই সমস্বরে বলে ওঠে।

—তাহলে এ রক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তির, সম্ভবতঃ হত্যাকারীর।

হোমস্ কথা বলতে বলতে দ্রুত চঞ্চল হাতে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে পরীক্ষা শেষ করল। সব শেষে মড়ার ঠোঁট পর্যন্ত শুঁকল। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বলল, আর কিছু দেখার নেই, মর্গে পাঠিয়ে দিতে পারো।

গ্রেগসনের হুকুমে তখনই চারজন লোক এসে লাশ স্ট্রেচারে তুলে ঘরের বাইরে চলে গেল।

লাশ তুলবার সময় একটা নতুন জিনিস পাওয়া গেল। ঠং করে একটা আংটি মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে লেসট্রেড ছোঁ মেরে সেটাকে তুলে নিল।

—এতো দেখছি বিয়ের আংটি—কনের আঙুলে থাকে।

সকলেই দেখলাম, সোনার ছোট রিংটা। লেসট্রেড বলল, মেয়েছেলেও জড়িয়ে আছে দেখছি এ কেসে।

—আরো গাড্ডায় পড়া গেল। হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গীতে বলল গ্রেগসন।

হোমস্ বলল—লাশের পকেটে কিছু পাওয়া গেছে?

গ্রেগসন সিঁড়ির নিচে জড়োকরা কয়েকটি বস্তু দেখিয়ে বলল—এখানেই সব আছে। সব কিছুর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল দুটো চিঠি—একটা লেখা হয়েছে কোন এক ড্রেবারকে, অন্যটা জোসেফ স্ট্যানজারসনকে।

—ঠিকানাটা?

জিজ্ঞেস করল হোমস্ সিঁড়ির তলার জিনিসগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে।

—স্ট্র্যান্ডের আমেরিকান একসচেঞ্জের ঠিকানায় লেখা—দুটোই এসেছে গুইয়ন স্টীম শিপ কোম্পানি থেকে। লিভারপুল থেকে জাহাজ ছাড়বার খবর।

—স্ট্যানজারসন সম্পর্কে খোঁজখবর করেছ কিছু?

গ্রেগসন বলল, সঙ্গে সঙ্গে সবকটা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিয়েছি। আমেরিকান একচেঞ্জে লোকও পাঠিয়েছি। ক্লিভল্যান্ডেও সকালেই টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ঘটনার বিবরণ জানিয়েছি।

—সেকী। আসল পয়েন্ট সম্পর্কে কিছুই জানতে চাওনি? হোমসের চোখে

কৌতুকের ঝিলিক।

এই সময়ে বাইরের ঘর থেকে লেসট্রেড এসে সোল্লাসে বলে উঠল,—মিঃ হোমস্, দেয়ালে এইমাত্র একটা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হয়েছে—আসুন।

লাশ আগেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ঘর থেকে। আমরা সকলেই ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। লেসট্রেড দেখাল—কাগজ উঠে যাওয়া দেয়ালের হলুদ প্লাস্টারের ওপর রক্তের অক্ষরে লেখা একটি মাত্র শব্দ—RACHE.

—দেখুন, লেখা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে। খুনী নিশ্চয়ই নিজের রক্ত দিয়ে লেখেনি। আত্মহত্যার কেস যে এটা নয় পরিষ্কারই বোঝা যায়। সাড়ম্বরে জাহির করল লেসট্রেড।

প্রতিপক্ষ গ্রেগসন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—এই শব্দ থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

—তা কেন, RACHEL নামটা লিখতে গিয়ে বাধা পাওয়ায় RACHE পর্যন্ত লেখা হয়েছে। নামটা মেয়েছেলের। অনেক কিছুরই আভাস এ থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ডিটেকটিভের কান্ড দেখে মৃদু মৃদু হাসছিল হোমস্।

এবার বলল—খুনীর নিজের হাতে লেখা শব্দটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে তোমারই লেসট্রেড। ঘরটা কিন্তু দেখা হয়নি আমার—

বলতে বলতে হোমস্ পকেট থেকে টেনে বার করল একটা মাপবার ফিতে আর একটা মস্ত গোলাকার আতস কাঁচ। তারপর ঘরময় শুরু হল তার নিঃশব্দ সঞ্চরণ।

কখনো উঁচু হয়ে, কখনো হাঁটু গেড়ে বসে, কখনো মেঝের ওপর সটান নুয়ে পড়ে কত কী খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। আর হাতের ফিতে দিয়ে মাপজোক করল।

কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আমি। অবাক চোখে কেবল তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।

দেওয়ালেও ফিতে ফেলে কি মাপল। একসময় মেঝে থেকে ধূসর ধুলোর একটা ছোট্ট স্তূপ তুলে কাগজে মুড়ে পকেটে রাখল।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে নিঃশব্দে নিজের মনে কাজ করে গেল আর মুখে চলল অস্ফুট বকবকানি।

সব শেষে আতস কাঁচ তুলে দেওয়ালের লেখাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা ভাবে দেখল। তারপর বেশ সন্তুষ্ট মুখে সরঞ্জাম দুটো পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

দুই গোয়েন্দা অপেক্ষা করেই ছিল। সমস্বরে বলে উঠল—কিছু বুঝতে পারলেন?

—তোমরা যথাসম্ভব নিখুঁত ভাবেই তো কাজ করে চলেছ দেখছি। প্রয়োজন

মত আমার সহযোগিতা ঠিকই পাবে। লাশ যে আবিষ্কার করেছিল তার ঠিকানাটা দাও, একবার কথা বলতে হবে তার সঙ্গে।

লেসট্রেড নোটবই খুলে বলল—জন রান্স, এখন ডিউটিতে নেই। কেনিংটন পার্ক গেটে ৪৩ নম্বর অডলি কোর্টে গেলেই পাওয়া যাবে।

ঠিকানাটা টুকে নিয়ে হোমস্ আমার দিকে তাকিয়ে বলল—চল ডাক্তার। পরে একটু থেমে হতভম্ভ দুই ডিটেকটিভের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, তোমাদের তদন্তে সুবিধার জন্য দু একটা কথা বলে যাই শোন—কেসটা খুনের—খুনী একজন পুরুষ—মাথায় ছ'ফুটেরও বেশি ঢ্যাঙা। চৌকোনা মুখ—বুট জুতো পরে, ত্রিচিনোপল্লী চুরুট খায়। যে খুন হয়েছে তার সঙ্গে এক ঘোড়ায় টানা চার চাকার গাড়ি চেপে এসেছিল এখানে। ঘোড়ার সামনের পায়ের একটা নাল নতুন—বাকিগুলো পুরনো। হত্যাকারীর মুখ উজ্জ্বল লালচে রঙের—ডান হাতের আঙুলের নখ বেশ বড়।

বিবরণ শুনে দুই ডিটেকটিভ হতভম্ব হলেও তাদের চোখে মুখে দেখা গেল অবিশ্বাসের ছাপ। হেসে দুজন দুজনের দিকে তাকায়। পরে লেসট্রেড বলে—কিন্তু কি করে খুন হলো তা তো বললেন না।

—বিষ—বিষ দিয়ে খুন করা হয়েছে হে। বলতে বলতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে হোমস্। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলল—আর একটা কথা লেসট্রেড, মিস র‍্যাচেলকে খুঁজতে গিয়ে পণ্ডশ্রম করো না। RACHE একটা জার্মান শব্দ—মানে হল প্রতিশোধ।

বেলা একটা নাগাদ তিন নম্বর লরিস্টন গার্ডেন্স থেকে বেরুলাম আমরা। হোমস্ প্রথমেই কাছের টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে একটা দীর্ঘ টেলিগ্রাম পাঠাল। তারপর গাড়ি ডেকে ঠিকানাটা বলে চেপে বসল।

হোমসের শেষের দিকের কথাগুলো শুনে আমিও তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম। এতসব কথা বলল কি করে ও! না কি একটা চাল দিয়ে এল?

চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলাম, মানুষ দুটোকে তো জব্বর ধাঁধায় ফেলে এলে—কিন্তু এতসব কথা বললে কি করে?

হোমস্ বলল, যা জেনেছি তাই বলে এসেছি—এ কেস আমার কাছে এখন পরিষ্কার। শোন, অকুস্থলে পৌঁছে প্রথমেই নজরে পড়ল গাড়ির চাকার দাগ—ফুটপাত ঘেঁসে দু'সারি দাগ স্পষ্ট।

গত সাত দিনের মধ্যে কাল রাতেই বৃষ্টি হয়েছে। গ্রেগসন বলেছে সকালের দিকে বাড়ির সামনে কোন গাড়ি ছিল না—ওরাও গাড়ি চেপে আসেনি। কাজেই চাকার গভীর দাগ কাল রাতের বৃষ্টির পরেই পড়েছে।

ঘোড়ার খুরের দাগও কাদায় স্পষ্ট হয়ে আছে—তিনটে অস্পষ্ট—একটা

স্পষ্ট—ওটাই নতুন নাল। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় ওই গাড়ি চেপেই গভীর রাতে দুজন এসেছিল এ বাড়িতে।

—খুবই সহজ ব্যাপার দেখছি—কিন্তু খুনীর বিবরণ কী করে দিলে?

—ওটা মাপজোকের ব্যাপার। তবু শুনে রাখ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লম্বা লম্বা পা ফেলার মাপ থেকে মানুষটা লম্বায় কতটা তা বলে দেওয়া যায়।

লোকটার পায়ের ছাপ জায়গায় জায়গায় পাওয়া গেছে—বাইরের কাদায় আর ঘরের ভেতরের ধুলোয়।

আমার হিসেবটা যাচাই করেও নিয়েছি। দেওয়ালের গায়ে লেখবার সময় মানুষ মাত্রই চোখের লেভেলে লেখে। লেখাটা হয়েছে মেঝে থেকে ছ ফুট উঁচুতে।

এবারে বয়স? সাড়ে চার ফুট পদক্ষেপে বাগানের রাস্তাটুকু হেঁটে এসেছে লোকটা। একজন পূর্ণ যৌবনের মানুষ ছাড়া এভাবে হাঁটা আর কার পক্ষে সম্ভব?

যে খুন হয়েছে তার পায়ে পেটেন্ট চামড়ার বুট নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ? চৌকোনা বুটের পাশে ছোট পদক্ষেপে হেঁটেছে পেটেন্ট চামড়ার বুট।

খুবই সরল হিসাব ওয়াটসন। পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ আর সিদ্ধান্ত—প্রবন্ধটাতে যা যা লিখেছি এ সবেরই বাস্তব প্রয়োগ তুমি দেখতে পেলে। আর কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে বল।

শুনতে শুনতে হোমসের প্রতি ক্রমশই শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছিল। বললাম—আঙুলের নখ আর ত্রিচিনোপল্লী ব্যাপারটা পরিষ্কার কর।

—শব্দটা দেওয়ালে লেখা হয়েছে রক্তে আঙুল ডুবিয়ে। আঙুল পুরুষমানুষের। আতস কাঁচে পরীক্ষা করে দেখলাম লিখতে গিয়ে প্লাস্টারেও আঁচড় লেগেছে। নখ লম্বা থাকলেই ওভাবে আঁচড় পড়া সম্ভব।

মেঝে থেকে খানিকটা ছাই কুড়িয়ে নিয়েছিলাম নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ। কালচে রং-এর ছাই স্তরে স্তরে সাজানো। একমাত্র ত্রিচিনোপল্লী চুরুটেই এমনি ছাই হয়। চুরুট বা তামাকের ছাই নিয়ে আমার বিশেষ পড়াশোনা আছে। বিষয়টা নিয়ে আমি প্রবন্ধও লিখেছি।

যে কোন চুরুট বা তামাকের ছাই দেখেই আমি পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি এবং ব্রান্ডের নামও বলে দিতে পারি। লেসট্রেড-গ্রেগসন কোম্পানির সঙ্গে খাঁটি ডিটেকটিভের তফাৎ এখানেই।

হোমসের লেখা প্রবন্ধের বিষয়বস্তু অসম্ভব অবাস্তব বলে মন্তব্য করেছিলাম। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ দেখে স্তম্ভিত হলাম। একবর্ণও বাড়িয়ে লেখেনি ও। কিন্তু এই কেসের অনেক কিছুই এখনো পর্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে—সে-সব রহস্য ভেদ করবে কি করে।

পাড়ার মধ্যে বাড়িটা ফাঁকা পড়ে ছিল—এই বাড়িতে দুজন এল কি মতলবে? গাড়ির কোচোয়ান গেল কোথায়? ঘরে এত রক্তই বা এল কোত্থেকে।

ডাকাতির কোন চিহ্ন নেই—তাহলে হত্যার উদ্দেশ্যটা কি? মেয়েছেলের হাতের বিয়ের আংটিই বা এল কোত্থেকে? তার ওপর, সরে পড়বার আগে হত্যাকারী RACHE শব্দ লিখল কি উদ্দেশ্যে? চিন্তাগুলো মাথায় কিলবিল করতে লাগল।

হোমস্ বলল, অস্পষ্ট এখনো অনেক কিছুই, তবে মূল বিষয়গুলো উদ্ধার করেছি। RACHE লেখাটা স্রেফ পুলিশকে ধোঁকা দিয়ে বিপথে চালিত করার একটা ফিকির মাত্র।

খাঁটি জার্মান ল্যাটিন ছাঁদে লেখে—কিন্তু A অক্ষরটা পরিষ্কার জার্মান ছাঁদে লেখা। আরো শুনবে? পায়ের ছাপ বিশেষভাবে পরীক্ষা করে বুঝেছি পেটেন্ট চামড়ার বুট আর চৌকোনা-মুখ বুট একই গাড়িতে এসে পাশাপাশি হেঁটে বাড়ির ভেতর ঢুকেছে—দুই বন্ধু যেভাবে হাঁটে।

ঘরের মধ্যে ঢোকার পর পেটেন্ট চামড়া একজায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেছে, চৌকোনা বুট ঘরময় পায়চারী করেছে।

ক্রমশঃ বেশি লম্বা হয়ে পড়েছে পা—বোঝা যাচ্ছে পায়চারী করতে করতে নিজেকে উত্তেজিত করেছে—খুনের প্রস্তুতি নিয়েছে। এর পরেই হয়ত সঙ্গীকে খুন করেছে।

প্রমাণের সঙ্গে যেটুকু অনুমান মিশে আছে আমার এই সিদ্ধান্তে—এবারে চটপট সেটা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

ভেতরে যখন আমরা কথায় ব্যস্ত, তখন গাড়ি ছুটে চলেছে একটা নোংরা বিষণ্ণ গলির ভেতর দিয়ে।

দু'পাশে সারি সারি অসংলগ্ন যাচ্ছেতাই দেখতে সব বাড়ি। ছেঁড়া নোংরা পোশাক পরা বাচ্চার পাল ছুটোছুটি করছে।

গাড়ি এসে দাঁড়াল ছেচল্লিশ নম্বর বাড়ির সামনে। অডলি কোর্ট। দরজায় তামার পাতে খোদাই করা জন রান্সের নাম।

রান্স দিবানিদ্রা উপভোগ করছিল।

স্বভাবতই খবর পেয়ে বিরক্ত হবার কথা। হোমস্ আগেভাগেই সে-ব্যবস্থা করে রাখল। একটা আধাগিনি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

রান্স এসে আমাদের আগমনের কারণ জানতে পেরে হাসিমুখে ঘরে নিয়ে বসাল। তারপর হোমসের হাতের দিকে তাকিয়ে বলল—যা যা ঘটেছিল—গোড়া থেকেই বলছি শুনুন।

রাত দশটা-ছটার ডিউটিতে ছিলাম। রাত দশটায় শুরু হয় বৃষ্টি। হল্যান্ড গ্রোভ

বীটের কনস্টেবল হ্যারি মার্চারের সঙ্গে দেখা হতে খানিকক্ষণ গল্প করলাম হেনরিয়েটা স্ট্রীটে দাঁড়িয়ে।

আন্দাজ রাত দুটোর একটু পরে ব্রিক্সটন রোডে টহল দিতে এলাম। রাস্তা ফাঁকা ছিল। লরিস্টন গার্ডেন্সের দুটো বাড়িতে লোকজন থাকে না জানতাম।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা বাড়ির জানালায় আলো দেখে কেমন সন্দেহ হল স্যার। বাড়িটা এমন খাঁ খাঁ করছিল যে দরজার সামনে পর্যন্ত গিয়েও ভেতর ঢুকতে সাহস পেলাম না।

মার্চারকে ডেকে নিয়ে যাব ভেবে রাস্তায় ফিরে এলাম। কিন্তু মার্চার ততক্ষণে লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে কোন গলিতে ঢুকে পড়েছে। রাস্তায় লোকজনও কাউকে দেখতে পেলাম না। ফিরে এসে একাই দরজা ঠেলে বাড়িতে ঢুকলাম।

যে ঘরে আলো জ্বলছিল—উঁকি দিয়ে দেখি—উবু হয়ে একটা লোক পড়ে আছে মাটিতে। ম্যান্টল পিসে লাল মোমবাতি জ্বলছিল—চোখে পড়ল ঘরময় রক্ত ছিটনো।

দরজায় ছুটে এসে বাঁশি বাজালাম। শুনতে পেয়ে মার্চার আরো দুজনকে নিয়ে দৌড়ে এল।

—তখনো কি রাস্তা ফাঁকাই ছিল—কোন রকম লোকই চোখে পড়েনি?

—না স্যার, তবে একটা মাতাল দেখেছি। রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে আর বেদম কাঁদছে—কাঁদতে কাঁদতে কখনো গান করছে।

—মাতাল? মুখটা দেখেছিলে? গায়ে কি ছিল?

—আমি আর মার্চার ধরাধরি করে খাড়া করে দিয়েছিলাম লোকটাকে। তখনই নজরে পড়ল চেহারাটা, লালমুখো তালঢ্যাঙা লোক। গায়ে ব্রাউন ওভারকোট।

—তারপর কি করলে?

—তখন তো নষ্ট করবার মত সময় ছিল না।

—লোকটার হাতে চাবুক-টাবুক ছিল? কিংবা পথের পাশে গাড়ি?

—না স্যার, ওসব কিছু দেখিনি।

আর কথা বাড়াল না হোমস। উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে আধাগিনিটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল—ব্যস, ওতেই হবে। এবারে চলি। কিন্তু রান্স, প্রমোশনের একটা মস্ত সুযোগ তুমি কাল রাতে বুদ্ধির দোষে হারালে। যে মাতালটাকে ধরে তুলেছিলে, এ রহস্যের নায়ক সে-ই। কাল রাতেই সার্জেন্টের স্ট্রাইপ তুমি পেয়ে যেতে—যদি সামান্য একটু বুদ্ধি খরচ করতে।

হতভম্ব রান্সের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে এসে বসলাম আমরা। গাড়ি এবারে বাড়ির দিকে চলল।

খুনীর চেহারার যে বিবরণ হোমস দিয়েছিল, মাতাল লোকটার চেহারার সঙ্গে

তা মিলে গেছে।

কিন্তু লোকটাই যদি খুন করে থাকে তাহলে গা ঢাকা দেবার পর আবার ফিরে এসে মাতালের অভিনয় করল কেন?

চলতে চলতে কথাটা হোমস্‌কে জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।

হোমস্ বলল—ভায়া, এই লোকটাকেই খুঁজে বার করতে হবে আমাদের। রান্স লোকটা যদি গর্দভ না হত, তাহলে আসামী এতক্ষণে আমাদের হাতের মুঠোয় থাকত। লোকটাকে ফিরে আসতে হয়েছিল ওই আংটির জন্য। মুহূর্ত কয়েক নীরব থেকে আবার বলল, আর এখন এই আংটির টোপ ফেলেই ঠিক কব্জা করব তাকে দেখো।

সকালে যথেষ্ট ধকল গেছে দুর্বল শরীরের ওপর দিয়ে। বিকেলে আর বেরুলাম না। হোমস্ বেরিয়েছিল কনসার্ট শুনতে। ঘরে বসে কোন কাজে মন বসাতে পারিনি।

হোমসের বিশ্লেষণ থেকে থেকে ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়। লাশের মুখ শুঁকে দেখেছিল হোমস্। তাই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলেছে খুনটা হয়েছে বিষ প্রয়োগে।

তাই যদি হবে তাহলে ঘরময় ছিটনো রক্ত কার? মৃতের দেহে কোন অস্ত্রাঘাতের চিহ্নও ছিল না।

শেষ পর্যন্ত এই চিন্তাসূত্রেই ঘুরপাক খেতে লাগল আমার মন। হাবেভাবে যা বুঝতে পেরেছি, মনে হচ্ছে এই রহস্যের সমাধান অনেক আগেই ছকে নিয়েছে হোমস্।

ও ফিরে এলে বেশ রাত করেই ডিনারের টেবিলে বসলাম।

আমার মুখ দেখেই মনের অবস্থা ঠিক আঁচ করতে পারল। বলল, ব্রিক্সটন রোড-রহস্য দেখছি বেশ কাবু করে ফেলেছে তোমাকে। সান্ধ্য দৈনিকে খবরটা ছেপেছে। তবে আংটি গড়িয়ে পড়ার ঘটনাটার উল্লেখ করেনি। তাতে আমার অবশ্য সুবিধাই হয়েছে।

বলতে বলতে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিল। তারপর বলল, বিজ্ঞাপনটা দেখ। আজ সকালেই ঘটনাটা দেখে আসার পর সবকটা কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

হারানো প্রাপ্তি স্তম্ভ খুলতেই নজরে পড়ল প্রথম বিজ্ঞাপনটা :

> 'হোয়াইট হার্ট মদ্যশালা আর হল্যান্ড গ্রোভের মাঝের রাস্তা
> ব্রিক্সটন রোডে আজ সকালে একটা সোনার আংটি পাওয়া গেছে।
> ২২১বি বেকার স্ট্রীটে ডাঃ ওয়াটসনের সঙ্গে আজ সন্ধ্যা আটটা
> থেকে নটার মধ্যে সাক্ষাৎ করুন।'

—বিজ্ঞাপনে তোমার নামটা বাধ্য হয়ে ব্যবহার করতে হয়েছে ভায়া—বুঝতেই

পারছ।

—কিন্তু আংটিটার কি হবে? ওটা তো আমার কাছে নেই। তাছাড়া বিজ্ঞাপনে কেউ সাড়া দেবে বলে মনে হয় না। যথেষ্ট ঝুঁকির ব্যাপার নয় কি এটা?

পকেট থেকে একটা আংটি বার করে আমার হাতে দিয়ে হোমস্ বলল—এতেই কাজ হাসিল করব। আমার ধারণা যদি ঠিক হয় তাহলে আংটি ফেরত পাওয়ার জন্য সে আসতে বাধ্য।

ড্রেবারের মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে আংটিটা পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল তার—টের পায়নি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পরে বুঝতে পেরে ছুটে এসেছিল। কিন্তু পুলিশ দেখে ঢুকতে পারেনি।

মোমবাতি নেভাতে ভুলে গিয়েছিল—পুলিশ হাজির হয়েছিল সেই আলো দেখে। পুলিশের যাতে সন্দেহ না হয় সেজন্যেই গেটের পাশে পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ মদ্যপের অভিনয় শুরু করে।

আংটি পাওয়া হল না—এবার তার পক্ষে কি করা স্বাভাবিক কল্পনা কর। রাস্তায় পড়েছে কি মৃতদেহের পাশে পড়েছে—এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়।

পথে কোন জিনিস কুড়িয়ে পেলে লোকে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়—সেই আশায় সান্ধ্য দৈনিকের বিজ্ঞাপনের স্তম্ভে চোখ থাকবে তার—এটাই তো স্বাভাবিক ঘটনা।

এবারে বিজ্ঞাপনটা তার চোখে পড়বে এবং নিশ্চিত তাকে আসতে হবে। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই এসে পড়বে দেখো। খুনের সঙ্গে আংটির সম্পর্কের কথা তার মাথায় আসবার কথা নয়। সুতরাং প্রস্তুত হও ভায়া।

হোমসের নির্দেশে শোবার ঘরে গিয়ে পুরনো মিলিটারী রিভলবারটা সাফ করে গুলি ভরে নিলাম।

ফিরে এলে হোমস্ বলল, ওটা পকেটে রাখো। সবরকম অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকা ভাল। লোকটা এলে কথাবার্তা বলবে খুবই স্বাভাবিক ভাবে। আমি ঘরেই আছি—বাকি যা করবার সময় মত আমিই করব।

রাত আটটা বাজল।

হোমস্ খোলা দরজার পাশে চেয়ার নিয়ে গিয়ে বসল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হোমসের হিসাব অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণ করে সে এল। নিচে পরিচারিকার কাছ সন্ধান নিয়ে ওপরে উঠে এল।

কিন্তু ঘরে যে ঢুকল তাকে দেখে ধাক্কা খেলাম। জরাজীর্ণ বয়স্ক এক ভদ্রমহিলা। ঘোলাটে চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে পকেট হাতড়ে সান্ধ্য দৈনিকটা বার করল। পরে কাঁপা আঙুলে বিজ্ঞাপনটা খুলে ধরল। বলল—এই বিজ্ঞাপনটা দেখে এসেছি। ব্রিক্সটন রোডে একটা সোনার আংটি পাওয়া গেছে। আমার মেয়ে

স্যালি—গত বছর বিয়ে হয়েছে—ওটা আমার মেয়ের বিয়ের আংটি। কাল রাতে সার্কাস দেখতে গিয়ে হারিয়েছে।

আংটিটা দেখাতেই বৃদ্ধা বলে উঠল—হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো সেই আংটি—কি বলে যে ধন্যবাদ দেব আপনাকে—

যার প্রত্যাশায় আমরা সময় গুণছিলাম প্রস্তুত হয়ে বসে—তার পরিবর্তে এই বৃদ্ধা এস আমাকে যথেষ্ট ধন্দের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।

হোমসের চোখের দিকে তাকালাম। ওর ইঙ্গিত পেয়ে আংটিটা বৃদ্ধার হাতে তুলে দিলাম। তবে তার আগে তার নাম ঠিকানাটা টুকে নিলাম।

সইয়ার, তেরো নম্বর ডানকান স্ট্রীট, হাউন্ডসডিচ।

বৃদ্ধা পা ঘসটে ঘসটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হোমস্ লাফিয়ে উঠল। বলল, খুনীর চর—পেছু নিতে হবে, ওয়াটসন, আমি চললাম।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম—ওপাশের ফুটপাথ ধরে বুড়ি চলেছে পা টেনে টেনে—কিছু দূরে পেছনে পেছনে চলেছে হোমস্।

ঠিক রাত ন'টায় বেরিয়ে গেল হোমস্।

খালি ঘরে একা কি করি। একাটা বই টেনে নিয়ে ওর ফেরার প্রতীক্ষায় কান পেতে রইলাম।

যে থিওরী খাড়া করেছে বন্ধুবর, হয় তা এবারে মিথ্যা প্রমাণ হবে, নয়তো রহস্যের কেন্দ্রে পৌঁছবার অভিযান তার এখান থেকেই শুরু হল।

হোমস্ ফিরল রাত বারোটা নাগাদ।

মুখভাব দেখেই বুঝলাম অঘটন ঘটেছে। নৈশ অভিযান সফল হয়নি। কিন্তু চেয়ারে বসেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। আমি হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। অধীর কণ্ঠে বললাম—খুলে বলবে তো কি হয়েছে?

হাসি থামিয়ে তরল কণ্ঠে হোমস্ বলল, যা ঘটেছে তা যদি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কানে ওঠে তাহলে টিটকারিতে ওরা আমার ভূত ছাড়িয়ে দেবে। একেবারে বোকা বানিয়ে ছেড়েছে।

—তাহলে হাসছ কেন অমন করে?

—হাসছি? হাসছি এ জন্য যে আমি জানি শেষ পর্যন্ত মাছ জালে টেনে তুলব ঠিক।

—ব্যাপারটা খুলে বল শুনি।

—শোন তাহলে—বুড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গিয়েই বিষম খোঁড়াতে শুরু করল। শেষকালে চার চাকার একটা চলন্ত গাড়ি দাঁড় করাল।

আমি চুপি চুপি এগিয়ে গিয়ে পাশে দাঁড়ালাম—ঠিকানাটা কি বলে শুনবার

জন্য।

বুড়ি বেশ চড়া গলাতেই বলল—তেরো নম্বর ডানকান স্ট্রীট, হাউন্ডসডিচ চলো। বুড়ি উঠে ভেতরে বসল। আমিও বেমালুম গাড়ির পেছনে পাদানিতে জায়গা করে নিলাম।

ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি ছুটিয়ে এসে কোচোয়ান ডানকান স্ট্রীটে ঢুকল। তেরো নম্বর আসার আগেই আমি টুক করে নেমে বাকি পথটা ধীরে ধীরে হেঁটে চললাম।

কোচোয়ান বাড়ির সামনে গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে দাঁড়াল। কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল। সওয়ারীর নামার নাম নেই। শেষে ভেতরে উঁকি মেরে দেখে—সব ভোঁ ভাঁ—সওয়ারীর চিহ্নও নেই। তেড়েফুঁড়ে বেচারা বাছা বাছা খিস্তি ঝাড়তে লাগল। আমি তেরো নম্বর বাড়িতে গিয়ে ঢুকলাম। শুনলাম, সইয়ার বলে কেউ কোনকালে ওখানে ছিল না। বাড়িটা গণ্যমান্য এক ব্যবসায়ীর।

ডাক্তার, ছদ্মবেশটা জব্বর নিয়েছিল, প্রশংসা না করে পারছি না। তবে ছোকরা ছাড়া চলন্ত গাড়ি থেকে এমন বেমালুম বেপাত্তা হওয়া কোন বুড়ির কম্ম নয়। পেছু নিয়েছি টের পেয়েই কেটে পড়েছে।

—লোকটার চেলা-চামুন্ডা যথেষ্টই রয়েছে বোঝা যাচ্ছে।

—ঠিক ধরেছ—সঙ্গী-সাথীরা তার জন্য যথেষ্ট ঝুঁকিও নিতে পারে। ভালই হল—প্রতিপক্ষের শক্তির একটা আঁচ পাওয়া গেল। চল শুয়ে পড়া যাক। অনেক ধকল সয়েছ দিনভর।

পরদিন সবকটা প্রভাতী কাগজেই ব্রিক্সটন হত্যা-রহস্যের চাঞ্চল্যকর খবর ছাপা হল। লম্বা লম্বা বিবরণ থেকে নতুন তথ্যও কতকগুলো পাওয়া গেল।

'ডেলী টেলিগ্রাফ' মন্তব্য করেছে ঃ

অপরাধ ইতিহাসে এমন বৈচিত্র্যময় ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। নিহত ব্যক্তি কোন বিপ্লবী সংগঠনের শিকার বলেই ধারণা করা হচ্ছে। পৈশাচিক দেওয়াল-লিখন, নিহত ব্যক্তির জার্মান নাম, এবং খুনের মোটিভের অভাব—এই সবই তার প্রমাণ। আমেরিকার সমাজবাদীদের হাত রয়েছে এই খুনের পেছনে।

সব শেষে পত্রিকা সরকারকে উপদেশ দিয়েছে—ইংল্যান্ডে বিদেশীদের নিরাপত্তার দিকে সতর্ক নজর দেবার জন্য।

'স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকাও মন্তব্য করেছে ঃ

কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা এবং কর্মে শিথিলতার জন্যই এধরনের অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। নিহত ব্যক্তি একজন মার্কিন নাগরিক। ক্যামবারওয়েলের টর্কটেরেস অঞ্চলে মিসেস চারপেনটিয়ারের বোর্ডিং হাউসে কয়েক সপ্তাহ ধরে বাস করছিলেন ভদ্রলোক। সেক্রেটারী জোসেফ স্ট্যানজারসনকে নিয়ে বিশ্ব পর্যটনে

বেরিয়েছিলেন। ঘটনার দিন বাড়িউলির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দুজনেই অস্টিন স্টেশনে এসেছিলেন—লিভারপুল এক্সপ্রেস ধরবেন বলে। স্টেশনে দুজনকে একত্রে দেখাও গিয়েছিল। এরপর থেকে মিঃ ড্রেবারের লাশ পাওয়া পর্যন্ত মিঃ স্ট্যানজারসনের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। লাশ পাওয়া গেছে অস্টিন স্টেশন থেকে বহু মাইল দূরে ব্রিক্সটন রোডের একটা খালি বাড়িতে। মিঃ ড্রেবার কিভাবে সেখানে গেলেন, এবং কিভাবে তার মৃত্যু হল—তা এখনো পর্যন্ত জানা যায় নি। তবে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের স্বনামধন্য ডিটেকটিভ যুগল মিঃ লেসট্রেড এবং মিঃ গ্রেগসন এই কেসের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আশা করা হচ্ছে তাদের তৎপরতায় শিগগির রহস্য উন্মোচিত হবে এবং অপরাধী ধরা পড়বে।

'ডেইলী নিউজ'ও ঘটনাটাকে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড বলে বর্ণনা করেছে ঃ

নিহত ব্যক্তির বোর্ডিং হাউসের ঠিকানা পাওয়া গেছে—সেক্রেটারী স্ট্যানজারসনকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা চলছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মিঃ গ্রেগসনের তৎপরতায় তদন্ত কার্য চলছে। আশাকরা হচ্ছে শীঘ্রই দুষ্কৃতকারীকে ধরা সম্ভব হবে।

প্রাতরাশ খেতে খেতে দুজনেই খবরগুলোর ওপরে চোখ বোলাচ্ছিলাম। আর লেসট্রেড-গ্রেগসন অ্যান্ড কোম্পানির দৌড় উপভোগ করছিলাম। এমন সময় সিঁড়ি কাঁপিয়ে সশব্দে এসে হাজির হল হোমসের বেকার স্ট্রীট-বাহিনী।

এদের সম্পর্কে কিছুই জানতাম না আমি। তাই ছেঁড়া জামাকাপড় পরা একদল নোংরা রাস্তার ছেলে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ছে দেখে হকচকিয়ে গেলাম।

ঘরে ঢুকেই দু'সারিতে এটেনসন হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ভবঘুরে ছেলের দল। হোমস্ বলল, উইগিন্স, খবর পেয়েছিস কিছু?

উইগিন্স নামের হতচ্ছাড়া চেহারার ছেলেটি বলল—এখনো পাইনি স্যার।

—পাত্তা লাগিয়ে যা—ঠিক বার করা চাই। আর শোন, এখন থেকে আর সবাইকে নিচে রেখে ওপরে খবর দিয়ে যাবি তুই। এই নে—ভাগ এখন।

প্রত্যেকে একটা করে শিলিং নিয়ে দুমদাম শব্দে নিচে নেমে গেল।

বিস্মিত দৃষ্টি তুলে হোমসের দিকে তাকাতেই হেসে বলল, আমার নিজস্ব বাহিনী—অসাধ্য সাধন করতে পারে।

পুলিশ দেখলে লোকে মুখ খুলতে চায় না সহজে—কিন্তু এরা সব জায়গায় গিয়ে সবার কথা শুনতে পারে। এদের লাগিয়ে একটা ব্যাপার যাচাই করে দেখছি। ওয়াটসন, দেখ দেখ—গ্রেগসন যেন উড়ে আসছে বাড়ির দিকে।

বলতে বলতেই সদর দরজায় ঘণ্টা বাজিয়ে দমাদম শব্দে সিঁড়ি কাঁপিয়ে ঘরে এসে ঢুকল গ্রেগসন।

হোমসের হাত টেনে নিয়ে করমর্দন করতে করতে সহর্ষে বলে উঠল, মিঃ

হোমস্, অভিনন্দন জানান, জাল গুটিয়ে এনেছি।

—বাঃ চমৎকার। তরল কণ্ঠে বলল হোমস।

—খুনী এখন হাজতে—নৌবাহিনীর সাব লেফটেন্যান্ট।

—তাহলে তো অনেক ধকল গেছে! বোসো বোসো।

খুশি হয়ে আর্মচেয়ারে বসে গ্রেগসন বলল, মিঃ হোমস, আমাকে আপনাকে মগজ খাটিয়ে খেতে হয়—আপনি বুঝবেন আমার অবস্থা, কী পরিশ্রমে দু'দিনেই কাজ হাসিল করেছি। লেশট্রেড বড় বুদ্ধিমান মনে করে নিজেকে। সেক্রেটারী স্ট্যানজারসন বেচারা নির্দোষ মানুষ—সে ছুটেছে তার পেছনে।

—তোমার ব্যাপারটা জানবার জন্য খুব আগ্রহ হচ্ছে হে।

—বলছি, আপনাকে বলব না তো কাকে বলব। তবে এই মুহূর্তে পাঁচকান হোক আমি চাই না। মৃতদেহের পাশে একটা টুপি পড়ে ছিল—

—হ্যাঁ, ১২৯ ক্যাম্বার ওয়েল রোডের জন আন্ডারউড অ্যান্ড সন্স কোম্পানির তৈরি।

গ্রেগসন কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গেল হোমসের কথা শুনে।

—আপনারও নজরে পড়েছিল? সেখানেই গিয়েছিলাম আমি। টর্ক টেরাসের চার্পেন্টিয়ার বোর্ডিং হাউসে মিঃ ড্রেবারকে টুপিটা পাঠিয়েছিল ওরা। দেখা করলাম মিসেস চার্পেন্টিয়ারের সঙ্গে। আপনি তো জানেন মিঃ হোমস, কাজে নামলে গ্রেগসন সময় নষ্ট করে না। ভদ্রমহিলার মেয়েও তখন সেখানে ছিল। মেয়েদের পেট থেকে কথা বার করবার কায়দাকৌশল আমার ভালই জানা আছে। জেরা করতে করতে ঠিক বেরিয়ে পড়ল আসল ঘটনা।

মিসেস চার্পেন্টিয়ার চাপবার চেষ্টা করেছিলেন, মেয়েকেও সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেয়েটি চাপতে পারেনি। শেষে মা মেয়ে দুজনের কাছ থেকেই প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে সব বার করলাম।

মহাদেশ পর্যটনে বেরিয়েছিলেন মিঃ ড্রেবার। সঙ্গে ছিল সেক্রেটারী স্ট্যানজারসন। হপ্তা তিনেক হল তিনি উঠেছিলেন বোর্ডিং হাউসে।

স্ট্যানজারসন লোকটা শান্ত ভদ্র। কিন্তু তার মালিকটি একেবারে চাষাড়ে বর্বর। প্রথম দিনেই রাতে মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে। পরের দিন থেকেই শুরু করে উৎপাত।

বাড়ির পরিচারিকাদের সঙ্গে অশ্লীল মস্করা শুরু করে। দুদিন যেতে না যেতেই একদিন ভদ্রমহিলার মেয়ে অ্যালিসকে নানাভাবে ইঙ্গিত করে কথা বলা শুরু করে। একদিন তো তাকে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে।

বোর্ডার শাঁসালো বুঝেও এই ঘটনার পর শেষ পর্যন্ত মিসেস চার্পেন্টিয়ার বোর্ডারদের উঠে যাওয়ার নোটিশ দিতে বাধ্য হন। সেই মতই তারা বাড়ি ছেড়ে

দিয়ে স্টেশনে রওনা হয়েছিল।

মিসেস চার্পেন্টিয়ারের ছেলে আর্থার নেভিতে কাজ করে। সে এখন বাড়িতে ছুটি কাটাচ্ছে। বোর্ডারদের অভব্য আচরণের কথা ছেলের কানে তোলেননি মা।

ভেবেছিলেন ঝুটঝামেলা মানে মানে বিদায় হলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন। কিন্তু তা আর হল না শেষ পর্যন্ত। রাত আটটা নাগাদ সেক্রেটারীকে নিয়ে মিঃ ড্রেবার বেরিয়ে যান। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরেই আবার ড্রেবার একা ফিরে আসেন। একেবারে বেহেড মাতাল অবস্থায়। ঘরে ঢুকেই মেয়েটিকে বললেন, সে এখন প্রাপ্তবয়স্কা। তাকে বিয়ে করলে কারুর কিছু বলবার থাকবে না। রানী বানিয়ে রাখবে সে অ্যালিসকে।

বলতে বলতে মেয়েটিকে সে হাত ধরে দরজার দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। ভদ্রমহিলা তখন চিৎকার করতে থাকেন। ঠিক এই সময়েই তার ছেলে আর্থার বাড়িতে ঢোকে। ব্যস! ছেলে লাঠি হাতে পেটাতে পেটাতে ড্রেবারকে রাস্তায় নিয়ে যায়।

—থামলে কেন, খুবই উত্তেজক ঘটনা, বলে যাও।

হাই তুলতে তুলতে বলল হোমস।

—মিসেস চার্পেন্টিয়ারের প্রত্যেকটি কথা খুঁটিয়ে লিখে নিয়েছি নোট বইতে। মিঃ ড্রেবারকে মারতে মারতে সেই যে ছেলে বেরিয়ে যায়, রাতে শুতে যাবার সময় পর্যন্ত ফেরেনি। কখন ফিরে এসেছে তাও মিসেস চার্পেন্টিয়ার বলতে পারলেন না।

এরপর গোটা ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায় আমার কাছে। লেফটেন্যান্ট চার্পেন্টিয়ারকে কোথায় পাওয়া যাবে জেনে নিয়ে তখুনি দুজন অফিসার সঙ্গে করে গিয়ে হাজির হলাম। গ্রেফতার করলাম তাকে।

কাঠের মুগুরের মত লাঠিটা তখনো হাতে ছিল তার। মিঃ হোমস, আপনি শুনলে অবাক হবেন, গ্রেপ্তারের সময় নিজে থেকেই লেফটেন্যান্ট গ্রেপ্তারের কারণটা উল্লেখ করল। বলল, আমি জানতাম ড্রেবারের খুনের ব্যাপারে আমাকে গ্রেপ্তার করা হবে।

—চমৎকার। তোমার হিসেবে তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে—

সকৌতুকে বলল হোমস।

—লেফটেন্যান্ট ব্রিক্সটন রোড ধরে ড্রেবারের পেছন পেছন গিয়েছিল। পথে আর এক দফা ধস্তাধস্তি হয়। তখনই রুল দিয়ে তলপেটে মরণ মার মারে। চার্পেন্টিয়ারের ওই মারেই শেষ। এজন্যই শরীরে কোন ক্ষতচিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় নি।

তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে—রাস্তাও ফাঁকা, লাশ টেনে নিয়ে একটা খালি

বাড়িতে ঢুকিয়ে দেয়। মোমবাতি, রক্ত, দেওয়ালের লেখা—তারপর আংটি—সবই পুলিশকে বিভ্রান্ত করবার অপচেষ্টা মাত্র।

লেফটেন্যান্ট চার্পেন্টিয়ার অবশ্য একটা জবানবন্দী দিয়েছে। তাতে সে বলেছে, ড্রেবার মার খেয়ে কিছুদূর গিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি চেপে পালিয়ে যায়। আর ফেরার পথে এক জাহাজী বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে সে তার সঙ্গে গল্প করতে করতে অন্যদিকে চলে যায়।

বন্ধুটি কোথায় থাকে তার সন্তোষজনক উত্তরও দিতে পারেনি। ড্রেবারের মৃত্যু সম্পর্কিত ব্যাপারে কিছু স্বীকার করেনি। বলেছে, এর সঙ্গে নাকি তার কোন সম্পর্ক নেই।

তা যাই বলুক, এ পর্যন্ত খাপছাড়া ব্যাপারগুলো যেভাবে ঠিকঠাক মিলে গেছে, আমার মনে হচ্ছে কেসটা মিটতে আর সমান্যই বাকি। বেচারা লেসট্রেড, কোন খবরই রাখে না—ভুল সূত্রের পেছনে ছুটে মরছে।

গ্রেগসনের কথাও শেষ হল, লেসট্রেড বিমর্ষমুখে ঘরে ঢুকল। আমাদের কথার মধ্যে কখন ওপরে উঠে এসেছে টের পাইনি।

—এইতো—বলতে বলতেই এসে গেছেন দেখছি। সেক্রেটারী যোসেফ স্ট্যানজারসনের ব্যাপারে কদ্দুর এগুলেন? শ্লেষের সুরে গ্রেগসন বলে উঠল।

আসন গ্রহণ করতে করতে গম্ভীরভাবে লেসট্রেড বলল, আজ ভোরে হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেলে খুন হয়েছে মিঃ স্ট্যানজারসন।

আমরা তিনজনেই চমকে উঠলাম কথাটা শুনে। বেচারী গ্রেগসনের তো চেয়ার থেকে ছিটকে যাওয়ার মত অবস্থা হল।

বিস্ফারিত চোখে হোমসের মুখের দিকে তাকালাম। ললাট কুঞ্চিত, ভুরু বেঁকে নেমে এসেছে চোখের ওপর। ধীরে ধীরে বলল—স্ট্যানজারসনও গেল?

জড়িতস্বরে গ্রেগসন বলল—খবরটা পাকা তো?

—ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে লাশটা আমিই প্রথম দেখি।

হোমসের আগ্রহে তারপর ঘটনার বিবরণ দিল লেসট্রেড।

বলল, হত্যার ব্যাপারে স্ট্যানজারসনের হাত আছে বলেই গোড়ায় আমার মনে হয়েছিল। এখন পরিস্থিতি যা দাঁড়াল, তাতে বুঝতে পারছি, ধারণাটা ভুল ছিল। কিন্তু লোকটার হদিস বার করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলাম।

রাত দুটোর সময় ড্রেবারের লাশ পাওয়া গিয়েছিল ব্রিক্সটন রোডে—দুজনকে স্টেশনে দেখা গিয়েছিল রাত সাড়ে আটটায়। মাঝের কয়েক ঘণ্টা সময় আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। সেক্রেটারী কোথায় ছিল কি করছিল জানতে হবে।

লিভারপুলে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে পলাতকের দৈহিক বিবরণ জানিয়ে দিলাম।

বলে দিলাম, আমেরিকাগামী জাহাজগুলোতে নজর রাখতে। অনুমান করেছিলাম, ড্রেবারের সঙ্গছাড়া হবার পর স্টেশনের কাছাকাছিই কোথাও সে রাত কাটিয়েছে। সকাল হলেই গাড়ি ধরে পালাবে। অস্টেনের কাছাকাছি হোটেল আর থাকবার জায়গাগুলোতে খুঁজতে লাগলাম তন্ন তন্ন করে। আজ সকাল আটটায় গেলাম লিটল জর্জ স্ট্রীটের হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেলে। খবর নিতেই শুনলাম, স্ট্যানজারসন দুদিন ধরে এক ভদ্রলোকের পথ চেয়ে বসে আছেন।

জুতো পরিষ্কার করে যে ছোকরা সেই আমাকে নিয়ে উঠল তিন তলায়। আঙুল তুলে ঘরটা দেখিয়ে নামতে যাচ্ছে—দরজার দিকে তাকিয়ে আমি শিউরে উঠে চিৎকার করে উঠলাম। দরজার তলা দিয়ে রক্তের সরু ধারা বেরিয়ে এসে করিডরের অপরদিকে জমা হয়েছে।

আমার চিৎকার শুনে ছুটে এলো ছোকরা। দৃশ্য দেখে ভয়ে ভিরমি যাবার জোগাড়! ঘরের ভেতর থেকে দরজায় চাবি দেওয়া ছিল। দুজনে মিলে কাঁধের চাপ দিয়ে তালা ভেঙ্গে ফেললাম।

দেখলাম, খোলা জানালার পাশে তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে একটা মূর্তি। মৃত্যু অনেকক্ষণ আগেই হয়েছে—হাত পা ঠাণ্ডা আড়ষ্ট। চিৎ করে শোয়ানোর পর ছোকরা চাকরটা মিঃ স্ট্যানজারসনকে চিনতে পারল। মৃতদেহের বুকের বাঁ দিকে ছুরির আঘাতের গভীর ক্ষত। আর একটা জিনিস পেলাম গায়ের ওপরে। মিঃ হোমস, কল্পনা করতে পারেন কি লেখা ছিল মৃতের গায়ের ওপর?

—সেই RACHE শব্দটা। বলল হোমস।

—ঠিক ধরেছেন। ম্লান হেসে শ্রদ্ধা মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকাল লেসট্রেড।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করল—রহস্যময় এই অজ্ঞাত গুপ্তঘাতক গোটা ব্যাপারটাকেই তালগোল পাকিয়ে দিল। তখুনি তদন্তে নেমে পড়লাম।

হোটেলটার পেছনে অনেকগুলো আস্তাবল—খোলা উঠোনের চারদিকে সারবন্দী। এই উঠোন থেকে একটা সরু গলি বেরিয়েছে। একটা মই থাকে সেখানে। সকালে গয়লাদের ছেলে গোয়ালের দিকে যাবার সময় দেখতে পায়—মইটা লাগানো রয়েছে তিনতলার একটা খোলা জানালার সামনে। একটা লোক নেমে আসছে মই বেয়ে। ধীর স্থির ভাবে।

ছেলেটা ভাবল ছুতোর মিস্ত্রি হোটেলের কাজ করতে এসেছে বুঝি। এক পলক তাকিয়ে সে নিজের কাজে চলে যায়। ওই পলকের দৃষ্টিতে যতটা দেখেছে তা হল—লোকটা মাথায় ঢ্যাঙা, মুখ লাল, গায়ে লম্বা বাদামী কোট।

ঘরের জলপাত্রে রক্তগোলা জল পেয়েছি। খুন করে হাত ধুয়েছিল। বিছানার চাদরেও ছুরির রক্ত মুছেছে। খুন করার পরেও গুপ্তঘাতক অনেকক্ষণ ঘরে ছিল।

লেসট্রেডের বিবরণ শুনে আশ্চর্য হলাম। হত্যাকারীর চেহারা হোমসের দেওয়া বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

কিন্তু বিবরণ শুনে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না হোমসের মুখে। শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, খুনের সূত্র হিসাবে কাজে লাগতে পারে এমন কিছু পেয়েছ ঘরে?

—তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। পকেটের টাকাকড়ি যেমনকার তেমনই ছিল। ঘটনাটা ডাকাতির নয়—এটুকু বলা যাচ্ছে। মিঃ ড্রেবারের মনিব্যাগ পাওয়া গেছে স্ট্যানজারসনের পকেটে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়—মালিকের খরচপত্র সেক্রেটারিই করত।

পাশের চেয়ারে তামাক খাওয়ার পাইপটা পড়ে ছিল। টেবিলে এক গেলাস জল। আর জানালার গোবরাটে একটা ছোট্ট কৌটোয় গোটা দুই বড়ি।

আমাদের সকলকে চমকে দিয়ে সোল্লাসে চিৎকার করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল হোমস।

—কেল্লা ফতে! শেষ যোগসূত্রটা হাতে এসে গেল। লেসট্রেড, বড়িগুলোয় হাত দিয়েছিলে?

—যে কটা জিনিস পেয়েছি থানায় জমা দেবার জন্য সঙ্গে নিয়ে এসেছি। বড়ির কৌটোটাও আছে— কিন্তু এর কোন গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না।

হোমস হাত বাড়িয়ে কৌটোটা নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিল, ডাক্তার, তুমি কি বল, সাধারণ বড়ি বলে মনে হয়? একটা কাজ কর, ল্যান্ডলেডির যন্ত্রণাকাতর টেরিয়ার কুকুরটাকে ওপরে নিয়ে এস। কুকুরটার যন্ত্রণা শেষ করবার কথা তো ল্যান্ডলেডি গতকালই বলছিলেন। প্রাণীটাব কষ্ট নাকি আর দেখতে পারছেন না।

নিচে গিয়ে মুমূর্ষু কুকুরটাকে নিয়ে এলাম। ঘরের মেঝেয় কম্বলের বিছানা পেতে শুইয়ে দিলাম। কুকুরটা তখন ধুঁকছে—চোখ ঘোলাটে হয়ে এসেছে।

হোমস বলল, কেসটায় আর কোন জট নেই। মূল ঘটনাগুলো সবই আমার জানা হয়ে গেছে। স্টেশনে দুজনের ছাড়াছাড়ি হবার পর স্ট্যানজারসনের মৃত্যু পর্যন্ত যা যা ঘটেছিল সবই আমি জানি। প্রমাণসহ তা দেখাচ্ছি দেখ—এই দুটো বড়ি থেকে একটার অর্ধেকটা কুকুরটাকে আমি খাওয়াচ্ছি—প্রতিক্রিয়া চোখের সামনেই দেখতে পাবে।

কাগজকাটা ছুরি দিয়ে একটা বড়িকে দুই টুকরো করে হোমস অর্ধেকটা কৌটোয় রেখে দিল। বাকি অর্ধেকটা একটা মদের গ্লাসে নিয়ে এক চামচ জল ঢালল। বড়িটা নিমেষে গুলে গেল। এবারে খানিকটা দুধ মিশিয়ে একটা প্লেটে ঢেলে কুকুরটার সামনে ধরা হল। সঙ্গে সঙ্গে চেটেপুটে খেয়ে নিল সেটা।

বিনা কারণে হোমস কিছু করবার পাত্র নয়—আমাদের সকলেই তা জানি। একটা কিছু নিশ্চিত ঘটবে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে রইলাম সবাই টেরিয়ারের দিকে। হোমস ঘড়ি ধরে অপেক্ষা করে রইল।

এক এক করে বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেল। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী টেরিয়ারের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। যেমন ছিল তেমনি পড়ে রইল।

হোমস অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে নিজেই। কখনো ঠোঁট কামড়াচ্ছে, কখনো টেবিলে আঙুল চালিয়ে বাদ্য বাজাচ্ছে। গোয়েন্দা যুগলের মুখেও ফুটে উঠল বিদ্রূপের হাসির রেখা।

—এ কী করে সম্ভব? ড্রেবারের মৃত্যু হয়েছে যে বড়িতে, হুবহু সেই বড়ি পাওয়া গেছে স্ট্যানজারসনের ঘরে। একই বড়ি—আমার সিদ্ধান্ত তাই ছিল। এত পরিশ্রমের সিদ্ধান্ত তা ভুল হতে পারে না। কিন্তু এ বড়ি দেখছি নির্বিষ—এ কী করে সম্ভব? কুকুরটা দিব্যি বেঁচে আছে। এর কি মানে হতে পারে? দাঁড়াও দাঁড়াও—পেয়েছি---

বলতে বলতে হোমস উঠে কৌটো থেকে আস্ত বড়িটা নিল। তারপর আগের মত দু'-টুকরো করে একটুকরো দুধ আর জলের সঙ্গে গুলে টেরিয়ারের সামনেব প্লেটে ঢেলে দিল।

কুকুরটা জিব বাড়িয়ে তরল পদার্থে লাগাতে না লাগাতেই একটা হেঁচকি তুলল। তারপর চক্ষের নিমেষে সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে দুমড়ে মুচড়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

হোমস গভীর নিঃশ্বাস ফেলে চেয়ারে গিয়ে বসল। বলল—কৌটোয় দুরকম বড়ি রাখা ছিল। একটা অত্যন্ত মারাত্মক বিষ, আর একটা নির্বিষ। ব্যাপারটা যে এমন হতে পারে আগেই অনুমান করা উচিত ছিল আমার।

হোমসের অনুমান যে অভ্রান্ত চোখের ওপরেই তা দেখতে পেলাম। ধীরে ধীরে আমার কাছেও পরিষ্কার হতে লাগল ব্যাপারটা।

হোমস তখনো বলে চলেছে—মূল সূত্রটা গোড়াতেই হাতে এসেছিল, কিন্তু সেটার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারিনি। পর পর যা ঘটেছে সবই আমার সেই সূত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে ঘটেছে।

গ্রেগসন সহসা অত্যন্ত অসহিষ্ণু ভাবে বলে উঠল, মিঃ হোমস, স্বীকার করছি আপনার কাজের ধারা সবসময় একটু অন্য রকম, কিন্তু এখন দরকার খুনীকে গ্রেপ্তার করা। চার্পেন্টিয়ার মনে হচ্ছে দ্বিতীয় খুনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। তাকে গ্রেপ্তার করাটাও মনে হচ্ছে ভুল হয়েছে। স্ট্যানজারসনের পেছনে ধাওয়া করে লেসট্রেডও ভুলই করেছে।

আপনি মাঝে মাঝে এমন ভাবে কথা বলছেন যে মনে হচ্ছে, আমাদের চাইতে খবর অনেক বেশি রাখেন। কিন্তু পরিষ্কার করে কিছু ভাঙ্গছেন না। এবারে বোধহয়

সময় হয়েছে, আপনাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করছি—এ কেসের কতদূর আপনি জেনেছেন? খুন যে করেছে তার নাম বলতে পারেন?

সঙ্গে সঙ্গে লেসট্রেড বলে উঠল—স্যার, আমিও একই কথা বলতে চেয়েছিলাম। আমরা দুজনেই আসামী ধরবার চেষ্টা করেছি—কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। বারবার আপনার মুখে শুনেছি এ কেসের মূল ব্যাপার আপনার জানা—সাক্ষ্যপ্রমাণও কব্জায় নিয়ে এসেছেন—কিন্তু কিছুই ভাঙ্গছেন না।

—আমারও মনে হয়—খুনী যতক্ষণ বাইরে থাকবে—নতুন খুন খারাপীর সম্ভাবনাও ততক্ষণ থেকে যাবে। বললাম আমিও।

অমন চাপের মুখে পড়ে হোমস যেন দ্বিধান্বিত হল। গভীর চিন্তার ছাপও ফুটে উঠল তার মুখে। ঘরময় পায়চারি করতে লাগল অস্থিরভাবে।

একসময় দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার—খুন আর হবে না। গুপ্তঘাতকের নাম জানি কিনা জিজ্ঞেস করেছিলে—তার উত্তরে বলছি—হ্যাঁ জানি। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। তাকে গ্রেপ্তার করাটাই প্রধান সমস্যা। যদিও নিজেই আমি এ সমস্যার মোকাবিলা করবার ব্যবস্থা করেছি। তাকে সন্দেহ করা হয়েছে বা তার পেছনে চর লেগেছে সন্দেহ হওয়া মাত্রই লন্ডনের জনস্রোতে সে মিশে যাবে—তার পর তাকে খুঁজে বার করবার মত বান্দা তোমাদের স্কটল্যান্ডইয়ার্ডে নেই। আমার কথায় আঘাত পেয়ো না—চতুর লোকটার সম্পর্কে সঠিক ধারণাটা দেবার জন্যই এভাবে কথাটা বলতে হল। তবে তোমাদের আমি জানাব—আমার নিজস্ব ব্যবস্থা বানচাল না করে যতটুকু জানানো যায় সেটুকু জানাবো নিশ্চয়ই।

দুই ডিটেকটিভের চোখে মুখে অসহিষ্ণুতা যেন ফেটে পড়ছিল। চোখে দপ দপ করছে কৌতুক আর ক্ষোভের ঝিলিক।

হোমসের বক্তব্যে তারা মোটেই খুশি বলে মনে হল না। কিন্তু কারুর কিছু বলবার আগেই ঘটনার মোড় ঘুরল আশ্চর্যরকম ভাবে।

দরজায় টোকা পড়ল এবং পরমুহূর্তেই আবির্ভূত হল হা-ভাতে চেহারাব উইগিন্স।

—গাড়ি নিয়ে এসেছি স্যার।

কথাটা শুনেই কেমন তৎপর হয়ে উঠল হোমস। ড্রয়ার টেনে এক জোড়া হাতকড়া বার করতে করতে বলল, বেশ করেছিস। স্কটল্যান্ডইয়ার্ডে তোমরা এ জিনিস চালু করতে পার না? কি সুন্দর স্প্রীং-এর কাজ দেখতো। চোখের পলকে আটকে যায়। উইগিন্স, পাঠিয়ে দে, বাক্স প্যাঁটরাগুলো কোচোয়ানকে একটু ধরতে বল।

ঘরের কোণে একটা পোর্টম্যানটো ব্যাগ বসানো ছিল। হোমস উঠে গিয়ে

সেটাকে ঘরের মাঝখানে নিয়ে এসে স্ট্র্যাপ খুলতে লাগল।

এমন সময় কোচোয়ান এসে দরজায় দাঁড়াল।

হোমসের কাণ্ডকারখানা আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। কোথায় যাওয়াব মতলব করেছে বুঝতে পারছি না। আগে থেকে কিছু বলেও নি। এই মুহূর্তে কিছু জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে কিনা বুঝতেও পারছি না।

মেঝেয় হাঁটু গেড়ে বসে স্ট্র্যাপ টানাটানি করতে করতে হোমস বলে উঠল, ওহে, এগিয়ে এসে একটু হাত লাগাও।

এগিয়ে এসে হাত নামাল গারোয়ান। ঠিক তখনই কটাং করে একটা ধাতব শব্দ—আর সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল হোমস।

উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠল—তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি—মিঃ জেফারসন হোপ—এনক ড্রেবার আর জোসেফ স্ট্যানজারসনকে ইনিই খুন করেছেন।

পলকের মধ্যে এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা ঘটে গেল যে আমাদের বুঝে উঠতে কয়েক সেকেন্ড সময় লেগে গেল।

হতচকিত গাড়িওয়ালা কব্জিতে আটকানো হাতকড়ার দিকে হিংস্র জ্বলন্ত চোখে তাকাল। পরমুহূর্তে একটা চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন করে হোমসের হাত ছাডিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জানালার ওপর।

ঝনঝন শব্দে কাচের টুকরো ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একপাল হাউন্ডের মত আমরা চারজনই ছুটে গিয়ে তাকে টেনে ধরলাম।

দৈত্যের শক্তি যেন লোকটাব গায়ে। বারবার ছিটকে ফেলে দিতে লাগল আমাদের। কাচে কেটে গিয়ে মুখ হাত ফালা ফালা হয়ে গেছে লোকটার—রক্ত ঝরছে দরদর করে—কিন্তু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। চার চারটে মানুষের হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টার বিরাম নেই। লেসট্রেড এক সময়ে তার গলার তলায় কব্জি ঢুকিয়ে চাপ দিয়ে জিভ বার করে দিল। বৃথা চেষ্টা বুঝতে পেরে লোকটাও নিরস্ত হল।

সঙ্গে সঙ্গে তার দুটো পা আর দুটো হাত আচ্ছা করে বেঁধে ফেলা হল—যাতে আর নড়াচড়া করতে না পারে।

লোকটাকে মেঝেয় শুইয়ে রেখে যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন আমরা চারজনেই হাঁপাচ্ছি রীতিমত। মুখ ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ।

হোমস চেয়ারে বসতে বসতে বলল—ওর নিজের গাড়িতেই ওকে স্কটল্যান্ডইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে। বলুন, এবারে এই রহস্য-উপাখ্যানের কে কি জানতে চান। খোলখুলি বলতে আর বাধা নেই।

দুই

উত্তর আমেরিকা মহাদেশের মাঝামাঝি অংশে বিশাল অনুর্বর মরু অঞ্চল। কবরের নীস্তব্ধতা বুকে নিয়ে যেন আকাশের দিকে মুখ করে স্তব্ধ হয়ে আছে।

সিয়েরা নেভাদা থেকে নেব্রাসকা আর উত্তরের ইয়োলো স্টোন নদী থেকে দক্ষিণের কলোরাডো পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই ঊষর অঞ্চল। এর বুকে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে বরফ-ঢাকা মেঘাবৃত পর্বতমালা, কোথাও ধূ ধূ উপত্যকা—কোথাও গিরিখাদ ভেদ করে মেঘ-গর্জনে প্রবাহিত হচ্ছে অবিরাম জলধারা।

বিচিত্র এই প্রান্তর ঋতুতে ঋতুতে রূপ পাল্টায়। কিন্তু অন্তহীন অনুর্বরতা এই ভূমিকে করেছে জনমানবহীন, অনধিগম্য। ছোট ছোট ফাঁকা গাছ আর পাথুরে ভূমিতে বিচরণ করে কুটিল নেকড়ে আর ধূসর গ্রিজাল ভালুক। আকাশে ডানা ঝাপটায় বুজার্ড শকুন। এরাই এই বিজন ভূমির একমাত্র বাসিন্দা।



সিয়েরা ব্ল্যাঙ্কোর উত্তরের সানুদেশ থেকে চোখে পড়ে—দিগন্তপ্রসারী প্রান্তরে কেবল তাল তাল চ্যাপারাল ঝোপ। সবকিছুর ওপরে লবণধূলির ছোপ।

দিগন্তের প্রান্তসীমায় বরফ-ছাওয়া পাহাড়ের চূড়ার আভাস।

হু হু বাতাসের হাহাকার ছাড়া এই প্রান্তরে আর কোন শব্দ কানে আসে না।

সিয়েরা ব্ল্যাঙ্কোর দিক থেকে একটা সরু পথ বেরিয়ে মরুভূমির বুকে এঁকে

বেঁকে এগিয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে। দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের পায়ে পায়ে আর গাড়ির চাকার পেষণে তৈরি হয়েছে এই পথরেখা। পথের পাশে পাশে মাঝে মাঝে নজরে পড়ে বলদের আর মানুষের কঙ্কাল।

সিয়েরা ব্ল্যাঙ্কোর সানুদেশে সামনের ভয়াবহ দৃশ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল একজন পর্যটক। মুখ শীর্ণ উদভ্রান্ত। ঠেলে বেরিয়ে আসা হাড়ের ওপর যেন চেপে আছে শরীরের চামড়া।

দীর্ঘ বাদামী চুল, চোখজোড়া কোটরে প্রবিষ্ট কিন্তু উজ্জ্বল দীপ্তিময়।

এই শরীরে বয়স আন্দাজ করা কঠিন—চল্লিশ থেকে ষাটের যে কোন কোঠায় হতে পারে।

হাতের রাইফেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দীর্ঘ বলিষ্ঠ গড়নের দেহাকৃতিটি।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর মানুষটি গিরিসংকট পার হয়ে উচ্চতায় উঠে এসেছে একফোঁটা জলের আশায়।

কিন্তু জল কোথায়—চারদিকে ঘিরে রয়েছে কেবল নিরাশার করাল রুক্ষ প্রান্তর। অভিযাত্রীর সংশয় নেই—মৃত্যু আসন্ন।

এক সময় পাথরের ছায়ায় এসে হাতের ভারি রাইফেলটা মাটিতে নামিয়ে রাখল সে। তারপর কাঁধে ঝোলানো ধূসর শাল কাপড়ের মস্ত পুঁটলিটা নামালো।

সঙ্গে সঙ্গে পুঁটুলির ভেতর থেকে সরু গলায় একটা গোঙানির শব্দ উঠল—বড্ড লেগেছে বাবা।

—আহা, বেরিয়ে আয় মা—চুম দিয়ে দিলে সেরে যাবে।

বলতে বলতে শালের ভাঁজ খুলে বছর পাঁচ-ছয় বয়সের ফুটফুটে মিষ্টি চেহারার একটা মেয়েকে টেনে বার করে আনল। মেয়েটির গায়ে গোলাপী ফ্রকের ওপর ক্ষুদে অ্যাপ্রন। পায়ে পরিপাটি জুতো।

হতভাগ্য পর্যটক সোহাগ ভরে কাছে টেনে মেয়েটিকে আদর করে উদ্‌গত দীর্ঘ নিঃশ্বাসটাকে বৃথা চাপবার চেষ্টা করে।

—বাবা, মা কোথায়? ব্যথা লাগলে মা চুম দিয়ে দিত।

—মা চলে গেছে—

—তাই, কিন্তু যাবার সময় আমাকে আসছি বলে গেল না যে বড়? বড্ড তেষ্টা পেয়েছে—জল নেই?

—এখানে তো দেখছি কিছুই নেই—দেখি—তুই এখানে আমার কাঁধে হেলান দিয়ে বোস।

—নদী তো ছাড়িয়ে এলে বাবা—

—ভেবেছিলাম আর একটা নদী পেয়ে যাব। ম্যাপে মনে হয় কোথাও ভুল ছিল। তোর জন্য কয়েক ফোঁটা জল অবশ্য আছে।

—কতদিন তুমি চান করতে পারছ না বাবা।

—খাবার জলই পেলাম না। জলের অভাবে প্রথমে গেলেন মিঃ বেনডার, পরে মিসেস ম্যাকগ্রেগর, তারপর জনি হোপ—তোর মা।

মেয়েটি ফ্রকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ওঠে—মাও মরে গেছে—

—আমি আর তুই ছাড়া সকলেই গেছে। এদিকেও জলের চিহ্ন চোখে পড়ছে না, এবারে আমরাও যাব।

—আমরাও মরে যাব? তাহলে তো মায়ের কাছে যেতে পারব, তাই না বাবা।

—পারবি।

—কি মজা হবে—মা আমাদের কেক আর জল খেতে দেবে। দু'পিঠে সেঁকা কেক আমার খুব প্রিয়।

এই সময় উত্তরের দূর আকাশে তিনটি বিন্দু ভেসে উঠল। ক্রমশই এগিয়ে আসতে লাগল বিন্দুগুলো—আর আকারে বড় হতে লাগল।

কাছে এলে দেখা গেল তিনটি বিশাল বাদামী পাখি—বুজার্ড শকুন।

শকুন তিনটা অভিযাত্রীদের মাথার ওপর কয়েকবার পাক খেল, তারপর দূরের উঁচু একটা পাথরের মাথায় এসে বসল। নজর রইল মানুষ দুটোর দিকে। মৃত্যু-দূত শকুনেরা বুঝি শুনতে পেয়েছে মৃত্যুর পদধ্বনি।

—বাবা, কী সুন্দর পাখি—এদেশটাও ভগবান তৈরি করেছে?

—তা করেছে।

—ভগবান তো ইলিনয় তৈরি করেছে, মিশৌরী তৈরি করেছে—এদেশটা অন্য কেউ তৈরি করেছে বাবা—জল দিতে ভুলে গেছে।

—এস আমরা ভগবানকে ডাকি। দুঃসময়ে ভগবানকে ডাকতে হয়।

মেয়েটি এবারে উঠে গিয়ে তার ছোট্ট দুই হাতে জমির ওপরে একটা শাল বিছিয়ে দিল। তারপর দুজনে হাঁটু গেড়ে বসে, দুহাত বুকের ওপর রেখে প্রার্থনায় বসল।

বিজন মৃত্যু-প্রান্তরে কটি বুজার্ড শকুন ছাড়া আর কেউ এই অদ্ভুত প্রার্থনার দৃশ্য দেখতে পেল না।

প্রার্থনা শেষ করে কিছুক্ষণ পরে পাথরের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ল তৃষ্ণার্ত মেয়েটি। তিন দিন তিন রাতের অনিদ্রা আর ক্লান্তি নিয়ে মেয়েটির প্রহরায় বৃথাই বসে থাকবার চেষ্টা করল অভিযাত্রী। এক সময় সে-ও শিশুটির পাশে শরীর এলিয়ে দিয়ে গভীর নিদ্রায় ডুবে গেল।

অভিযাত্রী যদি আর আধঘণ্টা জেগে থাকত, তাহলে দেখতে পেত এক বিচিত্র দৃশ্য। দূরে দিগন্তরেখায় ধূলির ঝড় উড়িয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে কালো কালো বিন্দু। ধূলির আচ্ছাদন হাল্কা হয়ে গেলে স্পষ্ট হয়ে উঠল ক্যানভাস-ছাওয়া ঘোড়ায়

টানা গাড়ির মুখ আর অশ্বারোহী মূর্তি।

ক্রমশ স্পষ্ট হল—মরুযাত্রীদের বিরাট একটা দল চলেছে পশ্চিম দিকে। সামনের গাড়িগুলো পাহাড়ের সানুদেশে পৌঁছে গেছে। শেষ অংশ এখনও দৃষ্টির বাইরে—দূর দিগন্তের অন্তরালে।

দীর্ঘ সারিতে রয়েছে অসংখ্য মানুষ, অসংখ্য গাড়ি—কোনটা ঢাকা, কোনটা খোলা। ঘোড়ার পিঠে চেপে পায়ে হেঁটে চলেছে অগুন্তি মানুষ। মেয়েরা পিঠে বোঝা নিয়ে নুয়ে পড়ে হাঁটছে গাড়ির পাশে পাশে। বাচ্চার দলও চলেছে গাড়ি ঘিরে।

এ এক বিশেষ যাযাবর দল, চলেছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

গাড়ির চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ, মানুষের কলরব আর অসংখ্য ঘোড়ার হ্রেষারবে মুখর হয়ে উঠেছে মরুভূমির নিস্তব্ধ বাতাস।

এই বিপুল বিচিত্র মিশ্র আওয়াজেও ঘুম ভাঙল না পাহাড়ের ওপরের মানুষটির। বুজার্ড শকুনগুলোর শাণিত লোলুপ দৃষ্টির সামনে অকাতরে পড়ে রয়েছে দুটি মূর্তি।

মরুযাত্রীদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলেছে জনা কুড়ি অশ্বারোহী। লোহার মত নিরেট মুখ সকলের। কাঁধে রাইফেল।

খাড়া পাহাড়ের তলদেশে এসে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে একজন বলল, ব্রাদার, কুয়োগুলো কিন্তু সিয়েরা ব্ল্যাঙ্কোর ডানদিকে।

আর একজন বলে উঠল, জলের জন্য ঘাবড়িও না। পাথর ফুঁড়ে যিনি ফোয়ারা বার করেন, আমরা তাঁরই নির্বাচিত সন্তান। জলের জন্য আমাদের ভাবনা কি।

অমনি সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনি উঠল—আমাদের ভাবনা কি—

আবার যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে দলটা, এমন সময় পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল একজন। কম বয়সী এক তরুণ। কঠিন পাথরের গা ঘেঁষে উজ্জ্বল গোলাপী রঙের কী উড়ছে হাওয়ায়।

যুবকের দৃষ্টি অনুসরণ করে প্রত্যেকেই স্তব্ধ হয়ে দেখল দৃশ্যটা। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে পড়ল সকলে।

কাঁধের রাইফেল চলে এল হাতে। পেছন থেকে আরো ঘোড়সওয়ার ছুটে এসে দল ভারি করল।

পাথরের গায়ে পতপত করে উড়ছে উজ্জ্বল গোলাপী পুচ্ছ।

বিস্ময় আর সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল সকলে। ভিড়ের মধ্য থেকে মুখে মুখে একটা শব্দ উঠল—লাল চামড়া। লাল চামড়া।

বয়সে ভারী মানুষটিকে এদের দলপতি বলে মনে হল। সে বললো, লাল চামড়ার ইন্ডিয়ানরা এ অঞ্চলে বেশি নেই।

কে একজন বলে উঠল, ব্রাদার স্ট্যানজারসন, ওপরে গিয়ে দেখে আসব?

—ঘোড়া রেখে যাও।

অমনি একদল তরুণ টপাটপ ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল। তারপর পাথরের গায়ে লাগাম বেঁধে রেখে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে দ্রুত অথচ সন্তর্পণে উঠতে লাগল পাহাড়ের গা বেয়ে।

গোলাপী পুচ্ছ প্রথমে দেখেছিল যে তরুণটি, সে-ই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সকলকে।

দেখতে দেখতে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেল তরুণের দল।

লাফিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ স্তম্ভিত বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সকলে। সামনেই অভাবিত আশ্চর্য এক দৃশ্য।

ন্যাড়া পাহাড়ে চ্যাটালো মাথায় দৈত্যাকৃতি এক পাথরের পাশে এলিয়ে আছে দীর্ঘকায় শীর্ণ এক পুরুষ। রুক্ষ কদাকার মূর্তি। ধূসর দাড়ি উড়ছে হাওয়ায়।

পাশেই ঘুমুচ্ছে এক শিশু। সুগোল কচি হাতে জড়িয়ে রেখেছে সঙ্গীর শক্ত বাদামী ঘাড়। শিশুর গোলাপী ঠোঁটের ফাঁকে উঁকি মারছে সাদা দাঁতের সারি। মুখে লেগে আছে স্বর্গীয় হাসির আভাস। যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও সে হাসছে।

স্তম্ভিত হয়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগল যাযাবর তরুণের দল।

আশায় আশায় পাথরের ওপরে বসেছিল যে শকুনগুলো—আগন্তুকদের অতর্কিত আবির্ভাবে কর্কশ চিৎকারে বাতাস কাঁপিয়ে এবারে উড়ে গেল আকাশে।

পাখিদের বিকট চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল দুজনের।

পুরুষ অভিযাত্রী উঠে বসে সামনে তাকিয়েই হতভম্ব হয়ে গেল। সবিস্ময়ে উঠে দাঁড়াল।

ঘুমের আগে যে নিষ্প্রাণ নির্জন প্রান্তর বিভীষিকা বিস্তার করে পড়ে ছিল দিগন্ত জুড়ে—এখন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে—সারিবদ্ধ মানুষ পশু আর হরেকরকম গাড়ি। চোখ কচলে দৃষ্টিবিভ্রম দূর করবার চেষ্টা করল সে।

কিন্তু ব্যাপারটা যে দৃষ্টিবিভ্রম নয়—একেবারেই বাস্তব—অচিরেই সেটা বুঝতে পারল অভিযাত্রী।

তরুণদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে কাঁধে তুলে নিল। আর দুজন শীর্ণ অবসন্ন মানুষটিকে দু'পাশ থেকে ধরে নিয়ে চলল নিচে।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষগুলোকে পেয়ে বুঝি জীবনের আশা ফিরে পেল অভিযাত্রী।

চলতে চলতে বলল, আমার নাম জন ফেরিয়ার। একুশজনের মধ্যে এখন বেঁচে আছি আমরা এই দু'জন। দক্ষিণ অঞ্চলে সকলকেই রেখে আসতে হয়েছে।

—তোমার মেয়ে? একজন শুধায়।

—এখন আমারই। ওকে আমি বাঁচিয়েছি—এখন ও আমারই মেয়ে—আমার কোল থেকে আর কাউকে ছিনিয়ে নিতে দেব না। তাই নাম রেখেছি লুসি ফেরিয়ার। কিন্তু তোমরা কারা?

চলতে চলতে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেলে ফেরিয়ার দীর্ঘকায় সুঠামদেহী তরুণদের দিকে।

—ঈশ্বরের নিগৃহীত সন্তান আমরা—অ্যাঞ্জেল মেরোনার ধর্মে দীক্ষিত। সংখ্যায় প্রায় দশ হাজার।

—ও রকম নামতো শুনিনি আগে।

দৃঢ়স্বরে জবাব দিল একজন তরুণ—পালমিয়ার জোসেফ স্মিথকে একটা সোনার পাত দেওয়া হয়েছিল। মিশরীয় হরফে তাতে পবিত্র বাণী উৎকীর্ণ ছিল। আমরা সেই পবিত্র ঈশ্বরীয় বাণী অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি।

ইলিনয় প্রদেশের নভু অঞ্চল থেকে আমরা আসছি এখন। সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছি।

ঈশ্বর বিদ্বেষী অত্যন্ত উগ্র এক ব্যক্তির অত্যাচারে আমরা দেশ ছেড়ে নতুন দেশের সন্ধানে বেরিয়েছি।

নভু নামটা শোনা ছিল জন ফেরিয়ারের। বলল, নভু অঞ্চলে বাস করে তো মর্মোনরা।

—হ্যাঁ, আমরাই মর্মোন। ঈশ্বর তাঁর পবিত্র অবতার পাঠিয়েছেন আমাদের মধ্যে— তার মাধ্যমেই তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। তোমার ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেবেন আমাদের অবতার।

পাহাড়ের সানুদেশে প্রতীক্ষায় ছিল অসংখ্য নারী পুরুষ শিশুর ব্যগ্র চোখ। অসহায় একটি শিশু আর অবসন্ন শীর্ণ ক্লিষ্ট মানুষটিকে দেখে সকলের কণ্ঠেই সমবেদনার স্বর ধ্বনিত হল।

উদ্ধারকারী তরুণের দল ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে দুজনকে এনে দাঁড় করাল ছিমছাম চেহারার বড় আকারের একটা গাড়ির সামনে।

এই গাড়ির ছটি ঘোড়া। চালকের পাশের আসনে বসে রয়েছে কর্তৃত্বব্যঞ্জক চেহারার একজন মানুষ। বয়স তিরিশের কোঠায়। কিন্তু নেতা বলে প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায়।

আসনে বসে একটি বই পড়ছিল। হাতের বই নামিয়ে তরুণদের সব কথা শুনল মন দিয়ে। তারপর ধীর গম্ভীর স্বরে বলল, আমার সঙ্গে আসতে হলে একটি শর্ত মানতে হবে। আমরা যে ধর্মে বিশ্বাসী সেই ধর্মমতে বিশ্বাস আনতে হবে।

জন ফেরিয়ার আপ্লুতকণ্ঠে বলল—যে কোন সর্তেই আমি রাজী।

নির্বিকারভাবে বলল সেই নেতা—ব্রাদার স্ট্যানজারসন, সঙ্গে নাও এদের।

বাচ্চাটার উপযুক্ত যত্নের ব্যবস্থা করে দাও। অবসরমত পবিত্র ধর্ম বিষয়ে বুঝিয়ে দিও। আর দেরি করো না—এবারে এগিয়ে চল।

নবাগত দুজন ঠাঁই পেল স্ট্যানজারসনের গাড়িতে। অবতার তার ওপরই এদের পরিচর্যার ভার দিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে খাবারও দেওয়া হল দুজনকে।

গভীর গুঞ্জন ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে। চাবুকের আওয়াজ, গাড়ির চাকার ধ্বনি, ঘোড়ার হ্রেষারব মিলে বিচিত্র মিশ্র শব্দ উঠল বাতাসে।

পথচলা শুরু হল দলটার।

স্বদেশ ত্যাগের পর দীর্ঘ দুর্গম পথ আর অসংখ্য প্রতিকূলতা অতিক্রম করে মর্মোনরা অবশেষে পৌঁছলো রকি মাউন্টেনের পশ্চিম প্রান্তে রৌদ্রোজ্জ্বল উটা উপত্যকায়। অবতার জানাল—এই সেই ঈশ্বর-প্রতিশ্রুত দেশ। উর্বর এই ভূখণ্ডেই বসতি স্থাপন করবে মর্মোনরা।

দয়ালু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নতজানু হয়ে সমবেত ভাবে প্রাণঢালা প্রার্থনা জানাল সকলে।

দেখতে দেখতে শুরু হল নগর পত্তনের কাজ।

মর্মোনদের নতুন উপনিবেশ—সল্টলেক সিটি।

সুদক্ষ শাসনকর্তা ও দলপতি ইয়ং-এর ব্যবস্থাপনায় অচিরেই তৈরি হল ম্যাপ আর চার্ট। আঁকা হল ভবিষ্যৎ শহরের নক্সা। মর্যাদা অনুসারে জমি জায়গাও বিলি হয়ে গেল। সমাজের সকল স্তরের সব বৃত্তির মানুষকে লাগিয়ে দেওয়া হল কাজে।

আগাছা ঝোপঝাড় সাফ হয়ে—রাস্তাঘাট বাগান তৈরি হতে হতে একটা বছর কেটে গেল।

গ্রীষ্ম আসতেই সোনালী গমের শিষ ঝলমলিয়ে উঠল সারা দেশে। শ্রী আর সম্পদ ক্রমেই বাড়তে লাগল।

ক্রমে বাড়ি ঘর তৈরি সম্পূর্ণ হল। শহরের কেন্দ্রে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ল বিরাট মন্দির। সকাল সন্ধ্যায় মন্দিরে প্রার্থনায় সমবেত হয় উপনিবেশের কৃতজ্ঞ সুখী মানুষ। স্মরণ করে সেই পরম কারুণিককে।

ব্রাদার স্ট্যানজারসনের ক্যানভাস-ঢাকা চলন্ত গাড়িতে সুখে স্বচ্ছন্দে পথযাত্রার শেষ পর্যন্ত দিন কাটিয়েছে জন ফেরিয়ার আর তার পালিত কন্যা লুসি ফেরিয়ার।

অমায়িক ব্যবহার আর আন্তরিক আচার আচরণের জন্য অল্প সময়ের মধ্যেই সে সকলের শ্রদ্ধা ভালবাসা অর্জন করেছে।

নতুন গড়ে ওঠা উপনিবেশে তাঁকেও ঠাঁই দেওয়া হল। উর্বর জমিজমা সে-ও পেল সমপরিমাণে।

ফেরিয়ার কাঠের গুঁড়ির একটা ঘর বানাল প্রথমে নিজের জমিতে। তার সহায়

হল নিজের প্রখর বিষয়বুদ্ধি, অক্লান্ত পরিশ্রম আর কাজের দক্ষতা।

অল্প সময়ের মধ্যেই ছোট কুঁড়েকে বাড়িয়ে তৈরি করল এক ভিলা। নতুন শক্তি নিয়ে উদয়াস্ত লেগে রইল চাষাবাদের কাজে। দিনে দিনে বিত্তসম্পদ বেড়ে উঠতে লাগল তার।

এক এক করে যখন বারোটা বছর অতীত হল, দেখা গেল নতুন উপনিবেশের সবচেয়ে বিত্তবান ও সম্পদশালী মানুষ জন ফেরিয়ার।

বসবাসের তল্লাটের বাইরেও বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল তার নাম।

মর্মোন ধর্মে বিশ্বাসী সকলেই খুশি ফেরিয়ারের আচার আচরণে। ধর্মের নিয়মনীতি আচার অনুষ্ঠান অবিচলভাবে অনুসরণ করে সে।

কেবল একটি ব্যাপারে ফেরিয়ারকে নিয়ে স্বধর্মীদের মধ্যে কিছু যা মনোবেদনা। অনেক অনুরোধ উপরোধেও বিয়ে-থা করে সংসারী হতে রাজী হয়নি ফেরিয়ার।

মর্মোনদের সমাজ একাধিক বিবাহের পক্ষপাতী। অনেকের ঘরেই দুটো তিনটে স্ত্রী। কিন্তু নারী সংসর্গ থেকে সর্বদাই দূরে থাকল ফেরিয়ার। অন্তরের সমস্ত মমতা, স্নেহ ভালবাসা দিয়ে সে বড় করে তুলল মেয়ে লুসিকে।

লুসি এখন বড় হয়েছে। যৌবন ডানা মেলেছে তার দেহে ও মনে।

ফেরিয়ারের খামার বাড়ির পাশ দিয়ে হাইরোড বরাবর যেতে যেতে পথিকেরা লুসির দীর্ঘ সুকুমারী মূর্তি দেখে উদ্বেলিত হয়।

মনোরম ভঙ্গিমায় সে যখন বাবার বুনো ঘোড়া মাসট্যাঙ্-এর পিঠে চেপে পথে বেরয়, মুগ্ধ বিস্ময়ে সকলে তাকিয়ে দেখে তার দিকে।

দিনে দিনে সৌন্দর্যময়ী লুসির রূপের কথা ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে।

জুন মাসের এক প্রভাত। লুসি বাবার একটা কাজ নিয়ে চলেছে শহরে।

সেই সময় ক্যালিফোর্নিয়ায় চলেছে স্বর্ণসন্ধানীদের একের পর এক অভিযান। পথে ঘাটে মানুষ আর মানুষ। মালবোঝাই ঘোড়ায় টানা গাড়ি।

পথের ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলেছে লুসি—অভ্যস্ত দক্ষ হাতে ঘোড়া চালিয়ে মনোরম ভঙ্গীমায়।

শহরের প্রান্তে এসে কিন্তু বিপদে পড়ে গেল লুসি। রাস্তা জুড়ে চলেছে গরু আর মোষের বিরাট একটা দল। চারণভূমি থেকে নিয়ে চলেছে জনা ছয় পশুপালক।

রাস্তা বন্ধ দেখেও থামল না লুসি। ছোট্ট একটা ফাঁক দেখে ঘোড়া নিয়ে ঢুকে পড়ল। দেখতে দেখতে চারদিক থেকে শিং বাঁকানো বলিষ্ঠ সব মোষ আর গরু ওকে ঘিরে ধেয়ে চলল।

ভয় নেই লুসির। গরু মোষ সামলাবার কায়দা জানে সে। দিব্যি ফাঁকে ফাঁকে এগিয়ে নিয়ে চলল ঘোড়াটাকে।

এই সময় কি করে একটা বলদের শিং-এর খোঁচা লেগে গেল মাসট্যাঙের পাঁজরের পাশে। অমনি ক্ষেপে গেল ঘোড়া।

সামনের পা তুলে ক্রমাগত লাফ দিতে লাগল। ফলে তার খুরের চাট লাগতে লাগল মিছিলের জন্তুগুলোর গায়ে।

দাপাদাপি শুরু হল সেগুলোর মধ্যেও। একটা চাটের বদলে মাসট্যাঙের জুটতে লাগল লম্বা শিং-এর তিনটা গুঁতো।

এমনভাবে লাফাতে শুরু করল ঘোড়াটা যে তার পিঠে বসে থাকাই মুশকিল হল। পাকা ঘোড়সওয়ার বলে লুসি কোনরকমে সামাল দিয়ে চলল। বারবার পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে ঘোড়া শরীর ঝাঁকুনি দিচ্ছে।

কতক্ষণ এভাবে থাকা যায়! হাত ফসকে একবার পড়তে পারলেই পিষে চিড়ে চ্যাপ্টা হতে হবে।

প্রাণপণে তবু ঘোড়ার গলা আঁকড়ে রইল লুসি। কিন্তু হাত যেন ক্রমেই শিথিল হয়ে আসতে লাগল। আর শেষ রক্ষা বুঝি হয় না।

লুসি বুঝতে পারছে তার পরিণতি। কিন্তু সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও হাত ঠিক রাখতে পারছে না। ভয়ে চোখ বন্ধ করে রইল লুসি।

সহসা ধ্বনিত হল একটা কণ্ঠস্বর—ভয় নেই। লাগাম ছাড়বেন না।

সঙ্গে সঙ্গে পশুর ভিড়ের মধ্য থেকে এগিয়ে এল একটা দড়ির মত পাকানো বলিষ্ঠ হাত।

শক্ত মুঠিতে ঘোড়ার মুখের লাগাম চেপে ধরে লুসিকে টেনে নিয়ে এল মিছিলের বাইরে।

রোদে পোড়া বাদামী মুখটার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল লুসি।

বুনো চেহারার এক বলিষ্ঠ তরুণ। তেজিয়ান একটা ঘোড়ার পিঠে বসে আছে দৃপ্তভঙ্গিতে।

পরণে শিকারীর মোটা পোশাক, কাঁধে লম্বা রাইফেল।

লুসি বিগলিত হেসে বলল, বড্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

—জন ফেরিয়ারের বাড়ি থেকে বেরুতে দেখলাম না আপনাকে?

—হ্যাঁ, আমার বাবা।

—তাহলে আমার নাম বললেই চিনতে পারবেন। জিজ্ঞেস করবেন সেন্ট লুইয়ের জেফারসন হোপকে মনে পড়ে কিনা।

লুসি গম্ভীর ভাবে বলল—আপনি নিজেই একদিন এসে জিজ্ঞেস করুন না।

জেফারসন হোপের সঙ্গে এভাবেই প্রথম আলাপ হল লুসির। এমনি এক স্মরণীয় নাটকীয় পরিস্থিতিতে।

তরুণ জেফারসন দলবল নিয়ে নেভাদা মাউন্টেনে রুপোর সন্ধানে ঘুরছে

অনেকদিন। সন্ধানও পেয়েছে। মূলধনের সন্ধানে তাই তাকে প্রায়ই আসতে হয় সল্টলেক সিটিতে। সেদিন রাতেই সে এল জন ফেরিয়ারের ভিলায়।

কথা হল দুজনে। বাইরের জগতের খবরাখবর জেফারসন পায় না অনেককাল। ফেরিয়ারের মুখে সেই খবর পেয়ে খুশি।

দু'চারদিন যাতায়াত করতেই এই বলিষ্ঠ দেহ ও খোলা মনের তরুণটির গুণমুগ্ধ হয়ে পড়ে ফেরিয়ার।

বাবার মুখে জেফারসনের গুণের কথা শুনে দিনে দিনে লুসিরও অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। তার অজান্তেই চুরি হয়ে যায় তার মন।

এক সন্ধ্যায় ঘোড়া ছুটিয়ে এল জেফারসন। দাঁড়াল ফটকের সামনে। ওকে দেখেই ছুটে এল লুসি।

মুখোমুখি দাঁড়াল দুজনে।

লুসির হাত দুটি নিজের হাতে নিয়ে জেফারসন আবেগ মিশ্রিত স্বরে বলল, লুসি, মাস দুয়েকের জন্য বেরুচ্ছি। ভাল থেকো। ফিরে এসে আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করব।

—বাবা যদি রাজি না হন?

—রাজি হয়েছেন। রুপোর খনিতে কাজ দেখাতে পারলেই তিনি খুশি।

জেফারসনের বিশাল বুকে আরক্তিম মুখ লুকিয়ে লুসি বলল, তাহলে আমি আর কি বলব।

জেফারসন বিদায় নিয়ে টুপি নেড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিল এরপর। দূর থেকে দূরে ক্রমে ওর ঘোড়া মিলিয়ে গিয়েছিল।

জন ফেরিয়ার জানত এমন একটা দিন এগিয়ে আসছে যেদিন তাকে ধর্মান্ধ মর্মোনদের বিষনজরে পড়তে হবে। এই নিয়ে তার ভাবনার অন্ত ছিল না।

লুসি আর জেফারসন যতই ঘনিষ্ঠ হয়েছে—ভয়টা ততই তার মনে মোচড় দিয়ে উঠেছে। অপরিসীম ধৈর্য আর সংযমে নিজেকে সামলে রেখেছে। মেয়েকে বিন্দুবিসর্গও বুঝতে দেয়নি।

মর্মোনদের ধর্ম সম্পর্কে তার মতামত যাই হোক না কেন, ফেরিয়ার মনে মনে স্থির করে রেখেছিল—লুসির বিয়ে মর্মোনদের সঙ্গে দেবে না। এদের বিবাহরীতি তার পছন্দ নয়।

আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে আর যাই হোক ঘরসংসার হয় না। জেফারসন হীরের টুকরো ছেলে। তার ওপর স্বধর্মী—খ্রীস্টান। তাকে পেয়ে সে হাতে চাঁদ পেয়েছিল। তাই একদিকে যেমন আতঙ্কে বুক কুঁকড়ে উঠেছে তেমনি আর একদিকে লুসির হাস্যময় সুখী মুখ কল্পনা করে আপ্লুত হয়েছে।

ভয়টা অমূলক নয় ফেরিয়ারের। এখানে এই দীর্ঘ বারো বছরে সে অনেক কিছুই

দেখেছে, অনেক কিছুই শুনেছে।

ধর্মের নামে এরা উম্মাদ। ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কথা বলাটা তাই বিপজ্জনক। অত্যন্ত সাধু সজ্জন প্রকৃতির মানুষও ধর্ম নিয়ে কথা বলতে ভয় পায়।

প্রচলিত ধর্মীয় নিয়মনীতির বিরুদ্ধে কথা বলার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় প্রাণ দিয়ে। গির্জার বিরুদ্ধে যে রুখে দাঁড়িয়েছে চিরতরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে সে। তার বৌ ছেলেমেয়ে আপনজন কেউ আর কোনদিন সন্ধান পায়নি তার।

ভুল করে রাগের মাথায়ও যদি কেউ ধর্ম-বিরুদ্ধ কথা উচ্চারণ করে ফেলে রেহাই পায়নি সেও। কাক-পক্ষীর অজান্তে সে একদিন সবার মধ্য থেকে হারিয়ে গেছে।

মর্মোনদের সংগঠন সর্বজ্ঞ—সর্বশক্তিমান। অথচ সে সংগঠনকে কেউ চোখে দেখেনি, তার নাম শোনেনি। কিন্তু সংগঠনের কাজ প্রত্যক্ষ করেছে সকলেই।

ভয়ংকর এই অদৃশ্য সংগঠনের শক্তি প্রয়োগ সীমিত ছিল প্রথম কেবল অবাধ্যদের ওপর।

মর্মোনধর্ম গ্রহণ করে যারা পরে তা বর্জন করতে চেয়েছে কিংবা কোনভাবে নিয়ম লঙ্ঘন করে ধর্মীয় রীতিকে কলুষিত করেছে—তাদের শাস্তি বিধান করত এই সংগঠন। কিন্তু ক্রমশই ব্যাপক ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে এই ভয়াবহ শক্তি।

মর্মোনদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কমে আসছিল। অথচ বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত। নারীর সংখ্যা কমে এলে এই বিবাহরীতি চিড় খাবে—ব্যাপারটা যখন এরকম পরিস্থিতিতে পৌঁচেছে—তখনই মর্মোনদের মুখে মুখে নানারকম ভয়াবহ কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

ভয়ে ত্রাসে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল অনেকে। কিন্তু দেশত্যাগী অধিবাসীরা দুর্গম অঞ্চলে পালিয়ে গিয়েও পরিত্রাণ পেল না। তাদের শিবির লুঠ হল—খুন হল নির্বিচারে।

হারেমে মহন্তদের আমদানি হতে লাগল নতুন নতুন স্ত্রীলোক। শোনা যায় মুখোশধারী আততায়ীরা নাকি রাতের অন্ধকারে দল বেঁধে আসে। নিঃশব্দে কাজ হাসিল করে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

রহস্যময় এই সংগঠন ক্রমে বিশেষ এক পৈশাচিক নামে পর্যবসিত হল।

ড্যানাইট ব্যান্ড বা অ্যাভেঞ্জিং অ্যাঞ্জেলস্ নাম শুনেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায় মানুষের।

ধর্মের নামে এই খুন জখম, নারকীয় কান্ড যারা চালিয়ে যাচ্ছে—তাদের রহস্যময় সংগঠনের সদস্য কে বা কারা তা কেউ জানতে পারেনি কোনদিন।

অবতারদের অধর্ম, কুকীর্তি বা ক্রূর ইচ্ছার প্রসঙ্গ নিয়ে ভুলেও কোনদিন কাউকে কিছু বলতে সাহস পায়নি ফেরিয়ার। উটায় বালিরও কান আছে।

কিন্তু এটাও জানত, একদিন লুসিকে নিয়ে তাকে মুখোমুখি হতে হবে এই নৃশংস মর্মোন সংগঠনের। মর্মোনধর্মের রীতি ভেঙ্গে লুসির বিয়ে অন্যত্র দেবার চেষ্টা করলেই বাধা আসবে। আর সে বাধা, বলা যায় না তার প্রাণ নিয়ে, হয়তো টান দেবে। জেনে শুনেও মন শক্ত রেখেছিল ফেরিয়ার। ভেবেছিল নির্দিষ্ট সময় এগিয়ে এলে দেশ ছেড়ে মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে।

গুটিগুটি পায়ে সেই সময় দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে—জেফারসন দু'মাস পর ফিরে এলেই সেই সময় উপস্থিত হবে।

লুসির মুখে সংবাদটা শুনবার পর থেকেই ভেতরে ভেতরে অস্থির আর আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সে।

ঘুরেফিরে একই চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

সল্টলেক সিটি ছেড়ে জেফারসন হোপ রওনা হয়েছে—তিন সপ্তাহ অতিক্রান্ত হল।

একদিন ভোরের দিকে গম ক্ষেতে বেরুবার উদ্যোগ করছে জন ফেরিয়ার। এমন সময় বাগানের ফটক খোলার শব্দ শুনল।

জানালা দিয়ে উকি মেরে দেখল—বলিষ্ঠ আকৃতির মধ্য বয়স্ক এক পুরুষ হন হন করে এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকে।

হৃদপিন্ডটা লাফিয়ে উঠল বুকের ভেতর। চিনতে অসুবিধা হল না মর্মোন প্রধান বিঘ্রাম ইয়ংকে।

নিজেই বাড়ি বয়ে এসেছে—এই ইঙ্গিত শুভ হতে পারে না। আতঙ্কে ভয়ে শিউরে উঠেও জন দৌড়ে এগিয়ে গেল অভ্যর্থনা জানাবার জন্য।

কঠিন মুখে অভিবাদন গ্রহণ করে ঘরে এসে বসল বিঘ্রাম ইয়ং।

জন ফেরিয়ার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হৃৎপিন্ডের শব্দ শুনছে।

তীক্ষ্ণচোখে তাকে নিরীক্ষণ করে মর্মোন প্রধান বলল, ব্রাদার ফেরিয়ার, না খেতে পেয়ে মেয়েকে নিয়ে মরুভূমির বুকে মরতে বসেছিলে তুমি। আমরা তোমাকে উদ্ধার করেছি, আহার দিয়ে বাঁচিয়ে তুলেছি। পরে নিরাপদে এই ঈশ্বরদত্ত রাজ্যে নিয়ে এসে জমিজায়গার অংশ দিয়েছি। তোমাকে আমরা আমাদের একজন করে নিয়েছি। তুমি যাদের কাছাকাছি পেয়েছ তারা প্রত্যেকেই এ ধর্মে প্রকৃত বিশ্বাসী।

তোমার সঙ্গে আমাদের একটাই শর্ত ছিল, আমাদের ধর্মমতকে তুমি মনে প্রাণে গ্রহণ করবে—নিষ্ঠা নিয়ে ধর্মের নীতি-নির্দেশ পালন করবে। তুমিও কথা দিয়েছিলে। কিন্তু এখন শুনতে পাচ্ছি তুমি আমাদের ধর্মকে অবজ্ঞা করছ।

জিব দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে ফেরিয়ার বলল, আমি তো কোনভাবেই কোন

রীতি লঙ্ঘন করিনি। সাধারণ তহবিলে নিয়মিত চাঁদা দিই, মন্দিরে যাই—

—তুমি বিয়ে করনি।

—আমার প্রয়োজন নেই বলে করিনি। আমার মেয়ে রয়েছে—তাকে দেখাশোনা করতে হয়। তাছাড়া দেশে মেয়ের সংখ্যা কম—বিয়ের প্রয়োজন আমার চাইতে যাদের বেশি তাদের কথাও আমার ভাবা উচিত।

—তোমার এই মেয়েকে নিয়েই কথা বলতে এসেছি। অনেক রকম কথা কানে আসছে।

জন ফেরিয়ার-এর প্রাণ উড়ে যাবার মত হলো এই কথা শুনে।

—তোমার মেয়ে বড় হয়েছে—উটা অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী সে—গণ্যমান্য অনেকেরই চোখে পড়েছে, পছন্দও হয়েছে। কিন্তু শুনছি সে নাকি একজন বিধর্মীর বাগদত্তা। যদিও কথাটা আমি গুজব বলেই ধরে নিচ্ছি।

আমাদের মধ্যে থেকে তুমি আমাদের ধর্মীয় নীতিকে এভাবে পায়ে ঠেলবে এ আমি বিশ্বাস করতে চাই না।

ফেরিয়ারের জবাব শুনবার আশায় একটু বিরতি দিল মর্মোন ধর্মগুরু। ফেরিয়ার নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে শুনে যেতে লাগল।

—আমাদের চার মহন্তর অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয়েছে, এই একটি ব্যাপারে তোমার ধর্মবিশ্বাস আমরা যাচাই করব।

তোমার মেয়ের বয়স কম হলেও তার মতামতের দাম দেওয়া হবে। আমাদের বয়স্কদের পত্নীর সংখ্যা অনেক। কিন্তু আমাদের ছেলেদেরও বউ থাকুক সেটাই আমরা চাই। স্ট্যানজারসনের এক ছেলে। ড্রেবারের দুই ছেলে। ওরা অর্থবান, বয়সও কম, ধর্মেও প্রকৃত মতি আছে। এদের মধ্য থেকে একজনকে তোমার মেয়ে বেছে নিক। এ ব্যাপারে তোমার কিছু বলার থাকলে বল।

ফেরিয়ার ধীরে ধীরে শান্ত কণ্ঠে বলল, এ বিষয়ে কথা বলবার আগে আমাকে একটু সময় দিন।

—বেশ, একমাস সময় তোমাকে দেওয়া হল। নিজে ভেবে মেয়ের সঙ্গে আলোচনা করে কর্তব্য স্থির কর।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল ইয়ং। দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ধারালো কণ্ঠে বলল, ব্রাদার ফেরিয়ার, চার মহন্তর আদেশ অমান্য করবার আগে সিয়েরা ব্ল্যাঙ্কের শুষ্ক মরুবালুকার কথা একবার মনে করো।

ঘর থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে গেল ইয়ং। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থেকে ফেরিয়ার শুনতে লাগল তার অপসৃয়মাণ পদশব্দ।

ফেরিয়ার চমকে উঠল পিঠে কোমল স্পর্শ পেয়ে। তাকিয়ে দেখল, লুসি। নিশ্চয় আড়াল থেকে সবই শুনেছে। চোখের পাতায় জল লেগে রয়েছে।

ফেরিয়ার ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়ের মাথায় হাত রাখল।

লুসি বলল, আমাকে নিয়ে তোমার বিপদ হল বাবা।

মেয়ের মাথায় সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বলল ফেরিয়ার—ভাবিস না মা—একটা কিছু ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। জেফারসন বড় ভাল ছেলে। তাছাড়া খৃষ্টান। ওকে ছাড়া তোর পাশে আমি আর কাউকে ভাবতে পারব না। যতই ওরা মুখে ধর্মের কথা বলুক—কোন দিক থেকেই এরা যোগ্য নয়।

একমাস তো সময় আছে—খবর পেলে ঠিক ছুটে আসবে। কাল নেভাদায় একটা দল যাচ্ছে—এদের হাতেই তাকে খবর পাঠাব। ও এলে চিন্তাভাবনা করে কর্তব্য স্থির করব।

—তোমাকে নিয়েই যত ভাবনা বাবা। অবতারের বিরুদ্ধাচরণ যারা করে তাদের ভাল হয় না। কত গল্পই তো শুনি এ নিয়ে। তারা নাকি চিরতরে হারিয়ে যায়।

—বিরুদ্ধাচরণ তো কিছু করিনি এখনো। একমাস সময় আছে। তেমন বুঝলে আগে থেকে সব বিক্রিবাটা করে নগদ টাকা বার করে নেব। তারপর উটা ছেড়ে চলে যাব। এখানকার চালচলন আমার মোটেই ভাল লাগে না। একজনের হুকুমে ওঠা বসা—স্বাধীনতা বলে কিছু নেই, এ রীতিনীতি বরদাস্ত হয় না।

—কিন্তু এখান থেকে বেরুবে কি করে বাবা?

—ভাবিস না মা, জেফারসন আগে আসুক—ঠিক একটা ব্যবস্থা দেখিস হয়ে যাবে।

মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে নিশ্চিন্ত করে ঘরে পাঠিয়ে দেয় ফেরিয়ার। কিন্তু নিজে রাতে শুতে যাবার আগে দরজা জানালা বেশ ভাল করে বন্ধ করল। তারপর শোবার ঘরে ঝোলানো মরচেপড়া পুরনো শট্‌গানটা নামিয়ে গুলি ভরে রাখল।

পরদিন সকালেই সল্টলেক সিটিতে রওনা হল ফেরিয়ার।

পরিচিত একজন যাচ্ছে নেভাদা মাউন্টেন্‌স, তার মুখে জেফারসনকে খবর পাঠিয়ে দিল। ঘোরতর বিপদ, খবর পাওয়া মাত্রই যেন চলে আসে। খবর পাঠাতে পেরে যেন বুকের বোঝা খানিকটা হাল্কা হল।

বাড়িতে একা রেখে এসেছে লুসিকে। কিসে থেকে কি হয়। একসঙ্গে দীর্ঘকাল থাকলেও মর্মোনদের মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পারে না ফেরিয়ার। এখন তো আরও নয়। সিটিতে আর দেরি না করে বাড়ির দিকে রওনা হল।

খামার বাড়ির কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ল ফটকের সামনে দুপাশে দুটি ঘোড়া বাঁধা। কে আবার এল?

দ্রুত পা চালিয়ে বাড়ি ঢুকে দেখে বসবার ঘর দখল করে আছে দুই যুবক। লম্বাটে মুখ, ফ্যাকাসে চেহারার একজন চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে পা তুলে দিয়েছে

স্টোভের ওপর।

আর একজন, ষাঁড়ের মত চেহারা, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত গুঁজে শিস দিয়ে চলতি গানের সুর ভাঁজছে।

ফেরিয়ার ঘরে ঢুকতে দুজনেই মাথা হেলিয়ে অভিবাদন জানাল। তারপর চেয়ারে বসা ছোকরা বলল, আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি আমরা। এ হল মহন্ত ড্রেবারের ছেলে, আমি স্ট্যানজারসন।

শঙ্কায় দুলে উঠল ফেরিয়ারের বুক। ব্যাপারটা ততক্ষণে সে আঁচ করে নিয়েছে। কঠিন মুখে তাকাল পর পর দুজনের মুখের দিকে।

স্ট্যানজারসন বলল, আপনার মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে আমরা এসেছি। অবশ্য বাবাদের কথাতেই আসা। আমাদের দুজনের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে পারেন। ব্রাদার ড্রেবারের এখন পর্যন্ত সাতজন স্ত্রী, আমার মাত্র চারজন। সেকারণে আমার দাবীই অগ্রগণ্য।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের সুরে যুবক ড্রেবার চিৎকার করে বলে উঠল, ব্রাদার স্ট্যানজারসন, এটা কোন কাজের কথাই নয়। কে কটা বৌকে পুষতে পারে বিবেচ্য বিষয় হল সেটাই।

গায়ে জ্বালা ধরে গিয়েছিল ফেরিয়ারের। ইচ্ছে হচ্ছিল ঘোড়ার চাবুকটা টেনে নিয়ে কষে বসিয়ে দেয় দুই অসভ্য ছোকরার পিঠে।

অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে যুবকদের সামনে এগিয়ে এসে কড়া গলায় বলল, শোন ছোকরা, আমার মেয়ে যখন ডাকবে তখন এসব কথা নিয়ে এসো। তার আগে আর কোনদিন এ বাড়িতে পা দেবার চেষ্টা করবে না।

বলতে বলতে ফেরিয়ারের রোদে-পোড়া বাদামী মুখ হিংস্র হয়ে উঠল।

রাগের কারণটা যেন বুঝতে পারেনি এমনি অবাক হওয়া মুখে দুই মূর্তিমান ফেরিয়ারের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল। লোকটার মাথায় গণ্ডগোল নেই তো! মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছে মহন্তদের ছেলে কৃতার্থ না হয়ে ক্ষেপে উঠেছে মোষের মত।

—এখনো দরজা খোলা আছে, নইলে জানালা দিয়েই দু'জনকে বেরুতে হবে।

প্রচণ্ড ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে শীর্ণ দীর্ঘ হাত তুলে ধরল ফেরিয়ার দরজার দিকে।

রাগে অপমানে ফ্যাকশে হয়ে গেল মহন্তদের দুই গুণধর পুত্রের।

কথা বলা নিরাপদ নয় বুঝতে পেরে দুজনেই সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

ফটকের দিকে যেতে যেতে স্ট্যানজারসন ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বলল—এর ফল আপনাকে ভুগতে হবে, বলে গেলাম। চার মহন্তের নির্দেশ আপনি পায়ে

ঠেলেছেন—কথাটা মনে রাখবেন।

প্রচণ্ড আক্রোশে গর্জন করে উঠে ফেরিয়ার বন্দুক আনতে ছুটল। লুসি এগিয়ে এসে বাধা দিল। বাবাকে জাপটে ধরে বলল, বাবা, মাথা ঠাণ্ডা কর। জেফারসনকে ফিরে আসতে দাও।

মেয়ের কথায় যেন সম্বিত ফিরে পেল ফেরিয়ার। উটার এই মর্মোন উপনিবেশে মহন্তদের অবাধ্যতার পরিণাম তার অজানা নয়।

সে দেখেছে, সামান্য অপরাধের দায়েও অর্থ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদেরও চরম মূল্য দিতে হয়েছে। রহস্যজনক ভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে তারা। গির্জার দখলে গেছে তাদের বিষয় সম্পত্তি।

আজকের ঘটনার পর নিজের সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভেবে অন্তরাত্মা শিউরে উঠল ফেরিয়ারের।

সমাজে যতই মান্যগণ্য হোক না কেন সে, মর্মোনদের অদৃশ্য রহস্যময় সংগঠনের কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না তাকে। সর্বশক্তিমান অবতার ইয়ং বাড়ি বয়ে এসে তাকে হুঁশিয়ারি জানিয়ে গেছে।

ত্রাসে শঙ্কায় ভেতরটা কুঁকড়ে এলেও ফেরিয়ার মেয়েকে তা বুঝতে দিল না। সহজ নিরুদ্বেগ ভাব টেনে রাখবার চেষ্টা করল চোখে মুখে।

লুসির সতর্ক চোখ কিন্তু ফাঁকি দিতে পারল না ফেরিয়ার। সহজেই বাবার মনের অবস্থা সে আঁচ করতে পারল। জেফারসনের কথা বলে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করল বাবাকে।

মর্মোন অবতারের পরোয়ানা পরের দিনই এসে হাজির হল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ফেরিয়ার সবিস্ময়ে দেখল গায়ের চাপায় পিন দিয়ে একটুকরো কাগজ আঁটা। আঁকাবাঁকা হরফে তাতে লেখা ঃ উনত্রিশ দিন দেওয়া হল প্রায়শ্চিত্তের জন্য।

সিরসির করে একটা ঠাণ্ডা ধারা বয়ে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। তার মনে পড়ল—ইয়ং তাকে এক মাসের সময় দিয়ে গিয়েছিল। অদৃশ্য অনুচরের সংকেতলিপি স্মরণ করিয়ে দিল—ত্রিশদিনের একদিন গত হল।

রাতের অন্ধকারে নিঃসাড়ে এসে রেখে গেছে এই চিরকুট। অথচ শোবার আগে দরজা জানালা সে নিজের হাতেই এঁটে বন্ধ করেছিল। গোপনচারী এমন শক্তিধর শত্রুর সঙ্গে কি করে এঁটে উঠবে ফেরিয়ার!

এই ঘোর বিপদে পাশে দাঁড়াবার মত একমাত্র জেফারসন ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। কিন্তু সে-ও এখন নাগালের বাইরে।

ফেরিয়ার চিরকুটটা দুমড়ে মুচড়ে বাইরে ফেলে দিল। লুসিকে কিছুই জানাল না এ ব্যাপারে।

পরের দিন ঘটল আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

মেয়েকে নিয়ে ব্রেকফাস্টে বসেছে ফেরিয়ার। এমন সময় কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল লুসি। ফেরিয়ার তাকিয়ে দেখে পোড়া কাঠ দিয়ে লেখা একটা সংখ্যা—আঠাস। ফেরিয়ার সবই বুঝল—কিন্তু মেয়েকে ভাঙল না কিছুই।

সে-রাতে বন্দুক নিয়ে পাহারায় বসে রইল ফেরিয়ার। কান সজাগ রাখল খরগোসের মত। কিন্তু কাউকেই নজরে পড়ল না, কোন শব্দও কানে এল না। পরদিন দরজা খুলতেই দেখল পাল্লায় রঙ দিয়ে বড় বড় করে লেখা—সাতাশ।

উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় এই ভাবে একটার পর একটা অভিশপ্ত রাত কেটে চলল। আর অদৃশ্য শত্রু বাড়ির কোথাও না কোথাও লিখে রেখে যাচ্ছে—অবশিষ্ট দিনের হিসাব—একমাস শেষ হতে আর কতদিন বাকি।

একটা করে দিন কমছে আর নিঃসীম আতঙ্ক ক্রমশঃ ভারী হয়ে বসছে বুকের ওপরে। উদ্‌ভ্রান্ত ভয়ার্ত ফেরিয়ার একাই বয়ে চলেছে এই বোঝা।

জেফারসনের আশায় বুক বেঁধে ছিল কিছুদিন। কিন্তু একে একে দিনের মেয়াদ হ্রাস পেয়ে যখন তিনে এসে ঠেকল—সেই প্রত্যাশাও হয়ে এল ক্ষীণ।

ফেরিয়ার বুঝতে পারল, বৃথা দিন গোণা। পরিত্রাণের আর পথ নেই। পালিয়ে যে বাঁচবে সে উপায়ও নেই।

পাহাড়ঘেরা এই উপনিবেশ থেকে পালাবার পথ তার অজানা। তাছাড়া পথের মোড়ে মোড়ে বসে গেছে সতর্ক প্রহরা। এই পরিস্থিতিতে আত্মসমর্পণ ছাড়া বাঁচবার অন্য রাস্তা নেই।

প্রতীক্ষার শেষ প্রান্তে পৌঁছে মরিয়া হয়ে উঠল ফেরিয়ার। জীবন যায় যাবে—তবু মেয়েকে এভাবে বিসর্জন হতে দেব না।

দিন রাত তন্ময় হয়ে কেবল এসব ভাবনাই ভাবে অসহায় ফেরিয়ার। আকুল কান্না দুমড়ে মুচড়ে বুক ভেঙে গলা ঠেলে আসতে চায়। অতি কষ্টে সংযত করে নিজেকে।

দুই সংখ্যাটি যেদিন বাড়িতে বিজ্ঞাপিত হল—সেদিন রাতে আর নিজেকে সামলাতে পারল না ফেরিয়ার।

এক মাসের মেয়াদ শেষ হতে আর একদিন বাকি। তারপর? তারপর কি হবে লুসির? ভাবতে ভাবতে অসহায় অক্ষম ফেরিয়ার চোখ ঢেকে কেঁদে ওঠে হু-হু করে।

সহসা কান্না থামিয়ে কান সজাগ করে ফেরিয়ার। এই নিস্তব্ধ নিশীথে কোথায় যেন একটা শব্দ হল?

কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে কান পেতে থাকল—হ্যাঁ, দরজার কাঠে যেন

আলতো টোকার শব্দ।

ছিটকে হলঘর পেরিয়ে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায় ফেরিয়ার। নিশ্চয় শেষ দিনের বিজ্ঞপ্তি কেউ লিখতে এসেছে।

সহ্যের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে—চোয়ালে চোয়াল চেপে এক মুহূর্ত ভাবল ফেরিয়ার। তারপরই একঝটকায় খিল তুলে পাল্লা খুলে দিল।

নিস্তব্ধ নিরুপদ্রব রাত বাইরে। আকাশের তারার ক্ষীণ আলোতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালিত করল বাগানে। কিন্তু বেড়ার ঘেরের অভ্যন্তরে অস্পষ্ট কোন ছায়াও নজরে পড়ল না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াতেই সহসা পায়ের দিকে নজর পড়তে চমকে উঠল ফেরিয়ার।

মুখ থুবড়ে মাটির ওপরে টান টান হয়ে পড়ে রয়েছে একটি লোক।

আতঙ্কে দু'পা পিছিয়ে এসে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল ফেরিয়ার। তার আগেই দেখল, সাপের মত বুকে হেঁটে মানুষটা ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল—জেফরসন হোপ।

—একি তুমি? যেন মুক্তির আনন্দ উদ্গত হল ফেরিয়ারের কণ্ঠ থেকে, এভাবে আসতে গেলে কেন?

ঘরে টেবিলে তখনো ফেরিয়ারের রাতের খাবার ঢাকা ছিল। জেফারসন টেবিলে বসে ঠাণ্ডা খাবার মুখে তুলতে তুলতে বলল, আগে কিছু খেয়ে নিই, পরে কথা হবে। দুটো পুরো দিন পেটে দানাপানি কিছু পড়েনি।

ঠাণ্ডা রুটি মাংস খেয়েই পেট ভরাল ফেরিয়ার। তারপর ঘুরে বসে বলল, বাড়ির চারদিকেই পাহারা। ছুঁচ গলবার ফাঁক নেই। কিন্তু আমাকে আটকাবে সে ক্ষমতা কোথায় ওদের।

—জেফারসন, বড় বিপদ আমাদের।

—জানি আমি, কালই শেষ দিন। তাই এভাবে এসময়ে আসতে হল সুযোগ করে। আজ রাতেই যা করবার করতে হবে—আর সময় নেই। ঈগল র‍্যাভিনে দুটো ঘোড়া আর একটা গাধা বেঁধে রেখে এসেছি—দরকারী যা কিছু সঙ্গে নিয়ে নিন—পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে কার্সন সিটি যাব, ঠিক করে এসেছি।

তাড়াহুড়ো করে তখুনি লুসিকে জাগানো হল। খাবারদাবারের একটা পোঁটলা বাঁধল জেফারসন। কুঁজোয় ভরে নিল জল।

লুসি তার দরকারী মূল্যবান জিনিসের একটা পোঁটলা বেঁধে জেফারসনের হাতে দিল। এতদিন পরে দেখা—এমন এক পরিস্থিতি যে দুটো মুখের কথাও বলতে পারল না সে জেফারসনকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌটলাপুটলি বাঁধা হয়ে গেল।

জেফারসন বলল, ওরা সদর দরজা আর খিড়কির দরজায় নজর রেখেছে। তবে পাশের জানলা দিয়ে বেরিয়ে ক্ষেতের মধ্যে যাওয়া যাবে। রাস্তায় পৌঁছে মাইল দুই গেলেই ঘোড়ার কাছে পৌছাতে পারব। এখনই বেরিয়ে পড়লে ভোর নাগাদ পাহাড়ের মাঝামাঝি পৌছানো যাবে।

—পথের অবস্থা কেমন? ফেরিয়ার শঙ্কিত দৃষ্টিতে জানতে চায়।

জেফারসনের ঢিলা পোশাকের সামনে উঁকি মারছিল রিভলবারের কুঁদো—তার ওপর হাত রেখে সে দৃপ্ত তেজে বলে উঠল—যেমনই হোক—আমাদের এগুতে হবে। শেষ হবার আগে অন্ততঃ কয়েকটাকে তো নিয়ে যেতে পারব।

জেফারসন বেশ কিছু সোনার মোহর আর নোট সঙ্গে এনেছিল। তুলে দিল ফেরিয়ারের হাতে। নিজের কাছে যা ছিল সব একসঙ্গে থলে বোঝাই করে ঘাড়ে নিল সে।

জেফারসন খাবারের পুঁটলি আর জলের কুঁজো নিল। লুসি নিল নিজের পোশাকআশাকের পুঁটলি।

বাড়ির সব আলো নেবানো। আকাশে হাল্কা মেঘের আস্তরণ।

জানালা খুলে একে একে সবাই নেমে এল বাগানে। তারপর হেঁট হয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ঝোপের আড়ালে গা ঢেকে এসে পৌছালো শস্য ক্ষেতের ধারে।

সামনেই একটা ফাঁক—তার ভেতর দিয়ে গলে ক্ষেতের মধ্যে ঢুকতে হবে। পথ দেখিয়ে সামনে চলেছে জেফারসন।

ফাঁকের মধ্যে ঢুকতে গিয়ে কিন্তু থমকে গেল, আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে দু'হাতে চেপে বাপবেটিকে মাটিতে শুইয়ে দিল। পরক্ষণে নিজেও পড়ে রইল নিশ্চল হয়ে।

এই সময়েই একটা নিশাচর পাহাড়ি পেঁচা ডেকে উঠল কর্কশ কণ্ঠে, গজ কয়েক দূরেই। খানিকটা দূর থেকে যেন জবাবে ডেকে উঠল আর-একটা পেঁচা।

পেঁচার ডাক থামতেই সামনের ক্ষেতের ফাঁকের ভেতর থেকে একটা আবছায়া ছায়ামূর্তি উঠে দাঁড়াল।

এই ফাঁকটাতেই ঢুকতে যাচ্ছিল জেফারসন—তার সতর্ক বুনো কান বিপদের আভাস পেয়েই রুখে দিয়েছিল। দেখা গেল, মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই সেই ছায়ামূর্তির মুখ থেকে বেরিয়ে এল পেঁচার কর্কশ ডাক। সেই ডাক শুনে অন্ধকারের মধ্য থেকে এগিয়ে এল আর একটা ছায়ামূর্তি।

প্রথম মূর্তি বলল, মনে থাকে যেন, কালকে মাঝ রাতে—নিশাচর হুইপার উইল পাখি তিনবার ডাকবে পর পর—

—ঠিক আছে, ব্রাদার ড্রেবারকে জানিয়ে দেব। বলল দ্বিতীয় মূর্তি।

—ব্রাদার ড্রেবার যেন সবাইকে বলে দেয়—নাইন টু সেভেন—

—সেভেন টু নাইন।

দুই মূর্তি দুদিকে এগিয়ে মিশে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

মাটির ওপর মড়ার মত পড়ে থেকে সবই শুনল জেফারসন। সংকেত আর পাল্টা সংকেত-ধ্বনি কানে লেগে রইল তার।

পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুঁজো হয়ে উঠে দাঁড়াল জেফারসন। তারপর বাপবেটিকে টানতে টানতে সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে গলে গিয়ে ছুটতে লাগল সামনে।

কারুর মুখে কোন কথা নেই। হেঁট হয়ে কেবল ছোটা।

লুসি দম ফুরিয়ে থমকে গেলে পাঁজাকোলে করে তুলে নিয়ে ছুটছে জেফারসন।

মাঝে মাঝে ফিস ফিস করে বলছে—সাবধান, চারপাশে সান্ত্রীদের প্রহরা। তাড়াতাড়ি পার হয়ে যেতে হবে।

হাঁপাতে হাঁপাতে হাইরোডে পৌঁছাল তিনজন। কিন্তু থামল না। ছুটতে লাগল আরও বেগে।

কিছু দূরেই একটা এবড়ো-খেবড়ো পায়ে-চলা পথ বেরিয়ে পাহাড়ের দিকে গেছে। এদিককার পথঘাট জেফারসনের মুখস্থ। মোড় ঘুবল পায়ে-চলা পথে।

বন্ধুর দুর্গম পথ। মাঝে মাঝে পাথরের বাধা। একটা সংকীর্ণ নদীখাত পেরিয়ে এঁকে বেঁকে আরও বেশ কিছুটা এগিয়ে—চারদিকে উঁচু পাথরের পাঁচিলঘেরা একটা নিভৃত অঞ্চলে এসে থামল সকলে।

বাইরে থেকে দেখা যায় না বলে বাহনগুলো বাঁধা ছিল এখানেই।

জেফারসন ঝটপট লুসিকে বসিয়ে দিল গাধার পিঠে। তারপর নিজেরা দুজনে দুই ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল। ঘোড়া হাঁকিয়ে চলল বিপজ্জনক খাড়াই পথে।

সামনে দুস্তর পথ—পেছনে শত্রুর ভয়। মনে শঙ্কা।

সবকিছু উপেক্ষা করে দুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর জেফারসন ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছে।

পর পর লাইন দিয়ে চলেছে তিনজনের বাহন।

একদিকে মাথা তুলে দাঁড়ানো দেয়ালের মত খাড়া পাথরের পাহাড়। আর একপাশে অমসৃণ পাথরের চাঁই—ইতস্ততঃ ছড়ানো। তার মধ্যে দিয়ে যে সংকীর্ণ পথরেখা—অতি সতর্ক দৃষ্টিতে সেই পথে বাহন চালনা করতে হচ্ছে। যতই এগুচ্ছে ততই দূরে সরে যাচ্ছে—মহন্তদের অভিশপ্ত শহর। বুকের পাষাণভারও যেন হাল্কা হচ্ছে ততই।

নিস্তব্ধ দুর্গম পাহাড়ী পথে চলতে চলতে সহসা ভয়ার্তরবে চেঁচিয়ে উঠল লুসি। সামনেই বিশাল এক পাথরের মাথার ওপরে দাঁড়িয়ে এক সান্ত্রী। হাতে বন্দুক।

তারাজ্বলা আকাশের পটভূমিতে পরিষ্কার দেখতে পেল জেফারসন তাকে। পথচারী তিনমূর্তিকেও দেখতে পেয়েছে সান্ত্রী। গলা চড়িয়ে হাঁক দিল—কে যায়?

নিস্তব্ধ গিরিসংকটের পাথরে পাথরে প্রতিধ্বনি তুলে দূরে মিলিয়ে গেল সেই চিৎকার-ধ্বনি।

পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো পেশীবহুল শক্ত দেহে দামাল ভয়শূন্য মন জেফারসনের। সান্ত্রীর হাঁক কানে যেতেই জিনে ঝোলানো রাইফেলে হাত রেখে চিৎকার করে বলল—নেভাদার অভিযাত্রী।

বন্দুকের ট্রিগারে হাত রেখে নিঃসঙ্গ প্রহরী বলল—কার হুকুমে?

এক মুহূর্তে চিন্তা না করে জবাব দিল জেফারসন—চার মহন্তর হুকুমে।

—নাইন টু সেভেন—

বাগানের পথে শুনে-আসা সংকেত প্রতি-সংকেতের বয়ান মনে রেখেছিল জেফারসন। তাই সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—সেভেন টু নাইন।

প্রতি-সংকেত শুনে সন্তুষ্ট হল সান্ত্রী বোঝা গেল। বলল—এগিয়ে যান—ঈশ্বর পথ নির্বিঘ্ন করুন।

মহন্তদের এলাকার শেষ এখানেই।

সর্বশেষ পাহারার ঘাঁটি পার হওয়া গেল। পথ এখন থেকে অনেক চওড়া হয়ে এগিয়েছে।

সান্ত্রীর জবাবে নিশ্চিন্ত হয়ে দ্রুত ঘোড়া হাঁকাল তিন পলাতক। সামনে বিস্তৃত মুক্তির পথ।

দীর্ঘ সংকীর্ণ গিরিসংকটের পথেই রাতটা কাটল।

বিরামহীন ভাবে কখনো পাশাপাশি, কখনো পেছন পেছন সার দিয়ে চলেছে দুটি ঘোড়া আর একটি গাধা।

চলতে চলতে ভোরের সূর্য যখন লাল আভা ছড়িয়ে দিয়েছে পাহাড়ের মাথায় মাথায় সেই সময়ে ওরা পৌঁছাল একটা খরস্রোতা নদীর ধারে। ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়ানো হল এখানে। নিজেরাও পাথরের ওপরে বসে প্রাতরাশ সেরে নিল।

ক্লান্তি আর অবসাদে শরীর ঝিমিয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু দু'দণ্ড বসে বিশ্রাম নেবার সময় নেই। ক্লান্তিহীন জেফারসন তাড়া দিয়ে বলে ওঠে—এখনো বিশ্রামের সময় আসেনি। অনেক পথ ভাঙতে হবে এখনো—নইলে আর প্রাণ বাঁচান যাবে না। কার্সন সিটিতে পৌঁছে নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম নেওয়া যাবে।

আবার সুরু হল তিন মূর্তির পথ চলা। সংকীর্ণ গিরিসংকট বেয়ে এগিয়ে চলা।

গোটা দিনটা কাটল একই ভাবে। রাতে কয়েক ঘণ্টার জন্য সামান্য বিশ্রাম জুটল বটে, সূর্য ওঠার আগেই শুরু হল আবার যাত্রা।

এদিকে সঙ্গের খাবারও নিঃশেষ হয়ে এসেছে। তার জন্য অবশ্য ঘাবড়ায় না

জেফারসন। পাহাড়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় তার জানা।

এখন দরকার নিরাপত্তা—শত্রুর লৌহমুষ্টি যেখানে পৌঁছুবে না, এমন একটা জায়গা। পেছনে এখনো পর্যন্ত অবশ্য শত্রুর আভাস নজরে পড়েনি। এ যাত্রা হয়তো প্রাণ বেঁচে গেল।

দুপুরের দিকে একটা জায়গায় ঘোড়া থামাল জেফারসন। পাহাড়ের খাঁজে ঘোড়া বাঁধল। তারপর শুকনো ডালপালা জোগাড় করে আগুন জ্বালাল। কনকনে ধারাল হাওয়ায় গা গরম না করলে আর চলছে না।

ঠিক জায়গা দেখে বাপ-বেটিকে বসিয়ে দিয়ে রাইফেল হাতে বেরিয়ে পড়ল—শিকারের খোঁজে।

দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। বাপ-বেটিতে উবু হয়ে বসেছে আগুনের পাশে। ঘোড়া আর গাধা পাশে দাঁড়িয়ে। এই দৃশ্য পেছনে রেখে পাহাড়ের গা বেয়ে এগিয়ে চলল জেফারসন। গিরি সংকটের পর গিরিসংকট পার হয়ে গেল।

কিন্তু কোন শিকারই নজরে পড়ল না।

কতদূর এগিয়ে গেছে বুঝতে পারছে না জেফারসন।

ঘণ্টা দু'তিন একই ভাবে ঘুরছে। ভাবছে, বৃথা আর হয়রানি না হয়ে এবার ফিরবে। এমন সময় চোখে পড়ল তিন চারশ ফুট ওপরে একটা শিখরের কিনারে একটা ভেড়া দাঁড়িয়ে আছে। প্রকাণ্ড একজোড়া শিং মাথার ওপরে—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

জেফারসন কাঁধের রাইফেল হাতে তুলে নিল—পাহাড়ের গায়ে গা মিশিয়ে শুয়ে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য স্থির করল। তারপর এক সময় টিপ করে ট্রিগার টিপে দিল।

অব্যর্থ লক্ষ্য—ছিটকে উঠে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ল ভেড়াটা—তারপর ঢালু গা বেয়ে গড়িয়ে গেল নিচের উপত্যকায়।

মৃত ভেড়ার শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে বেশ খানিকটা মাংস কেটে নিল জেফারসন।

বেলা শেষ হয়ে এসেছে। এক্ষুনি না ফিরলে পথ দেখে চলা দায় হবে।

শিকারের সন্ধানে কতদূর চলে এসেছে কে জানে। মাংস কাঁধে ফেলে দ্রুত পা চালাল জেফারসন।

উপত্যকা থেকে বেরিয়ে অনেকগুলো গিরিসংকট—একই রকম দেখতে। তাড়াহুড়ো করে চলতে গিয়ে অপরিচিত পথে চলে গেল জেফারসন। সামনেই একটা পাহাড়ী নদী—এ নদী সে আগে দেখতে পায়নি। তাই আবার ফিরল—এগিয়ে চলল আর একটা গিরিসংকট ধরে।

অন্ধকার নেমে এসেছে চারপাশে। ঝাপসা হয়ে এসেছে সামনের পথ।

ঘুরতে ঘুরতে পরিচিত পথে নেমে এল জেফারসন। পা যেন আর চলতে চাইছে না—শরীরেও অপরিসীম ক্লান্তি। তবু চলার ক্ষান্তি নেই।

অনেকক্ষণ বেরিয়েছে সে। ওদিকে ওরা বাপ-মেয়েতে নিশ্চয় তার পথ চেয়ে অধীর হয়ে উঠেছে।

সহসা উল্লসিত হয়ে উঠল জেফারসন। সামনের গিরিসংকটের প্রবেশ মুখ নজরে পড়ল আবছাভাবে।

চিনতে পারল—এই গিরিসংকটেই আগুন জেলে বসিয়ে রেখে দিয়েছিল দুজনকে। আনন্দে দু'হাত মুখের কাছে এনে গম্ভীর তীক্ষ্ণ শব্দ বাতাসে ছড়িয়ে দিল জেফারসন।

প্রতিধ্বনির লহরি তুলে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল সেই শব্দ। জেফারসন ফিরে এসেছে—এই তার সংকেত।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পাল্টা সংকেত শুনবার জন্য কান পেতে রইল। কিন্তু কোন সাড়াই পাওয়া গেল না।

আবার চিৎকার করে জেফারসন—পর পর কয়েকবার। কিন্তু নিস্তব্ধ বিজন গিরিসংকটে প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কোন শব্দই পাওয়া গেল না।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল জেফারসন। অজানা আতঙ্কে বুক কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই কাঁধের মাংসের বোঝা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পাগলের মত ছুটে চলল সামনে।

মোড় ঘুরেই সেই জায়গাটা। যাবার সময় দেখে গিয়েছিল দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। এখনো আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে বটে—কিন্তু বোঝা যায় অনেকক্ষণ আগুনে কাঠ পড়েনি।

নিঃশব্দ নিস্তব্ধ চারদিক। রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে নেমে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল জেফারসন।

বৃদ্ধ ফেরিয়ার, লুসি—বাহন তিনটি—কোন কিছুরই চিহ্ন নেই কোথাও। যাদুবলে যেন সব উধাও হয়ে গেছে।

জেফারসন বুঝতে পারে—মহন্তদের অদৃশ্য ভয়ংকর সংগঠনের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি সে। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে থাবা বাড়িয়ে শিকার তুলে নিয়ে গেছে—

হতচকিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় জেফারসন।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে নেয় সে। অদম্য প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হয় দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরায়। শক্তিশালী দুর্দান্ত শত্রুর সামনেও অসহায় মনে করে না সে নিজেকে।

ধীর পায়ে এগিয়ে এসে নতুন কাঠ ফেলে ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালে অগ্নিকুণ্ডে। লকলকে শিখার আলোয় তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে চারদিক।

অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখে সে নিঃসংশয় হয়। সল্টলেক সিটির অশ্বারোহী বাহিনীর স্পষ্ট নিদর্শন। অতর্কিতে এসে শিকারকে তুলে নিয়ে গেছে।

সহসা একদিকে চোখ পড়তে চমকে ওঠে জেফারসন। লাফ দিয়ে এগিয়ে যায় সামনে।

লাল রঙের মাটির একটা ঢিবি—আগে এ-ঢিবি ছিল না—সদ্য খোঁড়া। আকার আকৃতি দেখে নিশ্চল হয়ে যাবার মত অবস্থা হয় তার। কবর নয় তো? এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল একটা লাঠি পোঁতা রয়েছে—লাঠির ডগায় আটকানো একটা কাগজের টুকরো। তাতে লেখা—

জন ফেরিয়ার,
সল্টলেক সিটির প্রাক্তন বাসিন্দা
মৃত্যু ৪ঠা আগস্ট, ১৮৬০

কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে ক্ষিপ্তের মত আর একটা কবরের সন্ধান করতে থাকে জেফারসন।

কিন্তু না, কোথাও আর কোন চিহ্ন দেখতে পায় না।

মাথার চুলে হাত চালিয়ে মুঠি চেপে ধরে জেফারসন—লুসিকে তারা ঘোড়ায় চাপিয়ে নিয়ে গেছে। মহন্ত-পুত্রদের কারো অন্তঃপুরে তার সব আশা আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের সমাধি রচিত হবে!

পারা গেল না। প্রাণপাত চেষ্টা করেও নির্মম নিয়তিকে এড়ানো সম্ভব হল না!

লুসি তার সমস্ত নাগালের সীমার বাইরে। কিছুই আর কররার নেই।

সহসা দেহের কোষে কোষে ধ্বনিত হতে থাকে একটা শব্দ—প্রতিশোধ।

আর কিছু করার না থাকে—একটি কাজ এখনো করবার আছে। বুকভাঙা এই শোক শান্ত করতে হলে শত্রুদের নিজ হাতে এই কুকর্মের চরম শাস্তি দিতে হবে। নিতে হবে প্রতিশোধ।

অটল সংকল্পে মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করে অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান শিখার সামনে দাঁড়িয়ে বারবার উচ্চারণ করতে থাকে জেফারসন—প্রতিশোধ—চাই প্রতিশোধ।

মাংসের বোঝা কুড়িয়ে এনে ধীরে সংযত হাতে রান্না করল জেফারসন। রান্না মাংস পুঁটলিতে বেঁধে পর মুহূর্তে রওনা হল ফেলে আসা পাহাড়ি পথ ধরে—যে পথে শত্রুরা তার লুসিকে লুণ্ঠন করে এগিয়ে গেছে।

প্রতিহিংসার লেলিহান আগুন বুকে নিয়ে পাগলের মত পা চালাতে থাকে জেফারসন।

ক্লান্তি অবসাদ শোক নৈরাশ্য—সবকিছু তুচ্ছ করে।

ঘোড়ায় চেপে যে গিরিসংকট পার হয়ে এসেছিল সে, পায়ে হেঁটে অতিকষ্টে পাঁচদিনে সেখানে ফিরে এল।

পাথরের গায়ে পা হয়েছে রক্তাক্ত, কাঁটার খোঁচায় পোশাক ছিঁড়ে হয়েছে ফালাফালা।

রাতে কোথাও দু-এক ঘণ্টার বিরতি ছাড়া টানা চলেছে তার পদযাত্রা।

তবুও ক্লান্তিহীন জেফারসন। নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে জপছে কেবল একটি শব্দ—প্রতিশোধ—চোয়ালে চোয়াল চেপে।

ছদিনের দিন এসে পৌঁছল সেই ঈগল গিরিসংকটে। মহন্তদের শহর এখান থেকে দেখা যায় অনেক নিচে।

পাথরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আগুনজ্বলা চোখে তাকিয়ে থাকে সেদিকে।

নিঃসীম অবসাদে শরীর ভেঙ্গে আসছে—তবু রাইফেলে ভর দিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে শহরের চতুর্দিক।

কয়েকটা মূল সড়কে রঙীন পতাকা চোখে পড়ল। গৃহসজ্জার চিহ্নও রয়েছে ইতস্ততঃ। কোন উৎসবের স্পষ্ট চিহ্ন। কিন্তু হঠাৎ উৎসব কিসের? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে জেফারসন।

এমন সময় ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে আসে। চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়—

সরাসরি তার দিকেই এগিয়ে আসছে শব্দটা। ক্রমে অশ্বারোহী নজরে পড়ে—চিনতে পারে জেফারসন। তার এক সময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু—কুপার—মর্মোন।

জেফারসন নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়। হতভাগিনী লুসি ফেরিয়ারের খবর সংগ্রহ করতে হবে কুপারের কাছ থেকে।

জেফারসন ক্লান্ত অবসন্ন পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে—কুপার, চিনতে পার, আমি জেফারসন হোপ।

ঘোড়ার লাগাম টেনে অকপট বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে কুপার। তার জেফারসনকে চিনতে ভুল হয় না।

কিন্তু সেই যৌবনদীপ্ত প্রাণচঞ্চল মূর্তির এই কী হাল! গায়ের জামাকাপড় শতছিন্ন, মুখ শুষ্ক—দীপ্তিহীন চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। আপাদমস্তক কালিমাময়—যেন ভয়ংকর কোন ঝড় থেকে উঠে এসেছে। ধীরে ধীরে প্রচ্ছন্ন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে কুপারের চোখে মুখে।

—শরীরের একী হাল হয়েছে তোমার? শিগগির গা ঢাকা দাও—ফেরিয়ারদের ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে বলে পরোয়ানা বেরিয়েছে তোমার নামে। চার মহন্ত চতুর্দিকে চর লেলিয়ে দিয়েছে। তোমার সঙ্গে কথা বলাও এখন বিপদ।

জেফারসন ক্লান্ত কণ্ঠে বলে—পরোয়ানার তোয়াক্কা করি না আমি। কুপার, আমাকে একটি খবর জানিয়ে যাও। তুমি আমার অনেক দিনের পুরনো বন্ধু—ঈশ্বরের নামে বলছি—নিশ্চয় তুমি লুসির খবর রাখ—যা জান আমাকে

বলে যাও। লুসি ফেরিয়ার এখন কোথায়?

—ড্রেবার ছোকরার অন্তঃপুরে—বিয়ে হয়েছে কালই।

মাথাটা ঘুরে গেল জেফারসনের। মুখ হল রক্তশূন্য। কোনরকমে নিজেকে সামলে একটা পাথরের গায়ে বসে পড়ল।

—লুসির বিয়ে হয়ে গেছে!! কোন রকমে দম টানতে টানতে বলল জেফারসন।

—দেখছ না এনডোমেন্ট হাউসে পতাকা উড়ছে। কালই বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে নিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠেছিল ড্রেবার আর স্ট্যানজারসনের মধ্যে। যে দলটা তোমাদের পেছনে ছুটেছিল—ওরাও ছিল তাদের মধ্যে। লুসির বাবাকে গুলি করে মেরেছিল স্ট্যানজারসন—সে-কারণে সে ছিল বড় দাবিদার। শেষপর্যন্ত অবশ্য ড্রেবারের দল ভারি হয়ে গেল মিটিং-এ। অবতার ড্রেবার ছোকরাকেই দিল লুসিকে। মেয়েটাকে দেখেছি আমি—এর মধ্যেই শেষ হয়ে এসেছে—বেশিদিন টিকবে বলে মনে হয় না।

শুনতে শুনতে উঠে দাঁড়ায় জেফারসন। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে চলতে লাগল সামনের দিকে। কুপারও কথা বাড়াল না। নিজের পথে চলে গেল।

পেছনে রেখে গেল—প্রতিহিংসা-তাড়িত হিংস্র ভয়ঙ্কর জেফারসনকে।

কুপার যে আশঙ্কা প্রকাশ করে গিয়েছিল মাসখানেকের মধ্যেই তা সত্য হয়ে দেখা দিল। ঘৃণিত বিবাহের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেল লুসি। বিয়ের পর থেকেই বিছানা নিয়েছিল, সেই বিছানা থেকে আর উঠে দাঁড়াল না। একমাস পার না হতেই সব শেষ হয়ে গেল।

ড্রেবার ছোকরার নজর ছিল জন ফেরিয়ারের সম্পত্তির দিকে। লুসির মৃত্যু হল বটে, কিন্তু সম্পত্তির মালিকানা তার হাতে এসে গেল। ফুর্তি কিছু কমল না তার। এদিকে অন্যান্য বউরা মড়া আগলে রইল সারারাত। কবরে দেওয়ার আগের রাত এইভাবেই কাটাতে হয়—এটাই মর্মোন প্রথা।

মেয়েরা ঘরে কফিন আগলে বসে আছে। রাত গভীর। এমন সময় ঘটল এক আশ্চর্য কাণ্ড।

আচমকা ঘরের দরজা খুলে গেল সশব্দে। ছুটে ঘরে ঢুকল রোদে-পোড়া বিধ্বস্ত চেহারার একটা মূর্তি। ভয়ে কাঠ হয়ে গেল মেয়েরা।

সেই মূর্তি তীব্র চোখে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল কফিনের পাশে। হাঁটু গেড়ে বসল—উবু হয়ে প্রাণহীন হিমশীতল ললাটে ঠোঁট ছুঁইয়ে এক ঝটকায় আঙুল থেকে টেনে নিল বিয়ের আংটি। বীভৎস বিকৃত মুখে বলে উঠল—এ আংটি কবরে যাবে না। বলেই ঝড়ের বেগে ছিটকে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

উপস্থিত মেয়েদের কিছু বুঝে উঠবার আগেই পলকের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাটা। কারুর মুখে টু শব্দটি পর্যন্ত বেরুল না।

লুসির মৃত্যুর পর পার হল কয়েক মাস। ইতিমধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল একটা গুজব। শহরের উপকণ্ঠে নির্জন গিরিসংকটে নাকি একটা ভৌতিক মূর্তিকে দেখা যাচ্ছে। কাকে যেন খুঁজে ফিরছে সেই মূর্তি।

একদিন স্ট্যানজারসন জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল। সহসা একটা বন্দুকের গুলি ছুটে এল পাহাড়ের দিক থেকে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিটা ভাগ্যক্রমে তার মাথায় না লেগে বিদ্ধ হয় দেয়ালে।

আর একবার পাহাড়ে টহল দেবার সময় ওপর থেকে একটা বিশাল পাথরের চাঙড় গড়িয়ে পড়ে ড্রেবারের মাথার ওপর।

ভাগ্যক্রমে পা হড়কে পড়ে যাওয়ায় পাথরটা আঘাত না করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

এই দুটি ঘটনার পরেই সেই ভৌতিক মূর্তির রহস্য স্পষ্ট হয়ে যায় সকলের কাছে। সদলবলে তল্লাসি চালান হল পাহাড়ে। কিন্তু কোন হদিস পাওয়া গেল না জেফারসন হোপের।

ড্রেবার আর স্ট্যানজারসন ছোকরা নিজেদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে আনল বাধ্য হয়ে। বাড়ির বাইরে বেরুনো বন্ধ করল। সতর্ক পাহারা বসাল বাড়ির চারদিকে। বিশেষ কারণে বাইরে কাউকে বেরুতে হলে সান্ত্রী বেষ্টিত হয়ে বেরয়।

এভাবে চলল কিছুদিন। নতুন কোন ঘটনা আর ঘটল না। পাহাড়েও ভৌতিক মূর্তি আর নজরে পড়ে না কারুর। শত্রুর ভয় কমল খানিকটা।

এদিকে জেফারসন নিয়েছে নতুন পরিকল্পনা। প্রতিহিংসার দহনে দগ্ধ হচ্ছিল সে। শত্রুকে আঘাত করবার সুযোগের প্রতীক্ষায় রোদে পুড়ে জলে ভিজে, অনাহারে অনিদ্রায় কাটছিল তার দিন। ফলে শরীর ক্রমশই অশক্ত হয়ে আসতে লাগল।

সে বুঝতে পারল, এভাবে নিজেকে শেষ করে ফেললে তার প্রতিজ্ঞা পালন আর হবে না। নিজের হাতে শত্রুকে শাস্তি দিতে হলে শরীরটাকে সবল সক্ষম রাখা দরকার।

পাগলা কুকুরের মত এভাবে ঘুরতে থাকলে কদিন আর দেহে ধরে রাখা সম্ভব হবে প্রাণ। এভাবে শত্রুপক্ষের আশা পুরণ হতে দেবে না সে। তার চাই রক্তাক্ত প্রতিশোধ।

জন ফেরিয়ার আর লুসি ফেরিয়ারের খুনের প্রতিশোধ।

নতুন করে প্রতিহিংসার অভিযান শুরু করতে হলে চাই অনেক টাকা আর সবল সুস্থ শরীর।

তাই বুকে দাউ দাউ আগুন নিয়ে একদিন জেফারসন পাহাড় ছেড়ে ফিরে গেল নেভাদার খনি অঞ্চলে।

এক বছর পরেই ফিরে আসার সংকল্প নিয়েছিল জেফারসন। কিন্তু নানান পরিস্থিতির জন্য এক এক করে পাঁচটা বছর তাকে শেষ পর্যন্ত থাকতে হল।

এই পাঁচ বছরে একদিনের জন্যও সে ভুলে থাকেনি তার সংকল্পের কথা। বাইরে থেকেছে শান্ত ধীর ভেতরে জ্বলেছে প্রতিহিংসার অনল।

যত দিন গেছে, সেই অনলের দাহ মন্দীভূত না হয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে শতগুণ। তারপর একদিন ছদ্মবেশে নাম পাল্টে ফিরে এল সল্টলেক সিটিতে।

মনে আশঙ্কা থাকলেও আমল দেয়নি জেফারসন। তার সামনে তখন একটাই লক্ষ্য। যেভাবেই হোক অপরাধীদের ওপর বদলা নিতে হবে।

দীর্ঘ পাঁচ বছরের ব্যবধানে হাওয়া পাল্টে গিয়েছিল সল্টলেক সিটির। জেফারসন শুনল, গীর্জার বিরুদ্ধে একদল নবীন সদস্য মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

ধর্ম নিয়ে মতভেদের ফলে মহন্তদের খবরদারি দমিত হয়েছে। ধর্ম-বিরোধী বলে ঘোষিত হয়েছে কিছু নাম—তাদের মধ্যে রয়েছে ড্রেবার আর স্ট্যানজারসন। প্রাণের আশংকায় দেশ ছেড়ে পালিয়েছে তারা।

কোথায় গেছে কেউ জানে না। তবে গুজব শোনা গেল, ড্রেবার বিষয়-সম্পত্তি বেচে বিস্তর নগদ টাকা নিয়ে গেছে সঙ্গে।

স্ট্যানজারসন দেশ ছাড়া হয়েছে কপর্দকহীন অবস্থায়।

হতাশ হলেও ভেঙে পড়ল না জেফারসন। বুকের ভেতরের জ্বলন্ত হুতাশন নিয়ে নতুন অভিযান শুরু করল সে। সামান্য যা পুঁজি হাতে ছিল তাই নিয়েই সে ঘুরতে লাগল যুক্তরাষ্ট্রের শহর থেকে শহরে।

রক্তের নেশায় তখন তার উন্মত্ত অবস্থা। হাতের পুঁজি ফুরিয়ে গেলে কোন একটা জীবিকা বেছে নিচ্ছে।

কিছুদিন পরেই আবার নেমে পড়েছে পথে।

অহর্নিশ এই অন্বেষণ বৃথা গেল না জেফারসনের।

ওহিওর ক্লিভল্যান্ডে এক ঝলকের জন্য দেখতে পেল একটা মুখ, যে মুখের সন্ধানে সে পাগলা কুকুরের মত ছুটছে শহর থেকে শহরে। সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যান ছকে ফেলল জেফারসন।

জানালায় দাঁড়িয়ে ড্রেবারও পলকের জন্য দেখেই চিনতে পেরেছিল তার শত্রুকে। সে এখন মস্ত ধনী, স্ট্যানজারসন তার সেক্রেটারী।

মুহূর্ত মাত্র সময় নষ্ট না করে দু'জনে গেল পুলিশ ফাঁড়িতে। জানাল, একজন পুরনো শত্রু তাদের খুন করবার উদ্দেশ্যে পেছনে পেছনে ঘুরছে।

খুঁজে খুঁজে সেই রাতেই জেফারসনকে হাজতে পোরা হল। জামিনের টাকা

দিতে না পারায় কয়েক সপ্তাহ হাজত বাস করতে হল তাকে। বেরিয়ে এসে আর শত্রুর নাগাল পেল না—বাড়ি শূন্য। শুনল সেক্রেটারিকে নিয়ে ড্রেবার ইউরোপে পাড়ি জমিয়েছে।

এবারে অভিযান শুরু হল এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে।

কষ্টেসৃষ্টে পাথেয় জমিয়ে শত্রুর অন্বেষণে ছুটল জেফারসন। পিটার্সবার্গে গিয়ে শুনল—পালিয়েছে আর এক শহরে।

এইভাবে ধাওয়া করে শেষ পর্যন্ত নাগাল পেয়ে গেল দুই পাপিষ্ঠের। বোঝাপড়াটা হল লন্ডন শহরে।

ততদিনে যুবক জেফারসন হোপ আর যুবক নেই। পাক ধরেছে মাথার চুলে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহে এসেছে শীর্ণতা। কিন্তু বুকের আগুন রইল দগদগে—সংকল্প অটল অবিচল।

এর পরের কাহিনী শোনা যাবে প্রতিহিংসা-পাগল প্রায়-বৃদ্ধ জেফারসনের নিজের মুখ থেকেই। তার জবানবন্দী ডক্টর ওয়াটসনের খাতায় যেভাবে লেখা হয়েছিল হুবহু তাই তুলে ধরছি।

প্রচণ্ড ধস্তাধস্তির পর আসামীকে হাতে পায়ে বাঁধন দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম আমরা। এমন শক্তিমান পুরুষ আগে চোখে পড়েনি। রোদেপোড়া তামাটে মুখে যেন ঠিকরে পড়ছে অফুরন্ত প্রাণশক্তি।

আসামী নিজেই এক সময় আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠে বলে উঠল—এবারে নিশ্চয় থানায় যেতে হবে। আমার গাড়ি নিচেই রয়েছে—হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিন—নিজেই হেঁটে যাচ্ছি। আমার শরীরের ভার নিতান্ত কম নয়—বয়ে নিতে কষ্ট হবে আপনাদের।

আসামীর কথা শুনে লেসট্রেড আর গ্রেগসন দৃষ্টি বিনিময় করল। ধৃত আসামীর মুখে এমন প্রস্তাব তারা জীবনে কোনদিন শোনেনি।

শার্লক হোমস তৎক্ষণাৎ হেঁট হয়ে পায়ের বাঁধন খুলে দিল। পা টান টান করে দাঁড়িয়ে উঠে সকৃতজ্ঞ চোখে তাকাল সে হোমসের দিকে।

তারপর বলল, আমাকে কী করে যে খুঁজে বার করলেন বুঝতে পারছি না। আপনার ক্ষমতা সত্যিই অদ্ভুত।

.শার্লক হোমসের নির্দেশে দুই ডিটেকটিভ ততক্ষণে উঠে পড়েছে আসন ছেড়ে। আমাকেও সঙ্গে নেওয়া হল। সকলে মিলে আসামীকে আগে গাড়িতে তুলে দিয়ে আমরাও উঠে বসলাম। গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলল—লেসট্রেড নিজে।

থানায় পৌছে রীতিমাফিক যা যা করবার অফিসাররা যন্ত্রের মত কর্তব্য শেষ করল।

এই সময়েই আর একবার আসামী আমাদের চমকে দিল। থানার কর্তব্যরত অফিসার জানিয়েছিল, এই সপ্তাহের মধ্যেই তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করা হবে। অতএব তার বলার কিছু থাকলে সে বলতে পারে।

কয়েদী বলে উঠল—সবই বলব আমি, অনেক কিছু বলবার আছে। তবে আমাকে হয়তো কোর্টে আর শেষ পর্যন্ত যেতে হবে না। বুকটা পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন।

হোমসের ইঙ্গিতে আমি উঠে গিয়ে কয়েদীর বুকে হাত রাখলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম। সর্বনাশ। বুকের খাঁচার ভেতরে একটা তোলপাড় চলেছে—মুহুর্মুহু কেঁপে উঠছে বুকের দেয়াল।

হোমসের দিকে শঙ্কিত দৃষ্টি ফেলে বললাম—এ যে এওরটিক অ্যানিউরিজম-এর কেস। ধমনী ফুলে উঠেছে—রক্তচাপ সইতে না পেরে দেওয়াল যে কোন মুহূর্তে ফেটে যেতে পারে।

—ঠিকই ধরেছেন। হেসে বলল জেফারসন হোপ, পাহাড়ে পর্বতে ক্লান্তিহীনভাবে অনাহারে অনিদ্রায় ঘুরে ঘুরে কাটাতে হয়েছে অনেকদিন। এরই ফলে এই রোগ। গত কয়েক বছর থেকেই অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু সংকল্প সিদ্ধ না করে মরব না ঠিক করেছিলাম। এতদিনে তা পূর্ণ হল।

এবারে আমি প্রস্তুত। শান্তিতে চোখ বুজতে পারব। তবে তার আগে আপনাদের সব ঘটনা বলে যাব। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কিছু বলব না। সব শুনে আপনারাই বিচার করবেন—পাঁচটা গলাকাটার দলে আমাকে ফেলা যায় কিনা।

লেসট্রেড নিজের নোটবই নিয়ে বসলেন।

জেফারসন হোপ বলে গেল তার কাহিনী ঃ

ড্রেবার আর স্ট্যানজারসন দুটি খুনের অপরাধে অপরাধী। একজন খুন করেছে বাপকে, অপরজন মেয়েকে।

সেই সঙ্গে খুন করেছিল আমার সমস্ত জীবনের সাধ স্বপ্ন, বেঁচে থাকার আনন্দকে। এরপর এদের আর বেঁচে থাকার অধিকার থাকে না। অনেকদিনের পুরনো ঘটনা তাই আদালতে টেনে নিয়ে এই অপরাধের দণ্ডবিধানের উপায় ছিল না।

কিন্তু এদের দুটি হত্যারই সাক্ষী আমি নিজে। তাই আমিই হলাম একাধারে এদের দণ্ডদাতা বিচারক এবং জল্লাদ।

লুসি নামের মেয়েটির বিয়ে ঠিক হয়েছিল আজ থেকে কুড়ি বছর আগে। কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে তাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল ড্রেবারের সঙ্গে। সেটা ছিল একটা পাশবিক বিবাহ। তাই বুক ভেঙ্গে গিয়েছিল মেয়েটির।

তার শোচনীয় মৃত্যুর পর এই অভিশপ্ত বিয়ের আংটি ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলাম

আমি। কুকর্মের ওই চিহ্ন চোখের সামনে দেখতে দেখতে ড্রেবার মারা যাবে—কৃতকর্মের কথা তার মনে পড়বে—নিজে হাতে তাকে সেই সুযোগ এনে দেব—এই সঙ্কল্প নিয়েই বেরিয়ে পড়েছিলাম আমি।

এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে পেছু ধাওয়া করেছি। সে যে কী কষ্ট তা শুধু আমিই জানি। যখন হাতের টাকা শেষ হয়ে গেছে, কোন একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছি—নিজের সামান্য খরচখরচার পরে তিল তিল সঞ্চার করে সংগ্রহ করেছি পাথেয়।

তারপর আবার ধাওয়া করেছি। সর্বশেষ লন্ডন শহরে এসে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলাম আমার শিকার।

এর আগে অনেকবার হাত ফস্কে বেরিয়ে গেছে। ঠিক করলাম এবারে আর চোখের আড়াল করব না।

ঘোড়ায় চড়া, ঘোড়ার গাড়ী চালানো আমার কাছে ছিল হাঁটাচলার মত সহজ ব্যাপার। লন্ডনে এসে এক মালিকের কাছে ধর্না দিয়ে গাড়ি পেয়ে গেলাম।

রাস্তাঘাট চিনি না। গাড়ির মাথায় বসে খোলা ম্যাপ সামনে রেখে একে একে সব কটা সড়ক আর হোটেল চিনে ফেললাম। খুঁজতে খুঁজতে ওদের দুজনের ডেরার হদিসও পেয়ে গেলাম। নদীর ওপারে ক্যামবারওয়েলের একটা বোর্ডিং হাউসে উঠেছে দুজনে।

আমার মুখে এখন লম্বা দাড়ি। বেশবাসও অন্যরকম। সহজে চিনতে পারবার কথা নয়। ছায়ার মত লেগে রইলাম আমি পেছনে।

ড্রেবার আর স্ট্যানজারসন নিজেদের বিপদের কথা ভুলে যায়নি। তাই কখনো একা বেরুতো না কেউ, বিশেষ করে সন্ধ্যার পরে।

ঝাড়া দুটো সপ্তাহ লেগে থাকতে হল একইভাবে। এদের পেছু নেবার সুবিধার জন্য গাড়ি চালাবার সময়ও পাল্টাতে হল আমাকে।

রাতভর গাড়ি চালিয়ে মালিকের ভাড়া মিটিয়ে খুব সামান্যই থাকত। খুবই কষ্টে পড়লাম। কিন্তু সবই সয়ে যেতে লাগলাম দুই শত্রুকে কাছে পাওয়ার আনন্দে।

এদিকে অসুখটাও মাথা চাড়া দিচ্ছে মাঝে মাঝেই। ভয় হত কাজটা শেষ করার আগেই হয়তো বুকটা ফেটে শেষ হয়ে যাব নিজেই।

সুযোগ একদিন ঠিক এসে গেল। সন্ধ্যাবেলা টহল দিচ্ছি টুর্কুয়ে স্ট্রীটে। এ রাস্তাতেই ওরা থাকত।

দেখলাম একটা ভাড়াটে গাড়িতে মালপত্র তুলে দিয়ে ভেতরে উঠে বসেছে ড্রেবার আর স্ট্যানজারসন। আমি গাড়ি নিয়ে পেছন নিলাম ওদের গাড়ির।

অস্টেনে স্টেশনেতারা গাড়ি থেকে নামল। গাড়ির আড্ডার একটা ছোকরাকে গাড়িটা দেখতে বলে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে উঠলাম।

পেছন পেছন গিয়ে শুনতে পেলাম—লিভারপুলের টিকিট চাইছে। গাড়ির তখনো অনেক দেরি। গাড়ির দেরি শুনে খুশি হয়ে উঠল ড্রেবার।

ভিড়ের মধ্যে গা আড়াল করে আমি ওদের সব কথা শুনতে লাগলাম। ড্রেবার বলল, তার একটা জরুরী কাজ এই ফাঁকে সেরে আসতে যাবে—স্ট্যানজারসন তার জন্য অপেক্ষা করুক।

স্ট্যানজারসন রাজি হতে চাইল না ড্রেবারের কথায়। দুজনে কথা কাটাকাটিও হল। শেষ পর্যন্ত স্ট্যানজারসন খুবই মনমরা হয়ে গেল—বলল, লাস্ট ট্রেন মিস করলে যেন ড্রেবার হ্যালিডেজ হোটেলে চলে যায়। সেখানেই সে থাকবে।

এতদিনে আমার প্রতীক্ষিত সুযোগ এসে গেল। কিন্তু তাড়াহুড়ো করলাম না। ঠিকই করে রেখেছিলাম, মারবার আগে এদের পরিষ্কার ভাবে স্মরণ করিয়ে দেব—কি কাজের জন্য তাদের মরতে হচ্ছে।

আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার মত একটা সুযোগ পেয়েও গেলাম এই সময়ে।

কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোক ব্রিক্সটন রোডে বাড়ি দেখতে বেরিয়েছিলেন আমার গাড়িতে চেপে, নেমে যাবার সময় একটা চাবি ফেলে গিয়েছিলেন।

আমি চাবিটা পরদিন ভদ্রলোকের হাতে ফেরত দেবার আগে মোমের ছাঁচ তুলে রেখেছিলাম। পরে সেটা থেকে একটা নকল চাবি বানিয়ে নিয়েছিলাম।

লন্ডন শহরের একটা খালি বাড়িতে ঢুকবার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল এভাবে। জনমানবশূন্য এই বাড়ি নির্বিঘ্নে আমার কাজ হাসিল করার উপযুক্ত জায়গা। অপেক্ষায় ছিলাম—কি করে একজন একজন করে এই বাড়িতে এনে তোলা যায় সেই সুযোগের। এরপরই সুযোগটা হাতের মুঠোয় এসে গেল।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে পর পর কয়েকটা মদের আড্ডায় ঢুকল ড্রেবার। শেষ আড্ডাটা থেকে বেরুল চুর চুর মাতাল হয়ে। সামনেই একটা ঘোড়ায় গাড়ি পেয়ে চেপে বসল। আমার গাড়িও চলল অনুসরণ করে।

ওয়াটারলু ব্রীজ পেরিয়ে বেশ কয়েক মাইল পার হয়ে এসে দেখলাম দুই স্যাঙাৎ যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, তার সামনেই গাড়ি এসে দাঁড়াল।

গাড়ি নিয়ে তফাতে অপেক্ষা করে রইলাম। বুঝতে পারলাম না, ড্রেবার এ সময়ে আবার এভাবে ফিরে এল কি কারণে।

মিনিট পনের ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ শুনলাম বাড়ির ভেতরে চেঁচামেচির শব্দ। মারপিট বলেই মনে হয়।

আচমকা দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে এল দুটো লোক। একজন ড্রেবার, আর একজন অল্পবয়েসী এক ছোকরা। দেখে চিনতে পারলাম না।

ড্রেবারের কলার চেপে ধরে সিঁড়ির মাথায় এসে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিল ছোকরা। তারপর হাতের লাঠি মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে রাগে চিৎকার

করে তাড়া করল। ব্যাটা কাপুরুষ—তখুনি প্রাণ নিয়ে উঠে দৌড়লো মোড়ের দিকে। আমার গাড়ি সামনে পেয়ে লাফিয়ে উঠে বসল। বলল—হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেলে চল।

আমার অবস্থা তখন অনুমান করুন। শিকার একেবারে হাতের মুঠোয়। প্রবল উত্তেজনায় বুকের ভেতরে যেন ইঞ্জিন চলতে লাগল।

ভয় পেয়ে সংযত করতে লাগলাম নিজেকে। ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে লাগলাম।

মাঝপথে আবার একটা ঠেকে ঢুকে ড্রেবার মদ গিলে নিল। তারপর একরকম বেহুঁশ অবস্থাতেই গাড়িতে এসে উঠল।

অন্য কেউ এ সুযোগ পেলে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে ঠাণ্ডা হত। কিন্তু আমি সে-জাতের খুনী হতে পারি না। আমার উদ্দেশ্য ন্যায়বিচার। দণ্ড পাবার আগে আমার শত্রু নিজের পাপকর্মের চেহারাটা চোখের সামনে দেখতে পাবে—এই সুযোগ আমি তাকে দেব। কুড়ি বছর ধরে পেছনে ধাওয়া করেছি—আর এই কথা ভেবেছি।

আমেরিকায় ওদের পেছনে ধাওয়া করবার সময় ছোট ছোট অনেক চাকরি আমাকে করতে হয়েছে।

ইয়র্ক কলেজে দারোয়ানগিরি আর ঝাড়ুদারের কাজও করেছিলাম। সে-সময় একদিন শুনলাম বিষ নিয়ে প্রফেসর ছাত্রদের বক্তৃতা দিচ্ছেন। অ্যালকলয়েড নামে একটা জিনিস তিনি ছাত্রদের দেখালেন। দক্ষিণ আমেরিকায় রেড ইন্ডিয়ানরা তীরে যে বিষ মাখিয়ে রাখে—সেই বিষ থেকে অ্যালকলয়েডটা উনি বার করে নিয়েছেন।

মারাত্মক সেই বিষের বোতলটা দেখে রাখলাম। পরে সুযোগ মত বোতল থেকে একটু ঢেলে নিয়েছিলাম।

ওষুধপত্র বানাবার কায়দা আমার জানা ছিল। ঐ বিষ দিয়ে কতগুলো বড়ি বানালাম। তারপর হুবহু একই রকম দেখতে আরও কয়েকটা বড়ি বানালাম—তার মধ্যে বিষ দিলাম না।

একটা সাদা কৌটোয় দুরকম বড়িই রাখলাম। আমার প্ল্যানটা ছিল—দুই শয়তানকে কৌটো থেকে বড়ি খাওয়াব—তারপর যা পড়ে থাকবে নিজে খেয়ে জ্বালা জুড়বো। তখন থেকেই বড়ির কৌটো পকেটে পকেটে থাকত।

রাত একটা নাগাদ দুর্যোগ শুরু হল। তুমুল বৃষ্টি নামল, সেই সঙ্গে প্রবল ঝোড়ো বাতাস।

রাস্তা জনপ্রাণী শূন্য। মনের আনন্দে চুরুট ধরালাম। এইসময় দেখতে পেলাম অন্ধকারের মধ্য থেকে আমার প্রাণের লুসি আর তার বাবা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। বিশ্বাস করুন, আমার চোখের ভ্রম নয়—পরিষ্কার দুজনকে দেখতে

পেলাম। দুজনে ঘোড়ার দুপাশে ছুটছে আর হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। উৎসাহিত হয়ে বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে ঢুকলাম ব্রিক্সটন রোডে।

সেই খালি বাড়িটার সামনে গাড়ি থামিয়ে মাতালের ঘুম ভাঙালাম। ভাবল হোটেল এসেছে—আমার হাত ধরে নিচে নেমে পেছন পেছন বাগান ধরে হেঁটে আসতে লাগল। টালমাটাল মানুষটাকে পাশাপাশি হেঁটে সামলে নিয়ে যেতে হল আমাকে।

সদর দরজার চাবি খুলে সামনের ঘরে ঢোকালাম। মোমবাতি এনেছিলাম সঙ্গে —দেশলাই বার করে মোম জ্বাললাম।

তারপর মুখে আলো ফেলে ঘুরে দাঁড়ালাম ওর দিকে। বললাম, এনক ড্রেবার, দেখতো চিনতে পার কি না?

মদের নেশায় চোখ ঢুলুঢুলু। লাল চোখ তুলে কয়েক বার দেখল আমার আপাদমস্তক। বুঝতে পারলাম—আমাকে চিনতে পেরেছে। দরদর করে ঘামতে শুরু করল শয়তান। সারা শরীরে শুরু হল কাঁপুনি। আমি দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম—নরকের কুকুর—সল্টলেক সিটি থেকে এতদূর আমাকে তাড়িয়ে এনেছিস। লুসি ফেরিয়ারের মুখটা শেষবারের মত মনে করে নে।

আমি এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে মনে হচ্ছিল বুকের দেয়ালে হাতুড়ি পড়ছে। এসময় নাকের ভেতর দিয়ে বাড়তি রক্ত বেরিয়ে না গেলে হয়তো বেহুঁশ হয়ে পড়তাম। রক্ত বেরিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচলাম।

শয়তানটা ভয়ে ভয়ে দু'পা সরে গিয়ে বিড়বিড় করে বলল, খুন করবে?

আমি হেসে বললাম, খুন করব কেন? পাগলা কুত্তাকে যেভাবে মরতে হয়, সেভাবেই মরতে হবে তোকে। আমার সারা জীবনের স্বপ্ন সাধ জুড়ে যে ছিল, যার বাবাকে খুন করতে তোদের হাত কাঁপেনি, বাপকে খুন করে মেয়েকে নিয়ে পুরেছিলিস তোর সংসারের নরকে—তাদের কথা একবার মনে কর এবারে—

চিৎকার করে বলল—লুসির বাবাকে আমি মারিনি।

বললাম—কিন্তু লুসির বুক ভেঙেছিলিস তুই—তাকে বাঁচতে দিসনি। সেই পাপের শাস্তি আজ তোকে পেতে হবে।

বলতে বলতে কৌটোটা তার সামনে তুলে ধরে বললাম, ভগবানের বিচার আছে কিনা এবারে দেখ। দেরিতে হলেও ন্যায়বিচার তিনি করবেন। এই কৌটো থেকে একটা বড়ি খাবি তুই, একটা খাব আমি। জীবন আর মৃত্যু দুটোই মেশানো আছে কৌটোর বড়িতে। দেখা যাক কে মরে কে বাঁচে।

এবারে বিকট শব্দে চেঁচাতে লাগল ড্রেবার। অনুনয় করে হাতে পায়ে ধরতে লাগল। শেষ পর্যন্ত গলায় ছুরি ধরে তাকে বাধ্য করলাম বড়ি খেতে। বাকি বড়িটা খেলাম আমি।

মিনিট খানেক নিঃশব্দে দুজনেই দুজনের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তারপরই দেখলাম চোখ গোলগোল হয়ে পাক খেতে শুরু করেছে ড্রেবারের। বুঝলাম বিষের ক্রিয়া শুরু হয়েছে। হেসে উঠলাম বুক খালি করে।

লুসির অভিশপ্ত বিয়ের আংটিটা ধরে নাড়তে লাগলাম তার চোখের সামনে। দেখতে দেখতে হাত পায়ে খিঁচ ধরল। ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠে ছিটকে পড়ল মেঝের ওপরে।



চিৎ করে বুকের ওপর হাত দিয়ে দেখলাম—হৃদপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে।

নাক দিয়ে তখনো আমার অঝোরে রক্ত ঝরছিল। পুলিশকে ভুল পথে চালাবার একটা বদ মতলব এসে গেল মাথায়।

নিউ ইয়র্কের একটা খুনের ঘটনা মনে ছিল। খুন করবার পরে খুনি মৃতদেহের ওপরে লিখে রেখেছিল RACHE। আমিও নিজের রক্তে আঙুল ডুবিয়ে দেওয়ালে লিখলাম RACHE, তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলাম।

নিশুতি রাতের রাস্তা একেবারে ফাঁকা। ঝড়বাদল চলছে সমানে।

কিছুদূর গাড়ি হাঁকিয়ে যাবার পর পকেটে হাত দিয়ে দেখি আংটিটা নেই। লুসির স্মৃতি বলতে সেই আংটিটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ড্রেবারের লাশের

ওপর ঝুঁকে পড়বার সময়েই নিশ্চয় পড়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে ফিরে এলাম।

আংটিটা ফেলে যাওয়া যায় না। পাশের গলিতে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছি—একজন পুলিশের চৌকিদারের মুখোমুখি পড়ে গেলাম।

পাছে সন্দেহ করে বসে তাই সে-যাত্রা মাতালের অভিনয় করে কোনরকমে বেঁচে গেলাম।

আমার পয়লা নম্বরের শত্রু ড্রেবারকে এ ভাবে শেষে করলাম। বাকি রইল স্ট্যানজারসন। তাকেও একই কায়দায় মারতে না পারলে ফেরিয়ারের আত্মা তো শান্তি পাবে না।

জানতাম, হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেলে উঠেছে। সারাদিন হোটেলের আশেপাশে ঘুরঘুর করলাম। কিন্তু একবারও বাইরে বেরুল না শয়তানটা।

গতরাতে নির্দিষ্ট সময়ে ড্রেবার ফিরে না আসায় নিশ্চয় সন্দেহ করেছিল, বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু আমাকে ফাঁকি দেবে এমন বুদ্ধি শয়তানটার মাথায় ছিল না।

শোবার ঘরের জানলাটা ভালো করে দেখে নিলাম। পরের দিন ভোর হবার আগেই গিয়ে পাশের হোটেল থেকে মই জোগাড় করলাম। তারপর মই লাগিয়ে জানলা দিয়ে ঢুকলাম ঘরের ভেতরে।

নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে তখনো স্ট্যানজারসন। টেনে তুললাম। বললাম—ফেরিয়ারের খুনের জবাব দেবার সময় হয়েছে।

ড্রেবারের মৃত্যুবিবরণ তাকে শোনালাম। পরে বড়ির কৌটো বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—জীবন অথবা মৃত্যু যে কোন একটা বেছে নাও। এই শেষ সুযোগ।

কিন্তু আমার কথা মনঃপুত হল না শয়তানের। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে আমার গলা টিপে ধরতে গেল।

নিজেকে বাঁচাবার জন্য বাধ্য হয়ে ছুরি বসিয়ে দিতে হল বুকে। আমি জানি—বড়ি খেলেও ও বাঁচত না। ভগবানের বিচারে কখনো ভুল হয় না। ড্রেবারের মত ঠিক বিষ বড়িটাই হাতে উঠত।

আমার কাহিনী শেষ হয়ে এসেছে। বড্ড কষ্ট হচ্ছে। প্রাণটা বেরিয়ে যাবার জন্য ছটফট করছে। আমেরিকা ফিরে যাবার জন্য টাকা দরকার। নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে দিনকতক কাটালাম।

আজ গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম আড্ডায়। এমন সময় রাস্তার একটা ছোকরা এসে জেফারসন হোপকে খোঁজ করল। ২২১বি বেকার স্ট্রিটের এক ভদ্রলোক গাড়ি নিয়ে যাবার কথা বলেছেন।

সন্দেহ করবার মত কোন কারণ ছিল না। গাড়ি নিয়ে চলে এলাম। ওপরে

আসতেই এই ভদ্রলোক লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলেন হাতে। আমি টেরও পেলাম না—এমন ভাবে হাতকড়া আটকে গেল। স্যার, যা ঘটবার ঘটেছে। কিন্তু আমি আজ মুক্ত মনে পরম শান্তিতে চোখ বুজতে পারব।

অভিভূত হয়ে শুনছিলাম জেফারসনের মর্মস্পর্শী বিবরণ।

গোয়েন্দা দু'জনও নিশ্চুপ। কোন কথা নেই মুখে—খুনের দীর্ঘ বিবরণ শুনেও। ঘর নিস্তব্ধ। কেবল লেসট্রেডের পেন্সিলের ঘসঘস শব্দ ছাড়া। শর্টহ্যান্ডে বিবরণ নথিভুক্ত করছে।

শার্লক হোমস্ কথা বলল সবার আগে। বলল—একটা বিষয় জানা হল না, আমার বিজ্ঞাপনের জবাবে আংটি নিতে এসেছিল কে?

কৌতুকের হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে জেফারসন বলল—আমার ব্যাপারে আর কাউকে জড়াতে চাই না স্যার। আমার বন্ধুটি নিজে থেকেই আংটিটা আনতে গিয়েছিল। অবশ্য তখন একবারের জন্যও মনে আসেনি যে আংটির ফাঁদ পেতে কেউ আমাকে ধরতে চাইছে। তবে আপনাকে জব্বর ফাঁকি দিয়েছিল যা হোক!

সব কাজই শেষ হয়ে গিয়েছিল রীতিমাফিক। এরপর কয়েদীকে হাজতে নিয়ে যাওয়ার পালা।

লেসট্রেড বলল, সামনের বৃহস্পতিবার মেজিস্ট্রেটের সামনে আসামীকে হাজির করব। আপনাদের দয়া করে আসতে হবে। সাক্ষী হতে হবে।

কিন্তু নিয়তির অমোঘ বিধানে বৃহস্পতিবার আর কোর্টে গিয়ে সাক্ষী দিতে হল না আমাদের। ঊর্ধলোকের বিচারালয় থেকে তার আগেই ডাক এসে গেল জেফারসনের। ধরা যেদিন পড়ে সেদিন রাত্রেই জেফারসনের অ্যানিউরিজম ফেটে যায়।

পরদিন সন্ধ্যায় কেসটার ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছিল আমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে।

বললাম, এ কেসে তুমি আমাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করেছ। কোন রকম সাহায্য ছাড়াই তিন দিনের মাথায় এমন নাটকীয়ভাবে গ্রেপ্তার করেছ আসামীকে! এ অসম্ভব সম্ভব করলে কী করে বুঝতে পারছি না। এখানেও কি তোমার সেই অবরোহমূলক চিন্তা?

—নিশ্চয়ই। এ ধরনের ধাঁধার জবাব পাবার মোক্ষম পন্থা হ'ল পিছু-হাঁটা চিন্তাধারা। দেখ ভায়া, পরপর কতগুলো ঘটনা শোনার পর বেশির ভাগ লোকই বলতে পারে ঘটনা পরম্পরার ফলাফলটা কি হবে।

তারা ঘটনাগুলো মনের মধ্যে সাজিয়ে নিয়ে ঠিক করে নেয়—এই ঘটনার পরিণতি এই হবে। কিন্তু কিছু মানুষ আছে যাদের কেবল পরিণতিটা জানিয়ে দিলে—তারা মনের মধ্যে যুক্তি তর্ক দিয়ে ঠিক করে নেয়—কি কি ঘটনার ফলে

এমন একটা পরিণতি সম্ভব হতে পারে। চিন্তার এই ক্ষমতাই হল অবরোহমূলক চিন্তা বা বিশ্লেষণমূলক যুক্তি।

এবারে কেসটা সম্পর্কে শোন। এখানে পাওয়া গিয়েছিল একটা পরিণতি। কি কি ঘটনার ফলে এই ধরনের একটা পরিণতি সম্ভব হতে পারে, তা আমাকে ভেবে নিতে হয়েছিল।

তোমার নিশ্চয় মনে আছে, পর্যবেক্ষণ শুরু করেছিলাম রাস্তা থেকে। গাড়ির চাকার দাগ দেখলাম রাস্তায়। আমাদের সরকারী ডিটেকটিভ বন্ধুরা কেউই গাড়িতে আসেন নি। সুতরাং সিদ্ধান্তে এসেছিলাম—গাড়ির দাগ পড়েছে রাত্রে।

গাড়িটা যে ভাড়াটে গাড়ি তা-ও বুঝলাম সরু চাকার দাগ দেখে। ব্রুহাম, মানে বাড়ির গাড়ির চাকার দাগ হয় আরও চওড়া।

পরে বাগান দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলাম বাড়িটা পর্যন্ত। বাগানের কাদামাটিতে পরিষ্কার পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছিলাম আমি।

পায়ের ছাপের মানে বার করার ব্যাপারটা খুবই জটিল সন্দেহ নেই। কিন্তু উপযুক্ত ট্রেনিং পেলে ব্যাপারটা খুবই সহজ হয়ে আসে।

কনস্টেবলদের গোদা পায়ের পাশাপাশি আরও দু'রকমের ছাপ ছিল কাদামাটিতে। সেই দুজনের ছাপ যে আগে পড়েছিল বুঝতে পারলাম, অনেক জায়গায় পুলিশের পায়ের ছাপ সেগুলোকে চেপে দিয়েছে দেখে।

যারা আগে ঢুকেছিল তাদের পায়ের ছাপের মধ্যকার ফাঁক থেকে বোঝা গেল—একজন বেজায় রকমের ঢ্যাঙা। আর একজন সৌখিন মানুষ—বুটের ছাপ ছোট ছোট এবং বাহারি।

বাড়ির ভেতরে ঘরের মেঝেয় পড়ে থাকা লোকটার পায়ের বুট জোড়া দেখেই নিঃসন্দেহ হলাম—সঙ্গের ঢ্যাঙা লোকটাই খুনের আসামী।

মৃতের শরীরে ক্ষতচিহ্ন ছিল না কিন্তু। সেই মুখে বিভীষিকা ছিল। যারা হার্টফেল করে বা স্বাভাবিক কারণে মারা যায় তাদের মুখে বিভীষিকা থাকে না।

তাহলে মৃত ব্যক্তি আসন্ন মৃত্যুর খবর জানতে পেরেছিল। তাই উত্তেজনা আর বিভীষিকার ছাপ ফুটে ছিল স্পষ্ট হয়ে।

এর পর ঠোঁট শুঁকে তেতো গন্ধ পেলাম। বিষপ্রয়োগের সিদ্ধান্তে আসতে আর বাধা কোথায় বল। বিষটা দেওয়া হয়েছিল জানিয়ে, গায়ের জোরে।

এই পরিণতির অন্যান্য সম্ভাবনা সবই বাদ দিতে হয়েছিল কেন না আর কোন সম্ভাবনা দিয়েই এমন পরিণতি সম্ভব হচ্ছে না। গায়ের জোরে বিষ খাওয়ানোর ঘটনা অপরাধ ইতিহাসে নতুন কিছু নয়।

এর পরে এলাম মোটিভের সন্ধানে। কেন এই খুন?

মৃতদেহের পকেট থেকে কিছুই খোয়া যায় নি যাতে বোঝা যেতে পারে—এটা লুঠ পাটের ঘটনা। তাহলে থাকল, রাজনৈতিক ব্যাপার। রাজনৈতিক হত্যার ক্ষেত্রে ঘাতকদের খুনটাই থাকে লক্ষ্য। যাহোক করে কাজ সমাধা করেই তারা গা ঢাকা দেয়।

ঘরের ভেতরের পায়ের ছাপ থেকে বোঝা গেছে—খুনটা যে করেছে সে রয়ে সয়ে পায়চারি করতে করতে বেশ তাড়িয়ে তাড়িয়ে খুনটা করেছে।

এক্ষেত্রে একটাই পথ খোলা পাওয়া যাচ্ছে—সেটা হল—ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা মেটানোই খুনের উদ্দেশ্য। খুনটাও ঝটিতি করেনি। কোন অন্যায়ের শোধ তুলেছে ধাপে ধাপে।

দেওয়ালের লেখা দেখে আমার এই অনুমানটা আরও গভীর হল। পুলিশকে ধোঁকা দেবার চেষ্টাটা স্পষ্ট।

আংটিটা আবিষ্কার করার পর আমার আর সংশয় রইল না। কনের হাতের বিয়ের আংটি—খুনী নিশ্চয় বার করেছিল কোন একটি মেয়ের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। সে মেয়ে হয়তো জীবিতাবস্থাতে নেই।

তখনই জানার দরকার হয়ে পড়ল নিহত ব্যক্তির অতীত ইতিহাস। সেই কারণেই গ্রেগসনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সে ক্লীভল্যান্ডে পাঠানো টেলিগ্রামে মিঃ ড্রেবারের অতীত জীবন সম্বন্ধে জানতে চেয়েছে কিনা। জবাব শুনে বুঝেছিলাম, গ্রেগসনের উর্বর মস্তিষ্কে এই চিন্তাটা আসেনি।

খুঁটিয়ে ঘর পরীক্ষা করে পেলাম হত্যাকারীর উচ্চতা কতখানি, সে ত্রিচিনোপল্লী চুরুট খায়। এবং হাতের নখ লম্বা।

ধস্তাধস্তি বা আঘাতের চিহ্ন না থাকায় রক্তপাতের একটা কারণ অনুমান করে নিয়েছিলাম। উত্তেজনার সময় হত্যাকারীর নাক থেকেই রক্ত বেরিয়ে এসেছিল।

হত্যাকারীর পায়চারী করার ছাপ বরাবর ছিল রক্তের দাগ। গায়ে প্রচুর রক্ত না থাকলে উত্তেজনার মুহূর্তে এভাবে রক্তপাত হতে পারে না।

এ থেকে সিদ্ধান্তে এসেছিলাম, গুপ্তঘাতক বিরাটদেহী এবং টগবগে রক্তের লালমুখের মানুষ।

গ্রেগসন যে কাজটা অবহেলা করেছিল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে আগে সেই কাজটা সারলাম। ক্লিভল্যান্ড পুলিশ প্রধানকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানতে চাইলাম মিঃ ড্রেবারের বিয়ের সময়ে চাঞ্চল্যকর কিছু ঘটেছিল কিনা।

টেলিগ্রামের উত্তরটা পেয়েই শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম। প্রেমের ব্যাপারে এক পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বীর হামলায় ভয় পেয়ে ড্রেবার পুলিশের শরণ নিয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীটির নামও তারা জানিয়েছিল—জেফারসন হোপ এবং সে নাকি এখন ইউরোপে।

এভাবে চূড়ান্ত সূত্র হাতে পেয়ে আমার একমাত্র কাজ বাকি থাকল—ফাঁদ পেতে অপরাধীকে ধরা।

আগেই ভেবে নিয়েছিলাম, ড্রেবারের সঙ্গে লম্বা লম্বা পা ফেলে যে বাড়িতে ঢুকেছিল—ঘোড়ার গাড়িটা সে-ই চালিয়ে এনেছিল। রাস্তায় ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখেই আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম।

ঘোড়াটা হেঁটেছিল এলোমেলো ভাবে—গাড়োয়ান লাগাম ধরে থাকলে ওভাবে ঘোড়া কখনো হাঁটতে পারে না। গাড়োয়ান তাহলে কোথায় ছিল? বাড়ির মধ্যেই তার এই সময় থাকা সম্ভব। আর সে যদি বাড়ির ভেতরে থাকবে তাহলে তার পায়ের ছাপ নেই কেন?

তাছাড়া তৃতীয় কাউকে সাক্ষী রেখে খুন করা খুনীর পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা না। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে—যে খুনী সেই গাড়োয়ন। লন্ডন শহরে কারুর পেছু নিতে হলে গাড়োয়ান হওয়াটাই সবচেয়ে সুবিধাজনক।

এই সব তথ্য থেকে যে সিদ্ধান্তগুলো পাওয়া গেল সেগুলো বিবেচনা করে চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম—বিরাট এই শহরের অসংখ্য গাড়ির আড্ডায় কোথাও জেফারসন হোপ নামক এক গাড়োয়ান আত্মগোপন করে আছে।

লোকটা আমেরিকা থেকে এসে এখানে ছদ্ম নাম নিয়েছে এমন ভাববার কোন কারণ ছিল না। কেননা, এখানে তার আসল নাম কেউ জানে না।

সুতরাং এর পর আমার বেকার স্ট্রীট বাহিনীর বাউণ্ডুলে ছোঁড়াদের লেলিয়ে দিলাম। তারা গাড়ির আড্ডায় গিয়ে মালিকদের কাছে খোঁজ নিতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে খুঁজে পেয়েও গেল।

আমি অভিভূত হয়ে শুনছিলাম। বললাম, আশ্চর্য—অদ্ভুত তোমার যুক্তি আর বিশ্লেষণপদ্ধতি। এ যে দেখছি রীতিমত একটি বিজ্ঞান। গোয়েন্দা বৃত্তিটাকে তুমি বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠা করলে হোমস। এর আগে এমনটি আর হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।

—হয়নি বন্ধু। পৃথিবীতে এ বিষয়ে আমিই এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। যাইহোক, এবারে স্ট্যানজারসনের ব্যাপারে আসা যাক।

শোন, স্ট্যানজারসনের মৃত্যুর ঘটনাটা অপ্রত্যাশিত। একে রোধ করবারও কোন পথ ছিল না। বেচারা ছুরি খেয়ে মরেছিল বলেই বড়িগুলো হাতে পাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

বড়িগুলো বিষ বড়ি প্রমাণ পাবার পর আমার পূর্বের সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত এটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল।

পর পর ঘটনাগুলো থেকে যুক্তিসিদ্ধ অনুমান থেকে কি করে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম, এবারে আশা করি আর বুঝতে কষ্ট হবে না তোমার।

কথা শেষ করে হোমস হাসতে হাসতে বলল, এই নাও—এবারে এটা পড়ে দেখ।

একটা খবরের কাগজ এগিয়ে দিল হোমস।

সেদিনের 'একো' পত্রিকা। খবরটা আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়ে বলল—এই অংশটা পড়।

আমি পড়লাম :

মিঃ এনক ড্রেবার এবং মিঃ জোসেফ স্ট্যানজারসনের হত্যার অভিযোগে ধৃত আসামীর অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটায় চাঞ্চল্যকর এই মামলার বিবরণ আর জানবার কোন উপায় রইল না। তবে বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা জানতে পারলাম, এই জোড়া খুনের পেছনে ছিল বহু পুরনো ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা। এই সঙ্গে জড়িয়ে আছে রহস্যময় মর্মোন উপাখ্যান। নিহত দুই ব্যক্তিই যৌবনে মর্মোনদের উপনিবেশ উটার অধিবাসী ছিলেন। মৃত আসামী জেফারসন হোপও এসেছে মর্মোনদের সল্টলেক সিটি থেকে। দেশের বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটেছে বিদেশের মাটিতে। বৃটিশ পুলিশের আশ্চর্য দক্ষতায় খুনের এই পশ্চাদপট আবিষ্কৃত হয়েছে। আর এই আবিষ্কারের পূর্ণ কৃতিত্ব স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের স্বনামধন্য দুই ঝানু গোয়েন্দা মিঃ লেসট্রেড আর মিঃ গ্রেগসনের প্রাপ্য! আসামীকে ধরা হয়েছে—শার্লক হোমস নামক সখের গোয়েন্দার ঘরে। গোয়েন্দাগিরিতে ভদ্রলোকের প্রতিভার আভাস ইতিপূর্বে পাওয়া গিয়েছে। ভবিষ্যতে উপযুক্ত উপদেষ্টার সাহচর্য পেলে তার প্রতিভা যে বিকাশলাভের সুযোগ পাবে তা অনুমান করা যায়। বর্তমান এই মামলার কৃতিত্বের স্বীকৃতি-স্বরূপ তরুণ পুলিশ গোয়েন্দা দু'জনকে একটি প্রশংসিকা দিয়ে উৎসাহিত করা হবে বলে আমরা আশা করছি।

হোমস হাসতে হাসতে বলল—কি বুঝলে! কৃতিত্বটা কার ভাগে জুটবে সে কথাতো তোমাকে আগেই বলেছিলাম। এবার মিলিয়ে দেখ।

—সবুর করো। সবই আমি লিখে রেখেছি। আমার বই বেরুলে দেশের লোক সবই জানতে পারবে।

সাইন অব ফোর



অনেকবারই বলব বলব ভেবেছি, কিন্তু সাহস পাইনি। স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ একেবারে পছন্দ করে না হোমস। সে যে-ই হোক। আমাকেও একারণেই পিছিয়ে থাকতে হয়েছে—অসহ্য বিবেকের দংশন সহ্য করেও। কিন্তু আর পারা যায় না।

বেশ কয়েক মাস ধরে লক্ষ্য করেছি নিজের শরীরে নিজের হাতে বিষ ঢোকাচ্ছে দিনে তিনবার করে।

কখনো কোকেন কখনো মর্ফিন।

সেদিন আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম, শরীরটার সর্বনাশ না ঘটিয়ে দেখছি ছাড়বে না। ঈশ্বর তোমাকে যে অসাধারণ প্রতিভা দিয়ে পাঠিয়েছেন, এভাবে সাময়িক সুখের জন্য তাকে তুমি নষ্ট করতে পার না। বন্ধু হিসেবেই কথাগুলো বলতে বাধ্য হচ্ছি, কিছু যেন মনে করো না।

তাছাড়া আমাকে যদি ডাক্তার বলে মনে কর, তাহলেও তোমার এই অবস্থায় আমার একটা কর্তব্য তুমি স্বীকার না করে পারবে না। যা করে চলেছ তাতে দেহের কোষের এমন ভাবে পরিবর্তন ঘটে চলেছে যে এক সময় দেখবে অবসাদ আর দুর্বলতা স্থায়ীভাবে দেহে বাসা বেঁধেছে।

—ভায়া, আমার এই মনটা উপোসী হয়ে পড়লেই যত ফ্যাকরা। ভাববার মত সমস্যা না পেলে, মাথা ঘামাবার কাজ না পেলে কৃত্রিম উত্তেজকের শরণ নিতে হয়। নিরন্তর মানসিক উত্তেজনার খোরাক পাওয়া যায় বলেই তো এই নতুন পেশাটা সৃষ্টি করেছি। এখনো পর্যন্ত আমিই একমাত্র এবং অদ্বিতীয় বেসরকারী কনসাল্টিং গোয়েন্দা।

এই সময়ে দৃঢ় সংযত পদক্ষেপে ঘরে ঢুকলেন মিস মর্স্টান।

প্রথম দর্শনেই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন স্বর্ণকেশী মহিলাটি। পোশাকে চাকচিক্য নেই—সাদাসিদে কিন্তু রুচিসুন্দর।

ধূসরাভ হলদেটে পোশাকের সঙ্গে একই রঙের টুপি। চোখমুখ নিখুঁত নয় তবে আশ্চর্য শ্রীমণ্ডিত।

মমতা মাখানো দুটি নীলচোখ। হাবভাব বেশ মিষ্টি এবং অমায়িক। সংস্কৃতি ও সুরুচিমণ্ডিত এমন প্রতিচ্ছবি কদাচিৎ চোখে পড়ে।

শিষ্টাচার বিনিময়ের পর সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন মিস মর্স্টান, মিসেস সিসিল ফরেষ্টারের পারিবারিক সমস্যাটার সমাধান আপনি সুন্দরভাবে করেছিলেন। আপনার দক্ষতায় তাঁর অগাধ বিশ্বাস। সেই সূত্রেই আমার আসা। তবে আমার সমস্যাটা খুবই জটিল আর সাংঘাতিক দুর্বোধ্য।

কথাটা শুনে নড়েচড়ে বসল হোমস। শাণিত চোখমুখে ফুটে উঠল একাগ্রতা। বলল, বেশ তো বলুন, শোনা যাক আপনার কেস। ইনি আমার সহকারী বন্ধু ডক্টর ওয়াটসন। বিনা সঙ্কোচে আপনার কথা বলতে পারেন।

মিস মর্স্টানের মিষ্টি কালো চোখের তারা পলকের জন্য ঘুরে গেল আমার মুখের ওপর।

তিনি বলতে লাগলেন, ঘটনাগুলো যথাসম্ভব ছোট্ট করে বলছি। আমার বাবা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অফিসার ছিলেন। বাচ্চা বেলায় মা মারা যাওয়ার পর আমাকে বাবা দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এডিনবরার চমৎকার একটা বোর্ডিং-এ সতের বছর বয়স পর্যন্ত আমার কেটেছে।

বাবা ছিলেন তাঁর রেজিমেন্টের সিনিয়র ক্যাপ্টেন। ১৮৭৮ সালে বারো মাসের ছুটি নিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন। উঠলেন ল্যাংঘাম হোটেলে।

টেলিগ্রাম পেয়ে লন্ডন পৌঁছে হোটেলে গিয়ে শুনলাম, বাবা সেই হোটেলেই উঠেছেন, তবে আগের রাতে বেরিয়ে গেছেন, আর ফেরেননি।

সারাদিন বাবার পথ চেয়ে বসে রইলাম। পরে ম্যানেজারের পরামর্শমত সেই রাতে পুলিশে খবর দিলাম।

পরের দিন সকালে সব খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দিলাম। কিন্তু আজও পর্যন্ত বাবার কোন সন্ধান পেলাম না।

শেষের দিকে গলা ভারি হয়ে এল মিস মর্সটানের। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখলেন।

হোমস নোট বুক খুলে নিরুদ্দেশের তারিখটা লিখে নিল—১৮৭৮ সালের তেসরা ডিসেম্বর।

—হোটেলেই সঙ্গের মালপত্র সব ছিল। মালপত্র বলতে, কিছু বই, জামাকাপড়, আর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বেশকিছু দুষ্প্রাপ্য জিনিস। বাবা ছিলেন দ্বীপান্তর কয়েদীরক্ষীদের সর্বপ্রধান।

হোমস জিজ্ঞেস করল—শহরে কোন বন্ধুর বাড়িতে খোঁজখবর করেছিলেন?

—বাবার রেজিমেন্টে কাজ করতেন—থার্টি ফোর্থ বম্বে ইনফ্যান্ট্রি—মেজর শোল্টো। কেবল তাঁর কথাই আমি জানতাম। কিছুদিন আগেই অবসর নিয়েছিলেন মেজর। থাকতেন আপার নরউডে।

ওখানে খবর নিতে উনি বললেন, বাবা যে ইংলন্ড ফিরেছেন এ খবর তিনি জানতেনই না। মিঃ হোমস, আমার কাহিনীর পরের অংশ বড়ই চমকপ্রদ—শুনলেই বুঝতে পারবেন।

১৮৮২ সালের ৪ঠা মে টাইমস পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন বেরুলো—বিজ্ঞাপনের সংক্ষিপ্ত লেখাটা ছিল এরকম ঃ মিস মর্সটান যেন তাঁর বর্তমান ঠিকানা জানাবার ব্যবস্থা করেন—তাঁর নিজেরই উপকারের জন্য।

বিজ্ঞাপনে কারো নাম ঠিকানা ছিল না। আমি সে সময় মিসেস সিসিল ফরেস্টারের বাড়িতে গৃহশিক্ষয়িত্রীর চাকরি নিয়েছি। ওঁর পরামর্শ মত বিজ্ঞাপন স্তম্ভে আমার ঠিকানা ছাপিয়ে দিলাম।

সেই দিনই ডাকযোগে ছোট একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স এল আমার নামে। ভেতরে পেলাম একটা জ্বলজ্বলে বেশ বড় আকারের মুক্তো। কোন চিঠিপত্র নেই। প্রেরকের নামও না। সেই শুরু হল।

তারপর প্রতিবছর ঐ একই দিনে একই রকম কৌটো ডাকে এসেছে—তার ভেতরে পেয়েছি অবিকল একই রকম মুক্তো।

একজন বিশেষজ্ঞকে দেখিয়েছিলাম, তিনি বলেছেন, প্রতিটি মুক্তোই নাকি মূল্যবান এবং দুর্লভ।

বলতে বলতে একটা চ্যাপ্টা বাক্স খুলে দেখালেন মিস মর্সটান। ছটি অতি উজ্জ্বল বেশ বড় আকারের মুক্তো। এরকম মুক্তো আগে কখনো চোখে পড়েনি।

হোমস্ বলল, সম্প্রতি আপনাকে নিয়ে কিছু কি ঘটেছে?

—হ্যাঁ, সেই কারণেই আসা। আজ সকালেই একটা চিঠি পেলাম। চিঠিটা আপনি পড়ুন।

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল হোমস্। পরে খামটাও চেয়ে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

দেখল।

চিঠির লেখাগুলো এরকম ঃ

আজ রাত সাতটায় লিসিয়াম থিয়েটারের বাইরে বাঁ দিকের তৃতীয় থামের গোড়ায় উপস্থিত থাকবেন। প্রয়োজন বোধ করলে সঙ্গে দু'একজন বন্ধু আনতে পারেন। তবে পুলিশ এনে সব পণ্ড করবেন না। অনেক অবিচার আপনার ওপরে হয়েছে—এবার তার সুবিচার হবে।

—আপনার অজ্ঞাত বন্ধু।

চিঠি পড়া শেষ করে হোমস্ বলল, এ যে দেখছি রহস্যের পর রহস্য। খুবই কৌতূহল বোধ করছি আপনার এ কেসে মিস মর্সটান। তা এখন কি করবেন ঠিক করেছেন?

—আপনার কাছে সেটাই তো জানতে এসেছি।

—তাহলে আর পিছিয়ে থাকা কেন—চলুন যাওয়া যাক। আমরা দুই বন্ধু থাকব আপনার সঙ্গে। আমরা দুজন এর আগেও এক সঙ্গে কাজ করেছি।

মিস মর্সটান কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, আপনারা দুজনেই বড় ভাল! চাকরিতে অবসর নেবার পর থেকে মন খুলে কথা বলার মত কোন বন্ধু আমার নেই। আপনারা বড় দয়ালু। আমি যদি ছটায় চলে আসি—

—তাই আসবেন—বেশি দেরি করবেন না। হোমস্ বলল, আর একটা ব্যাপার আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। এই চিঠি আর মুক্তোর বাক্সের গায়ে লেখা ঠিকানা—এই দুই লেখার মধ্যে কোন মিল চোখে পড়েছে আপনার?

—ঠিকানাগুলো সঙ্গেই এনেছি আপনাকে দেখাবো বলে।

গোটাকয়েক কাগজ এগিয়ে দিলেন মিস মর্সটান।

দরকারী জিনিস ঠিক সময়ে হাতের কাছে পেয়ে হোমস্ খুশি হল। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে খামগুলো টেবিলের ওপর ছড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

ছোট হরফ—বড় হরফ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। পরে বলল—আমি নিঃসন্দেহ মিস—এই ঠিকানা আর চিঠি একই ব্যক্তির লেখা। আচ্ছা, এই লেখার সঙ্গে আপনার বাবার লেখার মিল আছে বলে মনে হয়?

—না, একেবারেই না।

এর পর আর কথা বাড়াল না হোমস্।

বেলা তিনটা হয়েছে।

উজ্জ্বল সহৃদয় চোখে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন মিস মর্সটান।

হঠাৎ কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতে লাগল যেন। অদ্ভুত এক অনুভূতি। আশ্চর্য একটা মাধুর্য যেন ছড়িয়ে ছিল এতক্ষণ ঘরে। তারই শূন্যতা বোধ।

জানলার ধার থেকে সরে এসে বললাম—আশ্চর্য মেয়ে, দেখলেই ভাল

লাগে।

—সর্বনাশ করেছে, বলল হোমস্, ব্যক্তিগত গুণাবলীতে মনকে আচ্ছন্ন করো না ভায়া, বিচারবুদ্ধি একদম গুলিয়ে যায়।

কথাবার্তায় অমায়িক ভুবনমোহিনী এক মহিলাকে জানি যিনি বীমার টাকা পাওয়ার জন্য নিজের তিন ছেলেমেয়েকে বিষ খাইয়ে মেরেছিলেন।

আবার দেখলে গা ঘিন ঘিন করে এমন একজন ভদ্রলোককে জানি যিনি লন্ডনের দীন দরিদ্রদের অবস্থা ফেরাবার জন্য এ পর্যন্ত আড়াই লাখ পাউন্ড খরচ করেছেন।—যেকারণেই বলি বন্ধু, আবেগ টাবেগ বেশি প্রশ্রয় দিও না মনে—যুক্তির ধার ভোঁতা করে ছাড়বে। শোন, বসে পড়াশুনো কর—ঘণ্টা খানেকের জন্য বেরুচ্ছি।

হোমস বেরিয়ে যাওয়ার পর উইপ উড রীডসের একটা বই নিয়ে বসলাম জানালার ধারে।

কিন্তু মন বসাতে পারলাম না। হোমসের সতর্কীকরণ সত্ত্বেও মিস মর্সটানের মিষ্টি হাসি আর সুরেলা কণ্ঠস্বর মনে পড়তে লাগল।

আকাশ-পাতাল চিন্তা ভর করল মাথায়। ক্রমশঃ কল্পনা এমনই বিপজ্জনক পথে গতি নিতে লাগল যে ভুলে গেলাম আমি একটা সামান্য ডাক্তার মাত্র—সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়া সার্জন—ব্যাঙ্কের তহবিল নিতান্তই কমজোরী—তার ওপর একটা কমজোরী জখম পায়ের মানুষ। আমার মত মানুষের এই কল্পনাবিলাস শোভা পায় না!

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে একটা ডাক্তারি বই নিয়ে মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

বেলা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ হোমস্ ফিরে এল। চোখ মুখ বেশ ঝকঝকে।

চায়ের টেবিলে জাঁকিয়ে বসে বেশ খোলসা গলায় বলল—কেসটায় রহস্য বিশেষ নেই। এখন একটা বিষয় পরিষ্কার করতে পারলেই হয়।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, সে কী—এরই মধ্যে সমাধান করে ফেললে?

—অতদূর এগিয়েছি বলা ঠিক হবে না—তবে মূল সূত্র হাতে এসে গেছে। টাইমস পত্রিকার পুরনো ফাইল ঘাঁটতে গিয়ে নজরে পড়ল—থার্টি ফোর্থ বম্বে ইনফ্যান্ট্রির অবসরপ্রাপ্ত অফিসার এবং আপার নরউডের বাসিন্দা মেজর শোল্টো ১৮৮২ সালের ২৮ এপ্রিল গতাসু হয়েছেন।

আপাতদৃষ্টিতে কেসের সঙ্গে এই খবরের যোগসূত্র হয়তো খুঁজে পাবে না। কিন্তু ব্যাপারটা মাথায় আনবার চেষ্টা কর ক্যাপ্টেন। মর্সটান রাতে হোটেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে আর ফেরেননি। ছুটিতে লন্ডন শহরে এসে গল্পগুজব করার জন্য একজনের বাড়িতেই তিনি যেতে পারেন—মেজর শোল্টোর বাড়িতে। কিন্তু

মেজর শোল্টো স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন মর্সটান লন্ডনে এ খবর তিনি জানেনেই না।

পাঁচ বছর পরে মারা যান শোল্টো। মৃত্যুর সাতদিনের মধ্যেই মিস মর্সটান—ক্যাপ্টেন মর্সটানের মেয়ে, একটা উপহার পেলেন।

ছ বছর ধরে একই দিনে পেয়েছেন সেই উপহার। সর্বশেষ পেলেন একটি চিঠি—তার ওপর নাকি অবিচার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাপের কাছ-ছাড়া করা মেয়ের প্রতি আর কি অবিচারের কথা ভাবা যেতে পারে?

শোল্টোর মৃত্যুর পর পরই এই উপহার কেন? শোল্টোর উত্তরাধিকারী কোন্ অবিচারের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বছর বছর মুক্তো পাঠিয়ে প্রায়শ্চিত করছে? আমি এ পর্যন্ত পৌঁছালাম—বল তোমার মাথায় এছাড়া আর কি আসছে?

—প্রায়শ্চিত্তটা একটু অদ্ভুত মনে হয় না কি? বললাম আমি, অবিচারের সংবাদ জানিয়ে লেখা চিঠিটা তাহলে ছ বছর আগে আসতে ক্ষতি কি ছিল? চিঠিতে সুবিচারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে—সুবিচারটা কি ধরনের? তাছাড়া অবিচার কি একটাই—মেয়েকে বাপের কাছ-ছাড়া করা! ফ্যাকড়া এখনো অনেক ব্রাদার—

—তা আছে—তবে আজ অভিযানের পরে অনেক অসুবিধেই দূর হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমাদের কথা চলা অবস্থাতেই মিস মর্সটানের চার চাকার গাড়ি এসে দাঁড়াল দোর গোড়ায়।

হোমস্ ড্র'য়ার খুলে রিভলবার পকেটে চালান কবল। সবচেয়ে ভারী ছড়িটা আমি সঙ্গে নিলাম। আসন্ন নৈশ অভিযানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম আমরা।

গাড়ির ভেতরে কাল আলখাল্লায় সর্বাঙ্গ মুড়ে বসে আছেন মিস মর্সটান। অজ্ঞাত অভিযানের অস্বস্তির ভাব মুখে মাখানো। কিন্তু মুখভাব সংযত। তাতে শ্রীমণ্ডিত মুখ যেন আলাদা সৌন্দর্য লাভ করেছে!

গাড়িতে যেতে যেতে মিস মর্সটান বললেন, আপনাকে বলতে ভুল হয়ে গেছে, বাবার টেবিলে একটা কাগজ পাওয়া গিয়েছিল। নানারকম নক্সাকাটা। কেউ কিছু বুঝতে পারিনি আমরা। আমি সেটা রেখে দিয়েছিলাম যত্ন করে—আপনি দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন তাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

হোমস্ সন্তর্পণে ভাঁজ খুলে কাগজটা হাঁটুর ওপর বিছিয়ে ধরল। তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আতস কাচ ফেলে দেখতে দেখতে বলল—একটা নক্সা দেখছি। প্রকাণ্ড বাড়ির একটা অংশের। অনেক হলঘর, অ নেক বারান্দা, গলিপথও অনেক। একদিকে লাল কালি দিয়ে আঁকা একটা ক্রুশচিহ্ন। তার ঠিক ওপরেই পেন্সিলের ফিকে লেখা—'বাঁদিক থেকে ৩০-৩৭'—বাঁদিকে কোণে দেখছি একটা সংকেতিক চিহ্ন।

একই লাইনে গায়ে গা ঠেকিয়ে চারটি ক্রশচিহ্ন—পাশে লেখা : চতুর্মুখ—জোনাথন স্মল, মহোমত সিং, আবদুল্লা খান, দোস্ত আকবর। হাতের লেখা ধ্যাবড়া। নাঃ এ কেসের সঙ্গে কোন যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না। তবে মনে হচ্ছে কোন গুরুত্বপূর্ণ দলিল। যত্ন করে রেখে দিন—পরে হয়তো কাজে লেগে যেতেও পারে। কেসটাতে যে এত সূক্ষ্মতা থাকতে পারে—গোড়ায় বুঝতে পারিনি।

কাগজটা ফেরত দিয়ে গাড়ির সামনে হেলান দিয়ে বসল হোমস্। মুখ ভাব দেখে বুঝলাম ধীরে ধীরে গভীর চিন্তায় তলিয়ে যাচ্ছে।

সেপ্টেম্বরের অলস রাত।

সাতটা তখনো বাজেনি।

লিসিয়াম থিয়েটারে পৌঁছে গেলাম আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই। দু'পাশের প্রবেশপথের সামনে এরই মধ্যে ভিড় জমতে শুরু করেছে। মানুষ আর গাড়ির চলাচলে জমজমাট চারদিক। চিঠির নির্দেশ মত বাঁদিকে তৃতীয় থামটার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

সঙ্গে সঙ্গে কোচোয়ানের বেশধারী একজন কৃশকায় চটপটে লোক এসে সামনে দাঁড়াল।

—আপনি কি মিস মর্স্টান?

—হ্যাঁ, এই দুই ভদ্রলোক আমার বন্ধু।

আমাদের দিকে তীক্ষ্ণ চোখ বুলিয়ে লোকটা বলল, আপনাকে পুলিশের লোক সঙ্গে না আনতে বলা হয়েছিল—কথা দিন এরা পুলিশের লোক নন।

মিস মর্স্টান বললেন—কথা দিচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা তীক্ষ্ণ শিস বাজাল। পরক্ষণেই অল্পবয়সী এক ছোকরা একটা ভাড়াটে গাড়ি নিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে।

যে লোকটা কথা বলছিল, সে চালকের আসনে উঠে বসল। আমরা ভেতরে উঠে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা ভেদ করে ছুটে চলল গাড়ি।

অদ্ভুত এই নৈশ অভিযান।

কি উদ্দেশ্যে কোথায় চলেছি কিছুই জানি না।

ফাঁদে পা দিতে চলেছি কিনা তাও অজানা।

কতক্ষণ চুপ করে বসে থাকা যায়। হোমস্ নিজের মনেই নিমগ্ন হয়ে আছে। মিস মর্স্টানও সংযত দৃঢ়।

বাধ্য হয়ে আমাকেই কথা শুরু করতে হল। আফগানিস্থানের স্মৃতিকথা শোনাতে লাগলাম ভদ্রমহিলাকে। আর লক্ষ্য রাখতে লাগলাম বাইরের দিকে।

কোন দিকে যাচ্ছি প্রথম প্রথম বুঝতে পারছিলাম।

ক্রমশই রাস্তা গুলিয়ে যেতে লাগল।

উল্কার বেগে অজানা পথে ছুটে চলতে লাগল গাড়ি। রাজপথ বাগান গলি ঘুঁজি—চত্বর—একে একে পার হয়ে যেতে লাগল সব।

হোমসের সতর্ক নজর এখন বাইরের দিকে। বিড়বিড় করে বলল—ব্রিজ পার হচ্ছি—

তাকিয়ে দেখলাম, নিচেই টেমসের জল। দেখতে দেখতে নদী পার হয়ে গাড়ি ঢুকল রাস্তার গোলক ধাঁধায়।

একসময় দু'পাশের কাল কাল ইটের বাড়ির সারির মাঝখান দিয়ে গাড়ি এসে দাঁড়াল একটা বাড়ির সামনে। দেখা গেল টিমটিমে আলো জ্বলছে রান্নাঘরে।

দরজা খুলে দিল একজন ভারতীয় হিন্দু চাকর। গায়ে ঢিলেঢালা পোশাক, কাঁধে হলদে উড়ুনি।

ভেতর বাড়ি থেকে একটা তীক্ষ্ণ সরু গলা ভেসে এল—খিদমতগার—সোজা আমার ঘরে নিয়ে এস।

একটা টানা লম্বা গলিপথ পার হয়ে যে ঘরে এসে আমরা ঢুকলাম—শ্রীহীন বাড়ির মধ্যে এটি একান্তই বেমানান।

দেয়ালে দেয়ালে চকচকে দামি পর্দা ঝুলছে—মেঝেয় পুরু মোলায়েম কার্পেট পাতা।

একপাশে প্রকাণ্ড দুটো সমুণ্ড বাঘছাল। কোণে মাদুরের ওপরে বসানো একটা আলবোলা।

ঘরের ঠিক মাঝখানে ঝোলানো একটা পায়রার আকৃতি লম্ফ। হাল্কা মিষ্টি প্রাণমাতানো একটা সুবাস ছড়িয়ে আছে ঘরের বাতাসে।

রীতিমত বিলাশ বহুল ঘরে আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়ে বসালেন ছোটখাট চেহারার অদ্ভুত দর্শন এক ভদ্রলোক।

মাথাটা অদ্ভুত রকমের উঁচু—শীর্ষদেশ কেশহীন চকচকে। দু'কিনার ঘিরে খাড়া লালচে চুল। ঠোঁটজোড়া অদ্ভুতভাবে ঝুলে আছে—মুখের দু'সারি দাঁতও বেজায় বেখাপ্পা, উঁচুনিচু। নোংরা দাঁতে হলদে ছোপ।

অবয়ব দেখে মনে হল বয়স তিরিশের কাছাকাছি।

তীক্ষ্ণ সরু গলার স্বরে আত্মপরিচয় দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, আপনি নিশ্চয় মিস মর্সটান। আমার নাম থেডিয়াস শোল্টো।

মিস মর্সটান আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

—বন্ধুদের এনে খুবই ভাল করেছেন, খুশি হয়েছি। আমি যা বলব বা করব, ওঁরা হবেন তার সাক্ষী। সব খবরই আমার কাছে পাবেন—আমার কনিষ্ঠ ভাই বার্থোলোমিউ যতই অসন্তোষ প্রকাশ করুক—আমি থাকতে অবিচার হতে দেব

না। দরকার হলে তিনজনে মিলেই ভাইটিকে বোঝাতে পারব।

ব্যাপারটা আমাদের একান্ত নিজস্ব—নিজেরাই বোঝাপড়া করতে পারব, বেরসিক পুলিশ এসে নাক গলাক তা আমাদের কারুরই ইচ্ছা নয়।

বলতে বলতে শোল্টো তার নীল দুর্বল দুটি চোখের জিজ্ঞাসার দৃষ্টি ফেলে চেয়ে রইল আমাদের দিকে।

হোমস্ বলল, আমাদের দিক থেকে আপনাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত করতে পারি। যা বলবেন আর কেউ তা জানতে পারবে না।

—ব্যস ব্যস ওতেই হবে, বলতে বলতে শোল্টো তামাকু সেবনের অনুমতি প্রার্থনা করে বলল, আমি আবার একটু নার্ভাস টাইপের মানুষ, অল্পেতেই ঘাবড়ে যাই। তামাকের ধোঁয়াটা ওষুধের কাজ করে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মোমবাতির শিখায় টিকে ধরিয়ে আলবোলার সরঞ্জাম ঠিক করে নিল। তারপর গুড়ুক গুড়ুক শব্দে নল টেনে চমৎকার সুগন্ধী ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। আমরা তিনজন তার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম।

স্বস্তির সঙ্গে যথেষ্ট ধূম উদ্গীরণ করার পরে শোল্টো মুখ তুলে বলল, মিস মর্স্টান, আমদের দেখা সাক্ষাতের ব্যাপারটা হয়তো একটু নাটকীয় হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু উপায় ছিল না আমার। আকস্মিক অবাঞ্ছিত কোন ব্যাপারের সম্ভাবনা না রেখে কাজ করতে হয়েছে আমাকে। একারণেই আমার বিশ্বস্ত লোক উইলিয়ামসকে ও যথেষ্ট তালিম দিয়ে হুঁসিয়ার করে পাঠিয়েছিলাম।

শোল্টো ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে আয়েসের ভঙ্গীতে যথেষ্ট সময় নিয়ে কথাগুলো বলছিল।

এদিকে রাতও বাড়ছে—অনেকটা পথ যেতে হবে আমাদের। মিস মর্স্টান এ সময় কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলেন শোল্টোকে।

মাথা দুলিয়ে হেসে হেসে শোল্টো বলল, সময় একটু লাগবে, হুটহাট করে কিছু করতে চাই না।

নরউডে গিয়ে বার্থোলোমিউর সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমার কাজ ভায়ার খুব পছন্দ হয়নি। এই নিয়ে কাল রাতে খুব কথা কাটাকাটিও হয়ে গেছে। সেজন্যেই চাইছি দল বেঁধে গিয়ে ওকে বুঝিয়ে সুজিয়ে পথে আনব।

আমি বললাম, রাত তো অনেক হল, নরউডে যেতে হলে এখুনি বেরনো ভাল।

হাসতে হাসতে শোল্টো বলল, যেতে তো হবেই—তার আগে পরিস্থিতিটা আপনাদের বোঝানো দরকার।

আমার জানা ঘটনাগুলো আপনাদের বলব—তবে তার আগেই বলে রাখি কাহিনীর বেশ কয়েকটা ব্যাপার আজও আমার কাছে ধোঁয়াটে হয়ে রয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার জবাব আমি দিতে পারব না।

আপনারা শুনেছেন নিশ্চয় আমার বাবা মেজর শোল্টো একসময়ে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন।

আজ থেকে এগারো বছর আগে অবসর নিয়ে এসে ওঠেন নরউডে—পণ্ডিচেরী লজে।

ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর ধন সম্পদ নিয়ে এসেছিলেন বাবা, সেই সঙ্গে ছিল প্রচুর দামী দুষ্প্রাপ্য বস্তু আর একদল ওই দেশের চাকর বাকর। বিশাল পণ্ডিচেরী লজে বিলাসবহুল জীবনযাত্রা শুরু হয় বাবার। তাঁর ছেলেপুলে বলতে আমি আর আমার ছোট ভাই বার্থোলোমিউ।

বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ক্যাপ্টেন মর্সটানের চাঞ্চল্যকর অন্তর্ধানের পর কাগজে খুব লেখালেখি হয়েছিল। ব্যাপারটা নিয়ে আমরাও অনেক জল্পনা কল্পনা করেছি—বাবার সঙ্গেও খোলাখুলিভাবে এই নিয়ে অনেক কথা বলেছি।

তখন ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারিনি যে গোটা রহস্যটাই ওঁর পেটের মধ্যে রয়েছে—মিঃ মর্সটানের অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারটা তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না।

বাবার কথা থেকে এটুকু শুধু জানতে পেরেছিলাম আমরা, অদৃশ্য একটা বিপদপাতের আশঙ্কায় তটস্থ হয়ে আছেন বাবা সব সময়।

পারতপক্ষে একলা কোথাও বেরুতেন না। দু'জন বিখ্যাত প্রাইজ ফাইটার মুষ্টিযোদ্ধাকে পণ্ডিচেরি লজে চাকরি দিয়ে রেখেছিলেন।

যে উইলিয়ামস আপনাদের গাড়ি চালিয়ে আনল, ও-ই সেই দু'জনের একজন, এক কালের ইংলন্ডের লাইট ওয়েট চ্যাম্পিয়ন।

বাবার বিপদটা যে কি—কিংবা কাকে তার ভয়—এ সম্পর্কে বাবা কখনো মুখ খোলেননি। তবে লক্ষ্য করেছি—কাঠের পা-অলা লোক দেখলেই বাবা কেমন ক্ষেপে উঠতেন।

একবার কাঠের পা-অলা নিরীহ এক ফেরিওলাকে দেখে রিভলবার ছুঁড়েছিলেন—সেই নিয়ে অনেক ঝক্কি গেছে।

গোড়ায় বিষয়টাকে বাবার খেয়াল বলে মনে করতাম—পরে অবশ্য এ ধারণা আমাদের পালটাতে হয়েছে।

সালটা ১৮৮২, সেই সময় ভারতবর্ষ থেকে একটা চিঠি পান বাবা। চিঠিতে কি লেখা ছিল কখনো তিনি বলেন নি কাউকে। কিন্তু চিঠিটা খুলে পড়ে প্রাতরাশের টেবিলেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।

একটা সাংঘাতিক মানসিক চোট পেয়েছিলেন বাবা, বিছানা নিয়েছিলেন সেই থেকে। কালব্যাধি তাকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে চলল। এপ্রিলের শেষের দিকে শেষ অবস্থা উপস্থিত হল। মৃত্যুর আগে আমাদের কিছু বলবেন বলে

কাছে ডাকলেন।

আমরা দু ভাইই তাঁর শয্যার পাশে উপস্থিত হলাম। তাঁর ইঙ্গিত মত দরজায় তালা দিয়ে বসে সেদিন তাঁর মুখ থেকে যা শুনেছিলাম হুবহু অই শোনাচ্ছি আপনাদের।

বাবা বললেন ঃ আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে বুঝতে পারছি—এসময়ে তোমাদের কয়েকটা কথা জানাতে না পারলে শান্তিতে মরতে পারব না।

হীন লোভের ফাঁদে পড়ে মহা পাপ করেছি—মর্সটানের মেয়েটাকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেছি। আমার ধনরত্নের অর্ধেকের মালিকানা মেয়েটার—অথচ তাকে আমি ফাঁকি দিয়েছি। সম্পদ যে আমি নিজে ভোগ করেছি তা-ও নয়, আগলে রেখেছি যকের মত। ধনসম্পদের লালসা মানুষকে অন্ধ করে দেয়—আমিও সব ভুলে ছিলাম, একজনকে তার প্রাপ্য অংশ দিতে চাইনি।

কুইনিনের শিশির পাশে যে মুক্তোর মুকুটটা রয়েছে ওটা এনেছিলাম মেয়েটিকে দেওয়ার জন্য। কিন্তু ওটা কাছ ছাড়া করতে প্রাণ চাইছে না। আগ্রা-সম্পদের একটা বখরা তোমরা মেয়েটাকে দিও—ওই মুকুটটাও—তবে আমি যাওয়ার আগে নয়।

এরপর বাবা ক্যাপ্টেন মর্সটানের মৃত্যু কিভাবে হয়েছিল সে কাহিনী বললেন।

ক্যাপ্টেন মর্সটানের হার্ট ছিল খুবই দুর্বল। হৃদ্‌পিণ্ড ধকল সইতে পারত না। বাবা ছাড়া কেউ জানতো না তার এই রোগের কথা।

যাই হোক, ভারতবর্ষে থাকার সময়ে আকস্মিক ভাবে কিছু ধনরত্ন আসে দুই বন্ধুর হাতে। বাবা সে সব নিয়ে আসেন ইংলণ্ডে।

মিঃ মর্সটান দেশে ফিরেই বাবার কাছে চলে আসেন বখরার জন্য। লাল চৌদার নামে আমাদের একজন অতি বিশ্বাসী চাকর ছিল। এখন সে পরলোকে। সে-ই দরজা খুলে দিয়েছিল মিঃ মর্সটানকে।

আগ্রা-সম্পদের মণিমুক্তার বখরা নিয়ে বেশ বচসা হয়েছিল দুই বন্ধুতে। রাগের মাথায় একসময় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন মিঃ মর্সটান। সেই সময় হঠাৎ বুক চেপে ধরেন। অসহ্য যন্ত্রণায় মুখ কুঁকড়ে আসে—সেই অবস্থাতেই আছড়ে পড়েন মেঝের ওপর।

পড়ার সময় রত্ন-বাক্সের কোণায় ঠুকে যায় মাথাটা। বাবা ছুটে আসারও অবসর পাননি—মিঃ মর্সটান মারা যান।

বাবা বললেন, ব্যাপারটা এমন আকস্মিকভাবে ঘটে যায় যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন।

চেঁচামেচি করে লোক জড় করতে ভয় পেলেন। সন্দেহটা তার ওপরেই পড়বে সবার। চেঁচামেচির পরেই এই আকস্মিক মৃত্যু, তাছাড়া রত্ন-বাক্সের কোণায় লেগে

মাথাও কেটে গেছে।

আরও একটা ব্যাপারে বাবা লোক ডাকতে পারেননি, সেটা হল, পুলিশ এলে সরকারী তদন্ত হবে, রত্ন-বাক্সের গুপ্ত সংবাদ আর গোপন থাকবে না তখন।

বাবা যখন এসব সাত-পাঁচ ভাবছেন সেই সময় ঘরে এসে ঢোকে লাল চৌদার। বাবার অনেক দিনের বিশ্বস্ত চাকর, কিন্তু সে-ও হয়তো বাবাকেই সন্দেহ করেছিল। শেষে দুজনে মিলে মৃতদেহ গুম করে ফেলেন। বাইরের কাকপক্ষীও কিছু জানতে পারে না।

বাবা মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আমাদের বললেন, ঘোরতর অপরাধে অপরাধী আমি। মৃতদেহ পাচার করেছি, কেবল তাই নয়, ধনদৌলতও লুকিয়ে ফেলে মর্সটানের অংশ আত্মসাৎ করলাম। বিবেক বড় দংশন করছে—এবারে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। কাল সব কিছু নিয়ে এসো আমার কাছে।

তারপরে আর কিছু বলতে পারেননি বাবা। সহসা বিস্ফারিত চোখে আমার পেছনের জানলার দিকে চেয়ে থেকে বিকট আর্তনাদ করে উঠলেন।

চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি জানলার কাচে নাকের ডগা চেপে ঘরের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে দাড়িওলা একটা বীভৎস মুখ।

অমন নারকীয় নিষ্ঠুর মুখ আমি আর দেখিনি। তখনি আমি আর বার্থোলোমিউ ছুটে বাগানে গেলাম। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কাউকে পেলাম না। শুধু জানালার নিচে ফুল গাছের মাটিতে দেখলাম একটি মাত্র পায়ের ছাপ।

বাবা তখনি মারা গেলেন। আর তার পর থেকেই শুরু হল উৎপাত।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, বাবার ঘরের জানলা দু'হাট করে খোলা—আলমারী বাক্স পেঁটরা সবই কে ঘাঁটাঘাটি করে গেছে। সিন্দুকের ওপরে সাঁটান রয়েছে একটা কাগজে। তাতে জড়ানো হস্তাক্ষরে লেখা—চতুর্মুখ। লেখাটার কোন মানেই বুঝতে পারলাম না। বাবার কোন জিনিস কিন্তু খোয়া যায়নি। কে যে রাতের অন্ধকারে কি খুঁজতে এসেছিল, সে রহস্য রহস্যই থেকে গেল আমাদের কাছে।

বাবা শেষ দিকে একটা অদ্ভুত আতঙ্কে ভুগতেন—অদৃশ্য একটা বিপদের আশঙ্কায় তটস্থ থাকতেন সব সময়—জানি না এসবের সঙ্গে তার কোন যোগ আছে কিনা।

কাহিনী শেষ করে নিভে আসা আলবোলার আগুন আবার সতেজ করার দিকে মন দিল শোল্টো।

এদিকে বাবার করুণ মৃত্যু-কাহিনী শুনতে শুনতে মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল মিস মর্সটানের। তাড়াতাড়ি পাশের টেবিলের একটা জলপাত্র থেকে এক গেলাস জল ঢেলে এগিয়ে দিলাম তার দিকে।

জল খেয়ে অনেকটা সামলে নিলেন তিনি।

হোমস্ ধীর গম্ভীর—চোখের পাতা নেমে এসে দু'চোখ আধবোজা। আজই সকালে মাথা খাটাবার মত সমস্যা হাতে নেই বলে দুঃখ করেছিল। চেহারা দেখে এখন মনে হচ্ছে থৈ খুঁজে পাচ্ছে না।

থেডিয়াস শোল্টো লম্বা নলটা মুখে লাগিয়ে অনবরত ধোঁয়া ছাড়ছে আর উজ্জ্বল চোখে পর্যায়ক্রমে আমাদের চোখের দিকে তাকাচ্ছে। আমাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে। আমার চোখে চোখ পড়তে স্মিত হেসে গল্পের পরবর্তী অংশ আরম্ভ করল।

—বাবার মৃত্যুর পর গুপ্তধনের সন্ধানে দুই ভাই মিলে উঠে পড়ে লাগলাম। বাগানের মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে খুঁজতে বাকি রাখলাম না কোথাও। কিন্তু কোথাও কিছু পেলাম না।

মুক্তোর মুকুটটা মিস মর্স্টানের সম্পত্তি—বাবার মুখে শুনেছিলাম! মুক্তোগুলো খুবই মূল্যবান। ভাই বার্থোলোমিউ লোভে পড়ে গেল।

বাবা যে খুব একটা গর্হিত কাজ করেছেন—এ ব্যাপারে সে একমত হতে চাইল না। তার মনোভাব পরিবর্তনের জন্য বুঝতেই পারছেন, যথেষ্ট বেগ পেতে হল আমাকে।

অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে শেষে রাজি করালাম—কিছু দিন অন্তর অন্তর একটা করে মুক্তো তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ভদ্রমহিলার অসহায়তা অন্ততঃ কিছুটা দূর হবে এতে।

গোটা কতক মুক্তো পাঠালামও। কিন্তু একজন অসহায় তরুণীকে এভাবে প্রতারণা করার কাজটা আমার কাছে খুবই কুরুচিপূর্ণ ব্যাপার।

অনেক টাকার মালিক আমরা। তবুও বার্থোলোমিউ লোভ ত্যাগ করতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত মতান্তর এমন পর্যায়ে পৌঁছলো যে, আমি পণ্ডিচেরী লজ ছেড়ে এখানে আলাদা হয়ে চলে এলাম। বুড়ো খিদমতগার উইলিয়ামসকে কেবল সঙ্গে নিয়ে এলাম।

গতকালই জানতে পারলাম, গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া গেছে। তক্ষুনি যোগাযোগ করলাম মিস মর্স্টানের সঙ্গে। আর আমার মতামতটাও গতকাল রাত্রে ভাইকে জানিয়ে রেখেছি। আমার ইচ্ছে, এখন সবাই মিলে গিয়ে যার যা প্রাপ্য হিসেব করে বুঝে নেব।

কথা শেষ করে উত্তেজনায় ক্ষুদ্রকায় শরীরটা কাঁপাতে লাগল শোল্টোর। আমাদের কারু মুখে কোন কথা নেই। চুপচাপ বসে আছি।

অখণ্ড এই নীরবতা সহসা ভঙ্গ করল হোমস্। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বলল—আপনি যথেষ্ট করেছেন মশায়, ধন্যবাদ। যেটুকু যা বোঝেন নি আমি সব

বুঝিয়ে দিতে পারি আপনাকে। অস্পষ্ট আমার কাছে কিছু নেই। কিন্তু রাত হয়েছে, সে সব পরে হবে—এখন চলুন যাওয়া যাক।

গাড়ি বাইরেই অপেক্ষায় ছিল। সবাই মিলে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। গাড়ি চলতে শুরু করল।

চাকার ঘরঘরানি শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে থেডিয়াস শোল্টো বলতে শুরু করল, আমার গুণধর ভাইটি দারুণ সেয়ানা। গুপ্তধন কি করে খুঁজে পেল শুনলে অবাক হবেন। বাগানের মাটি ঝাঁঝরা করেও যখন কিছু পাওয়া গেল না তখন বুঝতে পারল, গুপ্তধনের বাক্স বাড়ির ভেতরেই কোথাও আছে। তখন প্রতি বর্গইঞ্চি হিসেব করে বাড়িটার মাপজোক নিল।

বাড়িটা চুয়াত্তর ফুট উঁচু। প্রতিটি ঘরের উচ্চতা আলাদা ভাবে যোগ করল, তারপর ওপর নিচের ঘরের ব্যবধান মেঝেয় ফুটো করে সঠিক মাপ জেনে নিয়ে যোগফলের সঙ্গে জুড়ে দিল। দেখা গেল উচ্চতা দাঁড়াচ্ছে মাত্র সত্তর ফুট। তখনই তার টনক নড়ল।

চার ফুটের হিসেব বার করার জন্য উঠে পড়ে লাগল। তখন ওপর তলার সিলিং ফুটো করে দেখা গেল—ওপরেই চোখের আড়ালে রয়েছে একটা ঘর। গুপ্ত চিলেকোঠা। দেখা গেল চিলেকোঠার ঠিক মাঝখানে দুটো বরগার ওপরে রয়েছে সিন্দুকটা। ফুটোর মধ্য দিয়ে সিন্দুকটা নামিয়ে নিজের ঘরে এনে রেখে দিয়েছে। মণিমুক্তোর হিসেব করে দেখা গেছে—প্রায় পাঁচলক্ষ পাউন্ডের সম্পদ।

টাকার অঙ্কটা শুনে চোখ বিস্ফারিত হল আমার। মিস মর্সটানের মুখের দিকে চোখ ফেরাতে দেখি তিনিও আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

বিপুল এই সম্পদের স্বত্বটা হাতে এলে রাতারাতি বরাত ফিরে যাবে তাঁর। ছিলেন দরিদ্র গৃহশিক্ষয়িত্রী, হবেন ইংলন্ডের অন্যতম ধনবতী। নিঃসন্দেহে উল্লসিত হবার মত খবর।

কিন্তু কি জানি কেন, নিঃস্বার্থ, প্রকৃত বন্ধুর মত যেন খুসি হতে পারলাম না। বলতে বাধা নেই, আমার কেবলই মনে হতে লাগল—পেতে গিয়েও যেন হাতছাড়া হয়ে গেল।

নিদারুণ স্বার্থপরতায় মনটা মোচড় দিয়ে উঠল। নৈরাশ্য যেন সিসের মত ভারী হয়ে বসল বুকের ওপর। মিস মর্সটনকে অভিনন্দন জানাবার কথাও ভুলে গেলাম।

পরে শুনেছি—শোল্টোর কথা শুনবার পর নাকি আমি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। ভালভাবে কথা বলতে পারিনি—আবার উল্টোপাল্টা অনেক হাস্যকর কথাও নাকি বলেছি। কথাটা ঠিক, কেননা সে সব কথা কিছুই মনে নেই আমার।

যাই হোক, গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গাড়ি থেকে নামলাম আমরা।

শোল্টো বলল—আসুন, আমাদের পণ্ডিচেরী লজে ঢোকা যাক।

রাত তখন এগারোটা।

নির্মেঘ কুয়াশামুক্ত মনোরম রাত। আকাশে আধখানা বাঁকা চাঁদ।

সামনেই বিশাল স্তূপাকৃতি পণ্ডিচেরী লজ।

ভাঙা কাঁচের টুকরো বসানো উঁচু পাথুরে দেয়ালে ঘেরা। ভেতরে ঢোকার দরজা একটাই—লোহার পাত বসান পাল্লা। শোল্টো পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল আমাদের।

ভেতরে ঢুকতে যেতেই দেখা দিল বিপত্তি। দরজায় টোকার শব্দ শুনে ম্যাকমুর্দো নামে খর্বকায় বিশালদেহী এক দারোয়ান দরজা খুলে দিল। শোল্টোকে ছাড়া সে ভেতরে কাউকে ঢুকতে দিতে নারাজ। হুকুম নেই। শোল্টোর অসহায় অবস্থা দেখে আমরাও বিব্রত হয়ে পড়লাম।

বন্ধুবর শার্লক হোমস এগিয়ে এসে এই সময় অভাবিত ভাবে এই আতান্তর থেকে উদ্ধার করল আমাদের।

স্মিত হেসে হোমস্ বলল, ম্যাকমুর্দো, এত সহজেই ভুলে গেলে তুমি আমাকে? চার বছর আগে, যে রাতে তুমি বাজি জিতেছিলে, অ্যালিসনের ঘরে তোমার সঙ্গে একজন অ্যামেচার চার রাউন্ড লড়ে গিয়েছিল—তাকে মনে করতে পারছ না একেবারেই।

সঙ্গে সঙ্গে যেন চমকে উঠল প্রাইজ ফাইটার দ্বাররক্ষক।—আরে সর্বনাশ, মিঃ শার্লক যে। আসুন আসুন স্যার—সবান্ধবে ভেতরে আসুন। কি কাণ্ড চিনতেই পারিনি আপনাকে। তবে ও ভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে ঝট করে আপনার ক্রসহিটখানা চোয়ালের নিচে ঝাড়লেই কিন্তু ঝটপট মনে পড়ে যেত। মিঃ থেডিয়াস, আমি দুঃখিত। হুকুম ছিল নিশ্চিন্ত না হলে আপনার বন্ধুদেরও যেন বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া না হয়।

কাঁকর বিছানো রাস্তা বেশ খানিকটা হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালাম চৌকোনা কাঠখোট্টা বাড়িটার সামনে।

চাঁদের আলোয় নজরে পড়ল, এককোণে ঝকঝক করছে চিলেকোঠার জানালা—বাদবাকি অন্ধকারে ঢাকা—মৃত্যুপুরীর মত নিস্তব্ধতা চারদিকে।

এই থমথমে পরিবেশে থেডিয়াস শোল্টো নিজেও যেন ঘাবড়ে গেল। বলল, কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। ওকে সবই বলে গিয়েছিলাম খুলে—কিন্তু ওর জানালায় তো আলো দেখছি না।

হোমস্ খুঁটিয়ে দেখে বলল—ওই তো একটা দরজার পাশে ছোট জানালায় আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে।

—ওটা হাউসকীপারের ঘর। মিসেস বার্নস্টোন ওঘরে থাকে। আপনারা একটু

দাঁড়ান—ওর কাছেই সব খবর জানতে পাব।—কিন্তু—ওটা—ওটা কিসের শব্দ—

চলতে গিয়ে আচমকা ভয়ার্তস্বর করে থমকে দাঁড়িয়ে গেল শোল্টো।

হাতের লণ্ঠন কাঁপতে লাগল থরথর করে।

কাঠের মত দাঁড়িয়ে পড়ে আমিও কান পেতে শুনতে লাগলাম শব্দটা।

মহাকায় বাড়িটার দিক থেকে তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের ভয়ার্ত বিলাপধ্বনি ভেসে আসছে। পাশে থেকে আচমকা আমার হাত চেপে ধরলেন মিস মর্স্টান।

—মিসেস বার্নস্টোনের গলা। আপনারা দাঁড়ান, এখুনি আসছি।

বলতে বলতে দৌড়ে গিয়ে দরজায় টোকা দিল শোল্টো।

দূর থেকে দেখলাম—দীর্ঘাকৃতি একজন বৃদ্ধা দরজা খুলে দিল। শোল্টো ভেতরে ঢুকে গেলে আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

লণ্ঠনটা রেখে গিয়েছিল শোল্টো। হোমস্ সেটা তুলে নিয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে চারদিক দেখতে লাগল।

মিস মর্স্টানের হাত আমার হাতে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি দু'জনে।

বুকের মধ্যে এক বিচিত্র অনুভূতি। সেদিনই আলাপ—আগে কেউ কাউকে দেখিনি।

প্রথম দর্শনে আমার ভাল লেগেছিল। কিন্তু তার কোন বহিঃপ্রকাশ ছিল না—ছিল না তারও।

কথায় বা ভাবে ভালবাসার আভাস পর্যন্ত প্রকাশ পায়নি। কিন্তু আশ্চর্য, বিপদের মুহূর্তে—দুজনেই দুজনার সাহচর্য চাইছি। ভালবাসার গতি বড় বিচিত্র।

রহস্যময় এই নিঃশ্বাস রুদ্ধকারী পরিবেশে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াবার একটা আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল আমার মনে। মিস মর্স্টানের মুখেও পরে বহুবার শুনেছি একই কথা।

তিনি চাইছিলেন, আমি যেন তাকে নিরাপদে রাখি—আগলে রাখি। আশ্চর্য এক আনন্দময় অনুভূতি নিয়ে হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিলাম দুজনে।

হোমসের হাতের লণ্ঠনের আলোয় চোখে পড়ছে—মাটিতে রাশি রাশি গর্ত—আর খোঁড়া মাটির স্তূপ।

হোমস বলল—ছ বছর ধরে এই গর্ত আর মাটি খোঁড়া হয়েছে—গুপ্তধনের সন্ধানে।

ঠিক এই সময়েই দড়াম করে সামনের দরজা খুলে গেল। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে বিকট ভয়ার্ত চিৎকার তুলে ছুটে এল থেডিয়াস শোল্টো। আতঙ্কে দু'চোখ বিস্ফারিত।

—সর্বনাশ হয়েছে, বার্থোলোমিউ নিশ্চয় বিপদে পড়েছে। ভীষণ ভয় করছে

আমার।

নিদারুণ ভয়ে সত্য সত্যই শিশুর মত চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল শোল্টো।

তৎপর হয়ে উঠল হোমস্। দৃঢ় কণ্ঠে বলল, বাড়ির ভেতরে চলুন।

—তাই চলুন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

দৌড়ে আমরা হাউসকীপারের ঘরে গেলাম আগে। বুড়ি বার্নস্টোন ঘরের মধ্যে কেবল ছটফট করছে—চোখে ভয়-ব্যাকুল দৃষ্টি।

বলল, কর্তা সারা দিন দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে রয়েছে। ডাকাডাকি করে কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায়নি। ঘণ্টাখানেক আগে আমি উঁকি দিয়েছিলাম চাবির গর্ত দিয়ে—মিঃ থেডিয়াস, আপনি নিজে একবার গিয়ে দেখুন—কর্তার অমন মুখ আমি আগে কখনো দেখিনি।

শোল্টো ভয়ে জড়সড় হয়ে কাঁপতে লাগল। দারুণ ভয় পেয়ে গেছে।

হোমস্ আর দেরি করল না। নারকেলের ছোবড়ার কার্পেট পাতা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। আমিও চললাম পেছন পেছন।

মিস মর্স্টানকে রেখে গেলাম নিচে মিসেস বার্নাস্টোনের কাছে। ওকে পেয়ে বুড়িও যেন খানিকটা স্বস্তি পেয়েছে।

চলতে চলতে দু'বার হেঁট হয়ে পকেট থেকে লেন্স বার করে কার্পেটের ওপর কি যেন দেখল হোমস্।

তারপর মাথার ওপর লণ্ঠন তুলে তীক্ষ্ণ চোখে ডাইনে বাঁয়ে দেখতে দেখতে সিঁড়ির ধাপ ডিঙোতে লাগল।

সিঁড়ির শেষে একটা টানা লম্বা গলিপথ। একই ভাবে এগিয়ে গিয়ে তৃতীয় দরজার সামনে দাঁড়াল হোমস্।

প্রথমে টোকা মারল—পরে গায়ের জোরে ধাক্কা মারল। কিন্তু পাল্লা খোলা গেল না। হেঁট হয়ে চাবির গর্তে চোখ রাখল হোমস। পর মুহূর্তেই সটান দাঁড়িয়ে উঠে বলে উঠল—শয়তানের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে দেখ্ছি। ওয়াটসন—দেখ।

কোমর বাঁকিয়ে ফোকরে চোখ রাখলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে নিঃসীম আতঙ্কে শিউরে উঠলাম।

ঝর্ণাধারার মতই চাঁদের আলো ঢুকছে ঘরে। সেই দ্যুতিতে চোখে পড়ল—সোজা আমার দিকে তাকিয়ে আছে একটা মুণ্ডু। আর কিছু নজরে পড়ছে না।

মুণ্ডুটা যেন ঝুলে আছে শূন্যে—বিকট একটা হাসি নিয়ে মুখে। সব চেয়ে ভয়াবহ হল—মুখটা অবিকল থেডিয়াসের।

তখনই মনে পড়ল থেডিয়াস বলেছিল, বার্থোলোমিউ তার যমজ ভাই।

হোমস বলল, দরজাটা ভাঙা দরকার।

অগত্যা তাই করতে হল। দুজনের মিলিত ধাক্কায় মচাৎ শব্দে ঠিকরে গেল তালা। হুড়মুড় করে আমরা ঢুকে পড়লাম ঘরে।

বার্থোলোমিউর চেম্বার যেন একটা কেমিক্যাল লেবরেটরি।

সামনের দেয়ালের তাকে কাচের ছিপি দেওয়া দুসারি বোতল, টেবিলে ছড়ান বুনসেন বার্নার। টেস্টটিউব আর বকযন্ত্র।

একপাশের একটা বেতের ঝুড়িতে অ্যাসিডের পেটমোটা কার্বয়—অ্যাসিড পড়ছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। কালচে রঙের তরল পদার্থ গড়াচ্ছে মেঝেয়। উৎকট আলকাতরার গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী।

চুনবালি আর রাবিশের ওপর একটা কাঠের মই দাঁড় করানো—মইয়ের মাথায় কার্নিশে মানুষ গলবার মত একটা ফুটো। মইয়ের গোড়ায় বেশ খানিকটা দড়ি জড়ো করে রাখা।

টেবিলের পাশে কাঠের চেয়ারে নিশ্চল মূর্তিটা—মাথা ঝুলে পড়েছে কাঁধের ওপর—বীভৎস দুর্বোধ্য হাসি প্রকট মুখে।

শরীরটাও বীভৎসভাবে দুমড়ানো মোচড়ানো। দেহ নিথর—প্রাণ দেহ ছেড়েছে বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে।

টেবিলের ওপরে একটা অদ্ভুত যন্ত্র। বাদামী রঙের সরু একটা লাঠির মাথায় মোটা সুতো দিয়ে কষে বাঁধা একটা পাথর—অনেকটা হাতুড়ির মত।

পাশে খাতার পাতা থেকে ছেঁড়া একটা কাগজ—জড়ানো অক্ষরে তাতে লেখা—চতুর্মুখ।

কাগজটা টেনে হোমস হাতে নিয়ে বলল, বুঝতে পারছ কিছু?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম হোমসের মুখের দিকে।

মৃতব্যক্তির কানের ঠিক ওপরে চামড়ায় বেঁধা কালো কাটার মত একটা বস্তুর দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে হোমস বলল—দেখ, স্পষ্ট একটা হত্যাকাণ্ড। মৃত্যুর কারণ বিষমাখানো এই কাঁটা।

আলতো হাতে তুলে আনলাম কাঁটাটা। ক্ষুদে একটা লাল বিন্দু ছাড়া চামড়ায় আর কোন দাগই নজরে পড়ল না।

থেডিয়াস শোল্টো দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল, মূর্তিমান আতঙ্ক যেন।

আচমকা বিকট স্বরে ফুঁপিয়ে উঠে বলল—গুপ্তধন নেই—লুঠ হয়ে গেছে। কাল রাতে দুভাই মিলে ছাদের ফুটো দিয়ে ধরাধরি করে নামিয়ে এনেছিলাম। শেষবারের মত তখনই জ্যান্ত অবস্থায় আমি দেখে গেছি ওকে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার সময় দরজা বন্ধ করবার শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম।

—কটার সময় বেরিয়েছিলেন?

—দশটা—রাত দশটা। আর আজ এই সময় ও নেই। আমি এখন কি করি? পুলিশ এসে আমাকেই সন্দেহ করে ধরে নিয়ে যাবে। বলুন তো আমি যদি খুন করব তবে আপনাদের আমি এভাবে ডেকে আনি?

ক্ষিপ্তের মত কথাগুলো বলতে বলতে হাত ছুঁড়ে যেন নাচতে লাগল থেডিয়াস।

হোমস কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত করে বলল, মিছে ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আমরা এখানেই রয়েছি। আপনি থানায় গিয়ে খবরটা দিন—পুলিশকে সব খুলে বলুন।

থেডিয়াস ঘাড় নাড়ল অসহায়ভাবে। তারপর আচ্ছন্নের মত পা টেনে টেনে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

—খুবই গোলমেলে কেস মনে হচ্ছে—ক্রমশই মাথা ঘুলিয়ে উঠছে। বললাম আমি।

—একপাশে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা মাথায় দেখ আমি কি করি। কেস খুবই সোজা—দু'একটা ব্যাপার হাতে এলেই অঙ্ক মিলে যাবে। দেখো—সাবধানে যাও—পায়ের ছাপ ফেলে গুলিয়ে দিও না সব।

আমি একপাশে সাবধানে সরে দাঁড়ালাম।

হোমস বলল, দরজা তো কাল রাত থেকে বন্ধ ছিল—আততায়ী তাহলে এল কোন পথে?

বলতে বলতে জানলার ধারে লম্ফ নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। পরে হাট করে খুলে দিল।

—ছাদ নাগালের বাইরে—জলের পাইপও চোখে পড়ছে না। কাল সামান্য বৃষ্টি হয়েছিল রাতে—হুঁ পেয়েছি—দেখে যাও—গোবরাটে কাদা দেখতে পাচ্ছ?

এগিয়ে গিয়ে দেখলাম—কাদার চাকতির মত গোলাকার কয়েকটা দাগ। বললাম—এতো পায়ের ছাপ নয়?

—কাঠের খোঁটার ছাপ—এই দেখো গোবরাটটা—একটা ভারী বুটের ছাপ—চওড়া ধাতুর গোড়ালি লাগানো বুটজুতো। পাশেই—কি দেখছ?

—কাঠের খোঁটার ছাপ—তাহলে কি কাঠের পা-ওলা লোক?

—ঠিক ধরেছ। তবে সঙ্গে ছিল বেশ শক্ত সমর্থ চটপটে কেউ—ডাক্তার, পারবে এই দেওয়াল বেয়ে জানলায় উঠতে?

বাইরে চাঁদের আলো। খোলা জানালা দিয়ে তাকালাম বাইরে।

ইটের দেয়াল—মসৃণ, পায়ের আঙুল রাখবার সামান্য জায়গা নেই কোথাও। প্রায় ষাট ফুট উঁচুতে দেওয়াল। বললাম—অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব।

—সম্ভব করতে হলে একজন সঙ্গী দরকার—কি বল? কাঠের মইয়ের গোড়ায় দড়িটা দেখছ? ঘরের ভেতর থেকে সঙ্গীটি যদি দড়ির একটা দিক

দেওয়ালের এই হুকটার সঙ্গে বেঁধে অন্য দিকটা ঝুলিয়ে দেয় নিচে তাহলে দড়ি ধরে দেওয়ালে পা রেখে জানালায় উঠে আসার পক্ষে কাঠের পা কোন বাধাই নয়।

তবে স্বাস্থ্যটা বেশ মজবুত হওয়া দরকার। কাজ শেষ করে একই ভাবে নেমে যেতেও কোন বাধা নেই। সঙ্গীটি হুক থেকে দড়ি খুলে মইয়ের গোড়ায় ছুঁড়ে ফেলবে, তারপর জানালা টেনে বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দেবে আর যে পথে ঘরে



এসেছিল সেই পথেই বেরিয়ে যাবে। কি ডাক্তার, অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে কিছু?

আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই হোমস আবার বলতে লাগল—তবে একটা পয়েন্ট। লেন্সের ভেতরে দিয়ে দড়ির শেষের দিকে চোখ ফেলে বোঝা গেল—কাঠের ঠ্যাংওলা যে দড়ি বেয়ে উঠে এসেছিল—নামবার সময় সে বেচারীর হাত হড়কে গিয়েছিল। সরসর করে নেমে গিয়েছিল নিচে। আর তার ফলেই ছাল চামড়া উঠে গিয়েছিল।

—কিন্তু সঙ্গীটি ঘরের ভেতরে ঢুকল কি করে? জানালা দরজা তো বন্ধ ছিল। চিমনির ঝাঁঝরিও অত্যধিক সরু।

—এবারে আমার নীতিসূত্র প্রয়োগ কর ভায়া। অসম্ভব যা কিছু সব খারিজ করবার পর যা পড়ে থাকবে, যত উদ্ভটই হোক না কেন সেটাই সার সত্য। স্যাঙাৎ ঘরের মধ্যে আগে থেকে ঢুকে ঘাপটি মেরে থাকবে তা সম্ভব না, তেমন জায়গাই

নেই কোথাও।

সবিস্ময়ে বললাম—তবে কি ছাদের ফুটো দিয়ে?

—পথে এসো ডাক্তার। ঘরে ঢুকতে হলে ওই পথেই নামতে হবে তাকে। লম্ফটা ধর, গুপ্তধনের সিন্দুকটা যে ঘরে ছিল, দেখে আসি একবার সেখানটা।

মই বেয়ে ছাদের ঘরে উঠে গেল হোমস। তারপর লম্ফটা তার হাতে দিয়ে আমিও একইভাবে মই বেয়ে চিলে কোঠায় উঠে গেলাম।

ছোট্ট একটা কুঠুরি—মেঝে ভর্তি অনেক বছরের ধুলো। দেওয়ালে হাত বুলোতেই ছাদে যাওয়ার একটা ঠেলা দরজা পাওয়া গেল।

হোমস্ বলল, প্রথম আততায়ী এ পথেই প্রবেশ করেছে। আর কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক।

মেঝের কাছে লম্ফ নামিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। চোখে পড়ল—অসংখ্য অস্পষ্ট পায়ের ছাপ। আঙুল থেকে গোড়ালি পর্যন্ত পরিষ্কার নজরে পড়ছে। কিন্তু ছাপগুলো একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ মানেষের বলে মনে হল না। বললাম—এ যে দেখছি বাচ্চা ছেলের কাণ্ড।

গুম হয়ে রইল হোমস। কথা বলল কয়েক সেকেন্ড পরে। বলল, সবুর কর, আর একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক।

পকেট থেকে ফিতে লেন্স বার করল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে কখনো লেন্স দিয়ে ধুলোবালি কাঠ পরীক্ষা করল, কখনো ফিতে দিয়ে মেপে—এক মাপের সঙ্গে অন্য মাপ মিলিয়ে—আবার ধুলো-বালিতে নাক ঠেকিয়ে গন্ধ শুঁকে ঘরময় ঘুরে বেড়াল। অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম ওর কাণ্ড।

—না, আর বিশেষ অসুবিধে হবে না, বুঝলে ওয়াটসন। পয়লা নম্বর আওতায় এসে গেছে। কার্বয় চিড় খেয়ে ক্রিয়োসোট মেঝেয় পড়েছে। বেচারা তাতে পা দিয়ে ফেলেছে। এবারে কাজ হল, আমার একটা বিশেষ পরিচিত কুকুরকে এই গন্ধ শুঁকিয়ে ছেড়ে দেওয়া। তারপর—

বলতে বলতে কথা বন্ধ করে কান খাড়া করল হোমস্। নিচে গুরুভার পদশব্দ এবং উচ্চকণ্ঠের কথাবার্তা শোনা গেল।

হোমস্ বলল, ওরা এসে গেছে। ওয়াটসন, মৃতদেহটা পরীক্ষা করে কি মনে হয়েছে তোমার বলতে পারবে? ও-রকম শক্ত টান টান পেশি—মুখের বিকট খিঁচুনি—রাইগর মার্টিসেও যা হতে দেখা যায় না—বল কি মনে হচ্ছে তোমার?

বললাম, মৃতদেহের অবস্থাটা আমিও লক্ষ্য করেছি। আমার ধারণা গাছপালা বা লতাপাতা থেকে সংগ্রহ করা কোন অ্যালকালয়েড-এর দরুনই ঘটেছে এই মৃত্যু। শক্তিশালী বিষগুলো রক্তের সঙ্গে মিশতেই ধনুষ্টংকারের আক্ষেপ দেখা দিয়েছে।

—ঘরে ঢুকেই মুখের টান টান পেশী দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল। তাই রক্তে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার অস্ত্রটা আগে খুঁজে বের করেছিলাম। সামান্য একটা কাঁটা—ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছে মাথার চামড়ায়। জায়গাটা ফেরানো রয়েছে সিলিং-এর দিকে।

আমি কাঁটাটা লম্ফর সামনে তুলে ধরলাম। লম্বা কালো বেশ ছুঁচালো কাটা। মুখের কাছে বেশ চকচকে—মনে হয় আঠার মত কিছু লেগে রয়েছে। শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে। ভোঁতা দিকটা ছুরি দিয়ে চেঁচে গোল করা। এমন কাঁটা ইংলন্ডে তৈরি হয় বলে মনে হয় না।

হোমসকে সন্দেহের কথাটা জানালাম। বলল, ধরেছ ঠিক—এদেশের তৈরি নয়। যাই হোক মালমশলা যা পাওয়া গেল তাতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বেগ পেতে হবে না।

ভারী পদশব্দ ততক্ষণে করিডরে পৌঁছে গেছে। হোমসেব কথা শেষ হতে হতেই দুমদাম শব্দে একটা মোটাসোটা লোক ঘরে ঢুকল।

রীতিমত হোঁৎকা চেহারা—চোখের নিচে থলির মত ডুমো ডুমো মাংস ঝুলছে। সেই ফুলোর মধ্যে বসানো রয়েছে একজোড়া চকচকে ক্ষুদে চোখ।

তার পেছনে এল ইউনিফর্মধারী একজন ইন্সপেক্টর। তার পেছনে ফ্যাকাসে মুখে থেডিয়াস শোল্টো।

ভদ্রলোকের চেহারা যেমন অদ্ভুত, কথাবার্তাও তেমনি। পরিচয় পেয়ে জানলাম ইনিই মিঃ অ্যাথেলনি জোন্স।

ঘরে ঢুকেই রীতিমত হম্বিতম্বি শুরু করলেন।

পাঁচলাখ পাউন্ডের মণিমুক্তো উধাও ঘর থেকে—অথচ জানলা, দরজা ছিল বন্ধ,—আবার জানলার গোবরাটে পায়ের ছাপ—এসব দেখেশুনে নানারকম অদ্ভুত মন্তব্য করতে লাগলেন ভদ্রলোক। কেবল তাই নয়, তড়িঘরি মনোমত একটা সিদ্ধান্ত দাঁড় করাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

হোমস নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে সব লক্ষ্য করল। পরে বলল—মিঃ জোন্স, অনেক ঘটনাই এখনো আপনার অজানা। এই যে ক্ষুদে কাঁটাটা দেখছেন—এটা মৃতদেহের কানের পাশে চামড়ায় গাঁথা ছিল। আমার বিশ্বাস এতে বিষ মাখানো ছিল। তাছাড়া টেবিলে এই কাগজটা ছিল—এতে অদ্ভুত একটা লেখা দেখতেই পাচ্ছেন। পাশেই পাওয়া গেছে হাতুড়ির মত অদ্ভুত এই জিনিসটা। এইগুলোকে বাদ দিয়ে আপনি সমাধান দাঁড় করাচ্ছেন কি করে?

সরকারী গোয়েন্দা বেশ জোরের সঙ্গে বললেন—অসুবিধে কোথায়? পাঁচ লাখ টাকার মণিরত্ন খোওয়া গেছে ঘর থেকে—রাতে দুই ভাইয়ে একটা ঝগড়াও হয়েছিল এসব নিয়ে। বাড়ি বোঝাই ভারত থেকে আমদানি করা হরেক রকম

দুষ্প্রাপ্য জিনিস। এসবের ভেতর থেকেই খুনের উদ্দেশ্যে থেডিয়াস শোল্টো কাঁটাটা জোগাড় করেছে—বিষমাখানো হয়েছে সেই উদ্দেশ্যেই।

আর ওই লেখাটা পুলিশকে ধোঁকা দেবার একটা মতলব ছাড়া আর কিছু নয়। রাতে থেডিয়াস চলে যাবার পরে ভাইকে আর কেউ দেখতে পায়নি—সবই ঠিক আছে—গোলমাল কেবল একটাই। দরজায় তালা লাগানো ঘর থেকে কি করে বেরলো শোল্টো—আরে আরে ছাদে একটা ফুটো করা হয়েছে দেখছি—

বলতে বলতে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ওই বিশাল বপুখানা নিয়ে গোয়েন্দাপ্রবর মই বেয়ে গুটিসুটি মেরে চিলেকোঠায় ঢুকে পড়লেন।

পর মুহূর্তে তাঁর উল্লসিত চিৎকার শোনা গেল। ঠেলা দরজা আবিষ্কার করে ফেলেছেন। কিন্তু নিচে নেমে এসে যখন শুনলেন হোমস্ আগেই সেই দরজা দেখে এসেছে, বললেন—তাতে কিছুই যায় আসে না মিঃ তাত্ত্বিক—খুনী যে ও পথেই পালিয়েছে তাতে তো কোন সন্দেহ নেই।

শেষ পর্যন্ত জোন্স থেডিয়াস শোল্টোকেই খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করলেন।

বেচারা শোল্টো। মড়ার চোখের মত চোখ করে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে। হোমস তাকে আশ্বস্ত করে বলল—কিছু ভাববেন না, আপনাকে আমি খালাস করব।

প্রায় খেঁকিয়ে ওঠার মত করে বললেন ডিটেকটিভ জোন্স, ভুল করছেন মিঃ হোমস—আকাশের চাঁদ পাইয়ে দেবার কথা দিচ্ছেন—শেষকালে হালে পানি পাবেন না যে।

এতক্ষণ চুপচাই ছিল হোমস। এবারে স্বমূর্তি ধরল। বলল—মিঃ জোন্স, আপনাকে বিশেষ আর কি বলব। তবে জেনে রাখুন—আমি ওঁকে খালাস করব কেবল তাই নয়—আপনার গোটা তদন্তটাই যে ভুল তা-ও প্রমাণ করব।

আমার বিশ্বাস গতরাতে যে দুজন লোক এই ঘরে ছিল তাদের একজনের নাম জোনাথন স্মল।

ছোটখাট চেহারা, একটা পা নেই, তবে খুব চটপটে, কাঠের পাওলা মানুষ—পায়ের কাঠের খোঁটার ভেতর দিকটা ক্ষয়ে গেছে। বাঁ পায়ের ভারী বুটের সামনের দিকটা চৌকোনা থ্যাবড়া। গোড়ালিতে লাগানো আছে একটা লোহার বেড়। মাঝামাঝি বয়সের লোক—রোদে ঝলসানো চেহারা—দাগী আসামী।

আরও কিছু শুনবেন? লোকটার হাতের তালুতে বেশ কিছু চামড়া ঘসটে উঠে গেছে। আর তার সঙ্গী অন্য লোকটা—

—অন্য লোকটা কি? নাক কুঁচকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাটা বললেন বটে জোন্স, গলার স্বরে কিন্তু সাগ্রহভাব গোপন রইল না। বুঝতে পারলাম ওষুধ ধরেছে।

হোমস বলল—সেই লোকটা খুবই অদ্ভুত ধরনের। আশা রাখছি—শিগগিরই আপনার সঙ্গে দুজনের আলাপ করিয়ে দিতে পারব। চল ওয়াটসন।

সিঁড়ির মাথায় এসে হোমস আমাকে বলল, রাত অনেক হয়েছে। এই অভিশপ্ত বাড়িতে মিস মর্স্টানের আর থাকা উচিত নয়। তুমি বেরিয়ে যাও, লোয়ার ক্যামবারওয়েলে মিসেস সিসিল ফরেস্টারের বাড়িতে তাঁকে পৌঁছে দেবে—আমি এখানেই থাকব।

ফেরার পথে একটা জরুরী কাজ সারতে হবে তোমাকে। ল্যামবেথে যাবে। জলার তিন নম্বর পিনচিন লেন—ডানদিকের তৃতীয় বাড়ি। শেরম্যান বলে একজনকে পাবে সেখানে। মরা পাখির পেট থেকে নাড়িভুড়ি বার করে খড় ঠেসে ম্যমি বানিয়ে বিক্রি করে।

ঘুম থেকে তুলবে বুড়ো শেরম্যানকে। আমার নাম করে বলবে—টোবিকে এখুনি দরকার। টোবি হল একটা দোঁ-আঁশলা কুকুর। গন্ধ শুঁকে শিকার ধরতে ওস্তাদ।

অসুবিধে হবে না—গাড়িতে চাপিয়ে কুকুরটাকে নিয়ে সোজা এখানে চলে আসবে। ততক্ষণ আমি এখানে হাঁদা জোন্সের অত্যাশ্চর্য গোয়েন্দাগিরি দেখি। মিসেস বার্নস্টোন আর ভারতীয় চাকরটার সঙ্গেও একটু কথা বলা দরকার।

মিস মর্স্টানকে নিয়ে ছ্যাকড়া গাড়িতে যখন রওনা হলাম তখন রাত একটা। বাইরের প্রশান্ত ভাব দেখে বুঝবার উপায় ছিল না মিস মর্স্টান মনে মনে কতটা ধকল সয়ে ছিলেন।

গাড়িতে উঠে নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। ভেঙে পড়লেন কান্নায়।

কোন সান্ত্বনার কথাই আমি তাকে শোনাতে পারলাম না অথচ এই মুহূর্তে আমার ছোট্ট বুকের খাঁচায় তোলপাড় তুলেছে প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস।

যে মুহূর্তে পণ্ডিচেরি লজের অন্ধকার বাগানের পথে হাতে হাত রেখেছিলাম—অন্তরের ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছিলাম তাকে।

তার সংযত অকুতোভয় প্রকৃতি অবিশ্বাস্য দ্রুততায় আমার অন্তর জয় করেছিল। অন্তর দিয়ে তিনিও তা নিশ্চয় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই এখন গাড়ির মধ্যে এমন নিঃসঙ্কোচে চোখের জল ফেলতে পারছেন।

কিন্তু এই মুহূর্তে কিছু বলতে হলে ভেতরের প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস ভালবাসার কথা, প্রেমের কথা হয়ে বেরুবে। এই অসহায় দুর্বল মুহূর্তে যা নিতান্তই বিসদৃশ বলে মনে হচ্ছে আমার।

আর একটা কারণেও তার কাছে এই মুহূর্তে নিজেকে তুলে ধরতে পারিনি। তা হল দুজনের অসম আর্থিক অবস্থা।

হোমসের গবেষণা যদি সফল হয় তাহলে পাঁচ লক্ষ পাউন্ডের স্বত্বভোগী হবেন

উনি একাই। এই পরিস্থিতিতে আমার মত একজন আধা মাইনের অবসর নেওয়া ডাক্তারের আবেগ প্রকাশের ব্যাপারটা নিছক ভাগ্য ফেরাবার মতলব বলে যদি তিনি মনে করেন?

যদি আমাকে সুযোগ-সন্ধানী নিচ প্রকৃতির মানুষ বলে ভাবেন?

এরকম নানা আশঙ্কায়, শেষ পর্যন্ত নিজেকে সংযত রেখে চুপচাপ বসে থাকতে হল।

দুটো নাগাদ মিসেস সিসিল ফরেস্টারের বাড়ি পৌঁছালাম। মধ্য বয়সী সম্ভ্রান্ত মহিলা। সাক্ষাৎ মাতৃমূর্তি। জেগে বসেছিলেন। দরজা খুলে মিস মর্স্টানকে দেখেই আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

আলাপ পরিচয় হওয়ার পর মিসেস ফরেস্টার আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের বিবরণ শুনতে চাইলেন। কিন্তু ব্যয় করবার মত সময় তখন হাতে নেই। গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির কথা তাকে সংক্ষেপে জানাতে হল। কথা দিলাম, যখন যা ঘটবে এসে জানিয়ে যাব।

দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে এসে বসলাম। নিস্তব্ধ পথের ওপর দিয়ে উল্কার বেগে ছুটে চলল গাড়ি।

কুয়াশা ভেজা ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ লাগতেই মন ঘুরে গেল অদ্ভুত এই কেসটার দিকে।

গোড়া থেকে পর পর জটগুলো হাতড়ে দেখতে লাগলাম। মূল সমস্যাটা অবশ্য এখন খুবই পরিষ্কার—ক্যাপ্টেন মর্স্টানের মৃত্যু, বিজ্ঞাপন, মুক্তো পাঠানো এবং চিঠি—এসব ঘটনার মধ্যে জট আর কোথাও নেই।

কিন্তু অদ্ভুতভাবে দেখা দিয়েছে আরও গভীর শোচনীয় রহস্য। ভারতবর্ষের গুপ্ত সম্পদ, মিঃ মর্স্টানের মালপত্রের মধ্যে পাওয়া অদ্ভুত নক্সা—ক্যাপ্টেন শোল্টোর মৃত্যুর সময়ে দেখা রহস্যময় মূর্তি, গুপ্তধন উদ্ধার এবং উদ্ধারকারীকে হত্যা—এমনি অদ্ভুত ঘটনা পরম্পরা—বন্ধ ঘরে অদ্ভুত পায়ের ছাপ—কাঠের পা-ওলা মানুষ—কুঠারের মত দেখতে অদ্ভুত অস্ত্র, কাগজে লেখা নাম চারটি—যা ক্যাপ্টেন মর্স্টানের নক্সাতেও পাওয়া গেছে—

সব মিলিয়ে এক বিদঘুটে গোলক ধাঁধা। গুছিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলে মাথা গুলিয়ে ওঠে।

এসব নিয়ে মাথা ঘামানো এবং একটা ন্যায্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানো বুদ্ধিধর হোমস্ ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব।

ল্যামবেথের পিনচিন লেনে গাড়ি এসে পৌঁছাল। যার পর নাই নোংরা একটা রাস্তা। দু'পাশে সারি সারি দোতলা বাড়ি।

তিন নম্বর বাড়িটার দরজায় ধাক্কা দিয়ে অদ্ভুত অভ্যর্থনা পাওয়া গেল।

বেশ কয়েকবার ধাক্কা দেবার পর ওপরের জানলায় একটা মুখ বেরিয়ে এল। হেঁকে বলল—মাতলামির আর জায়গা পাসনি—দূর হ্—নইলে এখুনি কুকুর লেলিয়ে দেব—ছিঁড়ে খাবে।

মিঃ শেরম্যানের দুরবস্থাটা আঁচ করতে বিলম্ব হল না। মাঝরাতের মাতালের উৎপাতে বেচারা অতিষ্ঠ। আমাকেও একই উৎপাত ভাবাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

আমি তাঁকে আশ্বস্ত করবার জন্য হোমসের নামটা সবে উচ্চারণ করেছি—দেখলাম মন্ত্রের মত পরিস্থিতি পালটে গেল।

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল ওপরের জানালা এবং খুলে গেল নিচের সদর দরজা। বিনীত মুখে দরজার সামনে আবির্ভূত হল মিঃ শেরম্যান। দীর্ঘ কৃশ চেহারার বৃদ্ধ—চোখে নীলচে কাচের চশমা।

—কি আশ্চর্য—আসুন স্যার ভেতরে আসুন। মিঃ শার্লক হোমসের বন্ধুর জন্য এ বাড়ির দরজা সব সময় খোলা। গোড়ার কথাগুলো মনে রাখবেন না স্যার, ছোঁড়াগুলো যখন তখন এসে কড়া নেড়ে বড্ড উৎপাত করে—তা মিঃ হোমসের কি চাই এবারে দয়া করে বলুন।

—তোমার একটা কুকুর—

—অ বুঝেছি—টোবিকে দরকার। চলুন—বাঁদিকের সাত নম্বরে থাকে টোবি।

চারপাশের অদ্ভুত সব প্রাণীর মাঝখান দিয়ে মোমবাতি হাতে এগিয়ে চলল বৃদ্ধ। ছায়াময় অপরিসর আলোয় চোখে পড়তে লাগল স্ফুলিঙ্গের মত চকচকে বহু চোখ। নানা কোণ থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সতর্ক পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ালাম টোবির ঘরের সামনে।

ঝোলা কান লম্বা চুলঅলা অতিশয় কদাকার একটা প্রাণী স্প্যানিয়েল আর লার্চার-এর সংমিশ্রণ। হাঁসের মত দুলে দুলে চলে।

বৃদ্ধ শেরম্যান এক ডেলা চিনি দিল আমার হাতে। সেই চিনি দিয়েই বন্ধুত্ব হল টোবির সঙ্গে।

আমার পেছন পেছন এসে গাড়িতে উঠল।

নির্বিঘ্নে পণ্ডিচেরী লজে উপস্থিত হলাম। ফটক পাহারায় ছিল দুজন কনস্টেবল। পরিচয় দিলে কুকুর সমেত ভেতরে ঢুকতে দিল।

দোরগোড়াতে হোমসের সঙ্গে দেখা হল। শুনলাম—থেডিয়াস শোল্টোর সঙ্গে খুনীর সাগরেদ বলে হাউসকীপার, ভারতীয় চাকর ও ফটকের দারোয়ান লড়াকু ম্যাক্‌মুর্দোকে পর্যন্ত ধরে নিয়ে গেছে আথেলনি জোন্স। বাড়ি একদম খালি—ওপর তলার ঘরে একজন সার্জেন্ট মোতায়েন আছে কেবল।

হল ঘরে টোবিকে টেবিলের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রেখে আমরা ওপরের ঘরে

এলাম। চেয়ারে আসীন প্রাণহীন মূর্তিটি ঢেকে দেওয়া হয়েছে একটা সাদা চাদর দিয়ে। ঘরের এককোণে বসে আছে সার্জেন্ট।

হোমসের নির্দেশ মত ক্রিয়োসোটে রুমাল ভিজিয়ে ওর হাতে দিলাম। জুতো মোজা খুলে সার্জেন্টের হাতের লণ্ঠনটা নিয়ে চিলেকোঠায় উঠে গেল।

আমিও উঠলাম সঙ্গে। ধুলোর ওপরকার পায়ের ছাপগুলো আলো ফেলে ভাল করে দেখতে দেখতে হোমস বলল—চিহ্নগুলোর বৈশিষ্ট্য কিছু নজরে পড়ছে ওয়াটসন?

বললাম—বৈশিষ্ট্য বলতে ছাপগুলো হয় বাচ্চা ছেলের নয় তো বেঁটে কোন মেয়েছেলের। আর কিছু তো নজরে পড়ছে না।

—এই দেখ। বলে হোমস্ খালি পায়ের ছাপ ফেলল পাশে। বললে—লক্ষ্য কর, আমার আঙুলগুলো গায়ে গায়ে লেগে আছে, আর এই ছাপটায় আঙুলগুলো বেশ ফাঁকা ফাঁকা। এটা একটা বিশেষ পয়েন্ট মনে রেখো। চল ওদিকটায়।

ঠেলা দরজার সামনে এসে বলল—কাঠের ফ্রেমটা শুঁকে দেখো তো গন্ধ পাও কিনা।

ভেজা রুমালটা নিয়ে হোমস্ খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে রইল। আমি হুকুম মত কাঠের ফ্রেমে নাক লাগালাম। একটা কড়া গন্ধ—অনেকটা আলকাতরার মত।

হোমস্ বলল—আততায়ী বেরুবার সময় ওখানটাতেই প্রথম পা ফেলেছিল। গন্ধটা টোবির নাকেও নিশ্চয় ধরা পড়বে। তুমি এবার নিচে গিয়ে ওকে ছেড়ে দাও।

বলতে বলতে হোমস্ ছাদে উঠে গেল। আমি নিচে নেমে বাইরে বেরিয়ে গেলাম। ঘুরে আসতে আসতেই হোমস্ আলসের ওপর দিয়ে হেঁটে এসে চালের প্রান্তভাগে পৌঁছে গেল।

তারপর একটা জলের পাইপ বেয়ে পিপের ওপর পা রাখল, ওখান থেকে নেমে এল মাটিতে।

তারপর জুতো মোজা পরতে পরতে বলল, ডাক্তার, আমার হিসেব মিলে গেল। খুব স্বচ্ছন্দেই এ পথে ওঠা নামা করেছে এক নম্বর। যাবার সময় তাড়াহুড়োর মধ্যে একটা জিনিস ফেলে গেছে—এই দ্যাখ।

রঙিন ঘাসের একটা ছোট বটুয়া এগিয়ে দিল আমার দিকে। সাইজটা অনেকটা সিগারেট কেসের মত। ভেতরে গুটিকতক কালো কাঠের কাঁটা। দেখেই চিনতে পারলাম। বার্থোলোমিউ শোল্টোর কানের ওপর এরই একটা বেঁধা ছিল।

হোমস্ বলল, সাক্ষাৎ শয়তানের অস্ত্র এগুলো। নাড়াচাড়া করতে সাবধান—আঙুলে না ফুটে যায়। মনে হচ্ছে—স্টকটা এখানেই ফেলে গেছে।

যাক—চল এবার টোবিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক—চল্ টোবি, আগে গন্ধটা শুঁকে নে।

ক্রিয়োসোট ভেজানো রুমালটা টোবিকে ভাল করে শুঁকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল রুমালটা। তারপর একটা মোটা দড়ি গলায় বেঁধে নিয়ে গেল পিপেটার কাছে।

টোবি জমির কাছে নাক নামিয়ে ল্যাজটা শূন্যে তুলে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল আমাদের।

পুবের আকাশে সবে আলো ফুটতে শুরু করছে—স্পষ্ট হয়ে উঠছে চারদিক।

টোবি আমাদের টেনে নিয়ে গেল বাগানের দিকে।

খোঁড়াখুঁড়িতে ক্ষতবিক্ষত জমি, স্তূপীকৃত রাবিশ।

আগাছা ঝোপ পার হয়ে পাঁচিল বরাবর এগিয়ে এসে এক জায়গায় থেমে গেল টোবি।

দুটো দেয়ালের কোণা—দেখা গেল কয়েকটা ইঁট সরিয়ে নেয়া হয়েছে সেখান থেকে। ফাঁকে ফাঁকে পা দিয়ে পাঁচিলের মাথায় ওঠা যায় এখান থেকে। হোমস পাঁচিলে উঠে টোবিকে কোলে তুলে নামিয়ে দিল ওপাশে।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠে বসলাম পাঁচিলে। হোমস্ বলল—কাঠের পা-ওলার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি—দেখ, দেখ—টোবি দিব্যি এগুচ্ছে—রাস্তায় গন্ধটা রয়েছে এখনো।

আমরাও আগের মত দড়ি হাতে চলতে লাগলাম কুকুরটার পেছন পেছন। আঠাশ ঘণ্টা পার হয়ে গেল—রাস্তার হাজারো গন্ধের মধ্যে ক্রিয়োসোটের গন্ধ ঠিক আলাদা করে নিয়ে হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে টোবি।

চলতে চলতে হোমস্ বলল, আততায়ীদের টিকির নাগাল পাবার মত অনেক খবরই জানা হয়ে গেছে। অন্যভাবেও এগুতে পারতাম। তবে একেবারে হাতের কাছে এই সুযোগটা রয়েছে যখন, অবহেলা করতে পারলাম না। টোবির সাহায্য ঠিকই কাজে লাগবে। তবে কি জান, কেসটা নিতান্তই মামুলী—কৃতিত্ব নেবার মত কিছু নয়।

চলতে চলতে অবাক হয়ে বললাম, বলছ কি তুমি। কাঠের পা-ওলা লোকটার বিবরণ যেভাবে দিলে এ তো রীতিমত অবিশ্বাস্য এক ব্যাপার। তোমার বিশ্লেষণী ক্ষমতা যত দেখছি ততই বিস্ময় বাড়ছে আমার।

—জলের মত সোজা ব্যাপারটাকে তুমি বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলছ ডাক্তার। ব্যাপারটা আরো শোন তবে—গুপ্তধন সংক্রান্ত খবরটা দুজন অফিসার পেয়েছিল কোন কয়েদীর কাছ থেকে।

ক্যাপটেন মর্সটানের নোটবুকে রাখা নক্সাটার মধ্যে যে কয়টা নাম লেখা ছিল তার মধ্যে এক জনই ছিল ইংরেজ—জোনাথন স্মল, মনে করে দেখ। বাকি

নামগুলো হয় হিন্দু নয় মুসলমান।

জোনাথন স্মল গুপ্তধনের একটা নক্সা এঁকে অফিসারদের হাতে তুলে দিয়েছিল। নক্সায় গায়ে গায়ে লাগানো চারটে ক্রশ চিহ্নের পাশে যে চারটে নাম লেখা ছিল—ওই হল চতুর্মুখ।

ইংরেজঅফিসারেরাঅথবা তাদের একজন নক্সার গুপ্তধন উদ্ধার করে ইংলন্ডে নিয়ে আসে। এবং ধরে নিচ্ছি সেটা করেছিল অন্যান্যদের বঞ্চিত করেই।

নক্সায় যে তারিখটা বসানো আছে সে সময় ক্যাপ্টেন মর্স্টান কয়েদীদের সংস্পর্শে ছিলেন। জোনাথন স্মলও সেই সময়ে সাগরেদ সহ কয়েদীদের মধ্যে ছিল—সে কারণে গুপ্তধন নিজে গিয়ে তুলে আনতে পারেনি। বিশ্বাস করে নক্সাটা তুলে দিয়েছিল অফিসারের হাতে।

এ সবই আমার অনুমান—তবে এই অনুমানের ভিত্তিতে উপসংহারকে পর্যালোচনা করলেই সব কটা ঘটনার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। খেয়াল কর, মেজর শোল্টো গুপ্তধন নিয়ে দেশে এলেন, বেশ কয়েক বছর নিশ্চিন্তে কাটালেন। কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে যেই একটি চিঠি এসে পৌঁছল, অমনি ভয়ে আতঙ্কে তটস্থ হয়ে পড়লেন।

—তবে কি যাদের ঠকিয়েছিলেন তাদের ছাড়া পাবার খবর ছিল সেই চিঠিতে?

—ধরেছ ঠিক। ছাড়া পাওয়া অথবা জেল পালানো—দুটোর একটা খবর পেয়েই ধাত ছেড়ে গিয়েছিল তার। কাঠের পা-ওলা একটা লোকের আক্রমণের আশঙ্কায় সেকারণেই সন্ত্রস্ত থাকতেন সবসময়। লোকটা যে জোনাথন স্মল অর্থাৎ একজন ইংরেজ সেটা নিঃসন্দেহে বোঝা গেল—ইংরেজ ফেরিওলা দেখেই একবার প্রাণের ভয়ে গুলি করে বসেছিলেন। কি ভায়া—ঘটনার সঙ্গে যুক্তি মিলছে?

—গরমিল কোথাও নজরে পড়ছে না তো।

—এবার তাহলে পরবর্তী ঘটনার দিকে নজর দাও। সাদা চামড়ার জোনাথন স্মল ইংলন্ডে এল দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে—গুপ্তধন উদ্ধার এবং বেইমানের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া।

শোল্টোর বাড়ির সন্ধান জানবার পর যথারীতি সে বাড়ির কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করে। লাল রাও নামে একজন খাস চাকর আছে শুনেছি—লোকটা যে মোটেই সুবিধার নয় হাউসকীপার মিসেস বার্নস্টোনের মুখেও শুনেছি।

গুপ্তধনের হদিস জানত মেজর নিজে এবং তার একজন পরম বিশ্বাসী অনুচর। সে লোকটা মারা গেছে অনেক আগেই। সে কারণেই অনেক ঘোরাঘুরি করেও গুপ্তধনের সন্ধান জানতে পারল না স্মল। কিন্তু যথা সময়ে তার কাছে খবর পৌঁছে গেল—মেজর মৃত্যুশয্যায়। সন্ধানটা যে করে হোক জানতে হবে—এই আশায়

এবং গুপ্তধনের গুপ্ত ঠিকানা মাথায় নিয়েই পর পারে পাড়ি জমান মেজর এই ভয়ে ছুটে এল স্মল সঙ্গে সঙ্গে।

পাহারাদারের নজর এড়িয়ে মেজরের শোবার ঘরের জানালায় এসে দাঁড়াল। কিন্তু ছেলেদের দেখতে পেয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকতে পারেনি। ক্ষিপ্ত হয়ে সেই রাতেই হানা দিয়ে তছনছ করল ঘরের জিনিসপত্র। কিন্তু গুপ্তধনের ঠিকানা পেল না। তবে যাবার সময় কাগজে চতুর্মুখ শব্দটা লিখে দিয়ে জানান দিয়ে গেল কে এসেছিল।

মেজরকে খুন করতে পারলে সে বুকের ওপরে ওই একই লেখা রেখে জানান দিয়ে যেত যে চার সাগরেদের তরফ থেকে দণ্ড দিয়ে গেছে। অপরাধ-ইতিহাসে অপরাধীদের এ ধরনের আচরণ নজীরহীন নয়—অনেক মুল্যবান তথ্য এ থেকে বিশেষজ্ঞদের হাতে এসে যায়।

—এরপর কতটা ভেবেছ বল।

—জোনাথন স্মল পড়ল আতান্তরে। কিন্তু আশা ছাড়লে তো হবে না। গোপনে খবরাখবর নিতে লাগল। এর পরেই আবিষ্কৃত হল চিলে কুঠুরি।

বাড়ির ভেতরে নিজের লোক না থাকলে বাইরে থেকে নজর রেখে এ খবর পাওয়া সম্ভব নয়।

কাঠের পা নিয়ে অত উঁচুতে ওঠার ক্ষমতা নেই স্মলের। তাই সঙ্গে নিয়ে এল চোস্ত একজন সাগরেদ। এই সাগরেদই আচমকা খুন করে বসল বার্থোলোমিউকে।

খুন করার ইচ্ছে যে ছিল না এবং এর ফলে যে সে খুব চটে ছিল তা তার ঘরময় পায়ের ছাপ দেখেই বুঝতে পেরেছি।

মুখে কাপড় গুঁজে হাত পা বেঁধে নির্ঝঞ্ঝাটেই কাজ হাসিল করতে পারত সে। কিন্তু তার আগেই বিষ মাখানো কাঁটায় কাজ শেষ হয়ে গেছে। সাগরেদের বর্বর প্রকৃতির কিছুটা আভাস এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

অগত্যা চতুর্মুখ সংকেত লেখা কাগজটা টেবিলে রেখে প্রতিশোধের ইঙ্গিতটা দিয়ে গেল। এর পর রত্নবাক্স নামিয়ে দিল নিচে—সব শেষে নামল নিজে।

কিন্তু সাগরেদটি ভুল করে ক্রিয়োসোটে পা ডুবিয়ে বসল। সেই গন্ধ ধরেই এখন এগিয়ে চলেছে দো-আঁশলা টোবি। সূত্র আর সংকেতের রহস্য ভেদ করে এ পর্যন্ত এতটুকু দাঁড় করান গেছে। এখন আততায়ীদের নাগালে পাওয়ার ওয়াস্তা।

কাঠের পা-ওলা সাদাচামড়ার মানুষটার দু'পায়ের ব্যবধানের মাপ থেকে তার উচ্চতাটা মোটামুটি আঁচ করা গেছে। দাড়ি আছে তা-ও জানা গেছে—থেডিয়াস শোল্টো জানালায় তার দাড়িওলা মুখ দেখেই আঁতকে উঠেছিল।

আর আন্দামানের মত রোদ ঝলসানো জায়গার কয়েদী—বুঝতেই পারছ,তার চেহারাটা অনুমান করতে কষ্ট হবার কথা নয়। তবে—

—সাগরেদটির ব্যাপারে কতটা কি জানতে পারা গেছে?

—রহস্য খুব একটা যে আছে তা নয়। শিগগিরই সব জানা যাবে। দেখ, বকবক করতে করতে অনেকটা এসে গেছি। যদি দর্শন মিলে যায় তবে কিন্তু হাতাহাতি হতে পারে। জোনাথনকে তুমি সামলাবে। দুর্দান্ত সাগরেদটাকে আমি দেখব।

বলতে বলতে হোমস্ কোটের ডানহাতি পকেটে রিভলবার তুলে আনল।

শহরের প্রান্তে পৌঁছে গেছি আমরা। রাস্তার দু'পাশে শুরু হয়েছে প্রভাতী তৎপরতা। তার মধ্য দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে গন্ধ শুঁকে এগিয়ে চলেছে টোবি। সোজা সড়ক ছেড়ে গলিঘুঁজি পার হচ্ছে কখনো—কখনো আবার উঠে আসছে সড়কে।

মাইলস স্ট্রীট যেখানে নাইটস প্লেসে মোড় নিয়েছে—ঠিক সেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়াল টোবি। তারপর অস্থির ভাবে একবার সামনে একবার পেছনে করতে লাগল।

কখনো হেলতে দুলতে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল। গন্ধটা কোন দিকে গেছে যেন ঠিক করতে পারছে না—তাই গোলমালে পড়ে গেছে।

মিনিট কয়েক এভাবে কাটল। হঠাৎ যেন মনস্থির করে ফেলেছে এমনি ভাবে গোঁৎ খেয়ে প্রবল উৎসাহে ছুটে চলল একদিকে। ছুটতে হচ্ছে আমাদেরও।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত টোবি হতাশই করল। এমন এক জায়গায় আমাদের এনে দাঁড় করাল যে তার কাণ্ড দেখে দুই বন্ধুতে উচ্চৈঃস্বরে হেসে না উঠে পারলাম না।

সামনেই ছিল ব্রোডরিক অ্যান্ড নেলসনের কাঠের গোলা। টোবি সোজা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে—কাঠের গুঁড়ো আর কাঠের কুচোর মাঝখান দিয়ে এসে দাঁড়াল একটা ঠেলা গাড়ির সামনে।

ঠেলাগাড়িতে বসানো একটা মস্ত পিপে—পিপের গা বেয়ে ঠেলাগাড়ির চাকায় পড়ছে কালচে তরল ক্রিয়োসোট।

এখানকার বাতাসও ভারী হয়ে রয়েছে ক্রিয়োসোটের গন্ধে। সেদিকে তাকিয়ে যেন বিজয় গর্বে ডেকে উঠল টোবি।

এর পর আর না হেসে পারা যায়?

হোমস্ বলল—বেচারার কোন দোষ নেই ডাক্তার—ও যা পেয়েছে তাই দেখিয়েছে। কাঠ সিজন করার জন্য ক্রিয়োসোটের দরকার—লন্ডন শহরে সারাদিনে ক্রিয়োসোটের গাড়িও কম চলে না—ওর মধ্যে পড়ে বেচারা গন্ধটা

গুলিয়ে ফেলেছে।

—যে গন্ধ ধরে বেরিয়েছিল সেটা গুলিয়ে ফেলেছে—নাইটস প্লেসে—ওখানেই দু'দিকে দুটো গন্ধ পেয়ে গোলমালে পড়ে গিয়েছিল।

—ঠিকই বলেছ—ওখান থেকেই আবার শুরু করতে হবে—এবারে আর ভুল করবে না—দেখো এগোবে ঠিক গন্ধ ধরে।

হোমস্ ঠিকই বলেছিল—যেখানে গোলমালে পড়েছিল—সেইখানে টোবিকে নিয়ে যেতেই বাঁই করে একটা চক্কর খেল। তার পরই তীরের মত ছিটকে চলল নতুন একদিকে।

টোবি সোজা চলে এল নদীর ধারে। ব্রন্ড স্ট্রীটের শেষে সোজা দৌড়ে নেমে গেল নদীর পাড়ে একটা কাঠের জেটির সামনে। তারপর জেটিতে উঠে কিনারা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নদীর কালো স্রোতের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে লাগল।

—মানে, টোবি বলতে চাইছে ওরা নৌকো নিয়ে জলে নেমেছে। বলল হোমস্।

বেশ কয়েকটা ছোট শালতি আর ডিঙি জেটির ধারে জলে ভাসছে। টোবিকে সেখানে নিয়ে গেলাম। ঠিক গন্ধ পেয়েছে এমন কোন সাড়া তার কাছ থেকে পাওয়া গেল না।

জেটির ধারে ছোট একটা ইঁটের বাড়ি নজরে পড়ল। জানলার সামনে একটা কাঠের বোর্ডে বড় বড় হরফে লেখা—মার্ডেকাই স্মিথ। তার তলায় লেখা—দিন বা ঘণ্টা হিসাবে নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়।

আর একটা লেখা পড়ে জানা গেল—এখানে একটা লঞ্চও ভাড়ায় পাওয়ার সুবিধা আছে।

চারপাশ দেখে চোখ-কান বেশ সজাগ হয়ে উঠেছে হোমসের। বলল—টোবি ঠিক জায়গাতেই এনে ফেলেছে। পিছু নিয়ে যাতে ধরা না যায় তার ব্যবস্থা আগে থেকেই এখানে করা ছিল।

এমন সময় বছর ছয়েকের একটা ছেলের পেছনে ধাওয়া করে লালমুখো মোটাসোটা এক মহিলা বেগে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল।

চান করবার ভয়ে ছেলেটি দৌড়ে পালাচ্ছে।

গজরাতে গজরাতে মহিলা বলতে লাগল—বাপ দু'দিনের জন্য বাইরে বেরুল তো ছেলে অমনি রাজত্ব পেয়ে বসল—আজ ফিরে এসে কেটে ফেললেও আমি ধবর না এই বলে দিলাম।

হোমস্ এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—মিঃ স্মিথ কি বাইরে গেছেন নাকি—আমার যে দরকার ছিল জরুরী।

—কাল সকালেই তো বেরিয়ে গেছেন বাইরে। নৌকো দরকার হলে বলুন—আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

—স্টীম লঞ্চটাই যে দরকার ছিল আমার।

—স্টীম লঞ্চ নিয়েই তো বেরিয়েছে। কোত্থেকে এক কেঠো পা-অলা জুটেছে—যখন তখন এসে হাজির হচ্ছে। লোকটাকে আমার মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না—আমার কেমন ভয় ভয় করছে, জানেন।

—কাঠের পা-ওলা লোক!

—তবে আর বলছি কি মশায়। কদাকার দেখতে। মুখখানা বাঁদরের মত বাদামী। যখন তখন আসে আর কি রকম চোখ করে তাকায়। কর্তাকে মনে হয় আগে বলা ছিল। রাত তিনটেয় এসে ডাকতেই কর্তা বড় ছেলে জিমকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

—মিসেস স্মিথ, আমার কপাল বড় মন্দ। স্টীম লঞ্চটা ভাড়া নেব বলেই এসেছিলাম। নামটা যেন কি আপনাদের লঞ্চের?

—অরোরা।

—ও হাঁ অরোরা!

হোমস স্বভাবসিদ্ধ কৌশলে একে একে লঞ্চটার রঙ, গড়ন সবই অবলীলা-ক্রমে জেনে নিল।

এরপর মিঃ স্মিথকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা একটা পানসিতে উঠে বসলাম। বললাম, একটা লঞ্চ ভাড়া করে বেরুলে অরোরাকে খোঁজা যেত।

—পাবে কোথায়? এখান থেকে গ্রীনউইচ পর্যন্ত নদীর দু'ধারে তারপর ব্রীজের তলায় জেটির পর জেটি—কোথায় খুঁজবে?

পুলিশ লেলিয়ে দিলে সুরাহা হয়তো কিছু হতো। কিন্তু অ্যাথেলনি জোন্সের সাহায্য না নিয়ে যখন এতটা এগিয়েছি—বাকিটাও একাই দেখতে চাই। জোন্স তার নিজের ধাঁধায় ঘুরুক, তাতে আমার লাভ। খবরের কাগজে তো রিপোর্ট অবশ্যই বেরুবে—পলাতকরা তাতে নিশ্চিন্ত থাকবে পুলিশ বিপথে চলেছে ভেবে।

মিলব্যাঙ্ক পেনিটেনসিয়ারির কাছে পানসি থেকে নেমে পড়লাম আমরা। সেখান থেকে ভাড়া গাড়ি চেপে গ্রেট পিটার স্ট্রীট পোস্ট অফিসে নেমে একটা টেলিগ্রাম পাঠাল হোমস বেকার স্ট্রীট-বাহিনীর লেফটেন্যান্ট পুঁচকে উইগিন্সকে। বলল, ওদেরই উপযুক্ত কাজ এটা। ওরা না পারলে পরে অন্য ব্যবস্থা দেখা যাবে।

অস্বাভাবিক ধকলের মধ্য দিয়ে গেছে গোটা রাতটা। ক্লান্তি আর অবসাদে দেহ মন নেতিয়ে আসছিল।

অথচ বন্ধুটির মধ্যে উদ্দীপনার ঘাটতি নজরে পড়ল না। অটুট তার কর্ম চঞ্চলতা। রীতিমত ঈর্ষণীয়।

একরকম ঢুলতে ঢুলতেই বেকার স্ট্রীটে এসে পৌঁছলাম। স্নান সেরে জামাকাপড় পাল্টে ঝরঝরে হওয়া গেল।

হোমস্ ব্রেকফাস্টের টেবিলে এসে বসেছে। কফি ঢালছে। আমি এসে বসতে না বসতেই প্রভাতী স্ট্যান্ডার্ড কাগজের একটা খবরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

হাসতে হাসতে বলল—শিরোনামটা দেখছ তো—আপার নরউডে রহস্যজনক ঘটনা—করিৎকর্মা জোন্স আর সর্বজ্ঞ সাংবাদিকের বিশেষ কীর্তি বলতে পার।

খবরটায় চোখ বুলিয়েই চমকে উঠলাম। গায়েন্দা পুলিশ বাহিনীর বিখ্যাত অফিসার মিঃ অ্যাথেলনি জোন্স অবিশ্বাস্য দ্রুততায় তদন্ত পরিচালনা করে অপরাধীদের ধরে ফেলেছেন এবং মৃতব্যক্তির ভাই থেডিয়াস শোল্টো সহ হাউসকীপার মিসেস বার্নস্টোন, ভারতীয় খাস চাকর লালরাও এবং দরোয়ান বাকুলি ম্যাকমুর্দোকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে এসেছেন। ভারতবর্ষ থেকে আনা রত্নরাজিপূর্ণ একটি সিন্দুকের লোভেই আসামীরা পরিকল্পিত এই খুনের ঘটনাটি ঘটায়। সাংবাদিক পুঙ্গব সরকারী গোয়েন্দা প্রবরের উদ্দীপনা, তৎপরতা এবং অতি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রশংসা ছত্রে ছত্রে গেঁথে দিয়েছেন। তবে সৌভাগ্যের বিষয় বেসরকারী গোয়েন্দা মিঃ শার্লক হোমস্ এবং ডক্টর ওয়াটসনের নামটিও দয়া করে একপাশে ঠাঁই দিয়েছেন। মৃত ব্যক্তির ভাই থেডিয়াস শোল্টোর সঙ্গে এই দুজন পণ্ডিচেরী লজে গিয়েছিলেন এবং তারাই প্রথম রত্নবাক্স চুরির ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন।

মজাদার এই বিবরণটি পড়া শেষ হতে না হতেই অনেকগুলি খালি পায়ের শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে। পরক্ষণেই হুড়মুড় করে হোমসের বেকার স্ট্রীট ঠিকে গোয়েন্দাদের দলটা ঘরে এসে ঢুকল।

হোমসের টেলিগ্রাম পেয়েই সদলবলে হাজির হয়েছে তারা। হোমস্ তাদের যথারীতি জানিয়ে দিল—অরোরা নামে একটা স্টীম লঞ্চের খবর এনে দিতে হবে। মালিকের নাম মর্ডেকাই স্মিথ। কালো রঙের লঞ্চ, দু'পাশে দুটো লাল ডোরা, ফানেল কালো রঙের। পেছনে সাদা জেড। মর্ডেকাই স্মিথের জেটি হল মিলব্যাঙ্কের উল্টো দিকে। একজনকে সেখানে মোতায়েন থাকতে হবে—লঞ্চ ফিরলেই খবরটা পাচার করতে হবে। মাইনে আগের হারেই। তবে লঞ্চ যে দেখতে পাবে সে পাবে একটা আস্ত মোহর।

তখনকার মত প্রত্যেককে এক শিলিং করে আগাম হাতে গুঁজে দিল হোমস্। ছন্নছাড়া বাহিনী দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

হোমস্ বলল—আমার এই বাহিনীর কোন বিকল্প নেই জানবে। এরা সর্বত্র

যেতে পারে, সমস্ত দেখতে পারে। পাশে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনতে পারে। লঞ্চ যদি জলের ওপরে থাকে তবে এদের চোখে পড়বেই। আশা করছি রাত্রের মধ্যেই খবরটা পাওয়া যাবে। ততক্ষণ চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই।

এক ফাঁকে উঠে গিয়ে টোবিকে খাবার দিয়ে এলাম। এবার একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে হত। হোমসকে সে কথা বলতে বলল, ঘুমিয়ে নেবার মত ক্লান্ত এখনো হইনি। অত সহজে আমি ক্লান্ত হই না। পাইপটা ধরিয়ে এবার বসে বসে একটু চিন্তা করব। কেঠো পায়ের সাগরেদের কথা জিজ্ঞেস করেছিলে আমাকে তাই না?

—তা করেছিলাম।

—লোকটার সম্পর্কে টুকটাক তথ্য যা পাওয়া গেছে তা হল—পায়ের ছাপ, আকারে ছোট্ট আঙুলগুলো ফাঁক ফাঁক, বুট পরা পায়ের সাজান আঙুল নয়—খালি পা। পাথর বাঁধা কাঠের হাতুরী—বিষ মাখানো ক্ষুদে তীর—এ সব থেকে কি মনে হচ্ছে তোমার?

—এ ধরনের ক্ষুদে তীর সাধারণত রো-পাইপ থেকেই ছোঁড়া হয়—নলের মুখে ফুঁ দিয়ে। দক্ষিণ আমেরিকার এক শ্রেণীর বর্বর এই অস্ত্র ব্যবহার করে থাকে।

হোমস্ তাক থেকে ভৌগোলিক শব্দকোষের একটা খণ্ড টেনে নিয়ে বলল—আমাদের সম্পর্কটা ভারতবর্ষের সঙ্গে—দেখা যাক—এই তো পাওয়া গেছে শোন—সুমাত্রা থেকে ৩৪০ মাইল উত্তরে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ।

ওয়াটসন, হদিস পাওয়া গেছে—বিশ্বের সবচেয়ে বেঁটে জাত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীরা। এদের গড় উচ্চতা চার ফুটেরও কম। দুর্ধর্ষ প্রকৃতি, হিংস্র। কিন্তু মন জয় করতে পারলে এরাই অনুগত বন্ধু হয়ে উঠতে পারে।

চেহারা কদাকার—প্রকাণ্ড মাথা, চোখ ছোট—ভীষণাকার দেহের তুলনায় হাত আর পা আকারে ছোট।

জাহাজডুবি খালাসিদের কাছে এদের সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। এদের কাছে জীবন্ত আতঙ্ক স্বরূপ এই ক্ষুদ্রকায় মানুষগুলি। এরা নাগাল পেলে পাথরের গদা দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেয় নয়তো বিষ মাখানো তীর ছুঁড়ে নিমেষে শত্রু বধ করে। এরা বিশ্বের অন্যতম নরখাদক জাতি।

ওয়াটসন, এবারে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ—কাঠের পা-ওলা মানুষ সচরাচর চোখে ধরা না পড়লেও অদ্ভুত এই সাগরেদটি কিন্তু সাধারণের চোখে ফাঁকি দিতে পারবে না। স্মল নিজে আন্দামানে ছিল—নিশ্চয়ই সেখান থেকে এই বিচিত্র ভয়ঙ্কর সঙ্গীটি সে সংগ্রহ করেছে।

ক্রমাগত হাই উঠছিল। লক্ষ্য করে হোমস্ বলল—এ বেলা আর নয়। তুমি খানিকটা ঘুমিয়ে নাও গিয়ে। আমি একটু বেহালাটা নিয়ে বসি—তোমার নিদ্রাকর্ষণের সাহায্য হবে।

ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। উঠে দেখি হোমস্ তেমনি বসে রয়েছে একই জায়গায়। বেহালাটা পাশে রেখে মুখ ডুবিয়ে আছে একটা বইতে।

বলল—উইগিন্স এসেছিল—খবর দিয়ে গেল লঞ্চ এখনো চোখে পড়েনি। তবে যে কোন সময় খবর আসতে পারে—বাড়ি থেকে নড়াচড়া করবার উপায় নেই।

—আমি তা হলে তো একবার সিসিল ফরেস্টারের খবরটা নিয়ে আসতে পারি।

চোখ মুখে হাসি নাচিয়ে হোমস্ বলল—তাই কর তাহলে—তবে মিস মর্স্টানের খবরটা নিতেও ভুলো না যেন। তবে কি জান, মেয়েদের পেটে কথা থাকে না—বেশি কথা ওদের সঙ্গে বলতে নেই।

হোমসের মন্তব্যটা খারাপ লাগলেও কোন জবাব দিলাম না।

হোমস্ আবার বলল, নদীর ওপারে যখন যাচ্ছ—টোবিকেও তাহলে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। ওর কাজ ফুরিয়েছে।

টোবিকে সঙ্গে নিয়ে তখনই বেরিয়ে পড়লাম।

পিনচিন লেনের বুড়ো খুবই খুশি হল টোবি আর সেই সঙ্গে একটা আধ গিনি হাতে পেয়ে।

ক্যাম্বারওয়েল পৌঁছে দেখলাম—নতুন খবরের প্রত্যাশায় সাগ্রহে পথ চেয়ে বসে রয়েছে মিস মর্স্টান। রাতের ঘটনাটার মোটামুটি বিবরণ দিলাম। দুজনেই চমৎকৃত ও বিস্মিত হলেন কাহিনী শুনে।

রাজৈশ্বর্য হাতে আসছে—অথচ মিস মর্স্টানের যেন তা নিয়ে কোন তাপ উত্তাপ নেই। নির্লিপ্তভাবে বললেন, মিঃ থেডিয়াস শোল্টো অনেক করেছেন আমাদের জন্য। খাঁটি ভদ্রলোক। মিথ্যা অপবাদ থেকে তিনি মুক্ত হয়েছেন জানতে পারলেই বেশি ভাল লাগবে।

সন্ধ্যা নাগাদ ওখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। এসে দেখি ঘর শূন্য—চেয়ারের পাশে পড়ে আছে পাইপ আর বই—কিন্তু হোমস্ নেই।

মিসেস হাডসনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, আমি বেরিয়ে যাবার পরে পরেই নিজের ঘরে গিয়ে পায়চারি শুরু করেছে বন্ধুবর—সেই পায়চারি এখনো চলছে সমানে।

হোমসের শরীরের কথা ভেবে ভদ্রমহিলা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁকে আশ্বস্ত করে বললাম, দুশ্চিন্তা করবেন না। মাথায় সমস্যা ঢুকলে এরকম একটু অস্থির হয়ে যান উনি।

সারারাত আমারও দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না উদ্বেগে। পাশের ঘরে পায়চারির শব্দ এক মিনিটের জন্যও থামেনি।

সকালে উদভ্রান্ত চেহারা নিয়ে ব্রেকফাস্টের টেবিলে এল হোমস্। বলল—বড় বড় সব বাধা পার হয়ে এসে ছোট্ট একটা বাধায় আটকে পড়ব এভাবে—কিছুতেই তা মেনে নিতে পারছি না।

বাধাটা যে অরোরা তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু গোটা দিন গেল—উইগিন্সের দল অরোরার কোন সন্ধানই জানাতে পারল না। কেবল জানা গেল মিসেস স্মলও এখন পর্যন্ত স্বামীর কোন সন্ধান পাননি।

সন্ধ্যার দিকে ক্যাম্বারওয়েল গিয়ে মহিলা দু'জনকে সারাদিনের ব্যর্থতার খবর জানিয়ে এলাম।

এদিকে সব কাগজেই নরউড ট্র্যাজেডির খবর বেরিয়েছে। সবারই এক সুর—বেচারী থেডিয়াস শোল্টোই অপরাধী।

নতুন খবরের মধ্যে জানা গেল—আকস্মিক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য করোনারের জুরি নিযুক্ত হবে এবং পরের দিনই তদন্ত আরম্ভ হবে।

ভোরে ঘুম থেকে উঠেই চমকে উঠলাম। হোমস্ সেজেগুজে বাইরে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। পরণে খালাসীদের মোটা পোশাক—পুরু খাটো ওভার কোট, আর গলা ঘিরে লাল স্কার্ফ।

বলল, ওয়াটসন, উইগিন্সরা ব্যর্থ হয়েছে। আরও যে কয়েকটি সূত্র মারফত খবর আশা করেছিলাম, তারাও কিছু করতে পারেনি। তবে সারারাত ভেবে একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় এসেছে। বাজিয়ে দেখি এই ধাঁধা থেকে বেরনো যায় কিনা।

তুমি ঘরেই থাকবে। উইগিন্স হাল ছাড়েনি এখনো—যে কোন মুহূর্তে খবর আসতে পারে। আমার নামে আসা টেলিগ্রাম আর চিঠি খুলে পড়বে। তেমন খবর পেলে নিজের বিচারবুদ্ধি মত কাজ করবে। কখন কোথায় থাকব বলতে পারছি না, কাজেই আমাকে টেলিগ্রাম করবার প্রশ্নই আসে না।

দুই বন্ধুতে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। রহস্যাবৃত কেসটা সম্পর্কে একটা নতুন খবর চোখে পড়ল ঃ

নতুন পাওয়া প্রমাণ অনুসারে নরউড ট্র্যাজেডি সংক্রান্ত মামলাটি জটিল ও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। মিঃ থেডিয়াস শোল্টো এবং হাউসকীপার মিসেস বার্নস্টোনকে কাল রাতে হাজত থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মোক্ষম কিছু সূত্র

পুলিশের হাতে এসেছে এবং স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সুদক্ষ অফিসার মিঃ অ্যাথেলনি জোন্স স্বভাবসিদ্ধ তৎপরতার সঙ্গে অপরাধীর অন্বেষণ করছেন।

বন্ধুবর শোল্টোর খবরটায় স্বস্তি পেলাম। পুলিশ এবারে যে সূত্রই পেয়ে থাক না কেন—ও নিয়ে আর মাথাব্যথা নেই।

পাতা ওল্টাতেই হারানো প্রাপ্তি স্তম্ভে একটা বিজ্ঞাপনে চোখ পড়ল ঃ

গত মঙ্গলবার রাতে তিনটে নাগাদ অরোরা স্টীমলঞ্চ বেরিয়েছে। রং কালো, দুপাশে লাল পটি। ফানেল কালো ; সাদা ব্রেড। মাঝি মিঃ মর্ডেকাই স্মিথ এবং তার ছেলে জিম। জেটিতে মিসেস স্মিথের কাছে অথবা ২২১ বি বেকার স্ট্রীটে লঞ্চের অথবা মিঃ স্মিথের সন্ধান জানালে নগদ পাঁচ পাউন্ড পুরস্কার দেওয়া হবে।

বেকার স্ট্রীটের ঠিকানা দেখেই বুঝতে পারলাম কাজটা হোমসের। মাথা খাটিয়ে ফাঁদটা ভালই পেতেছে। উদ্বিগ্ন স্ত্রী নিখোঁজ স্বামীর এবং লঞ্চের সন্ধান চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে—এই স্বাভাবিক ভাবনা ছাড়া অন্য কোন সন্দেহ আসা সম্ভব নয় বিজ্ঞাপন থেকে।

গোটা দিনটা প্রতীক্ষায় রইলাম। দরজায় শব্দ হলেই কান পেতে থাকি—হোমস ফিরল বুঝি—নয়তো বিজ্ঞাপনের জবাব এল। কিন্তু প্রতীক্ষাই সার হল। শেষকালে নানান অমূলক আশঙ্কা মনে উঁকি ঝুঁকি দিতে শুরু করল।

ঘটনার সাক্ষীসাবুদ এবং সূত্র ইত্যাদি নিজের চোখেই দেখেছি—পর পর অনেক ঘটনা ও অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি। কোন্ কোন্ যুক্তির ভিত্তিতে হোমস্ সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে তা-ও আমার জানা এবং এটাও ভাল ভাবেই জানি যে হোমস্ চিন্তা ভাবনা করে মাথা খাটিয়ে যে সিদ্ধান্ত খাড়া করেছে তা-ও নির্ভুল—তবুও মনে হতে লাগল—হিসেবে কোথাও ভুল করে ফেলেনি তো!

যত সময় কাটতে লাগল ততই যেন আশঙ্কাটা দানা বাঁধতে লাগল মনে। কিন্তু ভুলটা তার কোথায় হতে পারে তা খুঁটিয়ে বার করবার ক্ষমতা আমার নেই।

বিকেল তিনটে নাগাদ চমকে উঠলাম সহসা। দারুণ জোরে নিচের ঘণ্টা বেজে উঠল। পরক্ষণেই ভারী পায়ের শব্দ করে ঘরে ঢুকলেন মিঃ অ্যাথেলনি জোন্স। আগের রাতের সেই টগবগে হামবড়াই ভাবটা যেন মিইয়ে গেছে। চোয়াল ঝুলে পড়েছে।

অভিবাদন জানিয়ে আসন নিলেন। তারপর পকেট থেকে বিরাট রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, মিঃ শার্লক হোমস্ বেরিয়েছেন নাকি?

—হ্যাঁ,

—দুশ্চিন্তা আর খাটাখাটুনি বড্ড বেড়ে গেল মশাই। নরউড কেসের থিওরীটা শেষ পর্যন্ত নতুন করে খাড়া করতে বাধ্য হলাম। মিঃ শোল্টো জাল কেটে বেরিয়ে

গেলেন। ভাইয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর তাকে যারা দেখেছে তাদের সাক্ষীর ভিত্তিতেই প্রমাণ করে দিলেন ছাদে উঠে ঠেলা দরজা খুলে ফুটো দিয়ে ঘরে তিনি ঢোকেননি। বড় জটিল পরিস্থিতিতে পড়ে গেলাম এবারে। মিঃ হোমসের সাহায্য না পেলে আর হচ্ছে না।

বললাম, মাঝে মাঝে সবারই সাহায্য দরকার হয়।

—আপনার বন্ধু শার্লক হোমসকে, কি বলব মশায়, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। কার্যপদ্ধতি কেমন যেন উল্টোপাল্টা ধরনের। খাপ খাওয়াতে পারি না। আচমকা পৌঁছে যান সিদ্ধান্তে।

অনেক কেসেই ওকে দেখেছি—সুরাহা করতে ব্যর্থ হয়েছেন এমনটি হয়নি কখনো। নিঃসঙ্কোচেই বলছি—পুলিশে নাম লেখালে এদ্দিনে অনেক উন্নতি করতে পারতেন। এই দেখুন না—দুম করে একটা টেলিগ্রাম পেলাম ওঁর কাছ থেকে। শোল্টো রহস্যের নতুন সূত্র নাকি পেয়েছেন।

পকেট থেকে টেলিগ্রামটা বার করে আমার হাতে দিলেন জোন্স। পাপলার ডাকঘর থেকে দুপুর বারটায় পাঠান হয়েছে তারবার্তাটা ঃ

বেকার স্ট্রীটে এখুনি চলে আসুন। আমি না থাকলে—ফেরা পর্যন্ত বসে থাকবেন। গুপ্তঘাতকবাহিনীর নাগাল পেয়ে গেছি। শেষ দৃশ্যে থাকার ইচ্ছে হলে আজ রাতে আমার সঙ্গে আসতে পারেন।

—টেলিগ্রামটা পেয়েই চলে এলাম—তদন্তকারী অফিসার হিসাবে সব সূত্রের শেষ পর্যন্ত দেখা আমার কর্তব্য—দরজায় কার পায়ের শব্দ হল যেন?

সিঁড়িতে বেশ ভারী পায়ের শব্দ কানে এল। হোমসের পদশব্দ নয় বুঝতে পারলাম। ক্রমে এগিয়ে এসে দরজায় পৌঁছাল।

হাপরের মত দম টানছে একজন বুড়ো নাবিক। সাঁই সাঁই শব্দ হচ্ছে শ্বাস টানার। খাটো পুরু ওভারকোট গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা। হাঁটু কাঁপছে থর থর করে। পিঠ বেঁকে কুঁজো হয়ে গেছে। চিবুক-ঢাকা রঙিন স্কার্ফের মধ্য দিয়ে কেবল একজোড়া তীক্ষ্ণ জ্বলজ্বলে চোখ নজরে পড়ছে। নিবিড় সাদা ভুরু, সুদীর্ঘ ধূসর গালপাট্টা। এক দক্ষ সমুদ্রচারী নাবিকের চেহারা।

মুগুরের মত লাঠিটা দু'বার ঠুকে নিয়ে জিজ্ঞেস করল—মিঃ শার্লক হোমস্ আছেন?

—তিনি নেই। তবে তার তরফে আমি রয়েছি—কিছু খবর দেবার থাকলে আমাকে দিতে পারেন। মর্ডেকাই স্মিথের লঞ্চের ব্যাপারে কোন খবর আছে কি?

—হ্যাঁ, আমি জানি লঞ্চ কোথায় আছে—উনি যাদের খোঁজ করছেন তাদের সন্ধান এমনকি গুপ্তধন কোথায় আছে তা-ও আমি জানি। কিন্তু তাকে না হলে

তো কিছু বলা যাবে না।

—তাহলে তাঁর ফিরে না আসা পর্যন্ত বসতে হবে।

—কাউকে খুশি করাটা আমার কাজ নয় জানবেন। আপনাদের দু'জনকে দেখে সুবিধের মনে হচ্ছে না—তাই কোন কথাও বলব না।

টলতে টলতে দরজার দিকে এগুলো বুড়ো। এমন সময় চেয়ার থেকে ছিটকে গিয়ে তার পথ আগলে দাঁড়ালেন জোন্স।

—একী অভব্য ব্যবহার! আমাকে এভাবে আটকাচ্ছেন কেন?

—আপনি এসে এই সোফায় বসুন। মিঃ হোমস্ শিগগিরই ফিরে আসবেন।

বেরুবার চেষ্টা বৃথা বুঝতে পেরে বৃদ্ধ ফিরে এসে সোফায় বসল। বিমর্ষ গোমড়া মুখখানা ঝুলে রইল বুকের ওপরে।

চুরুট খেতে খেতে আবার কথা শুরু করলাম আমি আর জোন্স। আচমকা হোমসের গলা শোনা গেল কানের কাছে।

—আমাকেও একটা চুরুট দিলে তো পারতে।

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম দুজনেই। পাশে দাঁড়িয়ে হোমস্, মুখে কৌতুকের হাসি।

—একী তুমি? কিন্তু সেই বুড়ো—

—এই তো বুড়ো।

সাদাচুলের পরচুলা, গালপাট্টা, ভুরু—সব হাতে নিয়ে দেখাল হোমস্—ছদ্মবেশটা তাহলে নিখুঁতই হয়েছিল বল।

—আপনি মশাই ভয়ানক লোক, সোল্লাসে বলে উঠল জোন্স, অমন ঠকঠক করে পা কাঁপানো—হাঁপানি রোগীর মত দমটানা—কাশি—পাকা অভিনেতাদেরও চমক লাগিয়ে দেবার মত। কিন্তু চিনতে না পারলেও ঘর থেকে বেরুতে তো দিইনি।

চুরুটে অগ্নি সংযোগ করে হোমস বলল—এই ধড়াচুড়ো পরেই কাজ হাসিল করতে হয়েছে মশাই। টেলিগ্রামটা পেয়েছিলেন তো?

—পেয়েই তো এলাম। এদিকে প্রমাণের অভাবে শোল্টো আর হাউসকীপারকে ছেড়ে দিতে হল—

—দুঃখ করবেন না—বদলি অন্য দু'জন পেয়ে যাবেন। তবে কথা দিতে হবে—যে ভাবে বলব সেভাবে চলবেন। পুলিশ অফিসার হিসাবে কৃতিত্ব আপনারই থাকবে—কেবল হুকুম মেনে চলতে হবে আমার, রাজি?

—আমার দরকার আসামীদের ধরা। তার নিশ্চয়তা যদি থাকে তবে যা বলবেন তাই শুনব।

—বেশ। তাহলে প্রোগ্রামটা এখনই পাকা হয়ে যাক। খুব জোরে ছুটতে পারে

এমন একটা স্টীম লঞ্চ জোগাড় করুন। ঠিক সাতটার সময়ে ওয়েস্ট মিনিস্টার স্টেয়ারে যেন হাজির থাকে।

—আমাদের পুলিশের একটা বোটই ওখানে চব্বিশ ঘণ্টা মোতায়েন থাকে। টেলিফোন করে এখুনি ব্যবস্থা পাকা করে নিচ্ছি। আর কি দরকার বলুন।

—মারপিট যদি হয়—দু'জন শক্তিশালী লোক দরকার।

—ওরকম জনাকয়েক বোটেই থাকে।

—আর একটা কথা, আসামী পাকড়াও হবে এবং গুপ্তধনও আমাদের হাতে আসবে। অর্ধেকের স্বত্ব যার—সেই ভদ্রমহিলার হাতে রত্নবাক্স স্বহস্তে পৌঁছে দেবেন আমার এই বন্ধুটি এবং তিনিই প্রথম খুলবেন সেটি—কি বল ওয়াটসন?

জোন্স বলল, নিয়মের বাইরে কাজগুলো হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, সে আমি ম্যানেজ করে নেব'খন। তবে গুপ্তধন প্রথমে সরকারের হাতে যাবে—তদন্ত শেষ হলে যাবে মালিকের হাতে।

—সে সব যতদূর ম্যানেজ করার দরকার আপনি সময় বুঝে করবেন। তবে, জানেন তো খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়েই আমার কাজ। দু-একটি অমনি বিষয় আমি জোনাথন স্মলের মুখ থেকে জেনে নেব—আমার এই ঘরে অথবা অন্যত্র আমাকে এই সুযোগ দিতে হবে। আপনাদের জবানবন্দীর ব্যাপারে অবশ্য আমার কিছু বক্তব্য নেই। আমার জিজ্ঞাসাবাদ হবে আমারই মত—তবে বাইরে পুলিশ প্রহরা থাকবে অবশ্যই।

—আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই। কে জোনাথন স্মল তাই এখনো পর্যন্ত জানলাম না—ওরকম নাম শুনিওনি কখনো—তাকে যদি আপনি পাকড়াও করেন—তার ইন্টারভিউ নিতে আমি আপত্তি করব কোন সুবাদে। সুতো তো এখনো আপনারই হাতে।

—তাহলে কথা পাকা রইল। আর একটা কথা—ডিনারটা আমাদের এখানেই সেরে নিন—বেরুনো যাবে এক সঙ্গে।

হোমস গাড়ি আগেই ঠিক করে রেখেছিল। সাড়ে ছটায় এসে হাজির হল। অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে ডিনার পর্ব সেরে সশস্ত্র হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

সাড়ে সাতটা নাগাদ ওয়েস্ট মিনিস্টার জেটিতে পৌঁছে দেখলাম স্টীমবোট প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে। পুলিশ বোট চিনতে পারা যায় এমন কোন চিহ্ন নেই কোথাও।

ডেকে উঠতেই জেটির দড়ি খুলে দেওয়া হল। হোমস, আমি আর জোন্স বসলাম পেছনে। হালে বসল একজন—একজন রইল ইঞ্জিনে। দুজন গাট্টাগোট্টা

পুলিশ ইন্সপেকটর রইল সামনে।

হোমস বলল—টাওয়ারের দিকে যেতে হবে—জ্যাকব সন্স ইয়ার্ডের উল্টোদিকে থামালেই হবে।

জোন্স যথার্থই বলেছিল—লঞ্চটা বাস্তবিকই দ্রুতগামী। স্পীড দিতে না দিতেই পটাপট গাদাবোটগুলো পেছনে পড়ে গেল—দেখতে দেখতে একটা রিভার স্টিমারকে পাশকাটিয়ে বেরিয়ে এল।

হৃষ্ট হেসে হোমস বলল—এমনটাই চেয়েছিলাম। শুনেছি অরোরা সাঙঘাতিক জোরে ছোটে। মনে হচ্ছে টেক্কা দিতে পারব।

জোন্স বলল—এর সঙ্গে পাল্লা দেবার মত লঞ্চ এ তল্লাটে খুব কমই আছে।

হোমসের কাছ থেকে কিছুই শোনা হয়নি। কোথায় গিয়ে কি ভাবে কি করল—কোথায় আমাদের নিয়ে চলল—কিছু আভাস না পেলে স্বস্তি পাচ্ছি না।

প্রসঙ্গ তুলে আনবার উদ্দেশ্যে বললাম—অরোরার সন্ধানটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পেলে?

—অনেক ভেবেচিন্তে নিজে বেরুবার সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলাম তাই হল—দেরি করলে অরোরাকে পাওয়া কষ্টকর হত। পণ্ডিচেরী লজ থেকে নিয়মিত খবরাখবর সংগ্রহের জন্য জোনাথন স্মলকে লন্ডনে কোথাও বেশ কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। সেই ঘাঁটি ছেড়ে বেরিয়েছিল সে রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে।

ভোরের আলো ফুটবার আগেই ঘাঁটিতে ফিরে আসবার মতলবও নিশ্চয় ছিল তার। সঙ্গের মর্কট সঙ্গীটিও ছিল দিনের আলোয় বেরুবার পক্ষে মস্ত বাধা। সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত চেহারা তার। কানাঘুষো হতে হতে পুলিশের লোক পেছনে লেগে যাওয়ার সম্ভবনা। কাজেই দিনের আলোয় বেরুবার মত ঝুঁকি সে নিতে পারে না।

মিসেস স্মলের কথা অনুযায়ী ওরা লঞ্চ ছেড়েছে রাত তিনটে নাগাদ। ঘণ্টাখানেক মাত্র সময়—এর পরেই আলো উঠে যাবে—লোকজনও বেরিয়ে পড়বে নদীতে। সুতরাং হিসেব করে দেখলাম—খুব একটা দুরে এগিয়ে যেতে পারেনি ওরা। কিন্তু লঞ্চটা অদৃশ্য। তবে সেটাকে রেখেছে কোথায়ও।

পুলিশের আশঙ্কা তো রয়েইছে—নদীতে লঞ্চ রাখবার কথা নয়। ভাবতে লাগলাম তাহলে রাখতে পারে কোথায়? এমন জায়গায় রাখতে হবে সেটাকে যে দরকার মত সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে।

আমি হলে যা করতাম এই অবস্থায়, সেই উপায়টাকেই আঁকড়ে ধরলাম। নৌকো যারা বানায় বা সারাই করে মেরামতের অছিলায় তাদের জিম্মায় দিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। লঞ্চ তখন চালান হয়ে যাবে মেরামতির ইয়ার্ডে—সেখান থেকে আবার ঘণ্টা খানেকের নোটিশেই লঞ্চ পাওয়া যাবে।

আমার অনুমানটা বাজিয়ে দেখবার উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ নাবিকের ছদ্মবেশ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। নদীর দু'ধারের সব কটি নৌকো কারখানায় খোঁজ নিলাম। শেষমেশ জ্যাকবসনের ইয়ার্ডে ঢুকে সন্ধান পেলাম, কাঠের পা-অলা একটা লোক দু'দিন আগে সামান্য মেরামতির জন্য অরোরা লঞ্চ রেখে গেছে সেখানে। অরোরার পাশে দাঁড়িয়েই কথা বললাম ফোরম্যানের সঙ্গে।

বলল, হাল মেরামতের কথা বলে গেছে কিন্তু তেমন কোন গোলমাল সে খুঁজে পায়নি।

ফোরম্যানের সঙ্গে কথা বলছি, ঠিক সেই সময়ই মূর্তিমান স্বশরীরে হাজির সেখানে। যাকে খুঁজে হন্যে হয়েছে আমার চরেরা। মর্ডেকাই স্মিথ। মদে চুরচুর অবস্থা।

সেই প্রথম দর্শন আমার। চিনতে পারবার কথা নয়। কিন্তু নিজেই লঞ্চ আর নিজের নাম জাহির করে বাজখাঁই গলায় বলল—আজকেই রাত আটটায় লঞ্চটা চাই। ভদ্রলোক দু'জন আর দেরি করতে নারাজ।

আমি নিঃশব্দে পিছু নিলাম। একটা শুঁড়িখানায় ঢুকল স্মিথ। আমার এক ছোকরা চরকে হাতের কাছে পেয়ে গেলাম এ সময়।

ইয়ার্ডে ফিরে এসে লঞ্চের ওপর নজর রাখবার জন্য তাকে দাঁড় করিয়ে দিলাম। বলে এলাম—লঞ্চ স্টার্ট দিলেই পাড়ে দাঁড়িয়ে যেন রুমাল নাড়ায়। আমরা মাঝ নদীতেই থাকব। মিঃ জোন্স, রত্নবাক্স সমতে দুশমন এবারে আমাদের হাতের মুঠোয়—

জোন্স বলল—ব্যবস্থাটা ভালই করেছেন। তবে জ্যাকবসনের কারখানায় পুলিশ বাহিনী ঢুকিয়ে রাখলে মনে হয় আরও সহজে কাজ হাসিল হতে পারত।

—সেটা কখনই সম্ভব হত না। ঘাঁটি থেকে বেরুবার আগে শয়তান স্মল চর পাঠিয়ে খবরাখবর নিত। সন্দেহ জাগলেই ঘাঁটিতে গুটিয়ে থাকত আরও কতদিন।

আমি বললাম—কিন্তু মর্ডেকাই স্মিথের পেছনে গিয়ে ঘাঁটির সন্ধানটা তো তুমি নিতে পারতে।

—ওয়াটসন—প্রতিপক্ষকে দুর্বল ভাবতে নেই মনে রেখো। এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে এসে যে এমন ভাবে গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারে তার বুদ্ধি ও কৌশল সম্পর্কে যথাযথ উঁচু ধারণা না থাকাটা নির্বুদ্ধিতা।

আমার ধারণা মর্ডেকাই স্মিথ নিজেও জানে না এই দুই স্যাঙাৎ কোথায় লুকিয়ে আছে। টাকা আর মদ দিয়ে ভুলিয়ে তাকে অরোরা সহ ধরে রেখেছে স্মল। টাকা পেলেই সে খুশি। কখন কি করতে হবে স্মিথের কাছে সে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা স্মল করে রেখেছে নিশ্চয়। আমার ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি আছে বলে মনে হয় না।

কথা বলতে বলতে কখন যে একটার পর একটা সেতু পার হয়ে গেছি বুঝতেই পারিনি। উল্কার গতি লঞ্চে। সন্ধ্যার মুখে মুখে টাওয়ারে পৌঁছলাম।

আকাশমুখো অনেকগুলো খোঁচাখোঁচা মাস্তুল আর দড়িদড়া দেখিয়ে হোমস বলল—ওই হল জ্যাকবসনের কারখানা।

বলতে বলতে পকেট থেকে রাত্রে দেখার দুরবীণ বার করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তীরের দিকে।

পরে বলল—আমার লোক রয়েছে—তবে রুমালটুমাল কিছু তো নাড়ছে না। ইয়ার্ডে ঢুকবার পথ এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়—কিন্তু সামনের ওই মালবোঝাই নৌকাগুলোর জন্য ওরা আমাদের দেখতে পাবে না।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। দেখা গেল ইয়ার্ড থেকে কাতারে কাতারে লোক বেরুচ্ছে। ইয়ার্ডের কাজ শেষ হয়েছে। এমন সময় চোখে পড়ল—সাদা মত কি একটা পত পত করছে। বললাম—হোমস্ তোমার সেন্ট্রি কিনা দেখ।

হোমস দুরবীণ চোখে লাগিয়ে রেখেছিল। বলল—সঙ্কেতটা আমাদেরই জন্য। অরোরা ছুটেছে উল্কার বেগে—ইঞ্জিনে ফুল স্পীড দিয়ে দূরের হলদে আলো জ্বলা স্টীমলঞ্চের পেছনে চলো—

কয়েকটা নৌকো পাশ কাটিয়ে অরোরা আমাদেরও দৃষ্টিগোচর হল। স্রোতের অনুকূলে তীর ঘেঁষে চলেছে জল তোলপাড় করে।

জোন্স উদ্বেগের স্বরে বলে উঠল—কী সর্বনাশ এ যে ভয়ংকর স্পীড—নাগাল ধরতে পারলে হয় এখন।

—ধরতেই হবে—আগুন ধরে গেলেও পোড়া লঞ্চ নিয়ে পৌঁছুতে হবে হলদে আলোর পাশে।

আমাদের স্পীড এর মধ্যে উঠে গেছে। নদীর শান্ত জল কেটে দু'টুকরো হয়ে যাচ্ছে। ইঞ্জিনের কাঁপুনির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সর্বাঙ্গ কাঁপছে থর থর করে। সামনে জলের ওপর অরোরার আলো আবছা মত নজরে পড়ছে।

সওদাগরী জাহাজ, গাদাবোটে, স্টীমার পার হয়ে চলেছি আমরা নক্ষত্রবেগে। কখনো পাশ কাটিয়ে, কখনো ফাঁক দিয়ে। এঁকে বেঁকে বাঁচাতে হচ্ছে সংঘর্ষ।

থেকে থেকে হোমস চেঁচিয়ে উঠছে ইঞ্জিন রুমের দিকে তাকিয়ে—আরো—আরো চাপাও কয়লা—যতটা সম্ভব স্টীম তোল।

অরোরার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রেখেছিল জোন্স। বললে—একটু এগিয়েছি মনে হচ্ছে—

সামনের ঝাপসা হলদে আলোটা অনেক স্পষ্ট হয়েছে—লঞ্চের অবয়ব নজরে পড়ছে। জোন্স ঠিকই বলেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নাগাল পেয়ে যাব।

রাত নিস্তব্ধ—পুল পেরিয়ে, ওয়েস্টইন্ডিজ ডক পাশ কাটিয়ে ডেফোর্ডের

সুদীর্ঘ বীচ বরাবর প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে চলেছি আমরা।

লঞ্চের খোল কাঁপছে থরথর করে—বয়লারগুলো পৌঁচেছে ক্ষমতার শেষ সীমায়।

মিনিটে মিনিটে ব্যবধান কমে আসছে। ছিমছাম অরোরাকে এবারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। জোন্স সার্চ লাইট ঘুরিয়ে সামনের লঞ্চের ওপর ফেলল।

ডেকের মূর্তিগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল। পেছনদিকে উঁচু হয়ে বসে আছে একটা লোক—দু'হাঁটুর মাঝে কালোমত একটা জিনিসের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। পাশেই নিউজিল্যান্ড কুকুরের মত কালো কি একটা পড়ে রয়েছে।

হালের চাকা ধরে আছে ছেলেটা, বুড়ো স্মিথকে দেখা যাচ্ছে বেলচে ভর্তি করে কয়লা ছুঁড়ছে ফার্নেসে।

উবু হয়ে বসে থাকা লোকটার হাত দুটো কেবল নড়ছে—কিছু একটা করছে মনে হয়। মুহুর্মুহু চোখ তুলে দেখছে ধেয়ে আসা পেছনের লঞ্চটাকে।

ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে পেছু নেওয়ার ব্যাপারটা আর সন্দেহের মধ্যে নেই তার। নিশ্চিত হয়ে গেছে।

ব্যবধান আরও কমে এসেছে। চারটে লঞ্চের দূরত্বে ছুটছে অরোরা। জোন্স চেঁচাচ্ছে হরদম। কানে গেছে নিশ্চয় লোকটার। তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুঁড়ে তেড়ে গালাগালি দিতে লাগল। রীতিমত শক্তিশালী চেহারা লোকটার।

দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে। পরিষ্কার দেখা গেল—ডান পায়ের উরুর তলায় একটা কাঠের ঠেকা লাগানো।

লোকটার বিকট ভয়ঙ্কর হুঙ্কার শুনে পাশের কালো পিণ্ডটা নড়েচড়ে উঠল।

সোজা হয়ে যখন দাঁড়ালো, দেখা গেল একটা ক্ষুদে মানুষ—অবিশ্বাস্য তার বামনাকৃতি। মাথাটা প্রকাণ্ড—কোঁকড়ানো কালো চুলের স্তূপ যেন একটা।

ক্ষুদে চোখ দুটি জ্বলছে নরকের স্ফুলিঙ্গের মত। শ্বাপদের মত দাঁত খিঁচোচ্ছে আমাদের।

বীভৎস বিকৃত প্রাণীটাকে উঠে দাঁড়াতে দেখেই হোমস রিভলবার বার করে ফেলল। আমিও তড়িঘড়ি রিভলবার হাতে তুলে আনলাম।

শান্ত চাপা গলায় হোমস বলল, ওয়াটসন, ওই ক্ষুদে শয়তানটার হাতের দিকে নজর রেখো—তুললেই গুলি করবে।

অরোরা প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছি—একটা লঞ্চের ব্যবধান সামনে।

সাদাচামড়ার কেঠো-পা লোকটা এখনো সমানে গলাবাজি করে যাচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে কদাকার বামনসঙ্গী নীরবে দাঁত খিঁচিয়ে চলেছে।

গায়ে মনে হয় একটা কম্বল জড়ানো। আচমকা গলার কাছে কম্বলের ভেতর থেকে ফস করে টেনে বার করল খাটো গোলাকার একটা কাঠের টুকরো।

এই সময়ে যুগপৎ গর্জে উঠল আমাদের দুটো পিস্তল। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত শূন্যে তুলে কাশির মত একটা শব্দ করে নদীর বুকে ঠিকরে পড়ল ভয়ঙ্কর প্রাণীটা।

ঠিক সেই সময়েই কেঠো-পা গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল হালের চাকার ওপরে। সমস্ত শক্তি দিয়ে চাকা ঘুরিয়ে দিল।

আচমকা গোঁৎ খেয়ে অরোরা সাঁৎ করে দক্ষিণ তীরের দিকে ঘুরে গেল। আর মাত্র কয়েক ফুট তফাৎ দিয়ে তীরবেগে আমাদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমাদের লঞ্চও তক্ষুণি ঘুরে ফিরে এল বটে ততক্ষণে অরোরা পৌঁছে গেছে তীরের কাছে।

সামনে বিস্তীর্ণ মাঠ খাঁ খাঁ করছে। পচা শেওলা ছাওয়া প্যাচপেচে কাদাজমি। অরোরা তীরবেগে উঠে পড়ল কাদাভর্তি তীরের ওপর। সামনের গলুই ঠেলে উঠল শূন্যে—পেছনের দিকটা নিচু হয়ে ডুবে গেল নদীর জলে।

কাঠের পা নিয়েই লাফ মেরে পড়ল দুশমন। কিন্তু উঠে আর দাঁড়াতে পারল না। কাঠের পা আমূল ঢুকে গেল কাদামাটির মধ্যে। টেনে হিঁচড়ে তবু উঠবার চেষ্টা করল—দুমড়ে মুচড়ে পা খুলবার চেষ্টা করল—ব্যর্থ হয়ে আক্রোশে চেঁচাতে লাগল গাঁকগাঁক করে। কিন্তু গেঁথে রইল কাদামাটির মধ্যে।

লঞ্চ নিয়ে কাছে গিয়ে কাদা থেকে তাকে টেনে তুলবার ব্যবস্থা করতে হল। দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে দেওয়া হল কাঁধের ওপর।

তারপর অতিকায় এক মাছের মত কাদা থেকে দড়ি টেনে হিঁচড়ে উদ্ধার করা হল তাকে।

অসহায় মুখ করে লঞ্চে দাঁড়িয়েছিল স্মিথ—ছেলেকে পাশে নিয়ে। হুকুম করতেই বাপবেটা উঠে এল পুলিশ লঞ্চে।

পরের কাজটা নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। অরোরাকে টেনে জলে ভাসিয়ে লঞ্চের পেছনে বেঁধে নিলাম আমরা।

ভারতীয় কারুকার্য শোভিত নিরেট লোহার একটা সিন্দুক পড়েছিল ডেকে। সন্দেহ রইল না—এটাই শোল্টোদের অভিশপ্ত গুপ্তধনের আধার। ধরাধরি করে সেটাকে বয়ে এনে তুললাম ছোট কেবিনে।

তারপর যে পথে এসেছিলাম ফিরে চলল লঞ্চ সেই পথে। স্রোতের প্রতিকূলে— ঘসঘস শব্দে ধোঁয়া ছাড় তে ছাড়তে।

ফেরার পথে সার্চ লাইট ঘুরিয়ে নদীর বুকে অনেক খুঁজলাম কিন্তু ক্ষুদ্রকায় সেই দ্বীপবাসীকে কোথাও চোখে পড়ল না। টেমসের তিমিরাবৃত শান্ত বুকে ঘটেছে তার সলিল সমাধি।

সবচেয়ে বড় চমক আমার জন্য তখনো অপেক্ষা করে ছিল। এত বড় একটা কাণ্ড যে ঘটে গেছে—ঘুণাক্ষরেও তার আভাস পাইনি।

লঞ্চের খোলে নামবার পাটাতনের দরজায় আঙুল তুলে দেখাল হোমস কাঁটাটা। দুজনে পাশাপাশি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক সেই জায়গাতেই বিঁধে আছে করাল মৃত্যুরূপী সেই ভয়াবহ বিষকাঁটা।

—এই মৃত্যু-শলাকার সামান্য স্পর্শেই কাঠ হয়ে পড়েছিল শোল্টো। হোমস মৃদু হেসে বলল—পিস্তল ছুঁড়তেও দেরি করে ফেলেছিলাম আমরা। ক্ষুদে বর্বর প্রাণীটার অদ্ভুত ক্ষীপ্রতার নিদর্শন দেখে বিস্ময়ে আতঙ্কে স্তম্ভিত কাঁটাটা বায়ু কেটে ছুটে এসে বিঁধেছে এখানে। অল্পের জন্য নিশ্চিত মৃত্যুর করাল থাবা থেকে বেঁচে গেছি। কাঁটাটার দিকে তাকিয়ে শিরশির করতে লাগল সর্ব শরীর।

লোহার সিন্দুকটার সামনেই কেবিনে বসানো হল কয়েদীকে। দু'হাতে হাতকড়া পরানো। ভিজে চুপচুপ হয়ে গেছে গোটা শরীর। বুকের ওপর মাথা ঝুলিয়ে আগুনজ্বলা চোখে তাকিয়ে আছে সিন্দুকটার দিকে।

আগাগোড়া রোদেপোড়া দুর্দান্ত বলিষ্ঠ একটা মানুষ।

মুখখানা যেন শক্ত লালচে মেহগনি কাঠে তৈরি। অসংখ্য বলিরেখায় জর্জরিত। এক পলক দেখেই বোঝা যায় দীর্ঘদিন রোদে জলে খোলা হাওয়ায় বন্য জীবন কাটিয়েছে।

বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মুখখানা এমনিতে শান্ত, কিন্তু চোয়াড়ে থুৎনি আর ভারী ভুরু দেখলেই অনুমান করা যায়, রেগে গেলে এ মুখই পিশাচের মত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

হোমস চুরুট ধরিয়ে বলল, জোনাথন স্মল, শেষটা যে এরকম হবে নিশ্চয় ভাবতে পারনি, আমি দুঃখিত।

কথাটা শুনে যেন কৌতুক খেলে গেল আসামীর মুখে। বলল, আমিও। কিন্তু সব হিসেব গরমিল করে দিয়েছে ওই ক্ষুদে শয়তান টোঙ্গা। শোল্টোর সঙ্গে আমার কোন শত্রুতাই ছিল না।

বিশ্বাস করুন, আমি বলিওনি তাকে কিছু। ও-ই মারাত্মক তীরটা ফস করে ছুঁড়ে বসল। কিছু আর করার ছিল না আমার। খুবই আঘাত পেয়েছিলাম মনে—নিরপরাধ মানুষটাকে এভাবে মরতে দেখে। দড়ি দিয়ে এলোপাথাড়ি পিটিয়েছিলাম বিটলে বামনটাকে।

—কিন্তু শোল্টোর মত অমন একজন প্রমাণ সাইজের মানুষকে তোমার ওই কালো বামন সাগরেদ কাবু করে ফেলতে পারবে—দড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময় এই বিশ্বাস নিয়েই তো উঠেছিলে?

—আপনি তো দেখছি অনেক খবরই রাখেন। আসলে আমি ভেবেছিলাম ঘর ফাঁকা থাকবে। বাড়ির খবরাখবর সবই নখদর্পণে ছিল আমার। ওই সময়ে শোল্টো নিচের তলায় খেতে যান।

আপনাকে কিছুই লুকোচ্ছি না স্যার। প্রাণ বাঁচাতে হলে এখন আমাকে সত্যিকথাই বলতে হবে। কপাল মন্দ আমার, নইলে যার সঙ্গে কোন বিবাদ নেই এখন তারই খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হল আমাকে।

—তোমাকে খুনের দায়ে জড়াবার দায়িত্ব মিঃ অ্যাথেলনি জোন্সের। আমার ঘরে উনি তোমাকে নিয়ে আসবেন—তখন যা জান খুলে বললে আমি লিখে নেব। তাছাড়া আমি তো জানি, তুমি ঘরে ঢোকার আগেই কাঠ হয়ে গিয়েছিল শোল্টো।

—ঠিকই বলেছেন স্যার। অমন দৃশ্য দেখব স্বপ্নেও ভাবিনি আমি। জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি ঘাড় কাত করে দাঁত খিঁচিয়ে রয়েছেন। ওই দেখে মাথায় এমনই রক্ত চড়ে গিয়েছিল যে দড়িপেটা করে শেষই করে ফেলতাম বামনটাকে—কোন রকমে পালিয়ে বেঁচে গেল।

হাতের গদাটা আর কিছু কাঁটা ফেলে গিয়েছিল সেই সময়ে। আর এগুলোর জন্যেই মনে হয় আমার পেছন ধরতে সুবিধা হয়েছিল আপনার।

তবে কি করে যে কি করলেন ভেবে হদিস পাচ্ছি না। নইলে পাঁচলক্ষ পাউন্ডের মালিক হয়েও জীবনের অর্ধেক কাটালাম আন্দামানের সাগর পাড়ে পাথর বসিয়ে, বাকি অর্ধেক কাটাতে হবে ডার্টমুর জেলের নর্দমা ঘেঁটে।

সওদাগর আখমতকে যেদিন থেকে দেখেছি আর আগ্রার মণিমুক্তোয় লোভ ফেলেছি সেদিন থেকেই অভিশাপ নেমেছে আমার জীবনে। মণিমুক্তোর আসল মালিকও এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়নি। সে মরেছে খুনের দায়ে, আতঙ্কে আর বিবেক যন্ত্রণায় মরেছে মেজর শোল্টো। বেঁচে থেকে আমাকে ভোগ করতে হবে মৃত্যু-যন্ত্রণা।

এই সময়ে আমাদের ছোট্ট কেবিনে গলা বাড়িয়ে জোন্স বলল, ডক্টর ওয়াটসন, সিন্দুক সমেত আপনাকে ভক্সহল ব্রীজে নামিয়ে দেব। ব্যাপারটা একেবারেই নিয়ম বিরুদ্ধ—খুবই ঝুঁকি নিতে হচ্ছে। তবে একজন ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে দিয়ে দেব। কিন্তু সিন্দুকে কি আছে তার ফর্দ তো করা যাবে না—চাবি তো নেই। ওহে, চাবিটা কোথায়?

—নদীর তলায়। স্মল জবাব দিল সঙ্গে সঙ্গে।

—বড্ড ঝামেলায় ফেললে দেখছি—শেষ পর্যন্ত তালাই ভাঙতে হবে। যাই হোক ডাক্তার, হুঁসিয়ার হয়ে যাবেন। সোজা বেকার স্ট্রীটে চলে যাবেন। থানায় যাওয়ার পথে আমরা বেকার স্ট্রীট হয়ে যাব।

ভক্সহলে সিন্দুক সমেত নামিয়ে দেওয়া হল আমাকে। সঙ্গে রইল নিতান্ত

অমায়িক প্রকৃতির এক ইন্সপেক্টর।

ওখান থকে মিনিট পনেরর মধ্যে পৌঁছে গেলাম মিসেস সিসিল ফরেস্টারের বাড়ি। মিসেস ফরেস্টারকে পাওয়া গেল না—পরিচারকের মুখে শুনলাম সন্ধ্যানাগাদ বেরিয়েছেন। কিন্তু এত রাত অবধি বসবার ঘরে জেগে বসে আছেন মিস মর্সটান।

ইন্সপেক্টরকে গাড়িতে রেখে আমি বাক্স হাতে বসবার ঘরেই গেলাম। আমাকে দেখেই লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার ছেড়ে। মুহূর্তে লাল হয়ে গেল গাল।

বললেন—গাড়ির শব্দ কানে এসেছে বটে—কিন্তু এত রাতে আপনি আসবেন ভাবতেই পারিনি। নিশ্চয় নতুন কোন খবর নিয়ে এসেছেন?

—তার চাইতেও বেশি। ভারী লোহার বাক্সটা টেবিলের ওপর রেখে বললাম, এই নিন আপনার সেই রাজ-ঐশ্বর্য।

নিরুত্তাপ শীতল কণ্ঠে বললেন মিস মর্সটান, সেই গুপ্তধন?

—গুপ্তধন—আগ্রার হীরেমুক্তো। দুভাগের একভাগ আপনার। আপনি আর থেডিয়াস শোল্টো—লাখ দুয়েক করে পাবেন নিশ্চিত। ইংলন্ডে এখন আপনি অনন্যা ধনবতী।

—কিন্তু আপনার কাছে ঋণ আমার অশেষ।

প্রতিবাদ করে বললাম—আমার কাছে নয়—এ জিনিস উদ্ধার করার ক্ষমতা আমার কোন কালে হত না। ঋণ যদি বলতে হয় তবে তা বন্ধুবর শার্লক হোমসের কাছে।

অতঃপর আগাগোড়া সব ঘটনা শোনাতে হল তাঁকে। অল্পের জন্য যে বিষ মাখানো তীরের খোঁচায় মরতে মরতে বেঁচে গেছি তাও বাদ দিলাম না। লক্ষ্য করলাম শুনতে শুনতে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল তাঁর। বললেন, আমার জন্যই এরকম একটা বিপদের মধ্যে পড়তে হল আপনাদের।

—বিপদ কেটে গেছে। এই রত্নবাক্স নিজহাতে আপনাকে তুলে দেব বলে এসেছি—সবার আগে খুলে দেখে আপনি খুশি হবেন।

মুখে খুশির ভাব এনে দু'হাতে বাক্সটা তুলবার চেষ্টা করে বললেন, অসম্ভব ভারী দেখছি। খুব সুন্দর বাক্স, ওপরে ভারতীয় কারুকার্য। কিন্তু এর চাবি কোথায়?

—টেমসের জলে ফেলে দিয়েছে স্মল। মনে হচ্ছে মিসেস ফরেস্টারের চুল্লি খোঁচানো শলাটা দিয়ে খোলা যেতে পারে।

হলোও তাই। বুদ্ধ মূর্তি খোদাই করা ভারী মোটা আলতারাপ লাগানো ছিল সামনে। লোহার ডাণ্ডাটা ঢুকিয়ে চাড় দিতেই খটাং শব্দে উপড়ে বেরিয়ে এল আলতারাপ।

ত্রস্ত হাতে তুলে ফেললাম ডালা। কিন্তু বিস্ময়ে চমকে স্তম্ভিত হয়ে দু'জনেই

তাকিয়ে রইলাম সিন্দুকের গর্ভে। অন্তঃসারশূন্য গর্ভ। একেবারেই ফাঁকা।

—রত্ন উধাও। শান্ত হাসি মুখে নিয়ে তাকালেন আমার দিকে মিস মর্স্টান।

বাঁচা গেল। যেন একটা অসহনীয় বোঝা বুক থেকে নেমে গেল আমার। এই ঐশ্বর্যই এতদিন আমার অন্তরের সাধ স্বপ্নকে কঠিন অন্তরালের মত আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবারে দুটি হৃদয়ের মাঝখান থেকে সরে গেল ঐশ্বর্যের প্রচীর।

আবেগের উচ্ছ্বাসে মুখ দিয়ে বেরিয়েই গেল কথাটা—যাক বাঁচা গেল—তাই তোমাকে এবারে নিজের মত করে পেলাম। অন্তরের নিভৃত মণিকোঠায় বসিয়ে যে প্রেম এতদিন তোমাকে নীরবে নিবেদন করেছি—তার কথা জানাবার পথ বন্ধ করে রেখেছিল এই ঐশ্বর্য।

বলতে বলতে দু'হাতে মেরীর হাত তুলে নিলাম আমি। মেরী হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল না।

ইন্সপেক্টর ধৈর্য ধরে গাড়িতেই বসেছিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চাপলাম। বেকার স্ট্রীটে পৌঁছে দেখি আমাদের আগেই কয়েদি আর হোমস সহ জোন্স পৌঁছে গেছে। প্ল্যানটা একটু পাল্টে নিয়েছিল। থানা হয়ে বেকার স্ট্রীটে এসেছে।

শূন্যগর্ভ বাক্সটা মেলে ধরতেই ঘর কাঁপিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল স্মল। বলল, নেই—নেই। এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি যে সেখানে আপনাদের নাগাল পৌঁছবে না। রত্নভাণ্ডার আমার—আমিই যখন ভোগ করতে পারলাম না, তখন আর কাউকে করতে দেব না।

শুনুন এবার তাহলে বলি, আমি আর আন্দামান কারাগারে বন্দী তিন আসামী—রত্নভাণ্ডারে অধিকার মাত্র এই চার জনের। আমি যা করেছি—এই চার জনের হয়েই করেছি। চতুর্মুখের সংকেত তাই গোড়া থেকেই ছিল।

শোল্টো বা মর্স্টান এ সম্পদের কেউ না। ওদের বড়লোক করবার জন্য আখমতের সর্বনাশ করিনি আমরা।

সিন্দুকের হীরেমাণিক তাই বামন টোঙ্গো যেখানে গেছে সেখানেই পাচার করে দিয়েছি। যেই বুঝতে পেরেছি ধরা পড়ে যাচ্ছি, অমনি নিঃশব্দে কাজ হাসিল করেছি।

—মিথ্যে কথা। কড়া গলায় বলল জোন্স, টেমসের জলে ফেলবার মতলব থাকলে পুরো সিন্দুকটাই ফেলে দিতে।

—কিন্তু আমি তো ভুলে যাইনি স্যার, আমার হদিস বার করবার বুদ্ধি যার আছে নদীর বুক থেকে সিন্দুক টেনে তুলবার বুদ্ধিও তার আছে। কিন্তু পাঁচ মাইল পথ ধরে যে হীরে মাণিক ছড়িয়ে দিয়েছি তা তুলে আনবার ক্ষমতা কারু নেই।

অনেক রক্ত ঝরানো সম্পদ—আমার একারও নয়—বুক ভেঙ্গে গেছে ফেলতে—তবু এ ছাড়া কোন পথ ছিল না। এখন আর কোন দুঃখ নেই তার জন্য।

—আদালতকে এভাবে বোকা বানাবার মতলব করে নিজেরই ক্ষতি করলে স্মল। বলল জোন্স।

সঙ্গে সঙ্গে যেন বিপুল আক্রোশে গর্জে উঠল স্মল। ঝনঝন শব্দে কেঁপে উঠল তার হাতের হাতকড়া। ঝড়ের মত তেড়ে বলে উঠল—আদালতের মহিমা আমার কিছু কম জানা নেই। ঐশ্বর্য রোজগার করেছি আমরা—আর রোজগার না করেই ভোগ করবে অন্য লোকে—আদালতের ব্যবস্থা তো দাঁড়াবে এই?

কুড়িটা বছর কাটিয়েছি জলাভূমিতে কালান্তক জ্বরের সঙ্গে লড়াই করে—শেকল বাঁধা অবস্থায় নোংরা কুঁড়ে ঘরে পড়ে থেকে মশার কামড়ে ছটফট করেছি—কালা চামড়ার পুলিশের অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছি—তারপর আগ্রার ওই ঐশ্বর্য এল হাতের মুঠোয়—আর সেই ঐশ্বর্যের জন্য যারা বিন্দু মাত্র ঘাম ঝরায় নি তাদের হাতে তুলে দিচ্ছি না বলে এখন আদালতের দোহাই পাড়ছেন। আমি জেলখানার ঘানি ঠেলে জীবন শেষ করব আর একজন আমার টাকায় রাজার হালে প্রাসাদে আরাম করবে—এর চাইতে টোঙ্গোর বিষ মাখানো তীর চামড়ায় ফুটিয়ে মরতেও রাজি আছি।

কথাগুলো বলে উত্তেজনায় আক্রোশে হাঁপরের মত হাঁপাতে লাগল স্মল। হোমস তাকে শান্ত করে বলল, স্মল, তোমার কাহিনী এখনো শোনা হয়নি। কি ঘটেছে পরিষ্কার না জানতে পারলে ন্যায় অন্যায় বিচার করব কি করে বল।

—ধন্যবাদ স্যার। আপনার ব্যবহাব ভাল লাগে। আপনার পরানো হাতের এই লোহার বালাগুলোর জন্য আমার কোন রাগ নেই। যা ঘটবার ঘটেছে। আমার কাহিনী আমি শোনাব। কোন কথা গোপন না করে সবই বলব। ঈশ্বর সাক্ষী রেখেই একথা বলছি।

এরপর আত্মস্থ হয়ে জোনাথন স্মল তার জীবনকাহিনী শুরু করল।

—আমি জন্মেছি ওরসেশটার শায়ারের পার্শোরে। ধার্মিক সদাচারী এক পরিবারে। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই ছিলাম বেপরোয়া আর দুর্দান্ত প্রকৃতির। পরিবারের রীতিনীতির ধার দিয়েও যেতাম না।

আমার ব্যবহার চাল চলনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল আত্মীয়স্বজন। ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত তাদের নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করলেন। আঠারো বছর বয়সে মেয়ে ঘটিত একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লাম।

আর তার ফলেই পালাতে হল দেশ ছেড়ে। হার্ড চাফস সৈন্যবাহিনীতে নাম লিখিয়ে চলে গেলাম ভারতবর্ষে।

এরপর থেকে নিয়তি এক অদ্ভুত খেলা আরম্ভ করল আমাকে নিয়ে।

সৈন্যবাহিনীতে সবে বন্দুক চালানোটা রপ্ত করেছি—এমন সময়েই ভাগ্যের মার শুরু হল।

একদিন সাঁতার কাটতে গেছি গঙ্গায়। ক্যাপ্টেন জন হোল্ডারও আমার সঙ্গে জলে নেমেছিলেন। আমাদের বাহিনীর সবচেয়ে দক্ষ সাঁতারু তিনি।

মাঝ গঙ্গায় সাঁতার কাটছি—এমন সময় একটা কুমীর হাঁটুর ওপর থেকে ডান পাটা কেটে নিয়ে গেল।

যন্ত্রণায় আর অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জন হোল্ডার আমাকে টেনে ডাঙায় নিয়ে এলেন।

হাসপাতালে পাঁচ মাস থাকার পর কাঠের পা নিয়ে বেরিয়ে এলাম। পঙ্গু হওয়ার দরুন সৈন্যবাহিনী থেকে নাম কাটা গেল। অসহায় অবস্থায় পথে এসে দাঁড়ালাম।

এই অবস্থায় কোথায় যাব কি করব—সামনের সবই অনিশ্চিত। তবে এই দুর্ভাগ্যের দিনেও ঈশ্বর আমাকে পায়ে ঠেলেননি। মনের মত একটা কাজ জুটে গেল।

আমার কর্নেলের বন্ধু অ্যাবেল হোয়াইট নামে একজন ইংরেজ নীলের চাষ করতেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মুল্লা নামে একটা জায়গায় তাঁর খামার। ঘোড়ায় চেপে ক্ষেত দেখাশোনা করা আর কুলিদের কাজের তদারকি—কাজের মধ্যে এই।

আমার সদাশয় কর্নেলের সুপারিশে বহাল হয়ে গেলাম আমি। চমৎকার কোয়ার্টার পেলাম, মাইনেও ভাল। তাছাড়া মিঃ অ্যাবেল হোয়াইট মনিব হিসেবেও খুব ভাল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে মনের আনন্দে কাজে নেমে পড়লাম।

দিনগুলো ভালভাবেই কাটছিল। আচমকা একদিন শুরু হয়ে গেল সিপাহী বিদ্রোহ। শান্ত নিরীহ দেশটা হয়ে উঠল উত্তাল। দু'লক্ষ কালো পিশাচ যেন রক্তের খেলায় মেতে উঠল।

আমাদের ওখান থেকে সবচেয়ে কাছে সেনাবাহিনী মোতায়েন ছিল আগ্রায়। দলে দলে ইউরোপীয়রা বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে ছুটতে লাগল সেদিকে।

মিঃ অ্যাবেল হোয়াইটের ধারণা ছিল গোলমালটা সাময়িক—শিগগিরই থিতিয়ে যাবে। কুঠি ছেড়ে নড়লেন না তিনি। আমিও থেকে গেলাম। কিন্তু চারদিকে তখন শুধু হত্যা আর আগুন। ডসন নামে এক ভদ্রলোক অফিস দেখাশোনা করত। স্ত্রীকে নিয়ে সেও রইল আমাদের সঙ্গে।

একদিন দূরের ক্ষেত থেকে সন্ধ্যা নাগাদ কুঠিতে ফিরছি। এমন সময় চোখে পড়ল—একটা খাড়াই নালার পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে ডসনের স্ত্রীর

মৃতদেহ। কিছু দূরেই রাস্তার ওপরে পড়ে ডসন নিজে। হাতে একটা রিভলভার। সামনে ধরাশায়ী চারজন সেপাই।

রক্ত হিম হয়ে গেল দৃশ্য দেখে। কুঠিতে ফিরে যাব কি না ভাবছি—এমন সময় দেখলাম আকাশে লাল শিখা ছড়িয়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে অ্যাবেল হোয়াইটের বাংলো। কালো সেপাইদের নারকীয় উল্লাস ভেসে আসছে বাতাসে।

আমার দিকে চোখ পড়ে গিয়েছিল বুঝি কয়েকজনের। সাঁই সাঁই করে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল কয়েকটা বুলেট।

আর দেরি করলাম না। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ধান ক্ষেতের ওপর দিয়ে ছুটলাম আগ্রার দিকে। মাঝ রাতে পৌঁছালাম পাঁচিলে ঘেরা নিরাপদ আশ্রয়ে।

কিন্তু সেখানেও স্বস্তিতে থাকা গেল না। গোটা ভারতবর্ষ তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। ইংরেজরা দল বেঁধে জড় হয়ে স্রেফ বন্দুকের জোরে এক এক জায়গায় ঠেকিয়ে রেখেছে তাদের।

যেখানে তা পারছে না সেখান থেকে অসহায় ভাবে দলে দলে পালাচ্ছে।

আমাদেরই কাছে ট্রেনিং নিয়ে যারা বন্দুক ধরতে শিখেছে, কামান ছুঁড়তে শিখেছে, লড়াই শিখেছে—তারাই আমাদের ঘোড়া, হাতিয়ার, রণকৌশল নিয়ে কাতারে কাতারে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আমাদেরই ওপর।

আগ্রায় মোতায়েন ছিল হাল্কা বন্দুকধারী সেনাবাহিনী। থার্ড বেঙ্গল ফিউজিলীয়ার। কিছু শিখ, দু'দল অশ্বারোহী সৈন্য আর একদল গোলন্দাজ। কেরানী আর ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটা স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী তৈরী হয়েছিল। কাঠের পা নিয়ে আমি তাদের সঙ্গে যোগ দিলাম।

জুলাইয়ের গোড়ার দিকে বিদ্রোহীদের সঙ্গে একচোট জোর লড়াই হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পালিয়ে শহরে মধ্যে এসে আশ্রয় নিতে হল।

আগ্রা শহরের যেখানে আমরা ছিলাম, সেখানে শ খানেক মাইল পূর্বে লক্ষ্ণৌ। দক্ষিণে কানপুর—প্রায় একই রকম দূরত্বে। কিন্তু নড়াচড়া করবার উপায় নেই। রক্ত-পাগল সেপাইরা উন্মাদ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে।

যাই হোক, আমরা কিছু লোক কোন রকমে নদী পেরিয়ে এসে ঘাঁটি গাড়লাম আগ্রার পুরনো কেল্লায়। সে এক অদ্ভুত কেল্লা—জীবনে অমন অদ্ভুত দুর্গ দেখিনি।

কয়েক একর জায়গা জুড়ে বিশাল দুর্গ। একটা অংশ আধুনিক কায়দায় সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে—শহর রক্ষার বাহিনী, মেয়েদের বাচ্চাদের থাকবার ও খাবার দাবারের ভাঁড়ার করে নেওয়া হয়েছে সেখানে। তার পরেও রাশি রাশি ঘর ফাঁকা পড়ে রয়েছে।

পুরনো পরিত্যক্ত অংশটা তুলনায় আরও বিশাল। কেঁচো বিছে আর মাকড়সার আড্ডা। কেউ যায় না সেখানে। লম্বা অলিন্দের গোলক ধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলে।

পুরনো অংশে যাওয়া এই কারণেই নিষেধ ছিল।

দুর্গের একদিকে নদী। কিন্তু অন্য সব দিকে বিস্তর দরজা জানালা—অগুন্তি প্রবেশ পথ। প্রতিটি দরজায় পাহারা বসাবার মত অত লোকজন ছিল না আমাদের। তাই কেল্লার মাঝে একটা কেন্দ্রীয় প্রহরী-ভবন করা হয়েছিল।

আর প্রত্যেকটি দরজায় একজন সাদাচামড়ার অধীনে দু তিনজন করে কালা আদমী মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা হল।

আমার ওপর পড়েছিল দক্ষিণ পশ্চিম দিকের একটা নিরালা দরজার ভার। দু'জন শিখ সৈন্য দেওয়া হয়েছিল আমার অধীনে।

রাতের ডিউটিতে মোতায়েন হলাম। নির্দেশ ছিল, গোলমাল দেখলেই যেন বন্দুক ছুঁড়ি তাহলে কেন্দ্রীয় প্রহরী ভবন থেকে সাহায্যের জন্য লোকজন ছুটে আসবে। আমার ডিউটির জায়গা থেকে প্রহরী ভবন প্রায় দু'শ গজ দূরে—আর এই জায়গাটুকুর মধ্যে অজস্র গলি-ঘুঁজির গোলক ধাঁধা।

তালঢ্যাঙা ভীষণ দর্শন দুই পাঞ্জাবী সঙ্গী নিয়ে দু'রাত ডিউটি করলাম। অদ্ভুত প্রকৃতির এই দুই পাঞ্জাবী।

একজনের নাম মহোমৎ সিং, আর একজন আবদুল্লা খান। ইংরেজী বলতে পারত কিন্তু আমার সঙ্গে বিশেষ কথা বলত না। গুরুমুখী ভাষায় নিজেদের মধ্যে সারারাত বকবক করত।

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে বড় একঘেয়ে লাগত। আমি নজর রাখতাম আঁকাবাঁকা নদী আর দূরে আলোঝলমল মিরাট শহরের ওপর। নদীর ওপার থেকে প্রায়ই ভেসে আসত বিদ্রোহীদের হুংকার আর উল্লাসধ্বনি।

দু'ঘণ্টা অন্তর রাতের অফিসার টহল দিয়ে যেত। সব কটি পোষ্ট ঘুরে ঘুরে দেখত।

তৃতীয় রাতে ডিউটিতে রয়েছি। বৃষ্টির রাত—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—মাটিতে জল কাদা। তার মধ্যেই ফটকের বাইরে একপায়ে দাঁড়িয়ে ডিউটি দিচ্ছি।

অনুচরদের সঙ্গে কথা বলে একঘেয়েমী কাটাব তার উপায় নেই। হুঁ-হাঁ—ছাড়া কথা বলে না।

রাত দুটোর সময় টহলদার অফিসার ঘুরে গেল। আড়মোরা ভেঙে আমি বন্দুক রেখে তামাকে আগুন ধরাব বলে দেশলাই জ্বালালাম। এমনি সময়ে আচমকা দৈত্যের মত দুই শিখ ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপরে।

একজন বন্দুক ছিনিয়ে নিল। আর একজন গলায় ছুরি চেপে ধরে বলল—সাহেব, চেঁচাবেন না। আমরা বিদ্রোহী নই—কেল্লা নিরাপদ।

ওদের গলার স্বর শুনে বুঝলাম—মিথ্যা বলছে না। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারলাম না। আমি চুপচাপ রইলাম।

আবদুল্লা খান ফিসফিসিয়ে বলল—সাহেব—আমাদের কথামত কাজ করলে কোন ভয় নেই। নইলে কচুকাটা করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেব। রাতারাতি বড়লোক হবার মত দৌলত আমরা হাতে পেয়েছি। আপনাকেও তার ভাগ দেব। কিন্তু খৃস্টের নামে শপথ করে বলতে হবে—আপনিও আমাদের দলের একজন—কখনো বেইমানি করবেন না।

প্রথমে আমি কেল্লা দখলের অভিসন্ধি সন্দেহ করেছিলাম। তাই নীরবে সুযোগের অপেক্ষায় থাকব ঠিক করে নিয়েছিলাম। কিন্তু ওদের কথা শুনে একদিক থেকে নিশ্চিন্ত হলাম।

বললাম—তোমাদের কথা আমাকে পরিষ্কার করে খুলে বল। বড়লোক হবার সাধ কার না হয়—কিন্তু সম্পদটা আসবে কোন পথে সেটা না জেনে নিশ্চিত হই কি করে। তবে কেল্লার নিরাপত্তা যতক্ষণ বিঘ্নিত না হবে ততক্ষণ আমাকে দিয়ে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না, শপথ করছি।

তারপর ওদের কাছ থেকে এক অদ্ভুত কাহিনী শুনতে পেলাম স্যার। আর তখন থেকেই ওদের তিনজনের সঙ্গে আমারও ভাগ্যের অদৃশ্য সুতো বাঁধা হয়ে গেল।

উত্তর প্রদেশের এক রাজা, প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক। কিন্তু সম্পদ ভোগ করতে জানতেন না—কেবল জমাতেন।

গোলমাল যখন শুরু হল রাজা দু'দিকেই তাল রেখে চলতে লাগলেন। সেপাই আর ইংরেজ যেই জিতুক যাতে নির্বিঘ্নে থাকতে পারেন।

অদ্ভুত এক প্ল্যান আঁটলেন রাজা। ঠিক করলেন—সোনাদানা সব প্রাসাদে রাখবেন। আর মূল্যবান সব রত্ন আর বাছাই করা মুক্তো একটা লোহার বাক্সে করে পাঠিয়ে দেবেন আগ্রা দুর্গে। যে পক্ষই জিতুক সম্পদের একটা অংশ তার হাতে থেকে যাবে।

প্ল্যান মত তিনি জমানো সম্পদ দু'ভাগ করে এক অংশ একজন বিশ্বাসী অনুচরকে দিয়ে আগ্রায় পাঠিয়ে দিলেন।

আখমত নাম নিয়ে সওদাগরের ছদ্মবেশে সেই অনুচর কেল্লায় ঢুকবার ফিকির করতে লাগল। সিপাহী আবদুল্লার এক ভাই—তার নাম দোস্ত আকবর, পথসঙ্গী হিসেবে আখমতের সঙ্গে রয়েছে। সিন্দুকের গুপ্তকথা কেবল সেই জানে।

সেই রাতেই দোস্ত আকবর আখমতকে কেল্লায় পৌঁছে দেবে মহোমৎ সিং আর আবদুল্লা সেই পথ চেয়ে আছে। এই ফাঁকা জায়গায় আখমত এল কি গেল কেউ তার খবর জানতে পারবে না। রাজার বিপুল ঐশ্বর্য ভাগ হয়ে যাবে আমাদের চারজনের মধ্যে।

ঘটনাটা শুনে আমি মন স্থির করতে লাগলাম কি করব। আবদুল্লা তখন বলল,

সাহেব, কম্যান্ডারের হাতে আখমত ধরা পড়লে প্রাণে বাঁচবে না, তেমনি ঐশ্বর্যও জমা পড়বে সরকারী তোষাখানায়। কিন্তু আমরা চাই রাজার ঐশ্বর্য আমাদের চারজনের পকেটে আসুক। কাকপক্ষী এর বিন্দু বিসর্গ জানতে পারবে না। রাতারাতি আমরা বড়লোক হয়ে যাব। এমন সুযোগ সব সময় আসে না সাহেব। এবারে বলুন আমাদের সঙ্গে আপনি আছেন, অথবা আপনি আমাদের শত্রু। যা বলবেন তার যেন নড়চড় না হয়।

স্যার, আমার পরিস্থিতি চিন্তা করুন। একদিকে অর্থের লোভ আর একদিকে মৃত্যু। শেষ পর্যন্ত আমি কথা দিলাম—মনে প্রাণে আমি তাদেরই সঙ্গী।

আবদুল্লা বন্দুক ফিরিয়ে দিয়ে বলল, আপনাকে পুরো বিশ্বাস করলাম আমরা। প্রাণ গেলেও আমাদের কারুর শপথ যেন অন্যথা না হয়।

প্ল্যানটা বেরিয়েছিল দোস্ত আকবরের মাথা থেকে। সেই মত সে আগ্রা দুর্গে ভাইকে খবরটা পাঠিয়ে দিয়েছিল। এরপর আমরা তিনজনে সওদাগরবেশী আখমতের পথ চেয়ে রইলাম।

বর্ষার বৃষ্টি সমানে ঝরছিল। তারই মধ্যে এক সময় স্তূপীকৃত রাবিশের আড়ালে ঢাকা দেওয়া লণ্ঠনের আলোর ঝিলিক চোখে পড়ল।

আবদুল্লা বলল, সাহেব, আপনি গিয়ে আগে চ্যালেঞ্জ করবেন। ঘাবড়ে দেবেন না যেন। জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করে আমাদের সঙ্গে ভেতরে পাঠিয়ে দেবেন—তারপর যা করবার আমরাই করব। আপনি বাইরে পাহারা থাকবেন।

কাঁপতে কাঁপতে আলোটা একসময় সামনে এগিয়ে এল। অমনি হাঁক ছাড়লাম। আর লণ্ঠনের ঢাকনা খুলে আলো ফেললাম।

বিশাল দেহী এক শিখ দাঁড়ানো সামনে। কোমর পর্যন্ত লোটাচ্ছে দাড়ি। অন্য লোকটা বেঁটে মোটা—গোলগাল চেহারা। মাথায় পাগড়ী, হাতে শালমোড়া একটা পোঁটলা। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে লোকটা। ভায়ার্ত চোখে তাকাচ্ছে চারদিকে ইঁদুরের মত।

লোকটাকে দেখে মায়া হল। কিন্তু ঐশ্বর্যের কথা ভেবে মনটাকে শক্ত করলাম।

আমাকে দেখে লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে চিৎকার করে উঠল—সাহেব, আমাকে বাঁচান। আমি সওদাগর আখমত—দীনদুঃখী মানুষ—কোম্পানি আমার মা-বাপ। তাই কেল্লায় ছুটে এসেছি নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। প্রাণে বাঁচলে মোটা পুরস্কার পাবেন আপনি আর আপনার সরকার।

পোঁটলার মধ্যে কি আছে জানতে চাইলে বলল—কিছু পারিবারিক স্মৃতি। অন্য লোকের কোন কাজে লাগবে না—কিন্তু আমার কাছে অমূল্য সম্পদ।

বেশি কথা বাড়ালাম না আমি। সিপাই আবদুল্লা আর মহোমৎ সিংকে নির্দেশ দিলাম ভেতরে প্রধান প্রহরীর কাছ নিয়ে যেতে। সঙ্গে সঙ্গে দুই শিখ দু'পাশ থেকে

ধরে লোকটাকে নিয়ে গেল ভেতরে। পেছন পেছন গেল দোস্ত আকবর।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিস্তব্ধ অলিন্দপথে ওদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। আচমকা ভেতরে চেঁচামেচি ঝটাপটির শব্দ উঠল। চমকে ঘুরে দাঁড়ালাম।

ছুটন্ত পায়ের একটা আওয়াজ ক্রমশই আমার দিকে এগিয়ে আসছে। লম্বা গলিপথে আলো ফেলতেই নজরে পড়ল বেঁটে সওদাগর প্রাণপণে ছুটে আসছে—সারা মুখ রক্তে মাখামাখি। তার পেছনেই খোলা ছুরি হাতে ব্যাঙের মত লাফাতে লাফাতে আসছে লম্বা দাড়িওলা দোস্ত আকবর।

আমার পাশ দিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছিল সওদাগর—এমন সময় বন্দুকটা গলিয়ে দিলাম দু'পায়ের ফাঁকে। ডিগবাজি খেয়ে মাটির ওপর গড়িয়ে পড়ে গেল লোকটা। কিন্তু উঠে দাঁড়াবার আগেই দোস্ত আকবরের হাতের ছুরি আমূল বসে গেল তার বুকে। চেঁচামেচি করবারও সুযোগ পেল না। প্রাণহীন দেহটা নিথর হয়ে গেল।

বলতে যখন শুরু করেছি—প্রত্যেকটা ঘটনা হুবহু বলে যাব স্যার। কোন কিছু লুকোবো না।

কথা বলার ফাঁকে হোমসের দেওয়া জলমেশানো হুইস্কি গলায় ঢেলে নিল স্মল। খানিকটা তাজা হয়ে আবার শুরু করল তার কাহিনী।

—আমি জানি আমার কাজটা আপনারা সমর্থন করবেন না। কিন্তু ভাল হোক মন্দ হোক—এ করা ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। লুঠেরাদের দলে না ভিড়লে টুঁটি কাটা যেত।

আখমত যদি পালিয়ে যেঁত ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে আমি ধরা পড়তাম। কোর্ট মার্শাল হত—গুলি খেয়ে মরতাম।

যাই হোক, আমি আকবর আর আবদুল্লা লাশ বয়ে নিয়ে গেলাম ভেতরে। দরজা আগলে রইল মহোমৎ।

গোর দেওয়ার ব্যবস্থা করে রাখাই ছিল—অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়ে বিশাল এক হলঘরে।

একদিকে মাটি ধসে গিয়েছিল। তার মধ্যেই লাশ শুইয়ে দিয়ে ইটের টুকরো ফেলে চাপা দিয়ে দিলাম।

আপনাদের টেবিলের ওপরের এই বাক্সটাই ছিল আখমতের বগলে। হাতলের সঙ্গে বাঁধা ছিল চাবিটা। চারজনে মিলে তালা খুলে ভেতরটা দেখলাম।

বাক্সভর্তি হীরে মাণিক—রোশনাইতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। এত সম্পদ একসঙ্গে কখনো দেখিনি। সকলে মিলে গুণে গুণে ফর্দ তৈরি করলাম।

একশ তেতাল্লিশটা প্রথম শ্রেণীর হীরে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম হীরে গ্রেট মোগলও ছিল তার মধ্যে। সাতানব্বইটা ছিল উৎকৃষ্ট পান্না, একশ সত্তরটা চুনী,

চল্লিশটা পদ্মরাগ মণি, দশটা নীলকান্ত মণি, একষট্টিটা আকীক পাথর, কিছু ফিরোজা মণি—এছাড়া আরও অনেক দামী দামী পাথর।

এই সঙ্গে ছিল শ তিনেক মুক্তো—একটা ছোট্ট সোনার মুকুটে গাঁথা ছিল বড় আকারের বারোটা মুক্তো। এবারে সিন্দুক যখন ফিরে পেলাম, তখন কিন্তু তার মধ্যে সোনার মুকুটটা ছিল না।

সিন্দুকে রত্ন ভরে নিয়ে আবার চারজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শপথ নিলাম—কেউ কাউকে বিপদে ফেলে পালাব না। সুদিনে দুর্দিনে পাশে থাকব এবং গুপ্তকথা কোন অবস্থায় প্রকাশ করব না।

দেশের চারদিকে তখনো ঘোরতর গোলমাল। সুতরাং সেই মুহূর্তে ভাগ বাঁটোয়ারার মধ্যে গেলাম না আমরা। শান্তি ফিরে আসার অপেক্ষায় রইলাম। যে হল ঘরে আখমতকে কবর দেওয়া হয়েছে সেই ঘরের দেওয়াল থেকে ইট সরিয়ে রত্ন-বাক্স লুকিয়ে রাখলাম। প্রত্যেকটা ইটের তলায় চারজনে সই করলাম।

এরপর ভারতবর্ষের বিদ্রোহ তছনচ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে শান্তি ফিরে এল দেশে। আমরাও চারজনে লুঠের মাল ভাগ বাঁটোয়ারা করার দিন গুণতে লাগলাম। কিন্তু এর মধ্যেই ঘটল দুর্বিপাক। আখমতকে হত্যার দায়ে চারজনেই গ্রেপ্তার হলাম।

ঘটনাটা ছিল আমাদের চিন্তারও বাইরে।

বিশ্বস্ত অনুচরের জিম্মায় রত্ন-বাক্স পাঠিয়েছিলেন রাজা। কিন্তু তবু নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। আর একজন অনুচরকে পাঠিয়েছিলেন ছায়ার মত পেছনে থেকে সবকিছু নজরে রাখার জন্য। ঘটনার রাত্রে এই অনুচর আখমতের পেছন পেছন এসে তাকে কেল্লায় ঢুকতে দেখেছিল। কেল্লায় ঠাঁই পেয়েছে ভেবে পরদিন দরখাস্ত পেশ করে নিজেও ঢুকল কেল্লায়। কিন্তু আখমতের দেখা পেল না কোথাও।

যথা সময়ে সে রহস্যটা প্রহরীদের এক সার্জেন্টের কানে তোলে। সার্জেন্ট জানায় অধিনায়ককে। তন্নতন্ন করে খোঁজা শুরু হল কেল্লা।

বেরিয়ে পড়ল আখমতের মৃতদেহ। তিনজন ঐ রাতে ফটকে পাহারা দিচ্ছিলাম। কাজেই গ্রেপ্তার হতে হল আমাদের।

আর চতুর্থজন—আকবর, নিহত ব্যক্তির পথসঙ্গী ছিল বলে গ্রেপ্তার হল সে-ও।

ততদিনে সেই রাজাও ভারতবর্ষের বাইরে। নির্বাসন দণ্ড দিয়ে তাকে ভারতবর্ষের বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছে। সে কারণেই আমাদের বিচারের সময় রত্ন-বাক্সের প্রসঙ্গ উঠল না।

খুনের অপরাধে আমাদের হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

ফাঁসিতে মৃত্যুর রায় হয়েছিল আমার প্রথমে। পরে আদেশ হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের।

কোথায় রাজ-ঐশ্বর্যের অংশ নিয়ে দেশে ফিরে এসে রাজার হালে দিন কাটাব, তা নয় ঢুকতে হল জেলখানায়। কোনদিন যে ছাড়া পাব সে আশাও নেই। পাগল হয়ে যাবার মত অবস্থা তখন আমাদের। পালাবার মতলব ভাঁজতে লাগলাম মনে মনে।



ইতিমধ্যে আগ্রা থেকে মাদ্রাজ পাঠানো হল আমাকে। সেখান থেকে আন্দামানের ব্লেয়ার দ্বীপে। বেশ কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ কয়েদীও পেলাম সেখানে।

ভাল ব্যবহার দেখে কর্তারা খুশি হয়ে আমাকে একটু আলাদা রকম ব্যবস্থা করে দিলেন।

মাউন্ট হ্যারিয়েটের সানুদেশে ছোট্ট হোপ-টাউনে একটা কুঁড়েঘর আর আনুষঙ্গিক কিছু জিনিসপত্র দেওয়া হল আমাকে।

জায়গাটা নির্জন। রাস্তা আর নর্দমা বানানো ছাড়াও চুপড়ি আলুর চাষ করতে হত আমাকে। এছাড়াও ছিল নানা রকম কাজ।

স্যাঁতসেতে এই পাহাড়ী জঙ্গলে জ্বরজারি লেগেই থাকত। তার ওপরে ছিল নরখাদকের ভয়। নিজেদের এলাকার বাইরে পা বাড়ালেই বিষ মাখান তীর ছুটে আসে।

এরই মধ্যে আমাকে মাঝে মাঝে ডাক্তারের কথামত লোকজনকে ওষুধ দেওয়ার কাজ করতে হত। ফলে ডাক্তারিবিদ্যাও কিছু রপ্ত হয়ে গেল।

সব কাজই আমি করতাম মনপ্রাণ দিয়ে—কিন্তু মাথায় ঘুরত সব সময় পালানোর মতলব। পালাবার সুযোগ খুব একটা ছিলও না। এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপের দূরত্ব ছিল কম করেও একশ মাইল।

ডক্টর সোমারটনের ডাক্তারখানায় বসে ওষুধ বানাতাম আমি। ডাক্তারের বয়স কম—খুবই মিশুকে। অন্যান্য তরুণ অফিসাররা রাতে ডাক্তারের বাড়ি আড্ডা মারতে চলে আসত। গল্পগুজবের সঙ্গে খেলা হত তাস।

আড্ডায় আসতেন দেশী সৈন্যবাহিনীর মেজর শোল্টো, ক্যাপ্টেন মর্সটান, লেফটেন্যান্ট ব্রমলি ব্রাউন। এছাড়াও আসতেন জনাকয়েক জেল অফিসার।

প্রত্যেকেই পাকা জুয়াড়ী। ফলে আড্ডাটা জমত ভাল। মাঝে মাঝে একঘেয়েমী কাটাবার জন্য আমি ডাক্তারখানার আলো নিবিয়ে দিয়ে মাঝের জানলায় দাঁড়িয়ে সকলের কথা শুনতাম—খেলা দেখতাম।

ঝুঁকি বাঁচিয়ে কৌশলে সকলেই খেলার চেষ্টা করতেন। কিন্তু দিনের পর দিন একজনকে দেখতাম হারতে।

মেজর শোল্টো—কশ্চিৎ কখনো জিততেন। তবে লোকসানটা তুলতে পারতেন না কখনোই। ফলে ধার হতে লাগল।

প্রথম প্রথম খেলেছেন নোট আর সোনা ফেলে। কিছুদিন পরেই দেখা গেল দরকার মত মোটা টাকা ধার নিচ্ছেন হ্যান্ড নোট লিখে।

একরাতে গো-হারান হারলেন শোল্টো। শোক ভুলতে মদ গিললেন আকণ্ঠ। সেই অবস্থায় টলতে টলতে কোয়ার্টারে ফিরছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ক্যাপ্টেন মর্সটান।

দুজনেই এক আত্মার বন্ধু। ছাড়াছাড়ি হত না কখনো।

আমার কুঁড়ের পাশ দিয়েই যাচ্ছিলেন—ঘরে বসে শুনলাম মেজর শোল্টো দুঃখ করে বলছেন—মর্সটান, সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বসেছি—এবার তো কাগজপত্র না আনলে আর উপায় দেখছি না।

কথাটা শুনেই একটা মতলব এসে গেল মাথায়। সুযোগ খুঁজতে লাগলাম।

দিন কয়েক পরে সকালবেলায় শোল্টোকে পায়চারী করতে দেখে এগিয়ে গেলাম। একথা সে-কথার পর বললাম—মেজর, একটা ব্যাপারে কি করব বুঝে উঠতে পারছি না—আমাকে একটা সৎ পরামর্শ দিন। পাঁচলক্ষ পাউন্ড দামের একটা গুপ্তধনের ঠিকানা আমি জানি। সে সম্পদ ভোগ করবার সুযোগ জীবনে আর নেই। তাই ভাবছি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেব কিনা—তাতে অবশ্য আমার জেল মেয়াদটা কিছু কমতে পারে মাত্র। কি করা যায় গুপ্তধনটা নিয়ে বলুন তো।

গুপ্তধনের অর্থমূল্য শুনে দম আটকে আসার মত হল মেজরের অবস্থা।

আমি সুযোগ বুঝে আবার বললাম, জহর আর মুক্তো মিলিয়ে এ সম্পদটা এমন জায়গায় রয়েছে যে সন্ধান জানলে যে কেউ নিতে পারে।

আসল মালিককে দেশছাড়া করেছে সরকার। কাজেই যে আগে যেতে পারবে সম্পদটা তারই হবে।

মেজর শোল্টো আমতা আমতা করতে লাগলেন। পরিষ্কার করে কোন কথা বলছেন না। তখন গোটা ঘটনাটা তাকে খুলে বললাম। কেবল আসল জায়গার হদিস গোপন রাখলাম।

মেজর সেদিন কিছুই বললেন না। কেবল বললেন ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, যেন আর কারুর কাছে মুখ না খুলি। এ নিয়ে পরে তিনি কথা বলবেন।

দু'দিন পার হল। তৃতীয় দিনের মাঝরাতে মেজর শোল্টো আর ক্যাপ্টেন মর্সটান আমার ঘরে এলেন।

বললেন, স্মল, তোমার ব্যাপারটা নিয়ে আমরা দুই বন্ধু চিন্তাভাবনা করে একটা সিদ্ধান্তে এসেছি। দেখ, বিষয়টা ব্যক্তিগত—সুতরাং এর ব্যবস্থাও সেভাবেই হওয়া উচিত বলে মনে করি। সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ার কোন প্রশ্নই আসে না। একটা মনের মত শর্ত আমরা নিজেরাই স্থির করে নিতে পারি। তাহলে তোমার হয়ে গুপ্তধন আমরা উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারি।

আমি বললাম, আমাকে মুক্তি দিতে হবে—আমার তিন বন্ধুরও জেলের বাইরে আসার ব্যবস্থা করতে হবে। শর্ত এই একটাই, তাহলেই অংশীদার করে নেব আপনাদের। পাঁচভাগের এক ভাগ পাবেন আপনারা।

বন্ধুদের ডুবিয়ে বাঁচতে চাইছি না দেখে আমাকে অবিশ্বাস করতে পারলেন না মেজর।

এ নিয়ে আর একটা বৈঠক হল। সেই সময় হাজির রইল মহোমৎ সিং, আবদুল্লা খান, আর দোস্ত আকবর।

আলোচনার পরে স্থির হল—দু'জন অফিসারকেই আগ্রা কেল্লার একটা নক্সা দেওয়া হবে—নক্সায় চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হবে—কোথায় আছে গুপ্তধন।

সেই নক্সা নিয়ে সত্যতা যাচাই করবার জন্য ভারতবর্ষে যাবেন মেজর শোল্টো। রত্নবাক্স দেখে যথাস্থানে রেখে দেবেন। পরে একটা বজরায় খাবার দাবার বোঝাই করে পাঠিয়ে দেবেন। বজরা এসে থাকবে র‍্যাটল্যাণ্ড দ্বীপে। আমরা সেখানে গিয়ে বজরায় উঠব।

মেজর শোল্টো ফিরে আসবেন নিজের কাজে। তারপর ছুটির দরখাস্ত করবেন ক্যাপ্টেন শোল্টো—আগ্রায় আমরা এক সঙ্গে মিলিত হব। সেখানেই গুপ্তধন ভাগ বাঁটোয়ারা হবে।

মেজর শোল্টোর অংশ বুঝে নেবেন ক্যাপ্টেন মর্সটান।

কথাবার্তা পাকা হয়ে গেলে ছজনেই প্রতিজ্ঞা করলাম—মন আর মুখ কখনোই আমাদের দুরকম হবে না।

সেই রাতেই দুটো নক্সা তৈরি করে সই করলাম চারজনে—আবদুল্লা, আকবর, মহোমৎ আর আমি।

এ পর্যন্ত কোন কথার খেলাপ আমরা কেউ করিনি। কিন্তু মেজর শোল্টো ভারতবর্ষে এসেই বিশ্বাসঘাতকতা করলেন—আর ফিরলেন না।

ক্যাপ্টেন মর্সটান জানালেন, দেশে হঠাৎ করে কাকা মারা যাওয়ায়—অনেক সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন মেজর। তাই সামরিক চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে গেছেন।

শোল্টো যে আমাদের পাঁচ জনকে পথে বসিয়ে গেলেন তা আর বুঝতে বাকি থাকল না আমাদের।

দিন কয়েক পরেই মর্সটান আগ্রায় গিয়ে দেখলেন—রত্নবাক্স উধাও হয়েছে। বিশ্বাসঘাতক শোল্টো একাই আত্মসাৎ করেছে বাক্সবোঝাই রাজ-ঐশ্বর্য।

এই হীন প্রতারণার ব্যাপারটা আমার শরীরে আগুন ধরিয়ে দিল। সেদিন থেকে ঠিক করলাম—প্রতিহিংসা আমার চাই—যে কোন মূল্যে। আগ্রার রত্নবাক্সের কথা আর মনে রইল না, দিনেরাতের চিন্তা হল একটাই, প্রতিহিংসা চাই।

সুযোগের প্রতীক্ষায় দিন গুণতে লাগলাম।

ডাক্তারে কম্পাউন্ডারি করতে করতে ওষুধপত্র, চিকিৎসা কিছু কিছু শিখেছিলাম। জ্বর হয়েছিল বলে ডাক্তার সোমারটন একদিন ডাক্তারখানায় এলেন না।

সেদিনই কয়েকজন কয়েদী একটা লোককে জঙ্গল থেকে বয়ে নিয়ে এল ডাক্তারখানায় আন্দামানের আদিবাসী। মানুষখেকো জাত। অসুখে ভুগে ভুগে নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল লোকটা।

বিপজ্জনক জেনেও চিকিৎসা করলাম। মাস দুয়েকের মধ্যে দিব্যি সে সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু তারপর থেকে আর জঙ্গলে গেল না। আমার ঘরের আশেপাশেই ঘুরঘুর করত।

কিছুদিনের মধ্যে তার দু একটা ভাষাও আমি শিখে ফেললাম। এই বুনো লোকটাই টোঙ্গো। খুবই অনুগত হয়ে পড়েছিল আমার।

ভাল নৌকো চালাতে পারত টোঙ্গো। নিজের একটা বড় ছিপ নৌকোও ছিল। তাকে ঘিরেই মুক্তির পরিকল্পনা খাড়া করলাম।

পুরনো একটা ঘাটে লোকজন যাতায়াত করত না—পাহারাদারও থাকে না। টোঙ্গোর সঙ্গে আলোচনার পর স্থির হল—গভীর রাতে নৌকো নিয়ে সেই ঘাটে

হাজির থাকবে সে। নৌকোয় আনবে অনেকগুলো লাউয়ের খোলভর্তি করে পানীয় জল। বেশ কিছু মিষ্টি আলু, নারকেল ও চুপড়ি আলু।

টোঙ্গোর আনুগত্যে খাদ ছিল না। অমন বিশ্বাসী অনুচর কেউ কখনো পেয়েছে কিনা সন্দেহ। নির্দেশমত নৌকো নিয়ে ঘাটে হাজির হল। কিন্তু বাধা পেলাম আমি।

কোনদিনই সেই ঘাটে পাহারাদার থাকে না। কিন্তু সেই রাতেই কি কারণে জানি না দেখলাম কয়েদীদের একজন গার্ড ঘাটে হাজির।

লোকটা পাঠান, পাজির পা-ঝাড়া। আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পেত না। সুযোগ পেলেই অপমান করত। উপায় ছিল না বলে সবই হজম করতে হয়েছে। প্রতিহিংসা নেবার সুযোগটা সেই রাতেই এসে গেল অযাচিতভাবে। কাঁধে বন্দুক নিয়ে পেছনে ফিরে দাঁড়িয়েছিল সে। মোক্ষম সুযোগ। অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে কাঠের পাটা খুলে হাতে নিলাম।

তারপর লাফ দিয়ে গিয়ে পড়লাম পেছনে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বন্দুক তুলবার সুযোগ দিলাম না। কাঠের পায়ের এক আঘাতে মাথা চৌচির হয়ে ছিটকে পড়ল।

লাফিয়ে গিয়ে উঠলাম নৌকায়। টোঙ্গো তৈরি হয়ে বসে ছিল। এক ঘণ্টার মধ্যেই মাঝ সমুদ্রে নিয়ে এল।

পাল বানাবার মত কয়েকটা জিনিস এনেছিল টোঙ্গো। সেসব দিয়ে কোনরকমে দশদিন ভেসে রইলাম জলের ওপরে। তারপর একদিন একটি সওদাগরী জাহাজ তুলে নিল আমাদের। জাহাজটা মালয় থেকে তীর্থযাত্রীদের নিয়ে যাচ্ছিল সৌদি আরবের জেড্ডায়।

আমার একান্ত অনুগত সেই পুঁচকে বুনো সঙ্গীকে নিয়ে এরপর তিন-তিনটা বছর এক বন্দর থেকে আর এক বন্দরে ভেসে বেড়ালাম।

নাস্তানাবুদ হয়েছি যথেষ্ট, কিন্তু উদ্দেশ্য ভুলিনি কখনো। শোল্টো আর প্রতিহিংসা—দুটি শব্দ অহরহ ধ্বনি তুলত বুকের মধ্যে।

নানান বাধা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে পৌঁছলাম বছর তিনেক আগে। খুঁজেও বার করলাম শোল্টোর আস্তানা। বুঝতে পারছিলাম না, আগ্রা দুর্গের হীরেরত্ন বেচে দিয়েছে কিনা।

খবরাখবরের জন্য কব্জা করতে হল একজনকে। নামটা জানতে চাইবেন না দয়া করে। জেলখানার ভেতরে আর কাউকে টেনে আনতে চাই না। আমার কার্যসিদ্ধির জন্যই নানাভাবে নানাজনকে দলে টানতে হয়েছে। একদিন খবর পেলাম হীরে মাণিক বিক্রি হয়নি—পণ্ডিচেরী লজেই আছে।

কিন্তু বহু চেষ্টা করেও শয়তানটার কাছে পৌঁছতে পারছিলাম না।

শোল্টো লোকটা ছিল মহা ধড়িবাজ। দু দুটো লড়াইবাজ প্রাইজ ফাইটারকে

বাড়ি পাহারার জন্য রেখেছিল চাকরি দিয়ে।

তাছাড়া ছিল ছেলে দুটি আর খিদমতগার। চোখে চোখে রাখত সবসময়।

শেষ পর্যন্ত একদিন খবর পেলাম—শোল্টো মৃত্যুশয্যায়। আর দেরি করতে পারলাম না। ভয় হল গুপ্তধনের খবরটা নিয়েই না শেষকালে পটকে যায়।

সুযোগও পেয়ে গেলাম—বাগান পার হয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দিলাম। দেখলাম শোল্টো বিছানায় শুয়ে—দু'পাশে দুই ছেলে। বাইরে থেকে কানে যাচ্ছিল না কোন কথা। কিন্তু ঘরে ঢুকবার আগেই নজরে পড়ে গেলাম শোল্টোর। দেখেই আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল।

সেই ধাক্কা আর সামলাতে পারল না। শেষ বোঝাপড়াটা তার সঙ্গে আর করা হল না।

কিন্তু হাল ছাড়লে তো চলবে না। গুপ্তধন কোথায় রেখেছে তার হদিস যদি পাওয়া যায় সেই আশায় রাতে এসে ঘরে ঢুকলাম—সব কিছু হাঁটকালাম, তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম—কিন্তু কোন লাভ হল না।

ঘর ছেড়ে বেরুবার আগে চারজনের তরফ থেকে চতুর্মুখ-এর স্বাক্ষর রেখে এলাম একটা কাগজে।

আমাদের চারজনকে বোকা বানিয়ে শোল্টো তো ডেং ডেং করে চলে গেল—আমি পড়লাম অথৈ জলে।

ছেলেরা গুপ্তধনের সন্ধানটা জানে কিনা সে-বিষয়ে এবার নজর রেখে চলতে হল। কাটতে লাগল দিনের পর দিন।

বাড়ির ভেতরের খবরাখবর পেতে লাগলাম নিয়মিত। শুনলাম সন্ধান চলছে।

তক্কে তক্কে রইলাম। দিন চলছে তখন আমার বুনো নরখাদক টোঙ্গোকে দেখিয়ে। বিচিত্র জংলী নাচ আর কাঁচা মাংস চিবিয়ে খাওয়া দেখে লোকে মজা পেত—টুপি ভরে উঠত পেনিতে।

কয়েকটা বছর কেটে গেল এভাবে। শেষে একদিন খবর পেলাম গুপ্তধন পাওয়া গেছে।

ওপরতলায় বার্থোলোমিউর গবেষণাঘরে রাখা আছে রত্নবাক্স। আরো জানতে পেলাম ছাদে একটা খোলা দরজা আছে—সেটা দিয়ে ঘরে ঢোকা যাবে।

কিন্তু পণ্ডিচেরী লজে গিয়ে দেখলাম, অত উঁচুতে কাঠের পা নিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে টোঙ্গোকে কাজে লাগালাম।

বার্থোলোমিউ কখন খেতে নিচে আসে সেই সময়টা জানা ছিল। কোমরে এক বাণ্ডিল দড়ি জড়িয়ে দিয়ে পথ দেখিয়ে দিলাম টোঙ্গোকে। দেয়াল আর পাইপ বেয়ে দিব্যি উঠে গেল তরতর করে।

কিন্তু কপাল মন্দ বার্থোলোমিউর, কপাল মন্দ আমাদেরও। সেদিন সে খেতে

নামেনি। ঘরেই চেয়ারে বসেছিল। আর মারাও গেল সেভাবে টোঙ্গোর বিশ মাখানো তীরে।

বাহাদুরি দেখাবার জন্যই কাণ্ডটা করে বসল জানোয়ারটা—বাইরে থেকে কিছুই বুঝতে পারিনি।

টোঙ্গোর ফেলে দেওয়া দড়ি বেয়ে জানালা গলে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দেখি ফুর্তিতে নাচছে টোঙ্গো।

কাণ্ড দেখেই মাথায় রক্ত চড়ে গেল। বিশ্বাস করুন, নিরপরাধ বার্থোলোমিউর কাঠ হয়ে যাওয়া শরীরটা দেখে খুবই দুঃখ পেলাম। ওর ওপরে কোন রাগ ছিল না আমার।

ঝামেলা না বাড়িয়ে কাজ হাসিল করাই ছিল উদ্দেশ্য। হতোও তাই। শয়তানটাই গণ্ডগোল পাকিয়ে ফেলল। রাগের চোটে দড়ির মাথা দিয়ে বেধড়ক পেটালাম। মেরেই ফেলতাম যদি না সিঁড়ি বেয়ে পালিয়ে যেত।

যা গেছে তার তো আর কাটান নেই। এবার সটকে পড়াটাই দরকার।

দড়ি বেঁধে রত্নবাক্স সহ সিন্দুক আগে নামিয়ে দিলাম নিচে। তারপর দড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম।

চতুর্মুখের সংকেত লেখা কাগজ রেখে এলাম টেবিলে যাতে সকলে বুঝতে পারে—আসল মালিকের কাছেই ফিরে গেছে রত্নবাক্স।

টোঙ্গো দড়ি টেনে তুলে জানালা বন্ধ করল। তারপর নেমে এল নিচে।

রত্নবাক্স হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই লন্ডন ছাড়ব, সেই প্ল্যানই করে রেখেছিলাম। বুড়ো স্মিথের অরোরার খবরটাও সেই উদ্দেশ্যেই জোগাড় করা ছিল। ও তল্লাটের সবচেয়ে দ্রুতগামী লঞ্চ।

অনেক টাকা দিয়ে স্মিথের সঙ্গে রফা হল—জাহাজে তুলে দিয়ে আসবে।

গোলমাল আঁচ করতে পেরেছিল বুড়ো—কিন্তু কখনো কিছু জানতে চায়নি। আমার কাজের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। টাকা পেয়েই সে খুশি—হুকুম তামিল করে গেছে মুখ বুজে।

এরপরের ঘটনা তো স্যার আপনাদের জানা—আর কি বলব।

হোমস বলল, যা শোনালে তা সত্যিই অসাধারণ। তবে গোটা ব্যাপারটাই আমার জানা হয়ে গিয়েছিল। নতুন কেবল একটা বিষয় জানলাম—দড়িটা যে তুমি সঙ্গে এনেছিলে তা জানতাম না। আচ্ছা, টোঙ্গোর বিষমাখানো তীরের কৌটো তো খোয়া গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও ছুটন্ত লঞ্চ থেকে ও আমাদের তীর ছুঁড়ে মারল কি করে?

শান্ত কণ্ঠে স্মল বলল, ব্লোপাইপে একটা থেকে গিয়েছিল।

—তাই বল। এ ব্যাপারটা আমার মাথায় আসেনি।

মিঃ অ্যাথেলনি জোন্স যেন হঠাৎ করে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বলল, মিঃ হোমস, যথেষ্ট করেছেন আমাদের জন্য। কিন্তু যা শুনলাম এরপর আপনাদের দুজনের কাছে কয়েদীকে বাইরে রাখতে আর ভরসা পাচ্ছি না। সঙ্গে ইন্সপেক্টর দুজন নিচে গাড়িতে অপেক্ষা করছে। এবারে চলি।

আমাদের দুজনকে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে স্মল মিঃ জোন্স-এর আগে আগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এবারে আমার পালা। কথাটা কিভাবে বলব হোমসকে তাই ভাবছিলাম। শুনে কি মন্তব্য করবে সে সম্পর্কেও কৌতূহল ছিল।

যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ মনের মধ্যে কাজ করছিল। ফাঁকা ঘরে এখন আমরা দুজন। মুখোমুখি বসে ধূমপান করতে করতে হোমস বলল, মাথামোটা জোন্স অন্তত একটা কৃতিত্বের দাবিদার। পণ্ডিচেরী লজের চাকর লাল রাও সব খবর পাচার করত স্মলকে—এই একটা লোককে নিজে থেকে জালে টানতে পেরেছিল জোন্স। এ কৃতিত্ব সম্পূর্ণ তার একার।

বললাম, নরউড-রহস্যে প্রাপ্তি যা কিছু তাহলে জোন্স আর আমার ভাগ্যেই ঘটল। জোন্স পেল কৃত্তিত্ব, আমি পেতে চলেছি একটা বউ। মিস মর্স্টান আমাকে তার ভাবী স্বামী নির্বাচন করেছেন। কিন্তু ভায়া.তোমার প্রাপ্তিযোগ যে—

হোমস তাকের দিকে হাত বাড়িয়ে কোকেনের বোতলটা নিয়ে বলল—এই তো পরম প্রাপ্তি। তবে ডাক্তার, দেখছি, আমার আশঙ্কাটাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হল।

কথাটা শুনে দমে গেলাম। ক্ষুণ্নস্বরে বললাম, একথা কেন বলছ, তবে কি আমার পছন্দ তোমার মনঃপূত নয়?

—আরে না, তা নয়। মিস মর্স্টান খুবই মিষ্ট স্বভাবের মেয়ে—অমনটা সচরাচর দেখা যায় না। বুদ্ধিও যথেষ্ট ধারাল—আমাদের কাজে সহযোগী হবার মত ক্ষমতা রাখেন। দেখনি—বাবার কাগজপত্রের মধ্যে থেকে নক্সা উদ্ধার করে কিভাবে এতদিন রেখে দিয়েছিলেন। তোমার পছন্দ ভুল হয়নি। তবে কি জান, আবেগ ভালবাসা ব্যাপারগুলো যুক্তি বুদ্ধিকে ভোঁতা করে দেয়—ভয় আমার সেখানেই। আর এ কারণেই বিয়ে থাওয়ার ধারকাছ মাড়াব না এ জীবনে।

হেসে বললাম, বেশ, আমার অগ্নিপরীক্ষার ফলাফল তাহলে কি দাঁড়ায় দেখা যাক। কিন্তু ভায়া তোমাকে বড্ড ক্লান্ত লাগছে যে।

—তা তো লাগবেই। মাথা হাল্কা হয়ে গেল যে। সামনের কটা দিন এবারে স্রেফ নেতিয়ে থাকতে হবে।

—ওই অখণ্ড কুঁড়েমীই তোমার প্রাণশক্তির উৎস। যারা তোমাকে জানে না তারা ভাববে কুঁড়ের বাদশা। কমদিন তো কাছে থেকে তোমাকে দেখলাম না। তোমার অদ্ভুত তদন্তপদ্ধতিও আমার মত এভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পায়নি কেউ।

ভ্যালি অব ফিয়ার



বির্লস্টোন ট্রাজেডি

দিনের শুরুতে প্রাতঃরাশের টেবিলেই চমকে উঠতে হল হোমসের স্বগতুক্তি শুনে।

—লেখাটা তো পোর্লকের বলেই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এর আগেও বার দুয়েক এ লেখা আমি দেখেছি।

প্রাতঃরাশ তখনো মুখে তোলেনি। একটা খামের ভেতর থেকে বার করা কাগজ টেবিলের ওপর মেলে ধরে চিন্তাক্লিষ্ট মুখে নিবিষ্টভাবে কি পরীক্ষা করছে।

পরে খামের ওপরের লেখাটা আলোর সামনে ধরে দ্বিতীয়বার নিজের মনেই উচ্চারণ করল—নিশ্চয়ই গুরুতর কোন সংবাদ-সংকেত।

—পোর্লকটা কে? জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।

প্রশ্নটা শুনে মুখভাব স্বাভাবিক হল। বলল, পোর্লক? এ হল একটা ছদ্মনাম। ওই ছদ্ম-পরিচয়ের আড়ালে নিজেকে সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশিয়ে রেখেছে। নিজেই আগে একটা চিঠিতে সে জানিয়েছিল আমাকে। তবে এমন এক ভয়াবহ

ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে রয়েছে, যে তার প্রভাবে নিজেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লাভ করেছে, অন্ততঃ আমার কাছে তো বটেই। প্রফেসর মরিয়ার্টির কথা আমার মুখে নিশ্চয়ই তুমি শুনে থাকবে।

—সেই কুখ্যাত জালিয়াত-সর্দার তো?

—ঠিকই ধরেছ, ওর মত মগজওয়ালা চক্রান্তকারী আর শঠ খুব কমই জন্মায়। সমাজে সে সম্মান ও গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত—সূক্ষ্ম গণিতবিজ্ঞানে তার নৈপুণ্য অসাধারণ। 'গ্রহাণুপুঞ্জের গতিবিজ্ঞান' নামের বিখ্যাত বইটি তারই লেখা। কিন্তু এ হল তার ছদ্মপরিচয়। এই পরিচয়েই সে সাধারণ মানুষের সমস্ত সন্দেহের উর্ধে অবস্থান করছে। লোকটা যে দুনিয়ার সেরা শয়তান তা জানবার উপায় নেই।

নিচের মহলের যাবতীয় নৃশংস কুকর্ম তার অঙ্গুলি হেলনে ঘটছে—সুসংগঠিত বিশাল এক দুষ্টচক্রের সে সংগঠক ও পরিচালক। অথচ, এই যে বললাম, অসাধারণ প্রতিভা বলে নিজেকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রেখে চলেছে। তবে কি জান—সুযোগ একদিন আমারও এসে যাবে নির্ঘাৎ।

শেষের কথাগুলো হোমস্ উচ্চারণ করল শক্ত চোয়ালে দৃঢ়তার সঙ্গে।

—কিন্তু পোর্লক? আমি হোমসকে আবার পূর্বপ্রসঙ্গের সূত্র ধরিয়ে দিই।

—পোর্লক? সিংহের সঙ্গে শৃগালের মতই নিশ্চয় তার অবস্থান। তবে গূঢ় কোন উচ্চাশায় যে ভুগছে তা বুঝতে পেরেছি তার পাঠানো দুটি অগ্রিম খবর পেয়ে।

সংবাদ দুটি অপরাধ দমনে আমাকে খুব সাহায্য করেছিল। আমিও তাকে উৎসাহিত করবার জন্য দশ পাউণ্ডের নোট পাঠাতে বিলম্ব করিনি। এবারেও তার এই সংকেতলিখনে নিশ্চয় কোন গুপ্ত খবর-সংকেত রয়েছে।

হোমসের হাতের সাদা কাগজে চোখ ফেলে দেখলাম, কিন্তু মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না।

কিছু সংখ্যা আর হরফ এভাবে সাজানো ঃ

534 C_2 13 127 36 31 4 17 21 41
DOUGLAS 109 293 5 37 BIRLSTONE
26 BIRLSTONE 9 127 171

হোমস বলল, কিছু বোধগম্য না হবারই কথা। গুপ্তসংকেত ছাড়া গুপ্তলিখনের পাঠোদ্ধার অসম্ভব কাজ বটে। তবে গুপ্তলিখনের সাধারণ পদ্ধতি আমার জানা। আর সেটা জানা বলেই পোর্লক সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে গুপ্তখবর পাচারের চেষ্টা করেছে।

হোমস্ আমার নীরবতা লক্ষ্য করে বলতে থাকে, লক্ষ্য কর, আমি খবরটা

উদ্ধারের চেষ্টা করছি। এতে একটা বইয়ের কতগুলো শব্দের নির্দেশ রয়েছে। যদিও বইটার নাম এখানে নেই। আমি নিশ্চিত দু'নম্বর চিঠিটি শিগ্‌গিরই হাজির হবে। বই-এর নাম অথবা অন্য কোন সমাচার তাতে থাকা উচিত। একই খামে সবকিছু পাঠানোর ঝুঁকি অনেক, বেহাত হতে কতক্ষণ।

আশ্চর্য, হোমসের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দু'নম্বর চিঠিটি এল। ছোকরা চাকর বিলি দিয়ে গেল। খাম খুলে দেখা গেল একই হস্তাক্ষর। লেখায় চোখ বুলিয়ে হতাশ কণ্ঠে হোমস বলল, সর্বনাশ। কি লিখেছে পোর্লক দেখ—

চিঠির লেখা আমিও পড়লাম। লেখাটা এরকম—

প্রিয় মিঃ হোমস,

গুপ্ত সংকেতের মূল সূত্রটা পাঠাবার উদ্দেশ্য ছিল এই চিঠিতে—কিন্তু অকস্মাৎ উনি উপস্থিত হলেন। দেখতে পাননি যদিও আপনার নাম-লেখা খামটা—তবে তাঁর চোখে আমি সন্দেহের দৃষ্টি দেখেছি। আগে পাঠানো সংকেতটা আপনার কোনই কাজে লাগবে না। নষ্ট করে ফেলবেন।—ফ্রেন্ড পোর্লক

আমি জিজ্ঞেস করলাম—উনি মানে তো প্রফেসর মরিয়ার্টি?

—ঠিকই ধরেছ, এ চিঠির লেখাও কেমন কাঁপা কাঁপা দেখ। বেচারা পোর্লক কোন বিপদে না পড়লেই বাঁচি।

হোমস চিন্তিত মুখে খানিকক্ষণ আগুনের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। তারপর প্রথম চিঠির গুপ্ত সংকেত উদ্ধারে মনোনিবেশ করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে হুইটেকারের একটা পুরনো পাঁজি নিয়ে এল। বলল—এস, সংকেতটা উদ্ধার করা যাক।

এই বলে প্রাতঃরাশ সরিয়ে রেখে চিন্তার সঙ্গী পাইপটা তুলে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করল।

—ওয়াটসন, দেখ, বইটার উল্লেখ নেই, কিন্তু আছে কিছু পৃষ্ঠার সংখ্যা। অনুমানের উপর ভিত্তি করেই এগুচ্ছি—দেখা যাক কি দাঁড়ায়।

বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা 534, রীতিমত মোটাসোটা বোঝাই যাচ্ছে।

পরের চিহ্নটা C_2, এটা পরিচ্ছেদের সংকেত হলে বলতে হয়, প্রথম পরিচ্ছেদ অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ—সচরাচর অসম্ভব বলেই ধরে নেয়া ভাল। যদি কলম ধরতে হয়—তাহলে—বইটা কলমে সাজানো।

এবারে বইটা কি বই হতে পারে? অসাধারণ কোন বই হলে—সংকেত-সূত্র না পাঠিয়ে সরাসরি বইটাই পোর্লক পাঠিয়ে দিত।

যে বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা সে জানিয়েছে, সে ধরে নিয়েছে সেই বই আমার কাছেও থাকা সম্ভব। এবং নির্দিষ্ট পৃষ্ঠার লেখা হুবহু এক। এক্ষেত্রে দু'কলমে ছাপা,

প্রত্যেক ঘরে পাওয়া যায় কোন বইয়ের কথা ভাবতে হলে প্রথমেই মনে পড়বে বাইবেলের কথা। কিন্তু বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ রয়েছে বাজারে, তার কোন দুটোর পৃষ্ঠা সংখ্যা এক হবে এমনটা আশা করা যায় না। ঘরে ঘরে বইটা রয়েছে—এবং ৫৩৪ পৃষ্ঠার লেখা হুবহু মিলে যাবে এমন বই-এর কথাই পোর্লক বলতে চেয়েছে।

আমি বললাম, তাহলে কি পাঁজি?

উল্লসিত হয়ে হোমস্ বলল, যথার্থ বলেছ, এই দেখ হুইটেকারের পাঁজি নিয়ে বসেছি—

বলতে বলতে 534 নম্বর পাতা ওল্টাল হোমস্। তারপর বলল—ওয়াটসন, এই পৃষ্ঠার 13 নম্বর শব্দটা লিখে নাও—দেয়ার, এর পরে 127, শব্দটা হল ইজ, বোঝা যাচ্ছে শব্দটা অর্থবহ—বেশ, এর পরের 36 নম্বর শব্দটা, ডেঞ্জার—চমৎকার।

তুমি লিখে নাও ওয়াটসন—আমি সংখ্যা মিলিয়ে পর পর বলে যাচ্ছি—দেয়ার ইজ ডেঞ্জার মে কাম ভেরি সুন ওয়ান। তারপর—DOUGLAS—রিচ কান্ট্রি নাউ অ্যাট বির্লস্টোন হাউস—তারপর আবার বির্লস্টোন কনফিডেন্স ইজ প্রেসিং।

হোমস উজ্জ্বল মুখে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বিস্ময়াবিষ্টের মত লেখাটার ওপর চোখ বোলাচ্ছি।

—তাহলে কি দাঁড়াল ওয়াটসন, নিজেই বলতে শুরু করল হোমস্—আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছে পোর্লক। ডগলাস নামের লোকটি যেই হোক না কেন—নিশ্চয় মফস্বলে থাকে—ধনীব্যক্তি, তার বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র চলছে—পোর্লক এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই এভাবে বিভিন্ন পৃষ্ঠার বাছাই করা শব্দের সংকেত-বার্তাটা পাঠিয়েছে।

সাফল্যের আনন্দে হোমস যেন তাড়িয়ে নিজের হাসি নিজেই উপভোগ করতে লাগল।

এমনি সময়ে দরজা খুলে ঘরে উপস্থিত হলেন স্কটল্যান্ডইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড।

তরুণ বুদ্ধিমান অফিসার। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। দুবার অবশ্য হোমসের সাহায্য চেয়েছিলেন।

হোমসের সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে—সবরকম সমস্যায় খোলাখুলি ভাবে তা প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করেন না। বিশালদেহী স্কচম্যানকে হোমসও তাই সানন্দে প্রশ্রয় দিত।

ইন্সপেক্টরকে দেখে হোমস সহাস্যে বলে উঠল, কি ব্যাপার, আসুন,—নিশ্চয় আবার কিছু গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে—

—তা যা বলেছেন।

বলতে বলতে টেবিলের কাগজের তাড়ার দিকে দৃষ্টি পড়ল ইন্সপেক্টরের। পোর্লকের সংকেতলিপির হেঁয়ালি ওতেই টুকেছি আমি।

—একি—বির্লস্টোন ডগলাস—কি ব্যাপার মিঃ হোমস, এসব নাম আপনি পেলেন কোথায়?

—মিঃ ম্যাক—নামগুলো দেখে আপনি আঁতকে উঠলেন মনে হচ্ছে?

—আঁতকে ওঠার কারণ যে রয়েছে মিঃ হোমস। বির্লস্টোন ম্যানর হাউসেব মিঃ ডগলাস আজই সকালে বীভৎসভাবে খুন হয়েছেন। সেই খবর পেয়েই আমি তদন্তে যাচ্ছিলাম—

খবরটা এতই আকস্মিক যে আমি রীতিমত চমকে উঠলাম।

হোমসের প্রতিক্রিয়া কিছুই বোঝা গেল না। নিরুত্তাপ কণ্ঠে সে কেবল বলল—ব্যাপারটা কৌতূহলোদ্দীপক। মিঃ ম্যাক, বিশেষ একটা মহল থেকে উড়ো চিঠিতে বার্তা পেলাম, বিশেষ এক ব্যক্তির চরম সর্বনাশ ঘটতে চলেছে। আর এক ঘণ্টা অতিক্রান্ত হবার আগেই জানতে পারলাম, লোকটি মারা গেছে!

এরপর হোমস সংক্ষেপে ইন্সপেক্টরকে পোর্লকের পাঠানো গুপ্ত লিখন সম্পর্কে বলল।

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলেন, খুন হবার আগেই যে ভবিষ্যদ্‌বাণী পাঠিয়েছে, একে গ্রেপ্তার করলেই তো—

কথা অর্ধসমাপ্ত রেখে ইন্সপেক্টর চিঠিটি নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, ক্যাম্বারওয়েলের ডাকঘরে ফেলা হয়েছে দেখছি—মিঃ হোমস, আপনি পোর্লককে টাকা পাঠিয়েছিলেন কি ভাবে?

—ক্যাম্বারওয়েল পোস্ট অফিসে—নোটে—তবে মিঃ ম্যাক—আপনি যা বলতে চাইবেন এই মুহূর্তে সেই সম্পর্কে জানাচ্ছি—পোর্লক টাকা নিতে আসে কি না তা দেখার চেষ্টা আমি করিনি—তাহলে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হত। কারণ কথা দিয়েছিলাম, তাকে আমি খুঁজে বার করবার চেষ্টা করব না।

—প্রফেসর মরিয়ার্টি এই লোকটার পেছনে রয়েছে বলেছিলেন, কিন্তু মিঃ হোমস্, একথা আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, প্রফেসর সম্পর্কে আপনার মুখে বিরূপ সমালোচনা শুনে আমি তার সঙ্গে মিশে দেখেছি—আপনার চিন্তাটা নিছক একটা কল্পনা ছাড়া কিছু না। প্রফেসর গণ্যমান্য পণ্ডিত ব্যক্তি।

হোমস খুক খুক করে হেসে জিজ্ঞেস করল, তা এই মাহামান্য ব্যক্তিটির সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎকারটি কোথায় ঘটেছিল? প্রফেসরের পড়ার ঘরে নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন।

—প্রফেসরের মাথার ওপরে একটা ছবি টাঙানো রয়েছে, লক্ষ্য করেছিলেন

নিশ্চয়ই?

—নিশ্চয়ই, সহসা আমার চোখ কিছু এড়ায় না।—তৈলচিত্রটি—একজন মহিলা হাতে মাথা রেখে তাকিয়ে রয়েছে।

—তৈলচিত্রটি জ্যাঁ ব্যাপতিস্তি গ্রুজের আঁকা—নাম শুনেই বুঝতে পারছেন একজন বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর। ১৮৬৫ সালে গ্রুজের আঁকা একটা ছবি হাজার পাউণ্ডে বিক্রি হয়েছিল—খবরের কাগজের এই খবরটা নিশ্চয় আপনার নজরে পড়েছিল? এবারে একবার ভাবুন—প্রফেসরের মাইনে কত? বছরে বড়জোর সাতাশ পাউন্ড।

—তাহলে ওই ছবি উনি—

—হ্যাঁ—আমিও তাই বলছি, উনি কিনলেন কি করে? আমি কখনো প্রফেসরের মুখোমুখি হইনি বটে, তবে তার ঘরে দুবার ঢুকেছিলাম। তার বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার মত কাগজপত্র যদিও কিছু পাইনি, তবে তার ঘরে গ্রুজ প্যান্টিং আমাকে বলে দিয়েছিল—বেআইনী পথে তার রোজগারের প্রশস্ত ব্যবস্থা রয়েছে।

ইন্সপেক্টর হোমসের কথায় সিরিয়াস হয়ে উঠেছেন।

এরই মধ্যে হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন, তবু ধৈর্য ধরে বসে জিজ্ঞেস করলেন, মিঃ হোমস, আপনার কথা তাজ্জব হবার মতই বটে। কিন্তু প্রফেসরের অর্থাগমের উৎসটি কি হতে পারে? চুরি ডাকাতি—জাল নোট তৈরি—কোনটা বলে আপনি মনে করেন।

হোমসের চোখে কৌতুকের ঝিলিক, বলল, জোনাথন ওয়াইল্ডের নাম নিশ্চয় শুনেছেন?

ইন্সপেক্টর থমথমে মুখে বললেন, নামটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে। তবে এই মুহূর্তে ঠিক মনে করতে পারছি না।

—মিঃ ম্যাক, লোকটা একটা ক্রিমিন্যাল—বলতে পারেন গত শতাব্দীর অপরাধ জগতের সম্রাট পুরুষ।

ইন্সপেক্টর যেন খানিকটা ধৈর্যচ্যুত হলেন এবারে। বলে উঠলেন, মিঃ হোমস, কথা হচ্ছে প্রফেসর মরিয়ার্টির বিষয়ে—আপনি টেনে আনলেন—

হোমস হেসে বলল—মিঃ ম্যাক, যদি ধৈর্য রক্ষা করতে পারেন, তাহলে বলি—প্রতিদিন অন্ততঃ বারোঘণ্টা করে অপরাধ জগতের ইতিহাস আপনার পড়া উচিত।

জানবেন, ইতিহাসের সব কিছুই চাকার মত ঘুরে ফিরে আসে। এমনকি প্রফেসর মরিয়ার্টিও।

লন্ডন ক্রিমিন্যালদের গুপ্ত উৎস ছিল জোনাথন ওয়াইল্ড। সামান্য টাকা দস্তুরির বিনিময়ে সে নিজের বুদ্ধি আর সংগঠন ধার দিত।

মিঃ ম্যাক—চাকা ঘুরছে, আগের ঘটে যাওয়া ঘটনা আবার সবই ঘটবে। প্রফেসর মরিয়ার্টি সম্পর্কে দু'চারটে কথা জানালেই আপনি আমার কথার অর্থ ঠিক ধরতে পারবেন।

জুয়াড়ী, জালিয়াতি, ব্ল্যাকমেলার, গুণ্ডা—এই রকম সব অপরাধীর একটি গুপ্ত সংগঠনের সংগঠক পরিচালক মরিয়ার্টি নিজে।

তার ডান হাত হল, কর্নেল সিবাসটিয়ান মোরান, নামটা শুনে চমকে উঠবেন না—কর্নেল আইনের ধরাছোঁয়ার নাগালের একদম বাইরে।

পালের এই গোদাটিকে মরিয়ার্টি মাইনে দেয় বছরে ছ হাজার পাউন্ড। প্রধানমন্ত্রীও এত টাকা পায় না। উপযুক্ত মূল্যই সে পায়। অনুমান করতে এবারে নিশ্চয়ই আপনার কষ্ট হচ্ছে না—মরিয়ার্টির লাভ কি বিপুল, আর কি ব্যাপক তার কার্যকলাপ।

সম্প্রতি মরিয়ার্টির গেরস্থালির বিল মেটাবার কয়েকটা চেক পরীক্ষা করতে গিয়ে জেনেছি—কুড়িটা ব্যাঙ্কে তার অ্যাকাউন্ট রয়েছে। তার বিরাট সম্পত্তির বেশিটাই অবশ্য রয়েছে বিদেশের ব্যাঙ্কে।

মিঃ ম্যাক, যদি কখনো এক বা দু বছর সময় পান, তাহলে প্রফেসরকে নিয়ে গবেষণা করবেন।

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড ক্রমশই যেন তলিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ যেন ঝাঁকি দিয়ে জেগে উঠলেন। বললেন, মিঃ হোমস, মরিয়ার্টি এখন থাকুক। কথা বলছিলেন বির্লস্টোন হাউস রহস্যের সম্পর্কে। বিষয়টাতে আলোকপাত করলে উপস্থিত কাজের সুবিধা হয়।

হোমস বলল, মিঃ ম্যাক, অপরাধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যেতে পারে। আপনার কথার সূত্র হল, মিঃ ডগলাস নৃশংস ভাবে খুন হয়েছে। এই অপরাধটার উৎস আমরা যা সন্দেহ করছি, যদি তাই হয়, তাহলে খুনের দুটো উদ্দেশ্য আমরা পাচ্ছি। প্রফেসর মরিয়ার্টি তার দলের লোকদের কঠোর হাতে শাসনে রাখেন। দলের সামান্য নিয়মভঙ্গেরও শাস্তি মৃত্যু। ডগলাস ব্যক্তিটি কোনভাবে হয়তো দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকবে—আর তার ফলেই মরিয়ার্টির নির্দেশে একে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে।

উদ্দেশ্য সম্পর্কে দ্বিতীয় অনুমানটা হল, মরিয়ার্টি তার গতানুগতিক ব্যবসাসূত্রে অর্থাৎ ডাকাতি বা এই ধরনের কোন ঘটনায় বখরার গোলমাল ঘটায় মরিয়ার্টি নিজেই খুনটা ঘটিয়েছে।

মোটা টাকার বিনিময়েও সে খুনটা ঘটাতে পারে।

তবে যে কারণেই হোক, মিঃ ম্যাক—আমার মনে হচ্ছে ঘটনাস্থলে একবার আমার যাওয়া দরকার।

সঙ্গে সঙ্গে যেন ইন্সপেক্টরের খেয়াল হল, তিনি হাতঘড়ির দিকে চকিতে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন,—মিঃ হোমস, আপনার কথা এমনই আগ্রহ সৃষ্টি করে যে, অন্য সবকিছু ভুল হয়ে গেছে, চলুন এবারে রওয়ানা হওয়া যাক—যেতে যেতেই ঘটনাটা যতটা জানতে পেরেছি, আপনাকে বলব।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ইন্সপেক্টরের সঙ্গে আমরা রওয়ানা হলাম—ভিক্টোরিয়ায়, বির্লস্টোন হাউসের দিকে।

পথে যেতে যেতে মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের কাছে যা জানা গেল তা হল—গ্রামের পুলিশ অফিসার হোয়াইট ম্যাসোন মিঃ ম্যাক-এর ব্যক্তিগত বন্ধু। তার পাঠানো সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায়—নিহতের নাম জন ডগলাস।

গতরাত্রে বারোটা নাগাদ তিনি নৃশংসভাবে খুন হন। শটগানের গুলিতে মাথা গুঁড়িয়ে গেছে। খুনের কেস বলেই সন্দেহ করা হচ্ছে—তবে এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তবে, বেশ কিছু জটিল এবং গোলমেলে ব্যাপার নাকি এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

এই সরকারী রিপোর্ট ছাড়াও গ্রামের পুলিশ অফিসার হোয়াইট ম্যাসোন একটি ব্যক্তিগত হাতচিঠিতে সকালের যে কোন ট্রেনে তাকে বির্লস্টোন পৌঁছবার অনুরোধ জানিয়েছেন—অর্থাৎ অযথা বিলম্ব এড়াবার জন বিধিবদ্ধ ভাবে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সাহায্য না চেয়ে এই ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়েছেন।

গোটা বিবরণটা শুনে হোমস বলল, মিঃ ম্যাক, যতটুকু শুনলাম তাতে বুঝতে পারছি, যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ না করে এখুনি কোন সিদ্ধান্ত খাড়া করা ঠিক হবে না। দেখা যাক।

সাসেক্স প্রদেশের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত বির্লস্টোন গ্রামটা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি সেকেলে ধরনের গুটিকতক কুঁড়ে নিয়ে গড়ে ওঠা। তবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুবই মনোরম।

সম্প্রতি কিছু বিত্তবান ব্যক্তি চারপাশের জঙ্গলে কিছু ভিলা বানিয়েছেন।

নতুন কিছু দোকানপাটও বসেছে। ধীরে ধীরে আধুনিক হয়ে উঠছে যেন শতাব্দী প্রাচীন গ্রামটা।

সাসেক্স প্রদেশের একরকম কেন্দ্রস্থলেই বির্লস্টোনের অবস্থান। গ্রামের মাইল বারোর মধ্যে টার্নব্রিজ হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোকালয়।

এখান থেকে আধমাইল মত দূরে বিশাল বটগাছের বাগান—সেই বাগানে বির্লস্টোনের সুপ্রাচীন ম্যানর হাউস।

এই ভবনের কিছু অংশ তৈরি হয়েছিল ধর্মযুদ্ধের সময়ে। ধ্বংসপ্রাপ্ত একটা কেল্লাবাড়ির ধ্বংসস্তূপের ওপরেই তৈরি হয় ইটের গ্রাম্য ভবন—ম্যানর হাউস।

পূর্বে একজোড়া পরিখা বেষ্টন করে ছিল বাড়িটাকে। বর্তমান মালিক বাইরের পরিখাটা শুকিয়ে এনেছেন। ভেতরের পরিখাটা এখনো আছে। চওড়ায় চল্লিশ ফুট, তবে গভীরতা সামান্য কয়েক ফুট মাত্র।

পুরো বাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে এই পরিখা। একটা ছোট নদীর জলে পুষ্ট—পরিখার একদিক দিয়ে ঢোকে আর একদিকে বেরিয়ে যায়।

একতলার জানলাগুলোর ফুটখানেক নিচেই পরিখার জল। পরিখা অতিক্রম করে বাড়িতে যাতায়াতের জন্য রয়েছে একটা ড্র ব্রিজ সেতু। চাকিকলের সাহায্যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ড্র ব্রিজ তুলে নেওয়া হয় এবং ভোরে তা নামিয়ে দেওয়া হয়।

অনেক বছর এ বাড়িতে কেউ বাস করেনি।

বছর কয়েক আগে বাড়ির দখল নিয়ে বসবাস করছেন ডগলাস দম্পতি। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি—শক্ত সমর্থ চেহারা, পেশীবহুল বলিষ্ঠ সুপুরুষ। ব্যবহারে অমায়িক এবং আমুদে প্রকৃতির মানুষ। তবে আচার-আচরণে কেমন শিষ্টাচারহীন বলে মনে হয়।

অবশ্য সাধারণ গ্রামবাসীদের কাছে যথেষ্টই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন—সব ব্যাপারেই মোটা চাঁদা দিতেন, গানবাজনা ধূমধামের আড্ডায় যোগ দিতেন। সকলেরই অনুমান—প্রচুর টাকার মালিক ডগলাস। আর সেই টাকা নাকি এসেছে ক্যালিফোর্নিয়ার সোনার খনি থেকে।

তাঁদের কথাবার্তা থেকেই বোঝা যেত জীবনের বেশ কিছুটা সময় তাঁর কেটেছে আমেরিকায়। বিপদে আপদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন তিনি—তাই বছর পাঁচেকের মধ্যে গ্রামে তার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা বেড়ে গিয়েছিল।

ডগলাসের স্ত্রী জাতে ইংরাজ। তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায় বছর কুড়ি বয়সের ফারাক।

ভদ্রমহিলাও সংযত ও প্রিয় ব্যবহারের জন্য পরিচিতদের মধ্যে প্রীতিভাজন হয়ে উঠেছিলেন। খুবই সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী—বিপত্নীক ডগলাসের সঙ্গে লন্ডনেই আলাপ তাঁর।

বয়সের ব্যবধানের জন্য দু'জনের সম্পর্ক নিয়ে লোকের কৌতূহল থাকলেও কোন বিরূপ সমালোচনা ছিল না। ভদ্রমহিলা স্বামীর পূর্বজীবন সম্পর্কে কিছুই বলতেন না, অথবা হয়তো, তাঁকে তা জানানোই হয়নি।

বাড়ি ফিরতে কিছু দেরি হলেই ভয়ানক উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তায় ভুগতেন মিসেস ডগলাস।

সিসিল জেমস বার্কার নামে ডগলাসের এক বন্ধু মাঝে মাঝে আসতেন ম্যানর হাউসে। জাতে ইংরাজ।

ম্যানর হাউসে তার যাতায়াত, আপ্যায়ন ও অবস্থান দেখে লোকেরা বুঝতে

পারত, লন্ডনের শহরতলীতে আস্তানা নেবার আগে থেকেই ডগলাসের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব।

কথাবার্তা থেকে বোঝা যেত—দু'জনেই এক সময়ে আমেরিকায় ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করেছেন।

বার্কার রীতিমত বিত্তবান এবং চিরকুমার। বয়স বড়জোর পঁয়তাল্লিশ—লম্বা খাড়া টানটান চেহারা। মুখভাবে সব সময় একটা লড়াকু ধরনের চেহারা। মুখে পাইপ নিয়ে গাড়ি চড়ে বেড়াতেন। সেই সময় কখনো ডগলাস অথবা মিসেস ডগলাস সঙ্গে থাকতেন।

বাড়ির চাকরবাকররা লক্ষ্য করেছে—মাঝে মাঝে মিসেসের সঙ্গে বার্কারের বন্ধুত্বটা যেন বরদাস্ত করে উঠতে পারতেন না ডগলাস।

এই সুপ্রাচীন ভবনের অন্যান্য বাসিন্দাদের মধ্যে দু'জনের সম্পর্কে জানাই যথেষ্ট—একজন অ্যামিস,—ফিটফাট, মর্যদাসম্পন্ন, গেরস্থালির কাজে পোক্ত। অপর জন, মিসেস অ্যালেন—সংসারের সব ঝক্কি তিনিই সামাল দিতেন।

দুর্ঘটনাটা ঘটবার দিন ডগলাসের বন্ধু বার্কার উপস্থিত ছিলেন ম্যানর হাউসে।

রাত এগারটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে তিনিই দৌড়ে গিয়ে স্থানীয় থানায় সংবাদটা জানিয়েছিলেন।

সেই সময় ডিউটিতে ছিলেন সাসেক্স কন্সট্যাবুলারির সার্জেন্ট উইলসন।

বারোটা বাজার কিছু পরেই পুলিশ অকুস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল। সার্জেন্ট দেখলেন, ড্র বিজ নামানো, জানালাগুলো আলোকিত এবং বাড়িময় চাপা কোলাহল।

গাঁয়ের চিকিৎসক ডাক্তার উডও উপস্থিত রয়েছেন। সিসিল বার্কারই এগিয়ে এসে সার্জেন্টকে ও ডাক্তারকে নিয়ে সেই সাংঘাতিক ঘরের দুঃসহ দৃশ্যটি দেখিয়েছেন।

ঘরের ঠিক মাঝখানে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে একটি দেহ। গায়ে রাত্রিবাসের সোনালি ড্রেসিং গাউন।

জন ডগলাসের বুকের ওপর রয়েছে একটি শটগান—ট্রিগারের ফুটখানেক তফাতে নলটি করাত দিয়ে কেটে বাদ দেওয়া।

এই হাতিয়ারটাই ডগলাসের মাথাটা খণ্ডবিখণ্ড করে দিয়েছে। শটগানের ট্রিগার দুটো তার দিয়ে বাঁধা।

বীভৎস দৃশ্যটা দেখে আঁৎকে উঠেছিলেন উইলসন। বললেন, এ ঘরের কোন-কিছুতেই কেউ যেন হাত না দেয়। তারপর তিনি নোট বই বার করে সিসিল বার্কারকে প্রশ্ন করে জবাবগুলো লিখে নিলেন।

ঘটনাটা ঘটেছে কাঁটায় কাঁটায় রাত সাড়ে এগারোটায়। বার্কার বন্দুকের চাপা

শব্দ পেয়েই শোবার ঘর থেকে ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই ঘরে এসে ঢুকেছিলেন।

সেই সময় ডগলাসের ঘরের দরজা খোলাই ছিল। টেবিলের ওপর জ্বলছিল মোমবতি।

দৃশ্যটা ভাল করে দেখবার জন্য মিনিট কয়েকের মধ্যে মোম নিবিয়ে তিনি ঘরের ল্যাম্পটা জ্বালান। মিসেস ডগলাসও সেই সময় ওপর থেকে দৌড়ে নিচে নেমে আসছিলেন।

বার্কার সেখান থেকেই ডগলাসের মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে ফিরে যেতে বারবার অনুরোধ করেন। হাউসকীপার মিসেস অ্যালান এসে তাকে ধরে নিয়ে যায়। সেই সময় অ্যামিসও এসে উপস্থিত হয়।

বার্কার জানালেন, ড্র বিজ তোলাই ছিল, প্রতি রাত্রের মত। তিনিই সেই সময় সেটা নামিয়েছেন। ঘরের পর্দা সরিয়ে বার্কার পুলিশ অফিসারটিকে দেখালেন, সার্সি বসানো জানালা খোলা—আর গোবরাটের ওপর এক থ্যাবড়া রক্ত লেগে রয়েছে—দেখে মনে হয়, বুটজুতোর শুকতলার ছাপ!

গোবরাট মাড়িয়ে কেউ যে বাইরে গেছে—তার স্পষ্ট নিদর্শন, এবং এ থেকে বোঝা যায় ডগলাস আততায়ীর হাতেই নিহত হয়েছেন।

প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময় ড্র ব্রিজ তোলা হয়। গতকাল বাইরের অতিথি কয়েকজন ছিলেন মিসেস ডগলাসের ঘরে। তারা চলে যাবার পরে সাড়ে ছটা নাগাদ ড্র বিজ তোলা হয়েছিল।

বার্কারের ধারণা ড্র ব্রিজ তুলবার আগেই আততায়ী গোপনে বাড়িতে ঢুকে ডগলাসের ঘরে পর্দার আড়ালে আত্মগোপন করে ছিল।

প্রতিরাতেই শুতে যাবার আগে ডগলাস সারাবাড়ি টহল দিয়ে দেখতেন আলোগুলো ঠিক আছে কিনা।

টহল শেষ করে এঘরে ঢুকতেই আততায়ী ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মুখের ওপর গুলি করে।

মৃতদেহের পাশে একটি কার্ড পাওয়া গেল—ধ্যাবড়া ভাবে কালি দিয়ে কার্ডে লেখা—V. V. এবং তার তলায় একটা সংখ্যা—341।

পাশেই আগুনের চুল্লির ধারে কম্বলের ওপর একটা হাতুড়ি পাওয়া গেল—সেটা বেশ বড়সড়। পাশে কিছু পেরেকও ছিল।

বার্কার জানালেন, রাতে কিছু ছবি ডগলাস এদিক ওদিক করেছিলেন—সেই জন্যই এই হাতুড়ি আর পেরেক। জানালার তলাতেই ঘরের কোণে পর্দার আড়ালে মেঝেয় পরিষ্কার জুতোর ছাপ পাওয়া গেল।

মৃতদেহের ডানহাতটা ড্রেসিং গাউনের হাতা থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল—ডাঃ উড মৃতদেহ পরীক্ষা করতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন, বাহুর

মাঝামাঝি একটা অদ্ভুত বাদামী ছাপ—বৃত্তের মাঝে একটা ত্রিভুজ।

এটা উল্কি চিহ্ন নয়—কোন সময়ে দাগানো হয়েছে চিহ্নটা। গত দশ বছর ধরেই মিঃ বার্কার এই চিহ্নটা দেখছেন বন্ধুর বাহুতে।

এর পর আবিষ্কার হল, আরও আশ্চর্য একটি ব্যাপার। মৃতদেহের বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে দুটি আংটি থাকতো সব সময়। গুটিপাকানো সাপ-আংটির আব বিয়ের আংটি। দেখা গেল—খুনী সাপ-আংটিটি খুলে বিয়ের আংটি নিয়ে সাপ-আংটিটি আবার পরিয়ে দিয়ে গেছে।

বির্লস্টোনের সার্জেন্ট তদন্তের রিপোর্ট টুকতে টুকতে বুঝতে পারলেন, খুব গোলমেলে কেস। তিনি চীফ সাসেক্স ডিটেকটিভ হেয়াইট ম্যাসনকে জরুরী তলব পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে তিনি পাঁচটা চল্লিশের ট্রেনে খবর পাঠান স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে—মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে।

বির্লস্টোন স্টেশনে হোয়াইট ম্যাসনই আমাদের স্বাগত জানাল।

স্থানীয় সরাইখানা ওয়েস্টভিল আর্মস-এ আগে থেকেই আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে রেখেছিল। মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা সরাইখানায় নিজেদের ঘরে পৌঁছে গেলাম। সেখানে বারান্দায় বসে—হোয়াইট ম্যাসনের তদন্তের রিপোর্ট শোনা গেল।

ম্যাসন বললেন, রাত সাড়ে তিনটা থেকে চারটের মধ্যে সার্জেন্ট উইলসনের কাছ থেকে কেসটা বুঝে নিয়েছি আমি। সার্জেন্টের লেখার সঙ্গে সব মিলিয়ে দেখেছি—পরে দু' একটি পয়েন্ট আমার মনে এসেছে—

ম্যাকডোনাল্ড বললেন—যেমন, হাতুড়িটা পরীক্ষা করে তার গায়ে কোন দাগ পাইনি। আত্মরক্ষার জন্য ওটা ব্যবহার করা হয়নি।

বন্দুকটা পরীক্ষা করে বুঝলাম—আমেরিকান শটগান। করাত দিয়ে নল কেটে নেওয়ায় প্রস্তুতকারকের নাম পড়া গেল না—কেবল P E N এই তিনটি অক্ষর নজরে পড়ল।

হোমস গম্ভীরভাবে শুনছিল। এবারে মন্তব্য করল—পেনসিলভ্যানিয়া স্মল আর্ম কোম্পানি। নামকরা আমেরিকান সংস্থা।

হোয়াইট ম্যাসন বিস্মিত দৃষ্টিতে হোমসের পানে তাকিয়ে বলল, আমেরিকান শট গানই বটে—তাহলে, খোলা জানলা, গোবরাটে রক্ত, মেঝেয় বুটজুতোর ছাপ, অদ্ভুত কার্ড, বন্দুক—সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে—চোর-ছ্যাচড় বাইরে থেকে এসে সামনে যে ঘর পেয়েছিল সেখানেই আত্মগোপন করেছিল। অথবা ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ মেটাবার উদ্দেশ্যেই সে এসেছিল। বন্দুকের শব্দে মিঃ বার্কার যখন ঘরে ঢুকেছেন তখন সে জানালা টপকে বেরিয়ে খাড়ি পার হচ্ছে।

ম্যাকডোনাল্ড বললেন, এটা চোর-ছ্যাচড়ের কাজ নয়। আংটির ব্যাপার আর

কার্ডটাই তার প্রমাণ। খুনের কারণটা ব্যক্তিগত। এবং ঘটনাটা পূর্বপরিকল্পিত।

আর যে অস্ত্রের শব্দে লোকজন জড়ো হয়ে যাবার সম্ভাবনা, সেই অস্ত্র নিয়ে বাইরে থেকে খুন করতে এসে আবার পরিখা পার হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া—ব্যাপারটা চিন্তা করলেই বোঝা যায়, আততায়ী বাইরে থেকে আসেনি। আপনি বলুন মিঃ হোমস্।

হোমস্ চিন্তিত ভাবে বলল, যথার্থই বলেছেন, আচ্ছা মিঃ হোয়াইট ম্যাসন, পরিখার পাড় ভালভাবে পরীক্ষা করেছিলেন? পায়ের ছাপটাপ—

—আমি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছি মিঃ হোমস্। পরিখার পাড় পাথর দিয়ে বাঁধানো। কোথাও কিছু পাওয়া যায়নি।

—চলুন একবার বাড়ির দিকে যাওয়া যাক—যদি ছোটখাট কিছু নজরে পড়ে। হোয়াইট ম্যাসনের কণ্ঠস্বর যেন কিছুটা দ্বিধা জড়িত।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড সহ সকলে আমরা চুড়োহীন এলম গাছে ছাওয়া গ্রাম্যপথ পার হয়ে মান্ধাতা আমলের একটা বাড়ির সামনে উপস্থিত হলাম।

জ্যাকোবিয়ান হাউস—টানা লম্বা নিচু—বিবর্ণ। তিন তিনটি শতাব্দীর সাক্ষী এই ম্যানর হাউস।

হোমস্ জানালাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, বড্ড সংকীর্ণ জানালা —মানুষ গলে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

এগিয়ে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিখার পাড় আর ঘাসের বর্ডার পরীক্ষা করল হোমস। তারপর প্রশ্ন করল, পরিখার গভীরতা কিরকম?

—পাড়ের কাছে দু ফুট, মাঝামাঝি জায়গায় ফুট তিনেক।

—পরিখা পার হতে গিয়ে তাহলে ডুবে মরার সম্ভাবনা দেখছি না।

ড্র ব্রিজ হেঁটে পার হলাম আমরা। খাস চাকর বুড়ো অ্যামিস আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।

ডাক্তার মিঃ উড চলে গিয়েছিলেন। মৃতদেহের প্রহরায় ছিলেন মিঃ উইলসন। ম্যাকডোনাল্ডের প্রশ্নের উত্তরে তিনি তার চিন্তা-ভাবনার কথা জানালেন। তার সিদ্ধান্ত—ঘটনাটা আত্মহত্যা নয়। যদি হত্যা বলে ধরা হয়, তাহলেও কিছুটা গোলমাল থেকে যায়। হত্যাকারী শটগানের ট্রিগার টেপার এক মিনিটের মধ্যেই শব্দ পেয়ে মিঃ বার্কার এবং অ্যামিস থেকে সকলে এসে হাজির হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে আংটি খোলা, এবং পরানো, গোবরাটে রক্ত লাগানো—এত সব কাণ্ড করে জানলা দিয়ে খুনী পালিয়েছে এটা অসম্ভবই বলা চলে।

হোমস্ সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—আপনার যুক্তি অতি সুন্দর, আমি একমত আপনার সঙ্গে। বাড়ির কোন লোকের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না।

মিঃ উইলসন বললেন, তাহলে, এবারে যদি ধরে নেওয়া যায়, অপরাধী বাইরে থেকে এসেছে—সেটা হওয়াই বেশি সম্ভব। প্রথমতঃ মিঃ ডগলাস জীবনের বেশির ভাগ সময়টাই কাটিয়েছেন আমেরিকায়, শটগানটাও আমেরিকায় তৈরি।

ব্যক্তিগত কোন আক্রোশের বশে, আততায়ী চারটে থেকে ছটার মধ্যে ড্র বিজ দিয়ে বাড়িতে ঢুকে সামনের ঘরটাতেই আত্মগোপন করেছিল—রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত।

মিঃ ডগলাস ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আততায়ী গুলি করে—কথাবার্তা বিশেষ যে হয়নি তা মোমবাতি দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

এদিকে মিসেস ডগলাসের বক্তব্য, তার ঘর থেকে মিঃ ডগলাস বেরিয়ে আসার কয়েক মিনিটের মধ্যেই গুলির শব্দটা তিনি শুনতে পেয়েছেন।

—ঠিকই বলেছেন—মোমবাতিটা নতুন। আধ ইঞ্চির বেশি পোড়েনি। আক্রান্ত হবার আগেই টেবিলে রেখেছিলেন—নইলে ঠিকরে মাটিতে পড়ে যেত—মিঃ বার্কার ঘরে ঢুকে লম্ফ জ্বেলেছিলেন।

খুনি বাইরে থেকে এসেছে, কি বাড়ির ভিতরের লোক—এই সমস্যাই প্রধান হয়ে উঠল শেষ পর্যন্ত।

ম্যাকডোনাল্ড হোমসকে নিয়ে মৃতদেহের কাছে এলেন। হোমস্ হাঁটু গেড়ে বসে ডান হাতের চিহ্নটা দেখেই বলে উঠল—এতো উল্কী নয়—স্পষ্ট চামড়া পোড়া দাগ। একি গালে একটা প্লাস্টারও রয়েছে যে—নিশ্চয় দাড়ি কামাবার সময়—অত্যধিক অস্থিরতা বা মানসিক উত্তেজনায় ছিলেন।

তারপর হোমস্ V. V. 341 লেখা এবড়ো-খেবড়ো কার্ডটা নিয়ে ডেস্কের কাছে গেল। দুটো দোয়াত থেকে ব্লটিং পেপারে কালি ঢেলে পরীক্ষা করল।—না, এ কালি কালো—বোর্ডের লেখার কালি একটু বেগুনি—মিঃ ম্যাক—এ লেখা দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে?

—গুপ্ত সমিতি টমিতি গোছের কিছু একটা হবে মনে হচ্ছে—হাতের ব্যাজটাও সেই সমিতিরই চিহ্ন হওয়া সম্ভব।

—দেখা যাক—বলল হোমস্, কিন্তু দুনিয়ায় এত অস্ত্র থাকতে এমন একটা অস্ত্র কেন খুনী ব্যবহার করল? আর আংটিটাই বা ছেড়ে গেল কেন?

বলতে বলতে হোমস গোবরাটের কাছে গিয়ে আতস কাচ ফেলে পরীক্ষা করে বলল—স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে চ্যাপ্টা রকমের বেশ বড়সড় জুতোর ছাপ। ছাপগুলো যথেষ্ট স্পষ্ট।

বলতে বলতে হোমস্ সাইড টেবিলের তলা থেকে একটা ডাম্বেল বার করে এনে শুধালো—অ্যামিস, একটা কেন—

অ্যামিস কিছু বলতে পারল না।

এবারে হোমস রীতিমত সিরিয়াস হয়ে উঠল—তাহলে ঘরে ডাম্বেল একটা—

এমন সময় দরজা ঠেলে সিসিল বার্কারের সটান শরীরটা ঘরে ঢুকল। তিনি জানালেন, একটা সাইকেল পাওয়া গেছে ঝোপঝাড়ের আড়ালে।

চিরহরিৎ ঝোপঝাড়ের আড়ালে তখুনি গিয়ে সাইকেলটা আমরা পরীক্ষা করলাম। রাগ-হুইটওয়ার্থ সাইকেল। বহু ব্যবহারে জীর্ণ, কর্দমাক্ত—দেখলেই বোঝা যায় বহু পথ পরিক্রমার চিহ্ন। সাইকেলের পাশেই একটা ঝোলার মধ্যে তেলের টিন আর স্প্যানার যন্ত্র পাওয়া গেল।

হোমস্ গম্ভীর দৃষ্টিতে সাইকেলটা নিরীক্ষণ করল, কোন মন্তব্য করল না।

এবারে বাড়ির লোকজনের জেরার প্রসঙ্গ এল। হোমসের নির্দেশমত ইন্সপেক্টর প্রথমে খাস চাকর অ্যামিসকে জেরা শুরু করলেন। সকলে বসলাম ডাইনিং রুমে।

অ্যামিস যা বলল, তা এই রকম ঃ

মিঃ ডগলাস বছর পাঁচেক হল বির্লস্টোনে এসেছেন, তখন থেকেই সে কাজে বহাল হয়েছে। মিঃ ডগলাসকে তার প্রচুর অর্থের মালিক বলেই মনে হয়েছে। এবং এই টাকা তিনি রোজগার করেছেন আমেরিকায়।

মনিব হিসেবে তিনি ছিলেন দয়ালু, বিচক্ষণ, এবং নির্ভীক মানুষ। লন্ডনে তিনি কদাচিৎ যেতেন।

খুন হওয়ার আগের দিন টার্নব্রীজ ওয়েলস-এ বাজার করতে গিয়েছিলেন। সেই দিনই সে তাঁকে কিছুটা উত্তেজিত এবং অন্যমনস্ক দেখেছে।

ঘটনার রাতে, সকলের খাওয়া শেষ হলে সে ভাঁড়ার ঘরে বাসনকোসন গোছাচ্ছিল। ভাঁড়ার ঘর রান্না ঘর বাড়ির পেছন দিকে। এমনি সময়ে খুব জোরে দরজার ঘণ্টা বেজে ওঠে।

তবে বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পায়নি—অত দূর থেকে না শুনতে পাওয়াই স্বাভাবিক।

অনেকগুলো বন্ধ দরজা আর টানা লম্বা গলিপথ পার হয়ে পড়ার ঘরের দিকে আসতে হয়। ঘণ্টার শব্দ শুনে সে যখন বাইরে বেরিয়ে আসে, একই সময়ে হাউসকীপার মিসেস অ্যালান ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল।

দুজনে একসঙ্গে সিঁড়ির গোড়া পর্যন্ত পৌঁছতেই ওরা দেখতে পায় ওপর থেকে ত্রস্ত পায়ে মিসেস ডগলাস নেমে আসছেন।

সেই সময়ে ভাঁড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে মিঃ ডগলাসের মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে ওপরে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন মিঃ বার্কার।

সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে মিসেস বার্কার সব শুনলেন, কোনরকম চেঁচামেচি বা হাহাকার করলেন না। ওপরে চলে গেলেন। মিসেস অ্যালান তাঁর সঙ্গে শোবার

ঘরে যায়, এবং তার সঙ্গেই শোবার ঘরে থাকে।

এরপর অ্যামিস মিঃ বার্কারের সঙ্গে পড়ার ঘরে এসে মেঝেতে মিঃ ডগলাসের রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখে।

সেই সময় ঘরে মোমবাতি জ্বলছিল না, জ্বলছিল ল্যাম্প। এর পর দুজনেই ছুটে হলঘরে আসে—অ্যামিস চরকি কল ঘুরিয়ে ড্র বিজ নামিয়ে দেয়—মিঃ বার্কার দৌড়ে পুলিশকে খবর দিতে চলে যান।

অ্যামিসের পর হাউসকীপার মিসেস অ্যালান যা বলল, তা অ্যামিসের বিবরণেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। ঘণ্টার শব্দ যখন হয় তখন তিনি শুতে যাচ্ছিলেন। তার আগে দড়াম করে দরজা বন্ধ করবার মত শব্দ তার কানে আসে। তাও ঘণ্টা বাজবার প্রায় আধঘণ্টা আগে।

মিসেস অ্যালান মিঃ বার্কারের নির্দেশ মত ওপরে মিসেস ডগলাসের শোবার ঘরে চলে গিয়েছিল।

মিসেস ডগলাস যেন খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন—কাঁপছিলেন ঠক ঠক করে।

ড্রেসিং গাউন পরে দু'হাতে মুখ ঢেকে ছিলেন। রাতে আর নিচে নামবার চেষ্টা করেননি তিনি।

অন্যান্য চাকরবাকররা বাড়ির একদম পিছনের দিকে ঘুমোয়। সেজন্যই কোন আওয়াজ তারা শুনতে পায়নি।

এরপর সাক্ষী হিসেবে এলেন মিঃ সিসিল বার্কার। তিনি আগের রাতে পুলিশের কাছে যে জবানবন্দী দিয়েছিলেন, এখন তার বাড়তি একটি কথাও বললেন না।

তবে খুন সম্পর্কে তার নিজস্ব মতামত—হত্যাকারী জানলা গলেই চম্পট দিয়েছে। তবে ড্র বিজ তুলে ফেলবার পরে হত্যাকারী কিভাবে কোথায় গেল—যদি সাইকেলটা তারই হয় তবে পালাবার সময় সেটা ফেলে গেল কেন—এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর তিনি দিতে পারলেন না।

মিঃ বার্কার এই খুন সম্পর্কে একটা অনুমানের কথা জানালেন।

মিঃ ডগলাস অল্পবয়সে আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায় গিয়ে প্রচুর অর্থ রোজগার করেন। বার্কারের সঙ্গে তাঁর আলাপ ক্যালিফোর্নিয়ায়। সেখানে বেনিটো ক্যানিয়ন বলে একটা জায়গায় দুজনে অংশিদারীতে খনির কারবার আরম্ভ করেন। ভাল পয়সা রোজগার হচ্ছিল—এমন সময় হঠাৎ করে নিজের অংশ বেচে দিয়ে মিঃ ডগলাস ইংলণ্ডে চলে আসেন। তখন তিনি বিপত্নীক।

এক বছর পরে মিঃ বার্কার কারবারের টাকাপয়সা তুলে নিয়ে ইংলণ্ডে এসে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হন।

ডগলাস কথা প্রসঙ্গে প্রায় বলতেন, মৃত্যু তাকে পেছনে তাড়া করে চলেছে।

এই ভয়েই তিনি ক্যালিফোর্নিয়া ছেড়ে ইংলণ্ডের গ্রামে নিরিবিলিতে বাস করতে থাকেন। মৃত্যুভয়টা কেন—কি রকম বিপদ, সে সম্পর্কে কিছু না বললেও, বার্কারের অনুমান গুপ্তসমিতি জাতীয় একটা আতঙ্ক ছায়ার মত তাকে তাড়া করে ফিরছিল। ডগলাস এই সংস্থাটি সম্পর্কে কখনো কিছু খুলে বলেননি।

মিঃ ডগলাসের সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়ায় মোট পাঁচ বছর তিনি ছিলেন। সেই সময় তিনি বিপত্নীক ছিলেন। প্রথম স্ত্রীর ছবি তিনি দেখেছেন—অনিন্দ্য সুন্দরী। ভদ্রমহিলার ধমনীতে ছিল সুইডিশ রক্ত—বার্কারের সঙ্গে ডগলাসের আলাপ হওয়ার একবছর আগে মিসেস ডগলাস টাইফয়েডে মারা যান।

রাজনীতির সঙ্গে মিঃ ডগলাসের কোন সম্পর্ক ছিল না। মানুষ হিসেবেও ছিলেন সৎ এবং সরল।

ক্যালিফোর্নিয়ায় বেশির ভাগ সময় পাহাড়ে খনিতে কাজ করতে পছন্দ করতেন। লোকজনের মধ্যে পারতপক্ষে যেতেন না। এসব দেখেই তার মনের ভয়টা মিঃ বার্কার আঁচ করতে পেরেছিলেন।

তারপর যখন হঠাৎ একদিন ইউরোপে চলে আসেন তখন তার ধারণা হয় নিশ্চয় কোন গুপ্ত হুঁশিয়ারীর ঘটনা ঘটেছিল।

তার চলে যাওয়ার কয়েকদিন পরেই ষণ্ডা মার্কা পাঁচ-ছজন লোক এসে মিঃ ডগলাসের সন্ধান জানতে চেয়েছিল।

লোকগুলো আমেরিকানই ছিল—তবে খনির লোক নয়। এই ঘটনা প্রায় বছর সাতেক আগের ঘটনা।

মিঃ ডগলাস বিপদটা নিশ্চয় জানতেন। তাই সব সময় সঙ্গে রিভলভার রাখতেন। বিপদটা এমনই ছিল যে পুলিশের সাধ্য ছিল না তার কবল থেকে তাকে বাঁচায়, সে কারণেই তিনি কখনো পুলিশকে জানাননি।

পাঁচ বছর আগে মিঃ ডগলাস যখন বিয়ে করেন তার একমাস আগে থেকেই মিঃ বার্কার তার সঙ্গে আছেন।

বিয়ের আগে মিসেস ডগলাসের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। বিয়ের পর দেখা সাক্ষাৎ হত এবং বাড়িতেও যাতায়াত হত। ফলে বন্ধুর সঙ্গে এবং বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে তার নিজের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্ব মিঃ ডগলাস অনুমোদন করেছিলেন কিনা এই প্রশ্নের জবাবে—যথেষ্ট অসহিষ্ণুতা এবং অস্বস্তি প্রকাশ করলেন মিঃ বার্কার।

অবশ্য পরে স্বীকার করতে বাধ্য হন মিঃ ডগলাস আন্তরিক ভাবেই তাকে ভালবাসতেন, সৎ বন্ধুর পক্ষে যতটা ভালবাসা সম্ভব।

কিন্তু মাঝে মাঝে আবার ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়তেন না, তা নয়। এ নিয়ে দু একবার তিনি রাগ করে বন্ধুর বাড়ি থেকে চলে এসেছেন—কিন্তু পরে পীড়াপীড়ি

করে মিঃ ডগলাস আবার তাকে বাড়ি নিয়ে গেছেন।

ইনপেক্টরের জেরা মনোযোগ সহকারে নিঃশব্দে শুনছিল হোমস্। শেষ হবার মুখে জিজ্ঞেস করল, মিঃ বার্কার, আপনি যখন ঘরে ঢোকেন তখন টেবিলে একটাই মোমবাতি জ্বলছিল, তাই না?—সেই আলোতেই তো আপনি এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা দেখতে পেলেন এবং ঘণ্টা বাজিয়ে লোক জড় করলেন?

—হ্যাঁ—

—ঘণ্টার শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির লোকজন জড় হয়ে যায়?

—হ্যাঁ, মিনিট খানেকের মধ্যেই।

—এই সময় এসে তারা দেখল, মোমবাতি নিবে গেছে, জ্বলছে ল্যাম্প—ভালভাবে দেখবার জন্য আপনি ল্যাম্পটা জ্বালিয়েছিলেন। সময় এবং কাজটা বিবেচনা করলে একটু আশ্চর্য হতে হয় না কি মিঃ বার্কার?

মিঃ বার্কার যেন ক্ষণেকের জন্য থমকে গেলেন জবাব দিতে।

বার্কারের সাক্ষী ওখানেই শেষ হল।

পরের সাক্ষী মিসেস ডগলাস।

ডাইনিং রুমে এসেই তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বললেন।

দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। স্বামীর মৃত্যুর পর যে বিষাদময়ী মূর্তি দেখব বলে আশা করেছিলাম—হতাশ হলাম।

প্রচণ্ড মানসিক আঘাতের ছাপ কোথাও নেই। তবে মুখভাব বিষণ্ণ—চোখে অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টি নিয়ে আমাদের সকলের মুখের ওপর চোখ বোলালেন।

প্রথমেই বললেন, আততায়ীকে ধরবার জন্য যত টাকার প্রয়োজন তিনি খরচ করতে প্রস্তুত আছেন। গুলির শব্দ শোনার পর মিনিট খানেকের মধ্যে ড্রেসিং গাউন পরে নিচে নেমে আসছিলেন, বাধা দেন মিঃ বার্কার।

দুঃসংবাদটা জানিয়ে নিচে নামতে নিষেধ করেন। মিসেস অ্যালান তখন ওপরে নিয়ে যান তাঁকে।

তাঁদের বিবাহিত জীবন পাঁচ বৎসরের। বিয়ের সময়েই স্বামীকে প্রথম দেখেন ইংলন্ডে।

আমেরিকায় থাকবার সময়কার কোন ঘটনার কথাই সচরাচর বলতে চাইতেন না। তবে মাঝেমধ্যে কথায়বার্তায় প্রকাশ হয়ে পড়ত অপ্রত্যাশিত আগন্তুকের সম্পর্কে একটা ভয়। সে কারণে রাতে বাড়ি ফিরতে দেরী হলে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন।

প্রায়ই স্বামী বলতেন—ভ্যালি অব ফিয়ার—আতংক উপত্যকা থেকে এখনো বেড়িয়ে আসতে পারেননি। আতঙ্ক উপত্যকাটা কি তা অবশ্য ভেঙ্গে কখনো বলেননি।

বছর তিনেক আগে একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, সেই সময় জ্বরের ঘোরে একটা নাম বলতে শুনেছেন—ম্যাকগিন্টি—বডিমাস্টার ম্যাকগিন্টি। পরে জিজ্ঞেস করলেও এ সম্পর্কে কিছু বলেননি।

স্ত্রীকে নিয়ে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ ডগলাসের ছিল না। তারা দু'জনই দু'জনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন।

জবানবন্দীর পর ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। ম্যাকডোনাল্ড বললেন, কড়ে আঙুল থেকে বিয়ের আংটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, মিঃ বার্কারের মত নারীলোভন চেহারার মানুষ পরিবারের বন্ধু এবং মিঃ ডগলাসের ঈর্ষা—বিষয়গুলোকে কি তুচ্ছ মনে হচ্ছে আপনার মিঃ হোমস্।

হোমস্ এই কথার উত্তরে কেবল খাস চাকর অ্যামিসকে ডাকল।

অ্যামিস এলে জিজ্ঞেস করল, কালরাতে পড়ার ঘরে ঢুকে সিসিল বার্কারের পায়ে তুমি কি দেখেছিলে মনে আছে?

—শোবার ঘরের চটি—পরে আমি বুট এনেছিলাম, সেই পরে পুলিশে খবর দিতে গিয়েছিলেন।

এরপর হোমস্ তার সঙ্গে গিয়ে হল ঘরের চেয়ারের নিচে বার্কারের চটি পরীক্ষা করে ফিরে এল। কার্পেট স্লিপারের তলায় কাল রক্তের দাগ স্পষ্ট রয়েছে।

ঘরের যা অবস্থা ছিল তাতে চটিতে রক্ত লাগা স্বাভাবিক। মিলিয়ে দেখা গেল, গোবরাটের রক্তের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

চ্যাটালো ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে পরিতুষ্ট কণ্ঠে হোমস্ বলল, নিঃসন্দেহ হওয়া গেল—জানালায় নিজেই ছাপ রেখে গেছে বার্কার। সেকারণেই বুটের ছাপের চেয়েও অনেক চওড়া মনে হয়েছিল।

—ব্যাপারটা তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে মিঃ হোমস্।

পুলিশ অফিসাররা বিস্মিত বিহ্বলতায় এক সঙ্গে প্রশ্ন করে উঠলেন।

হোমস্ নিঃশব্দে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল যেন সাফল্যের হাসি হাসল।

তদন্তের ব্যাপারে তিন গোয়েন্দাই ব্যস্ত। সাক্ষী হয়ে বসে থাকা ছাড়া আমার কিছুই করবার ছিল না। তাই তিন গোয়েন্দাকে রেখে সরাইখানার আস্তানায় ফিরে চললাম। যাবার পথে সামনের গাছপালা ঝোপে-ছাওয়া বাগান দেখতে দেখতে যাচ্ছি।

চারপাশে ইউগাছের সারি। ঝোপের আড়ালেই রয়েছে একটা পাথরের বসবার জায়গা। বাড়ির দিক থেকে এদিকে আসবার সময় এটা চোখে পড়ে না।

নিবিড় প্রশান্তি ঘেরা বাগানে পায়চারি করতে করতে আমি এগুচ্ছি, সহসা গভীর পুরুষ কণ্ঠের কথা ও ঝর্ণার মত মেয়েলি হাসির আওয়াজ কানে এল।

সঙ্গে সঙ্গে ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিলাম। নজরে পড়ল মিসেস ডগলাস আর বার্কার বসে রয়েছে।

দুজনেরই মুখে হাসি ও কৌতুকের ছাপ। শোকের কোন চিহ্ন নেই। বার্কারের চোখে পড়ে গেলাম আমি।

অমনি তিনি যেন ফিসফিস করে কি বললেন, তারপরেই উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

—মাপ করবেন, ডাঃ ওয়াটসন, দয়া করে একবার মিসেস ডগলাসের সঙ্গে কথা বলুন।

মিঃ ডগলাসের খণ্ডবিখণ্ড রক্তমাখা মাথাটার কথা মনে পড়ল। স্বামীর এমন নৃশংস মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভদ্রমহিলা এই নিভৃত বাগানে বসে কলহাস্যে স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছেন! কঠোর মুখে আমি এগিয়ে গেলাম বার্কারের পেছন পেছন।

তাকিয়ে দেখলাম ভদ্রমহিলার চোখে মিনতিকরুণ দৃষ্টি।

বললেন, ডাঃ ওয়াটসন, অনুমতি করলে, একটা অনুরোধ আপনাকে করব।

বললাম, স্বচ্ছন্দে—

—মিঃ শার্লক হোমস্ সম্পর্কে এবং পুলিশের সঙ্গে তার সম্পর্কের খবর আপনি যতটা জানেন, ততটা আর কেউ জানে না। কোন একটা ব্যাপার যদি তাঁকে জানানো হয় তাহলে তা কি তিনি পুলিশকে জানাবেন?

বার্কার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, উনি কি স্বাধীন, না সরকারী গোয়েন্দাদের তাঁবেদার?

প্রায় পর মুহূর্তেই মিসেস ডগলাস বলে উঠলেন, ডাঃ ওয়াটসন, আমাদের একটু সাহায্য করুন, তাহলে খুবই উপকৃত হব।

ভদ্রমহিলার মিনতিপূর্ণ কথা শুনে বললাম, দেখুন হোমস্ সব সময়েই স্বাধীন ভাবে কাজ করেন, তার প্রভু তিনি নিজেই। তবে যে অফিসারদের সঙ্গে তিনি কাজে নামেন, অপরাধী ধরবার ব্যাপারে তাদের সাহায্য হতে পারে এমন কিছু তিনি গোপন করেন না। এর বেশি কিছু আমি বলতে পারি না, আপনারা বরং সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলুন।

বলে আমি চলে এলাম। ওরা ওখানেই বসে রইলো।

সরাইখানায় হোমসকে প্রসঙ্গটা জানাতে সে স্মিত হেসে শুধু বলল, খুন আর ষড়যন্ত্রের উৎকণ্ঠায় দুজনেই প্রচণ্ড অস্বস্তিতে রয়েছেন। ওয়াটসন, সামান্য সবুর কর—নিখোঁজ ডাম্বেলটার সন্ধান পাবার পর আশা করছি রহস্যের একটা কিনারা তোমাকে দেখাতে পারব।

—ডাম্বেল? আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্নটা না করে পারলাম না।

—হ্যাঁ—গোটা কেসটা নিরুদ্দেশ ডাম্বেলটার ওপরেই ঝুলে আছে। ব্যাপারটা ইন্সপেক্টর ম্যাক বা হোয়াইটের মাথায় এখনো আসেনি। একটু চিন্তা কর—একটা মাত্র ডাম্বেল নিয়ে কোন ব্যায়াম কি সম্ভব?—তাতে মেরুদণ্ড বেঁকে যায়—

এরপর আগুনের সামনে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বসে হোমস্ বলল—শোন তাহলে ভায়া, বার্কারের বিবরণ ডাহা মিথ্যা, মিসেস ডগলাসের বক্তব্যও তাই। সমস্যাটা হল সেখানেই—মিথ্যা কথা বলে তারা কি গোপন করতে চাইছেন? দুজনেই কেন এত ঝুঁকি নিচ্ছেন?

কাহিনীর এলোমেলো বুনট থেকেই আমার বুঝতে কষ্ট হয়নি তাদের বক্তব্য মিথ্যা। তাদের বর্ণিত কাহিনীটা সাজানো—ডগলাসের আঙুল থেকে আংটি সরিয়ে বিয়ের আংটি খুলে আগের আংটি পরাতে আততায়ীর সময় লেগেছে এক মিনিটের কম সময়—একি সম্ভবপর বলে মনে হচ্ছে তোমার?

তাছাড়াও একটি অদ্ভুত কার্ড রেখেছে মৃতদেহের পাশে। খুন করবার আগে নিশ্চয়ই এসব করা হয়নি।

তারপর মোমবাতিটা? মোমটা একটু আগেই জ্বালানোর মানে হল, কথাবার্তা বেশিক্ষণের জন্য হয়নি।

এইটুকু সময়ের মধ্যে কি হাতের আংটি খুলে দেওয়া সম্ভব? তাছাড়া বিয়ের আংটি খুলে দেবেন ডগলাস—এটাও কষ্টকল্পনা নয়?

ওয়াটসন, আমি নিশ্চিত, লম্ফ জ্বালিয়ে গুপ্তঘাতক মৃতব্যক্তির পাশে ছিল কিছুক্ষণ। আর মৃত্যুর কারণ বাহ্যতঃ শটগানের গুলি—তা যদি হয় তাহলে আমাদের যে সময় বলা হয়েছে, বন্দুক ছোঁড়া হয়েছে তার অনেক আগে। আমার এই সিদ্ধান্তে কোন ভুল নেই।

বন্দুকের শব্দটা শুনেছেন দুজনে—বার্কার আর মিসেস ডগলাস, দুজনের মধ্যে একটা পরিষ্কার চক্রান্তের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্য গোবরাটে রক্তমাখা জুতোর ছাপ রেখেছিলেন বার্কার নিজেই।

আমি বিস্মিত হয়ে হোমসের বিশ্লেষণ শুনছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে খুনের সময়টা কি হবে?

—রাতে সাড়ে দশটার আগে নিশ্চয়ই নয়। ওই সময় বাড়ির সকলেই ব্যস্ত ছিল। পৌনে এগারোটায় অ্যামিস ভাড়ার ঘরে শুতে যায়। তুমি চলে আসার পরে আমি পরীক্ষা করে দেখেছি—পড়ার ঘরে কোন শব্দ হলে ভাড়ার ঘরে তা পৌঁছয় না।

খুব কাছে থেকে শটগান ছুঁড়লে আওয়াজটা একটু চাপাই হয়। মিসেস অ্যালান দরজা বন্ধ করবার মত একটা শব্দ শুনেছিলাম, চেঁচামেচির আগে। তিনি বন্দুকের শব্দটাই শুনেছিলেন—এবং খুনের আসল সময়টা তাই। অর্থাৎ রাত পৌনে

এগারোটা।

এখন প্রশ্ন—পৌনে এগারোটায় বন্দুকের শব্দ শুনে দুজনে নেমে আসার পর থেকে সোয়া এগারোটায় ঘণ্টা বাজিয়ে চাকর-বাকরদের ডাকার সময়টা পর্যন্ত ওরা কি করছিলেন? সঙ্গে সঙ্গে কেন ঘণ্টা বাজাননি?

এটাই এখন ধাঁধা। এর সমাধান হলেই বলতে পারব রহস্যের তলা পর্যন্ত আমি দেখতে পেয়েছি।

স্বামীর মৃত্যুর পরেও হাস্যমুখী মিসেস ডগলাস এবং বার্কারকে যে অবস্থায় আমি দেখেছি, হোমসের বিশ্লেষণ সে ঘটনাকেই আলোকিত করছে। বললাম, এদের দুজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া নিশ্চয় আছে।

—মুখে বলেছেন, স্বামীকে ভালবাসতেন, কিন্তু পতিপ্রাণা স্ত্রীর ব্যবহার তার মধ্যে সম্পূর্ণতঃই ছিল অনুপস্থিত। এটা যে কোন তদন্তকারীর নিকট একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। এ থেকেই পূর্ব-পরিকল্পিত একটা চক্রান্তের আভাস পাওয়া যায়।

আমার ধারণা—খুনের আসল রহস্য জেনেও গোপন করছে দুজনে। এবং সেই মতই, আমার ধারণা, ফিয়ার অব্ ভ্যালী,—বডিমাস্টার ইত্যাদি গল্পটা তৈরি করেছেন।

আর বাইরের লোকের প্রতি সন্দেহটা ঘোরাবার জন্য গোবরাটের রক্ত, সাইকেল প্রভৃতির আয়োজন। মৃতদেহের পাশের কার্ডটাও সেই উদ্দেশ্যে রাখা।

আর এত অস্ত্র থাকতে করাত দিয়ে কাটা শটগান—কেন? তা-ও আমেরিকায় তৈরি। আর ওয়াটসন, যদি ধরেও নিই বার্কার ও মিসেস ডগলাসের মধ্যে একটা অবৈধ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল—তা টেকে না—কোন নারী স্বামী হত্যার পর, প্রেমিকের সঙ্গে মিলে বিয়ের আংটি খুলে নিয়ে প্রকাশ্যে জানান দেবার মত বোকামি করে না।

—হ্যাঁ, অমোঘ সিদ্ধান্ত।

—ওয়াটসন, এবার আর-একটা রহস্যে বুদ্ধি খেলাও। মনে কর, পূর্বজীবনের কোন গুপ্ত রহস্যের জন্য বা বংশগত কোন প্রতিহিংসার বলি হতে হয়েছে মিঃ ডগলাসকে। এবং ধরে নিলাম খুনী এসেছে বাইরে থেকে—ডগলাসের বিয়ের সময় থেকে বিরোধের সূত্রপাত যদি মনে কর তাহলে, খুনী হত্যাকাণ্ডের পর আক্রোশ বশতঃ বিয়ের আংটিটা খুলে নিয়েছে।

কিন্তু সরে পড়বার আগেই মিসেস ডগলাস আর বার্কার ঘরে ঢুকেছেন। খুনী তখন তাদের এমন কোন ভয় দেখিয়েছে যার জন্য তারা তাকে ধরিয়ে না দিয়ে ড্র ব্রিজ তুলে দিয়ে পালাতে সাহায্য করেছে।

আমি পরীক্ষা করে দেখেছি—ড্র ব্রিজ নিঃশব্দেই ওঠানো নামানো যায়। নির্বিঘ্নে

হত্যাকারী পালালো—সাইকেলটা ফেলে রেখেই। এক্ষেত্রে তাহলে পরবর্তী অবস্থা কি দাঁড়াবে?

দুজনেই একসময় বুঝতে পারলেন—হত্যার দায়টা তাদের কাঁধেই চাপবে। এবং সেই সন্দেহের হাত থেকে নিজেদের দূরে রাখবার উদ্দেশ্যেই দুজনে গোলমেলে পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন।

অপরাধীর পলায়নের প্রমাণ হিসাবে বার্কারের রক্তমাখা চটির ছাপ গোবরাটে রাখা হল। এই কাজগুলোই হয়েছে, বন্দুকের শব্দ হবার পর—আধঘণ্টার মধ্যে।

কেবল দুজনেই তো বন্দুকের শব্দ শুনেছিলেন—খেয়াল রেখো। তারপর ঘণ্টা বাজানো—যথারীতি চিৎকার চেঁচামেচি সব হয়েছে।

—কিন্তু যা বলছ, তা প্রমাণ করবে কি ভাবে?

—সেই প্রস্তুতিই আমি নিতে চলেছি। বার্কারের ওপর খুব সন্তুষ্ট নয় অ্যামিস। বুঝতে পেরে তার সঙ্গেই ব্যবস্থাটা করেছি। তার ব্যবস্থায় খুনের ঘরে গিয়ে দেখব প্রমাণ কি সংগ্রহ করতে পারি। যাবার আগে তোমার বড় ছাতাটা নিয়ে যাব সঙ্গে। সহকর্মীরা সাইকেলের মালিকের সন্ধান করতে টার্নব্রিজ ওয়েলসে গেছে। ওরা ফিরে এলেই আমি রওনা হব।

প্রথম রাত্রেই সফল অভিযান শেষ করে ফিরে এলেন ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড আর হোয়াইট ম্যাসন।

তাদের কাছ থেকে জানা গেল—ম্যাসন বলেছিল, গত পরশুদিন টার্নব্রিজ ওয়েলস-এ মিঃ ডগলাস বাজার করতে গিয়ে অস্থির অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। সাইকেলে করে যদি কেউ এসেই থাকে তাহলে সেখানেই তাকে দেখতে পাবার কথা। এই সিদ্ধান্তে স্থির থেকে সাইকেলটা সঙ্গে করে তারা সব কটা বড় হোটেলে গেলেন।

ঈগল কমার্শিয়ালের ম্যানেজার সাইকেলটা দেখেই চিনতে পারলেন। তার কাছে জানা গেল, দুদিন আগে হার্গেভ নামে একটা লোক হোটেলে উঠেছিল; সাইকেলটা তার।

সাইকেলটা আর একটা চামড়ার ব্যাগ ছাড়া লোকটার সঙ্গে আর কিছু ছিল না। খাতায় লিখেছিল—লন্ডন থেকে এসেছে—কিন্তু ঠিকানা লেখেনি। চামড়ার ব্যাগটাও লন্ডনে তৈরি—ভিতরের জিনিসপত্রও ব্রিটিশ কিন্তু লোকটা ছিল খোদ আমেরিকান।

লোকটার ঘরে কোন মালপত্র নেই। এ অঞ্চলের একটা সাইকেল-ম্যাপ মাত্র টেবিলের ওপরে পাওয়া গেছে। গতকাল সকালে ব্রেকফাস্ট করে সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছে, তার সন্ধান করবার সময় পর্যন্ত সে ঘরে আসেনি।

লোকটার সম্পর্কে ম্যানেজার জানালো—প্রায় পাঁচফুট ন ইঞ্চির মত লম্বা মাথায়—বয়স, বছর পঞ্চাশ, মাথার চুল সামান্য কাঁচাপাকা। টিকলো নাক, মুখখানা—রীতিমত ভয়ংকর আর বীভৎস। হোটেল পরিচারিকাও সেই কথা জানায়।

হোমস্ বলল, মুখভাবটুকু বাদ দিলে মিঃ ডগলাসেরও একই রকম চেহারা। আর কিছু পেলেন?

ইন্সপেক্টর বললেন, লোকটার গায়ে ছিল ধূসর রঙের ভারী স্যুট, আঁটসাট ডবল ব্রেস্টেড জ্যাকেট, নাবিকদের মত খাটো হলদে রঙের ওভার কোট আর একটা নরম ক্যাপ।

—শটগানের কোন হদিস?

—ওটাতো লম্বায় দু'ফুটেরও কম। চামড়ার থলিতে সেটা ওভার কোটের তলায় রেখেই হয়ত ঘুরেছে।

—আপনি কেসটার সঙ্গে এসবের একটা সম্পর্কও দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন মনে হচ্ছে?

ম্যাকডোনাল্ড বললেন, মিঃ হোমস্, লোকটার চেহারার বিবরণ দিয়ে চারদিকেই খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। ধরা না পড়ে উপায় নেই, তখন গোটা ব্যাপারটার বিচার ঠিক ভাবে করা যাবে।

তবে আগে আপনাকে এটুকু শোনাতে আমি পারি—দু'দিন আগে হার্গেভ নামে একজন আমেরিকান একটা সাইকেল আর একটা চামড়ার ব্যাগ নিয়ে টানব্রিজ ওয়েলসে এসেছিল।

মাথায় নিয়ে এসেছিল খুনের অভিসন্ধি। লক্ষ্যস্থল তার স্থির করাই ছিল। যেভাবেই হোক লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে ম্যানর হাউসের বাগানে ঢুকে লরেলের ঝোপে সাইকেলটা লুকিয়ে রেখে ওৎ পেতে ছিল।

তার উদ্দেশ্য ছিল, মিঃ ডগলাস বেরিয়ে এলে গুলি করবে। শটগানের শব্দ অতটা কেউ গ্রামের জনবিরল পথে খেয়াল করবে না। কিন্তু তার হিসাব মত ডগলাসের সাক্ষাৎ সে পেল না।

তখন,গোধূলির আলো-আঁধারিতে গা ঢেকে বাড়ির দিকে এগুলো। সেই সময় ড্র ব্রিজ নামানোই ছিল। সেই সুযোগ সে কাজে লাগাল, সাইকেল ঝোপের ভেতরেই পড়ে রইল—সে বাড়ির ভেতরে ঢুকে সামনেই যে ঘর পেল, সেই ঘরে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রইল। একসময় তার চোখের সামনেই দেখতে পেল, ড্রব্রিজ তুলে নেওয়া হল, পালাতে হলে যে পরিখা টপকে যেতে হবে তা সে বুঝতে পারল।

রাত এগারটা পর্যন্ত একই ভাবে আত্মগোপন করে রইল। পরে যেই মিঃ

ডগলাস রোজকার অভ্যাস মত বাড়ি টহল দিয়ে ঘরে ঢুকেছেন সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে সে পালিয়ে গেল।

সে জানত সাইকেল নিয়ে পরে হৈচৈ হবে—হোটেলের লোক চিনে ফেলবে, এবং তার বিরুদ্ধে সাইকেলটাকে কাজে লাগানো হবে, তাই অন্য কোন ভাবে লন্ডনে পালিয়ে গেল। অথবা আগে থেকে ব্যবস্থা করে রাখা কোন জায়গায় আত্মগোপন করেছে।

হোমস্ ঠোঁটের কোণে হেসে বলল—চমৎকার বলেছেন। তবে আমার উপসংহারটা একটু ভিন্ন রকম।

খুনটা যে সময়ে হয়েছে বলে জানানো হয়েছে, আসলে ঘটেছে তার আধঘণ্টা আগে। মিঃ বার্কার ও মিসেস ডগলাসের মধ্যে একটা গোপন ষড়যন্ত্র রয়েছে—দু'জনেই খুনীকে পালাতে সাহায্য করেছেন। অথবা, পালাবার আগেই দু'জনে ঘরে উপস্থিত হয়েছিলেন।

তার পর যে কোন কারণেই হোক ব্রিজ নামিয়ে খুনিকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। মিঃ ম্যাক—আমার তদন্তের প্রাথমিক ফলাফলের অর্ধাংশ হল এই।

ইন্সপেক্টর বিমূঢ় ভাবে বললেন, এ যদি হয় তাহলে তো এক নিদারুণ হেঁয়ালিতে পড়তে হয় আমাদের।

হোমস্ বলল, হ্যাঁ এই হেঁয়ালিটার সমাধান কতটা করতে পারা যায় তাই এবারে একটু তদন্ত করে দেখবার ইচ্ছা।

—আমরা কি তাহলে কোন ভাবে—

—না, ধন্যবাদ মিঃ ম্যাক, তার দরকার হবে না। রাতের অন্ধকার আর ডাঃ ওয়াটসনের বড় ছাতাটাই আমার কাজের পক্ষে যথেষ্ট। আর আছে—অ্যামিস।

আমার সামনে এখন একটিই প্রশ্ন সব ধাঁধার কেন্দ্র-বিন্দু হয়ে আছে, সেটা হল, একজন ব্যায়ামবিদ, একটিমাত্র ডাম্বেল দিয়ে কেন দেহ গঠন করতে চায়?

বেশ রাত করেই হোমস্ ফিরল একক অভিযান শেষ করে। সে-রাতে তার কাছ থেকে কিছুই জানা গেল না।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে স্থানীয় পুলিশ সার্জেন্টের ছোট ঘরে গিয়ে দেখি—টেবিলের ওপর টেলিগ্রামের স্তূপ।

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড আর মিঃ হোয়াইট ম্যাসন সতর্ক ভাবে সেগুলো বাছাই করে সাজিয়ে রাখছেন।

জানা গেল, লিসেস্টার, নটিংহ্যাম, সাদামটন, ডার্বি, ইস্টহ্যাম, রিচমণ্ড প্রভৃতি সহ আরো প্রায় চোদ্দটা জায়গা থেকে ধোঁকাবাজ সাইক্লিস্টের খবর এসেছে। এর মধ্যে তিন জায়গায়—তাকে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করা হয়েছে।

ম্যাকডোনাল্ড নিজেই মন্তব্য করলেন, শেষে গোটা দেশটাই দেখছি হলদে সাইক্লিস্টে ছেয়ে গেছে।

—কি সর্বনাশ! সহানুভূতির সুরে বলল হোমস, দেখুন কেসটার তদন্ত আপনারাই. করবেন—আমি কেবল আড়ালে থাকব। সেকারণে নিষ্ফল কাজে আপনাদের উৎসাহ দেখে একটা কথাই বলতে ইচ্ছা করছে—যা নিয়ে মেতে আছেন তা পরিত্যাগ করুন।

—তার মানে, আপনি কি বলতে চাইছেন সাইক্লিস্টকে পেলেও গ্রেপ্তার করব না? কিন্তু আমার তো মনে হয় এদের মধ্যেই কোথাও না কোথাও সে লুকিয়ে আছে।

—তা থাকতে পারে, তাকে পেলে গ্রেপ্তারও অবশ্যই করা হবে। তবে দৃষ্টিটাকে ইস্টহ্যাম বা লিভারপুল থেকে সরিয়ে এনে আরো সোজা পথে ফেলুন।

ইন্সপেক্টর এবারে যেন বিরক্ত হয়েই বলে উঠলেন, আপনি কি বলতে চাইছেন পরিষ্কার করে বলুন মিঃ হোমস্।

হোমস্ বলল, মিঃ ম্যাক, আপনি তো আমার কাজের পদ্ধতি জানেন। অর্ধেক প্রমাণিত অনুমান আমি কখনো প্রকাশ করি না। পরিপূর্ণ সত্যে পৌঁছবার পর অবশ্যই তা প্রকাশ করব।

তবে এটুকু বলতে পারি—আর খুব অল্প সময়ই আমার সিদ্ধান্ত চেপে রাখব। তারপর সব দায়িত্বই আপনাদের।

—মিঃ হোমস্, কালরাত্রে টার্নব্রিজ ওয়েলস থেকে ফিরে তো মনে হয়েছিল—আমাদের ফলাফলের সঙ্গে আপনি একরকম একমতই ছিলেন। এক রাতের মধ্যে এমন কি ঘটে গেল যে—এখন আমাদের কাজকে নিষ্ফল চেষ্টা বলে মনে করছেন?

হোমস্ হেসে বলল, তাহলে খুলেই বলি, কাল রাতে কয়েক ঘণ্টা ম্যানর হাউসে কাটিয়ে এসেছি।

তাছাড়া, একটা কথা আপনাদের জানাতে পারিনি, তা হল, স্থানীয় তামাকওয়ালার কাছ থেকে এক পেনি দিয়ে একটা ছোট্ট বই কিনেছিলাম। সেই বইটা আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে।

অধৈর্য হবেন না মিঃ ম্যাক—এই প্রাচীন বাড়ির একটা কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ রয়েছে সেই বইতে। প্রথম জেমসের রাজত্বকালে পুরনো একটি বাড়ির জমির ওপর এই বির্লস্টোন ম্যানর হাউস নির্মিত। ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে একজন পার্লামেন্টারী কর্নেল এ বাড়ি দখল করে ছিলেন। গৃহযুদ্ধের সময় চার্লস এখানে বেশ কয়েকদিন লুকিয়ে ছিলেন।

—মিঃ হোমস, আপনার এসব কথার অবতারণার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝতে পারছি না।

—মিঃ ম্যাক—দৃষ্টি প্রসারিত করুন। এবারে অতীত ইতিহাস বাদ দিয়ে বর্তমান সম্পর্কে তাহলে কিছু বলি।

গতরাতে ম্যানর হাউসে গিয়েছিলাম, তবে মিসেস ডগলাস বা বার্কার কারুর সঙ্গেই সাক্ষাৎ করিনি। তারা উভয়েই শুনলাম বেশ খোশমেজাজেই রয়েছেন। শোক তাপের কোন ব্যাপার নেই।

পূর্বব্যবস্থা মত বিশ্বস্ত অ্যামিস আমাকে কিছুক্ষণের জন্য পড়ার ঘরে বসতে দিয়েছিল। আমি নিখোঁজ ডাম্বেলটা খুঁজছিলাম। গোড়া থেকেই সেটা আমার অনুমানের হিসেবে বিরাট জায়গা জুড়ে ছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য উদ্ধার করেছি সেটা।

—কোথায় পেলেন সেটা?

—সেই প্রসঙ্গেই তো আসতে চাইছি। তবে তার জন্য আর একটু সময় দরকার। এই অবসরে আপনারা বিকেল পর্যন্ত বিশ্রাম নিন। বেলা ঠিক চারটের সময়ে এখানে আবার মিলিত হব সকলে।

গোয়েন্দা সহকারীরা হোমসের কথায় কেমন হতবাক হয়ে থাকে। একটু পরেই ইন্সপেক্টর বলেন, এটা সত্য কথা যে মিঃ হোমস্, আপনার সব হেঁয়ালির পেছনেই একটা গূঢ় রহস্য থাকে, তাই অবহেলা করতে পারি না। তবে যা বলবার এবারে আমাদের বোধগম্য করে বলুন।

হোমস্ বলল, কথাটা সরল করেই বলি তাহলে। যাবার আগে একটা চিঠি দিয়ে যাচ্ছি, আপনি মিঃ বার্কারকে পাঠিয়ে দিন। আমি বলে যাচ্ছি আপনি লিখুন।

ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড লিখতে শুরু করলেন।

প্রিয় মহাশয়,

তদন্তের প্রয়োজনেই পরিখার জল অপসারণ করা কর্তব্য বলে মনে করছি। আমরা সেই মত ব্যবস্থাও নিয়েছি। লোকজন কাল সকাল থেকেই কাজে লাগবে। পরিখার জলের ধারা অন্য খাতে বইয়ে দেওয়া হবে। তাই আগে থেকেই আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হল।

হোমস্ বলল, এবারে চিঠির তলায় সই করে ঠিক চারটের সময় কারুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। আর এই ঘরে সকাল চারটের সময়েই উপস্থিত থাকবেন।

চারটের পর শুরু হল আমাদের অপরাহ্ণ বেলার অভিযান। হোমসের যেন সবই অদ্ভুত। গোয়েন্দা দুজন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন—তাদের চোখে মুখে অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কিন্তু হোমসের নির্দেশ অবহেলাও করতে পারছে না।

অভিযানটা চলবে কতক্ষণ তা অজানা, তাই সকলেই গরম কোট গায়ে চাপিয়ে এসেছে।

ম্যানর হাউসের পার্কের বাইরের সীমানা বরাবর হেঁটে বেড়ার গায়ে রেলিং-এ একটা ফাঁক পাওয়া গেল। সেই ফাঁক গলে আমরা ভেতরে ঢুকলাম।

অন্ধকারের জাল তখন চারদিকে বিস্তৃত হয়েছে।

আরও খানিকটা এগিয়ে লরেল ঝোপের আড়ালে হোমস্ বসে পড়ল। আমরা তিনজনও গুঁড়ি মেরে তার পেছনে বসলাম। শিকারের প্রতীক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকা যাকে বলে—এ যেন ঠিক তাই।

আমাদের সামনেই সুপ্রাচীন ম্যানর হাউস। অন্ধকার ক্রমশ তাকে আচ্ছন্ন করছে। পরিখা থেকে ঠাণ্ডা বাষ্প উঠে হাঁড়ে কাঁপন ধরাচ্ছে।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, প্রবেশপথের ওপরে জ্বলছে একটি মাত্র ল্যাম্প। আর সেই ভয়াবহ পড়ার ঘরে জ্বলছে একটা নিষ্কম্প গোলাকার আলো।

গুঁড়ি মেরে বসে থেকে কেটে গেল অনেকক্ষণ।

আমাদের অবস্থান—ড্র ব্রিজ আর দরজার উল্টো দিকে লরেল ঝোপে। একশ গজের মধ্যেই জানালাটা।

সহসা হোমস্ চাপাস্বরে বলে উঠল—এই তো—এজন্যেই তো প্রতীক্ষায় রয়েছি—

দেখলাম কব্জার ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ তুলে জানলার পাল্লা খুলে গেল। অন্ধকারের দিকে মুখ বাড়িয়ে একজন পুরুষ মানুষ কি দেখল। বোধহয় কেউ লক্ষ্য করছে কিনা তাই অনুসন্ধান করল।

কাঁধ আর মাথা ঝুঁকে পড়ল সামনে—তারপরেই জল আলোড়নের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ কানে এল। মনে হল মানুষটি পরিখার জলে কিছু ধরে আছে।

তারপরই জেলেদের জাল তুলবার কায়দায় হ্যাঁচকাটানে গোল মত একটা বস্তু তুলে আনল ওপরে—গরাদহীন খোলা জানালা দিয়ে টেনে নেবার সময় আলোটা ঢাকা পড়ল।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে আমরা দেখতে লাগলাম।

—এই তো সময়। চাপাস্বরে বলতে বলতেই যেন স্প্রীংয়ের মত হোমস ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

তারপর ঝড়ের বেগে ব্রিজ পার হয়ে গিয়ে ভীষণজোরে বাজিয়ে দিল ঘণ্টা। সঙ্গে সঙ্গে দুমদাম শব্দে ছিটকিনি আর খিল খুলে দোর গোড়ায় অ্যামিসের মূর্তি দেখা দিল।

হাতে ঠেলে তাকে পাশে সরিয়ে দিয়ে হোমস্ সরাসরি গিয়ে ঢুকল পড়ার ঘরে—একটু আগেই সেই ঘরে ছায়ামূর্তিটাকে আমরা দেখতে পেয়েছি।

আমরাও হোমসকে অনুসরণ করে ঘরে এসে উপস্থিত হলাম।

খানিক আগে যে আলো জ্বলছিল, সেই ল্যাম্প এখন সিসিল বার্কারের হাতে।

তার চোখে ভয়ার্ত তটস্থ দৃষ্টি। দৃঢ় কঠোর পরিষ্কার কামানো মুখে আতঙ্কের ছায়া।

—ওকি—আপনারা এ সময়ে—

দ্রুতচোখে চারদিক দেখে নিয়ে হোমস্ টেবিলের তলায় ঢুকে গিয়ে একটা জল সপসপে বাণ্ডিল দড়ির বাঁধন সহ টেনে নিয়ে এল সামনে।

—মিঃ বার্কার—ডাম্বেল দিয়ে ভারী করা যে বাণ্ডিলটা এই মাত্র আপনি জল থেকে তুললেন, সেটার জন্যই এসেছি আমরা।

—আপনি কি করে জানলেন?

—আমি জানি, আপনিই রেখেছিলেন। ইন্সপেক্টর, আপনার নিশ্চয় মনে পড়বে, ডাম্বেল অন্তর্ধানের ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল, আপনাকে বলেওছিলাম, বিভিন্ন চাপে, আপনি ততটা গুরুত্বপূর্ণ তখন মনে করেননি ব্যাপারটাকে।

একটা ভারী বস্তু নিখোঁজ, এবং জলও রয়েছে হাতের কাছে, বস্তুটা তাতেই নিশ্চয় ডোবান হয়েছে—এমন একটা ধারণা আমি ছকে নিয়েছিলাম। তারপর গতকাল অ্যামিসের কল্যাণে এ ঘরে ঢুকে ডাঃ ওয়াটসনের ছাতার বাঁকা হাতল দিয়ে বাণ্ডিলটাকে জল থেকে টেনে তুলে দেখে গিয়েছিলাম।

কিন্তু বাণ্ডিলটা কে রেখেছে তা জানা প্রয়োজন ছিল। সেই কারণেহ আজকের এই অভিযানের ব্যবস্থা। আর তার আগে পরিখার জল সরাবার পরিকল্পিত চিঠি আপনাকে দিয়ে লিখিয়েছিলাম।

জানতাম চিঠি পড়ে টনক নড়বে যে বাণ্ডিল রেখেছে তার আর সেটা সে সরানোর চেষ্টা করবে।

বলতে বলতে হোমস্ বাণ্ডিলটা টেবিলের ওপরে রেখে বাঁধন খুলে ফেলল। বার করে আনল একটা ডাম্বেল। ছুঁড়ে দিল ঘরের কোণে দাঁড় করানো জুড়িদার ডাম্বেলটার দিকে।

তারপর বার করে আনল—একজোড়া বুট জুতো—পায়ের আঙুলের দিকে দেখিয়ে বলল, দেখুন—স্পষ্ট আমেরিকান জুতো। তারপর বার করে আনল পর পর—খাপে ভরা একটা লম্বা মারাত্মক ছুরি, একবাণ্ডিল জামাকাপড়—একপ্রস্থ অন্তর্বাস, মোজা, ধূসর রঙের একটা টুইড স্যুট, আর একটা খাটো হলদে ওভার কোট।

হোমস্ এবারে ওভার কোটের ভেতরে আঙুল বোলাতে বোলাতে বলল, এই তো দেখুন ভেতরের পকেট—লাইনিং পর্যন্ত কাটা—করাত দিয়ে কাটা মারাত্মক হাতিয়ার যাতে রাখতে সুবিধা হয়। দর্জির লেবেলও রয়েছে—নিলি ওস্তাগর, ভারমিসা, যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রের যে অঞ্চল কয়লা আর লোহার জন্য বিখ্যাত, তার কাছেই একটা

সমৃদ্ধ শহরের নাম ভারমিসা। মিঃ বার্কারের কথা থেকেই জেনেছিলাম, মিঃ ডগলাসের প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে এই কয়লা অঞ্চলের একটা সম্পর্ক আছে।

মৃতদেহের পাশে রাখা V. V. লেখা কার্ডটার রহস্য এবারে পরিষ্কার হল—ভারমিসা ভ্যালী। এই সেই অভিশপ্ত ভ্যালী যেখান থেকে খুনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আসে গুপ্তঘাতকরা।

ভ্যালী অব ফিয়ার নামটা অনেক আগেই শোনা ছিল আমার। এ পর্যন্ত নিশ্চয় আমি পরিষ্কার ভাবে এগুতে পেরেছি—মিঃ বার্কার, এবারে বাকিটুকু আপনি বলুন।

থমথমে ইস্পাত কঠিন মুখে বার্কার বললেন, আপনি এতটুকু যখন বলেছেন, তখন পাদপূরণ আপনিই করুন। আমি একটি কথাও বলব না।

এমন সময় ঘুরে ঢুকলেন মিসেস ডগলাস। বার্কারের দিকে তাকিয়ে বললেন, সিসিল, যথেষ্ট করেছ আমাদের জন্য। যাই ঘটুক আমাদের ভাগ্যে, তোমার ঋণ পরিশোধ করবার নয়।

হোমস্ বলল, ম্যাডাম, আপনার প্রতি পূর্ণ সমবেদনা নিয়ে বলছি—পুলিশকে অবিশ্বাস করবেন না—সব কিছু খুলে বলুন।

বন্ধুবর ওয়াটসনের মারফৎ আপনি যে ইঙ্গিত পাঠিয়েছিলেন, তখন তা আমি কানে তুলিনি। কারণ তখনো পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল—আপনারা দুজন খুনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এখন আমার সেই ধারণা পাল্টেছে—তবে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়নি। তাই অনুরোধ করছি, আপনি বরং মিঃ ডগলাসকে বলুন—নিজের মুখে তিনি আমাদের কাহিনীটা শোনান।

হোমসের কথায় প্রবল বিস্ময়ে অস্ফুটে শব্দ করে উঠলেন ভদ্রমহিলা। উপস্থিত ডিটেকটিভদের সঙ্গে আমিও কম বিস্মিত হলাম না। সকলে তাকিয়ে আছি বিমূঢ় দৃষ্টি নিয়ে।

এমন সময় যেন মাটি ফুঁড়ে সামনে হাজির হল একটি পুরুষ মূর্তি। মিসেস ডগলাস ঘুরে দাঁড়িয়ে মূর্তির প্রসারিত হাত নিজের হাতে নিলেন মিসেস ডগলাস।

মিসেস ডগলাস স্বামীকে বললেন, জ্যাক, তাই হোক, তুমিই বল—

এবারে বলিষ্ঠদেহী দীর্ঘকায় মিঃ ডগলাস সামনে এগিয়ে এলেন। ধূসর চোখ, ছোট করে ছাঁটা কাঁচাপাকা গোঁফ, চৌকোনা চোয়াল।

মিঃ ডগলাস সটান আমার দিকে এগিয়ে এসে এক বাণ্ডিল কাগজ এগিয়ে দিলেন।

—ডাঃ ওয়াটসন, আপনার কথা আমি জানি। আপনি এই ইতিহাস লিখুন। লেখার এমন উপাদান দুর্লভ। ইঁদুরের গর্তের মত ঐ অপরিসর আস্তানায় গত দুদিন বসে লিখেছি এ কাহিনী—ভ্যালী অব ফিয়ার-এর কাহিনী—নিজে পড়ে পাঠকদের উপহার দিন।

হোমস্ বলল, মিঃ ডগলাস, অতীতের কথা নয়—বর্তমানের অবশিষ্টটুকু এবার আমাদের আপনি শোনান।

হোমসের কাছ থেকে একটা চুরুট চেয়ে নিয়ে চুষতে চুষতে ম্যান্টলপিসে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন মিঃ ডগলাস।

এমন সময় ক্ষুব্ধ বিস্মিত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন ইন্সপেক্টর—এসব কি হচ্ছে মিঃ হোমস্। ইনি যদি ডগলাস হবেন—তাহলে এই কদিন আমরা কার মৃত্যুরহস্যের তদন্ত করলাম? আর আপনি অতশত জেনেও আমাদের বৃথা হয়রানি হতে দিলেন?

—মিঃ ম্যাক—রাজা চার্লসের লুকিয়ে থাকার কাহিনী যে ক্ষুদ্র বইটিতে পেয়েছিলাম, আপনি তা দেখেছেন। লুকনোর একটা ভাল জায়গা যে এ বাড়িতে আছে—আর পুনরায় সেটা কাজে লাগানোও যেতে পারে—এমন চিন্তা সেই সময়ই এসেছে আমার মাথায়। আর গতকাল রাতে এই বাণ্ডিলটা তুলবার পর আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হলাম—যে মৃতদেহ আমরা দেখেছি তা মিঃ ডগলাসের না—তিনি নিশ্চয় আত্মগোপন করে আছেন এই বাড়িতেই। কাজেই আমাকে আপনি অভিযোগ করতে পারেন না। বুঝেছিলাম, স্ত্রী এবং বন্ধু যোগসাজসে তাঁকে লুকিয়ে রেখেছেন—সময় হলেই এখান থেকে নিরাপদ জায়গায় পালাবেন।

হোমসের কথা সমর্থন করে বললেন মিঃ ডগলাস—যথার্থই অনুমান করেছেন মিঃ হোমস্। সুযোগ মত নিরাপদ দূরত্বে পালাবার সিদ্ধান্তই আমার ছিল। যে রক্তলোলুপ হায়েনার দল আমার পেছনে লেগে আছে, তাদের হাত থেকে রক্ষা পাবার আর কোন উপায় আমার সামনে নেই।

মিঃ হোমস্, গোড়া থেকে আমি যা করেছি তার জন্য আমি বিন্দুমাত্র লজ্জিত নই। আমার কাহিনী শুনলেই এই কথা বিচার করতে পারবেন।

কিছু লোক আমাকে ঘৃণা করে—তার যে কারণ নেই তা নয়। তারা পণ করে—যেভাবেই হোক—যেখানেই হোক আমাকে তারা শেষ করবে।

শিকাগো থেকে ক্যালিফোর্নিয়া—তারা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। শেষকালে তাদের তাড়া খেয়েই আমেরিকা থেকে পালিয়ে এসেছি।

বিয়ের পর স্ত্রীকে এ সম্পর্কে বলে অযথা দুর্ভাবনায় ফেলতে চাইনি। তবুও মাঝে মাঝে আমার কথায় তিনি কিছুটা হয়তো আঁচ করে থাকবেন।

মনের দিক থেকে আমি বড় কঠিন সমস্যায় পড়েছিলাম। যাই হোক, ঘটনার আগের দিন টার্নব্রিজ ওয়েলসে গিয়ে সহসা ভিড়ের মধ্যে আমার পেছনে লেগে থাকা রক্তলোলুপ হায়েনার মত পরম শত্রুকে দেখতে পেলাম।

বাড়ি ফিরে এসে একাই লড়ব বলে স্থির করলাম। পরদিন আর পার্কে বেরুলাম না। সতর্ক হয়ে রইলাম। বেরুলে সেখানেই শটগান দিয়ে আমাকে শেষ করে দিত।

বরাবরই ড্র ব্রিজ তুলে নেবার পর আমার মন হাল্কা হয়ে যেত। ও যে বাড়ির ভেতর ঢুকে বসে থাকতে পারে—অতটা গভীর ভাবে আমি চিন্তা করে দেখিনি।

প্রতিদিনের মত ড্রেসিং গাউন পরে বাড়ি টহল দিয়ে পড়ার ঘরে ঢুকতেই আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কেমন সজাগ হয়ে উঠল। আমি যেন বিপদের আভাস পেলাম। সেই সময়ই পর্দার পেছনে বুট জুতো নজরে পড়ল।

মোমবাতি নামিয়ে রেখেই লাফ দিয়ে ম্যান্টলপিসের ওপর থেকে হাতুড়ি তুলে নিলাম। একই সঙ্গে সে-ও আমার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাতে চকচকে ছুরি নিয়ে।

হাতুড়ির ঘা খেয়ে ছুরি মেঝেয় ছিটকে পড়ল— আর সে বানমাছের মত টেবিলের ওপাশে সরে গিয়ে কোটের পকেট থেকে টেনে বার করল বন্দুক।

ট্রিগার টেনে তোলার আওয়াজ পেয়েই বন্দুক চেপে ধরলাম। সেই সময় ধস্তাধস্তিতে কার হাতে লেগে যে দুটো ট্রিগারই চোট হয়ে গেল—আর জোড়া গুলিতে উড়ে গেল তার মাথাটা বুঝতে পারলাম না।

টেড বল্ডউইন বলে আর তাকে চেনার উপায়ই রইল না।

বন্দুকের শব্দে বার্কার ও স্ত্রী নেমে এল। বেরিয়ে গিয়ে স্ত্রীকে কোন রকমে বুঝিয়ে ওপরে শোবার ঘরে পাঠিয়ে দিলাম। বাড়ির কেউই শব্দ শুনতে পায়নি কেবল আমরা তিনজনই জানি ঘটনাটা।

বল্ডউইনের বাহুর ওপর লজের দাগানো চিহ্নটা এই সময়ে চোখে পড়ল। তখনই মাথায় মতলবটা এসে গেল। ওর উচ্চতা, চুল, দেহের আকার হুবহু আমার মত। খণ্ড বিখণ্ড মুখ দেখে চিনবার উপায় নেই।

মিনিট পনেরর মধ্যেই তাকে ড্রেসিং গাউন পরিয়ে দু'জনে মিলে ধরাধরি করে মেঝেয় শুইয়ে রাখলাম।

হাতের কাছেই ওজনটা ছিল। তার জামা কাপড় জুতো—সব চিহ্ন বান্ডিল বেঁধে জানালা গলিয়ে জলে ফেলে দিলাম। যে কার্ডটা আমার মৃতদেহের পাশে রাখবে বলে এনেছিল, সেটা রাখলাম তার দেহের পাশে। আমার আংটি পরালাম ওর হাতে। বিয়ের রিং কখনো হাত থেকে খুলিনি। তাই এঁটে বসে গিয়েছিল আঙুলে। টানাহেঁচড়া করে আঙুলই ছড়ে গেল। এই দেখুন।

বলে মিঃ ডগলাস আঙুলটা দেখালেন। তারপর বললেন, এবারে একটা কাজ আমি করলাম। স্টিকিং প্লাস্টার এনে, ওর গালে লাগিয়ে দিলাম—ঠিক যেভাবে আমার গালে দেখছেন। মিঃ হোমস, এই একটি মাত্র জায়গায় আপনাকে আমি ধোঁকা দিতে পেরেছি। প্লাস্টারটা তুলে দেখলেই, অনেক হয়রানি আপনার কমত।

এর পরে চিন্তা এল—শয়তানগুলোর চোখ ফাঁকি দিয়ে কিভাবে শান্তিতে বাকি দিনগুলো কাটাতে পারি। বার্কারের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। সাহায্য করতে রাজি হল এবং স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলল।

বাড়িতে লুকিয়ে থাকবার এই জায়গার খবর আমি ছাড়া আর জানত অ্যামিস। কিন্তু এই খুনের সঙ্গে যে এই জায়গাটার কোন ভাবে যোগ থাকতে পারে এই ব্যাপারটা তখন মাথায় আসেনি। আমি সেই খুপরিতেই ঢুকে পড়লাম।

এর পর যা যা ঘটেছে সবই আমার কথা ভেবে করল বার্কার। তার সবকিছুই আপনাদের জানা।

জানালা খুলে গোবরাটে রক্ত লাগাল—যদিও সে জানত খুনির পালানোর ব্যাপারটা কেবল ওই দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না।

কিন্তু সেই মুহূর্তে আর কি সে করতে পারত?

বার্কার তার কাজ শেষ করে ঘণ্টা বাজাল। পরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমি করতে চাইছি না। মিঃ হোমস্, আমি যা বললাম—তার প্রতিটি বর্ণ সত্যি। ঈশ্বর আমার সহায় হোন—কেবল একটা কথা আমাকে বলুন ইংরেজ আইন আমাকে কি চোখে দেখবে?

মিঃ ডগলাসের কথা শেষ হলে কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ হয়ে রইলাম।

প্রথম কথা বলল হোমস্। বলল, মিঃ ডগলাস—ইংরেজ আইন একটা আইন মাত্র—এ থেকে আপনি বিশেষ কিছু আশা করতে পারেন না। তবে একটা কথা আমি জানতে চাই—লোকটা আপনার সন্ধান কি করে পেল? কি করে বাড়ি ঢুকতে হবে, কোথায় লুকোলে আপনাকে ঠিক হাতের মুঠোয় পাওয়া যাবে—এতসব খুঁটিনাটি সে জানল কি করে?

—কিছুই জানি না মিঃ হোমস্।

কথাটা শুনেই হোমসের মুখ ফ্যাকাসে আর গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, মিঃ ডগলাস, তাহলে দেখছি গল্পের শেষটা এখানো বাকি। ইংরেজ আইনের চেয়েও জঘন্য বিপদ আপনার জীবনে অকস্মাৎ নেমে আসতে পারে।

কয়লা অঞ্চলের শত্রুদের চাইতেও এ বিপদ ভয়াবহ। বিপদ যে ওঁৎ পেতে আছে তা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—আমার কথা যদি শোনেন তবে বলব, আপনি প্রতিটি মুহূর্তে হুঁশিয়ার থাকুন।

এর পরের দৃশ্যপটের জন্য আমাদের চোখ ফিরিয়ে নিতে হবে—প্রায় কুড়িটা বছর পেছনে। বির্লস্টোনের সাসেক্স ম্যানর হাউস থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে—

এবারে সেই কাহিনীই শুরু করা যাক।

দুই

১৮৭৫ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী।

স্কোরার্স্ পর্বতমালার গিরিখাতে স্তূপীকৃত হয়েছে তুষার।

ভারমিসা উপত্যকার কেন্দ্রীয় নগরী ভারমিসার সমতল অঞ্চল স্ট্যাগভিল

থেকে সরু রেল লাইন ঢালু পথ বেয়ে নেমে গেছে—কয়লা খনি আর লোহার কারখানা ছাড়িয়ে বার্লটস ক্রসিং, হেল্মডেল আর মার্টনের কৃষি অঞ্চলের দিকে।

রেলপথ একটাই। বিপরীত দিক থেকে ট্রেন এলে রেলের ট্রেনকে সাইডিং-এ সরে দাঁড়াতে হয়। প্রত্যেকটা সাইডিং-এ কয়লা আর লোহার আকর ভর্তি ট্রাক সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই বিজনতম অঞ্চলে ভাগ্যান্বেষীদের ভিড়।

পেঁচালো সুদীর্ঘ উপত্যাকার ওপর দিয়ে ট্রেন চলেছে টিকিটিকি।

সামানের দিকে যাত্রীগাড়িতে একটি তেলের বাতি জ্বলছে। লম্বা—সাদামাটা কামরা। জনা ত্রিশেক যাত্রী সব মিলিয়ে। অধিকাংশই শ্রমিক—উপত্যকায় সারাদিন খেটে বাড়ি ফিরে চলেছে। তাদের গায়ে কালিঝুলি ল্যাপ্টানো—হাতে সেফটি ল্যাম্প। শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে ধূমপান করছে—এবং গলা নামিয়ে কথা বলছে।

কামরার অন্য প্রান্তে ইউনিফর্ম পরা ব্যাজধারী দুজন পুলিশের লোক পাশাপাশি বসে।

কয়েকটি কুলি মেয়ে এবং স্থানীয় দোকানদারও এদিক সেদিক ছিটকে বসে আছে।

কোণের দিকে একজন সুদর্শন যুবা বসে একাকী। চেহারা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় আইরিশ ম্যান।

তরুণ যাত্রী যেন একা একা বসে হাঁপিয়ে উঠেছিল। বার বার শ্রমিকদের দিকে ফিরে তাকাচ্ছিল তরল দৃষ্টি নিয়ে। দু-একবার যেচে কথা বলবার চেষ্টাও করল। কিন্তু শ্রমিকদের কাটছাঁট জবাব শুনে আর এগুতে পারল না।

যুবা এবারে পকেট থেকে একটা বড় চিঠি বার করে পড়ল, তারপর টুকটাক কি লিখতে লাগল পাশের সাদা কাগজে।

লেখা শেষ করে কোমরের পোছনের পকেট থেকে বার করে আনল বড় আকারের একটা নেভী রিভলভার।

আলোর সামনে ধরে সে নাড়াচাড়া করতে লাগল যন্ত্রটা।

সংলগ্ন বেঞ্চিতে উপবিষ্ট একজন শ্রমিকের দৃষ্টি পড়ল হাতিয়ারটার ওপরে। সে হেসে বলল, হ্যালো বন্ধু—দেখছি একেবারে তৈরি হয়েই বেরিয়েছেন।

—যেখান থেকে আসছি সেখানে হর হামেশাই কাজে লাগে এটা—

—জায়গাটার নাম শুনতে পাই কি?

—শিকাগো—

—এদিকে নতুন নাকি?

—হ্যাঁ—

—তা ভালই হয়েছে, এখানেও দেখবেন দিব্যি কাজে লেগে যাবে। এখানকার কাণ্ডকারখানা শুনেছেন নিশ্চয়ই সব?

—তেমন কিছু তো শুনিনি?

—আশ্চর্য—দেশসুদ্ধ তোলপাড় চলছে এখানকার কাণ্ডকারখানা নিয়ে—

—কাজের লোকের কাজের অভাব নেই এ কথাটাই তো শুনেছি—আর সেজন্যই ছুটে আসা।

—আপনি কি শ্রমিক ইউনিয়নের কেউ?

—নিশ্চয়ই।

—তবে কাজ পেয়ে যেতে পারেন। বন্ধু টন্ধু থাকলে আরও আগে ব্যবস্থা হবে।

—আমি এনসেন্ট অর্ডার অব ফ্রী ম্যান সংস্থার সদস্য। তাদের শাখা সব শহরেই রয়েছে—আর শাখা থাকা মানেই—আমারও বন্ধু পাওয়া।

কথাটা শুনেই সহযাত্রী শ্রমিকের চোখ চকচক করে উঠল। চকিতে সে পেছনের যাত্রীদের দিকে তাকাল। যে যার কথায় মশগুল। পুলিশ দুজন ঢুলছে।

শ্রমিকটি এগিয়ে এসে বসল যুবকের পাশে। বলল—হাত রাখুন।

যুবক বাড়ানো হাতে হাত রাখল।

শ্রমিকটি বলল—আপনি মিথ্যা কিছু বলছেন না জানি। তবু নিশ্চিন্ত হতে চাই। বলে—ডান হাত তুলল ডান ভুরুর সামনে। তরুণ যাত্রীও তৎক্ষণাৎ বাঁ হাত তুলল বাম ভুরুর ওপরে।

—অন্ধকার রাত বড় অস্বস্তিকর। বলল শ্রমিকটি।

—পথ যে চেনে না তার কাছে। বলল তরুণ যাত্রী।

—ব্যস ব্যস—আমি ভারমিসা ভ্যালীর ৩৪১ নম্বর লজের ব্রাদার স্ক্যানল্যান। আপনাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে খুশি হলাম।

—ধন্যবাদ। আমি শিকাগোর ২৯ নম্বর লজের ব্রাদার জন ম্যাকমুর্দো। জে. এইচ. স্কট আমাদের বডি মাস্টার। এত তাড়াতাড়ি একজন ব্রাদার পেয়ে যাব ভাবতে পারিনি।

—আমাদের শ্রমিক ইউনিয়নে আপনার মত কর্মঠ সদস্য দরকার। তবে বুঝতে পারছি না, শিকাগোর মত জায়গায় আপনার কাজের অভাব পড়ল কেন?

—কাজের অভাব নেই। তবে—

বলতে বলতে পেছনের পুলিশের লোকদের দিকে তাকাল ম্যাকমুর্দো। তাকিয়ে সঙ্গীর দিকে চোখ ফেলে হাসল।

—ঝামেলায় পড়েছেন মনে হচ্ছে? শ্রীঘরের ব্যাপার না খুনটুন?

মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল ম্যাকমুর্দোর মুখমণ্ডল। ধীরে ধীরে বলল, শিকাগো থেকে কাজের সন্ধানে চলে এসেছি—এটুকু জানাই আপনার পক্ষে যথেষ্ট মনে

করি।

কিছুটা অপ্রস্তুত বনে গিয়েছিল স্ক্যানল্যান, বলল—ঠিক আছে ঠিক আছে—বুঝতে পেরেছি অনেকে অনেক কিছু ভাবতে পারে আপনার কীর্তিকাহিনী শুনে। যেতে দিন ওসব। নামছেন কোথায়?

—ভারমিসায়।

—তাহলে—এখান থেকে তৃতীয় স্টপেজ ভারমিসা—ওঠবার জায়গা ঠিক করা আছে?

পকেটের লম্বা লেফাপাটা বার করে ধরল ম্যাকমুর্দো। বলল—এই তো ঠিকানা—জাকব শ্যাফটার, শেরিডন স্ট্রীট, বোর্ডিং হাউস। শিকাগোর একজন পরিচিত ভদ্রলোক সুপারিশ করে পত্র দিয়েছেন।

—বেশ ভাল কথা। আমি অবশ্য ভারমিসা এতটা জানি না। আমি থাকি হবসনস প্যাচ-এ। তবে একটা কথা আপনাকে বলে রাখি—যদি কোন দিন ঝামেলায় পড়ে যান তাহলে সোজা চলে যাবেন ইউনিয়ন হাউসে। দেখা করবেন বস ম্যাকগিণ্টির সঙ্গে। উনিই লজের বডি মাস্টার। ব্ল্যাকজ্যাক ম্যাকগিণ্টির অনিচ্ছায় এ তল্লাটে কোন ঘটনা ঘটে না। বিপদে পড়লে সরাসরি গিয়ে তার শরণ নেবেন। ধন্যবাদ—নামতে হবে—কোন একদিন লজে দেখা হয়ে যেতে পারে।

স্ক্যানল্যান নেমে গেল।

ম্যাকমুর্দো বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

ফার্নেসের গনগনে আগুন সগর্জনে লাফিয়ে উঠে মাঝে মাঝে অন্ধকারের বুক চিরে যেন ফুঁসে উঠছে। অন্ধকারে সে এক নারকীয় দৃশ্য।

ম্যাকমুর্দো দেখল, একজন পুলিসের লোক চেয়ারে ঘুরে বসেছে। তার দিকে চোখ পড়লে বলে উঠল, ইয়ংম্যান, মনে হচ্ছে এদিকে নতুন এসেছেন?

তেতো গলায় জবাব দিল ম্যাকমুর্দো—তাতে হয়েছেটো কি?

—না বলছিলাম, একটু সাবধানে থাকবেন। মাইক স্ক্যানল্যান বা তার দলবলের কারো সঙ্গে ভাব জমাতে যাবেন না হঠাৎ করে।

—আমার বন্ধু নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। গায়ে পড়ে উপদেশ দিতে আসছেন কেন?

বলতে বলতে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ কুকুরের মত হাসল ম্যাকমুর্দো।

পুলিশের লোক দুজন হতবাক। একজন শান্তস্বরে বলল, ভাই আপনি এ অঞ্চলে নতুন বলেই কথাটা বলা—অত চটে উঠছেন কেন?

—নতুন এদেশে—কথাটা ঠিক। কিন্তু আপনাদের কাছে নতুন নই। আপনাদের ছাঁচ সব দেশেই এক।

অন্য পুলিশটি শুষ্ক হাসি হেসে বলল—লোক বিশেষ সুবিধের নন আপনি

বুঝতেই পারছি—দেখা যাক—হয়তো শিগগিরই দেখা হয়ে যেতে পারে।

অপর পুলিশটিও হেসে সায় কাটল।

গর্জন করে উঠল ম্যাকমুর্দো কথাটা শুনে। বলল, চলে আসবেন—আমাকে দরকার হলেই চলে আসবেন—ভারমিসার শেরিডন স্ট্রীটের জাকব শ্যাফটারের বাড়িতে। আপনাদের ভয়ে লুকিয়ে থাকবার পাত্র আমি নই, জানবেন।

নবাগত সহযাত্রীর এহেন উক্তিতে এক বিচিত্র দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকাল পুলিশের লোক দুজন।

ইতিমধ্যে ডিপোয় এসে ট্রেন দাঁড়াল। বহু লোক মালপত্র নিয়ে নেমে গেল।

ভারমিসা এ লাইনের বড় শহর। সঙ্গের একমাত্র চামড়ার থলিটা কাঁধে নিয়ে ম্যাকমুর্দো নামতে যাচ্ছে—এমন সময় একজন খনি-শ্রমিক এগিয়ে এল তার কাছে।

চাপা গলায় বলল, দোস্ত, আপনার কথা শুনে ভাল লাগল। মুখের মত জবাব দিয়েছেন টিকটিকিগুলোকে। চলুন আমিও এপথেই যাব—আপনার থলিটা আমাকে দিন। শ্যাফটারের বোর্ডিং হাউস আমার ঝুপড়ির পথেই পড়বে।

ব্যাগটা সঙ্গীর হাতে দিয়ে পাশাপাশি চলতে লাগল ম্যাকমুর্দো।

কামরার খনি শ্রমিকরা সকলেই তাকে লক্ষ্য করেছিল। সকলেই প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে যাবার আগে সম্মিলিত কণ্ঠে তাকে শুভরাত্রি জানিয়ে গেল।

আর ভারমিসার মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্দান্ত ম্যাকমুর্দোর কথা ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে।

ভারমিসা।

উপত্যকা নগরী।

আকাশে বাতাসে তার আতঙ্ক ছড়ান।

আগুন আর ধোঁয়ার ভাসমান মেঘে ছেয়ে রেখেছে যেন শহরটাকে। গর্ত খুঁড়ে মাটি বার করে এনে স্থানে স্থানে পাহাড় করে রাখা হয়েছে।

দারিদ্র্য, মালিন্য, আর কদর্য নোংরামির একটা আশ্চর্য জগৎ বললেই চলে। রাস্তাঘাট চওড়া, ফুটপাত সরু, এবড়োখেবড়ো। পাশে পাশে কাঠের বাড়ির সুদীর্ঘ সারি।

খনি অঞ্চল থেকে শহরের কেন্দ্রের দিকে ক্রমশই ঝলমলে দোকান, সুদৃশ্য বাড়ি—মদ খাওয়ার আর জুয়া খেলার আড্ডা মোড়ে মোড়ে।

এগিয়ে এসে খানদানি হোটেলের মত একটা সেন্ট্রাল ভবনের দিকে আঙুল তুলে পথ প্রদর্শক বলল—ঐ হল ইউনিয়ন হাউস। ম্যাকগিন্টিকে ওখানেই পাওয়া যাবে।

—ম্যাকগিন্টি—মানুষটা কেমন?

—সেকী! জানেন না নাকি তার সম্পর্কে কিছুই?

—শুনিনি কিছুই।

—এখানকার স্কোরারদের ব্যাপার কিছুই শোনেন নি?

—তা শিকাগোয় থাকতে শুনেছি বটে—স্কোরার মানে তো মানুষ খুনীর দল, তাই না?

অমনি চোখ কুঁচকে ফিসফিস করে উঠল সঙ্গী, চুপ চুপ, ওকথা মুখে আনবেন না। পথের ধুলোরও কান আছে এখানে।

—তাতে কি হয়েছে—যা শুনেছি তা বলেছি—তাতে দোষের কি আছে?

—যা বলেছেন—সে সম্পর্কে কিছু বলছি না, ভয়ে ভয়ে আশপাশ তাকিয়ে বলতে থাকে লোকটা—মানুষ মারার ব্যাপারটা এখানে খুন বলে কেউ মনে করে না—নিতান্ত জল-ভাত ব্যাপার। সাবধান—ওসব খুন-খারাবির ব্যাপারের সঙ্গে যেন ভুল করে ম্যাকগিন্টির নামটা উচ্চারণ করবেন না। যাই হোক—সাবধানে চলাফেরা করবেন—ওই যে এসে গেছি—রাস্তা থেকে একটু ভেতরের দিকে চলে যান—ওখানকার মালিক বুড়ো জ্যাকব—খুব সৎ লোক—জুড়ি শহরে দুটি নেই।

সঙ্গীকে ধন্যবাদ জানিয়ে চামড়ার ব্যাগটা হাতে নিল ম্যাকমুর্দো। তারপর রাস্তা অতিক্রম করে নির্দিষ্ট বাড়িটার দরজায় এসে কড়া নাড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে অনিন্দ্যসুন্দর এক তরুণী সামনে দাঁড়াল। তার দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য ম্যাকমুর্দো ভুলে গেল কথা বলতে। তরুণীর কাজল কাল সুন্দর চোখ জোড়া তাকে যেন অভিভূত করে ফেলল।

মেয়েটি মিষ্টি সুইডিস উচ্চারণে বলল—ভেবেছিলাম বাবা এলেন বুঝি। আপনি কি বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? বাবা শহরে গেছেন—এখুনি আসবেন।

ম্যাকমুর্দো তখনো ঠায় তাকিয়ে আছে। শেষে সম্বিত ফিরে পেয়ে বলল, এখানে থাকবার জন্য একজন সুপারিশ করে পাঠিয়েছেন আমাকে।

—আসুন, ভেতরে এসে বসুন। আমি মিঃ শ্যাফটের মেয়ে মিস এট্টি শ্যাফট। মা নেই—সংসার এখন আমার হাতে। ওই তো—ওই তো এসে গেছেন বাবা।

ভারী চেহারার একজন প্রৌঢ় এসে দাঁড়ালেন দরজার সামনে।

এই ঠিকানাটা ম্যাকমুর্দোকে দিয়েছে শিকাগোয় মর্ফি নামে এক ভদ্রলোক। মর্ফি আবার পেয়েছে আর একজনের কাছে। দু চার কথাতেই সব জানিয়ে কাজের কথা শেষ করলো ম্যাকমুর্দো।

শ্যাফট শর্ত ইত্যাদি নিয়ে বা টাকা কড়ির ব্যাপারে কোন দর কষাকষিতে গেল না। সাত দিনের অগ্রিম বার ডলার দিলেই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা। আস্তানায় ঠাঁই পেয়ে গেল ম্যাকমুর্দো।

পুলিশ-আদালতের সন্ধানী রক্তচক্ষু এড়িয়ে ম্যাকমুর্দোর প্রথম পদক্ষেপ ঘটল ভারমিসার আতঙ্ক উপত্যকায়।

এর পরই শুরু হল ঘটনার পর ঘটনার ঘনঘটা—যা শেষ হয়েছিল বহু দূরের এক ভূমি খণ্ডে।

শ্যাফটারের আস্তানাতে জনা দশ বারো বোর্ডার। তারা সকলেই সাধারণ শ্রেণীর মানুষ, দোকান-পশারী, কেরানী, কেউ বা কারখানার ফোরম্যান। সকলেই পরিষ্কার লোক।

কিন্তু দুর্দান্ত আইরিশ তরুণ ম্যাকমুর্দো এসে একহপ্তার মধ্যেই নিজের একটা আলাদা স্থান করে নিল এখানে। কখনো আড্ডায় বসে মন মাতানো গান জুড়ছে, কখনো জমিয়ে গল্প বলছে। ঠাট্টা তামাসাতেও তার জুড়ি নেই।

সব সময়েই প্রাণবন্ত, উচ্ছল, আর চমকপ্রদ। চুম্বকের মত সকলেই তার গুণমুগ্ধ হয়ে পড়ল।

ম্যাকমুর্দোর দোষ একটাই—কারণে অকারণে দপ করে জ্বলে উঠতো। ট্রেনের কামরাতেই তার সেই রূপ দেখা গেছে।

তার এই দপ্ করে জ্বলে ওঠা ক্রোধের জন্য তার প্রতি ভয় আর শ্রদ্ধা বেড়েছে সকলের।

প্রথম দর্শনেই সে এ বাড়ির মেয়েরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিয়েছে। আশ্চর্য রকমের সপ্রতিভ ম্যাকমুর্দো দুদিন যেতে না যেতেই তার সঙ্গে হাসি ঠাট্টায় জমিয়ে দুম করে বলে বসল—ভালবাসি।

তারপর থেকে সুযোগ পেলেই বলে যেত একই কথা।

মেয়েদের মন জয় করবার মত ভঙ্গীতে সে মাঝে মাঝে শোনাত তার স্বদেশের মনমুগ্ধকর গল্প।

শিকাগোর করাতকলে কাজ করবার সময়ের অভিজ্ঞতাও সে রসিয়ে রসিয়ে শোনাতে লাগল মেয়েটিকে।

কৃষ্ণকালো দুই চোখে সুগভীর ভালবাসা আর সমবেদনা নিয়ে শুনত মেয়েটি তার কথা। ক্রমে এভাবেই তারা পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। জমে উঠতে লাগল রোম্যান্স।

সুশিক্ষিত ম্যাকমুর্দো দুচারদিন ঘোরাঘুরি করেই হিসাব রক্ষকের সাময়িক একটা চাকরি জুটিয়ে নিল।

আর কাজের জায়গাতেই এমন ব্যস্ত হয়ে থাকতে হয় তাকে যে এনসেন্ট অর্ডার অব ফ্রীম্যান লজের বস-এর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ করে উঠতে পারছিল না।

একদিন ট্রেনে দেখা হল স্ক্যানল্যান-এর সঙ্গে। একই সংস্থার সদস্য দুজনে।

তাই প্রথম আলাপের কদিন পরেই সে দেখা করতে এল।

স্ক্যানল্যান লোকটা ছোটখাট আকৃতির, ধারালো মুখ, কালো চোখ। তবে একটুতেই ঘাবড়ে যায় কেমন।

খুশি হয়ে দুজনে বসে হুইস্কি পান করল। পরে স্ক্যানল্যান বলল, তুমি এই শহরে আছ অথচ বডিমাস্টারের সঙ্গে এখনো দেখা করবার সময় পাচ্ছ না—ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না মোটে।

ম্যাকমুর্দো বলল, সময় পাচ্ছি কোথায়? চাকরির ধান্দাতেই তো কেটে গেল কটা দিন।

—ওসব ছেঁদো কথায় চলবে না ব্রাদার। একবার ম্যাকগিন্টির বিষ নজরে পড়ে গেলে—

—ভাই, বছর দুই হল লজের মেম্বার হয়েছি আমি, কিন্তু কখনো তো লজ সম্পর্কে এমন তাগাদা আমাকে কেউ দেয়নি। এখানকার ব্যাপার-স্যাপার কিছুটা অন্যরকম মনে হচ্ছে যেন?

—তাই বুঝি? বলে রহস্যময় হাসি হাসল স্ক্যানল্যান। তারপর বলল, দেরি করো না ভায়া, এদিকে সেই খবরটাও বেশ চাউড় হয়ে গেছে।

—কোন খবরটা?

—সেই যে ট্রেনে দুজন পাহারাওলা পুলিশের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছিল। খবরটা কানে পৌঁছলে ম্যাকগিন্টি তোমাকে মাথায় তুলে নাচবে।

—হ্যাঁ, কুত্তাগুলোকে যা বলবার মুখের ওপর বলে দিয়েছি। কিন্তু তুমি জানলে কি করে?

—খবর কিছু চাপা থাকে না। কিন্তু দেরি করলে শেষে পুলিশের বদলে তুমিই তার চক্ষুশূল হয়ে পড়বে।

সেদিন চলে গেল স্ক্যানল্যান।

আর সেইদিনই ঘটনাচক্রে সুযোগটা এসে গেল ম্যাকগিন্টির মুখোমুখি হবার।

সেদিন রাতেই বোর্ডিং হাউসের মালিক তার প্রাইভেট রুমে ডেকে নিয়ে গেল ম্যাকমুর্দোকে। তারপর বিনা ভূমিকায় সরাসরি কথাটা উত্থাপন করল।

—মাষ্টার, আমার মেয়ের দিকে ঝুঁকেছেন বলে মনে হচ্ছে?

—ঠিকই ধরেছেন। জবাবও সেভাবেই দিল ম্যাকমুর্দো।

—তাহলে, সোজা কথাটা সোজা ভাবেই বলে দিই, এখানে সুবিধে হবে না—আপনার আগেই আর একজন এসে গেছে।

—জানি, এটি বলেছে। তবে নামটা বলেনি।

—ভয় পাবেন বলে বলেনি।

—ভয়? উচ্চ হাস্য করে বলে উঠল ম্যাকমুর্দো। সেই সঙ্গে জ্বলে উঠল চোখ।

—হ্যাঁ বন্ধু—টেড বল্ডউইনকে ভয় পাবার মধ্যে লজ্জা নেই। এখানকার স্কোরারদের নাম শুনেছেন?

—শুনেছি নামটা আগে—কারা এরা?

—স্কোরাররা এনসেন্ট অর্ডার অব ফ্রিম্যান।

—সেকি! আমি নিজেও তো অর্ডারের মেম্বার।

কথাটা শুনে চমকে উঠল বুড়ো। গলা খাটো করে বলল, আগে বলেন নি কেন? তাহলে তো আপনাকে এখানে আস্তানা নিতে দিতাম না।

—কেন? অর্ডারের মেম্বারদের ওপর এত চটা কেন আপনি? অর্ডার তো মানুষকে মানুষের প্রতি বিশ্বাস আর সম্প্রীতি শেখায়—দান ধ্যান করে—

—ওসব এখানে নয়—এখানে অর্ডার মানুষ খুনের সমিতি।

অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলল ম্যাকমুর্দো—মনে রাখবেন কথাটা দয়া করে—আপনাকে প্রমাণ করতে হবে—

—প্রমাণ আপনি কদিন পরে নিজেই পেয়ে যাবেন। মিলম্যান, আর ভ্যানকার্ট, নিকলসন পরিবার, বুড়ো মিঃ হিয়াম, বিলি জেমস—এদের সকলেরই মৃত্যু প্রমাণ হয়ে রয়েছে। আপনি নিজেও দুদিন পরে এদের একজন হয়ে যাবেন। এ অবস্থায় আপনাকে বাড়িতে রেখে এট্টির সঙ্গে প্রেম করতে দিতে পারি না। আপনি আজ রাতেই বাড়ি ছেড়ে দেবেন।

বেচারা ম্যাকমুর্দো।

আকস্মিক এই নির্বাসন দণ্ড তাকে মুষড়ে দিল।

যথসময়ে একা পেয়ে সেই রাতেই সে এট্টিকে দুঃখের কথা জানাল। এট্টিও চোখের জল ফেলল।

দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে অনেক পরামর্শ করল। শেষে এট্টি বলল, চল এখান থেকে পালিয়ে যাই। তুমি বল্ডউইনকে চেনো না, তার সাগরেদ ম্যাকগিন্টি আর স্কোরারদেরও চেনো না।

—চুলোয় যাক সব। ভয় আমি কাউকে পাই না। তোমাদের যদি এতই ভয়, সকলেই যদি এদের খবরাখবর রাখে তবে বিচার হয় না কেন?

—জ্যাক, সাক্ষী হবার মত কাউকে পাওয়া যায় না। ঘাড়ের ওপর একটা মাত্র মাথা রেখে কেউ এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পায় না। আর ওদের হয়ে সাক্ষী দেবার জন্য সব সময়ই লোক তৈরি হয়ে থাকে। —তারা বলে—আসামী অমুক সময়ে অমুক জায়গায় ছিল। অপরাধ আর প্রমাণ হয় কি করে?

—দেখ, কারণ আছে বলেই এরা এভাবে বলে।

—বল্ডউইনও এভাবে কথা বলে। তুমি তার মত বলো না জ্যাক। তাকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। ভয়? ভয়টা শুধু নিজের জন্য নয়—বাবার কথা ভেবেই।

আমার মনের কথা প্রকাশ পেলে তার দুর্গতির শেষ থাকবে না। চল আমরা বাবাকে নিয়ে এমন জায়গায় পালাই যেখানে এই বদমাসের নাগাল পৌঁছবে না। আমি বাঁচতে চাই জ্যাক।

ম্যাকমুর্দোর মুখের পেশী ক্রমশ দৃঢ় হতে থাকে কথাটা শুনে। তারপর বলল, এট্টি ভয় পেয়ো না। তোমার বা তোমার বাবার কোন ক্ষতি হবে না। শেষে দেখবে এই বদমাসদের থেকে আমি কোন অংশেই কম যাই না। তুমি আমার কতটুকু জান—

এই সময় আচমকা দড়াম করে দরজা হাট করে খুলে গেল। লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরে ঢুকল এক যুবক।

ম্যাকমুর্দোরই সমবয়সী হবে—গড়নপেটন বেপরোয়া। চওড়া বারান্দাওয়ালা টুপি মাথায়। টুপির তলায় দুটি চোখ জ্বলছে ধকধক করে।

চুল্লির পাশে উপবিষ্ট যুগলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে যুবক।

চমকে উঠে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল এট্টি।

—আসুন মিঃ বল্ডউইন—আসুন—

পলকহীন চোখে কোমরে দু'হাত রেখে ম্যাকমুর্দোর দিকে তাকিয়ে রইল বল্ডউইন।

তারপর সেভাবেই দৃষ্টি রেখে জিজ্ঞেস করল—এটি কে?

এট্টি এগিয়ে এসে বলে, আসুন মিঃ ম্যাকমুর্দো, আলাপ করিয়ে দিই মিঃ বল্ডউইনের সঙ্গে—নতুন বোর্ডার।

মাথা হেলিয়ে পরস্পরকে অভিবাদন জানায় দুই যুবক।

পরে বল্ডউইন শুধোয়—মিস এট্টির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা নিশ্চয়ই শোনা হয়ে গেছে।

—আপনাদের মধ্যে যে একটা সম্পর্ক থাকতে পারে তাই তো মাথায় ঢোকাতে পারছি না।

—পারছেন না—তাহলে শুনে রাখুন—এ ভদ্রমহিলা আমার, কেবল আমার, এবারে বেরিয়ে পড়ুন।

—ধন্যবাদ, বেড়িয়ে বেড়াবার মেজাজ নেই এখন।

—তা যদি না থাকে, তাহলে হাতাহাতির মেজাজ নিশ্চয়ই আছে।

—তা আছে। লাফিয়ে উঠে গর্জন করে বলে উঠল ম্যাকমুর্দো, একটা প্রাণ জুড়োবার মত কথা বললেন বটে।

দুই যুবকের অবস্থা দেখে এট্টি চেঁচিয়ে ওঠে—জ্যাক জ্যাক—থামো এ তোমার সর্বনাশ করে ছাড়বে।

—জ্যাক! তাহলে দেখছি এরই মধ্যে অনেক দূর এগিয়েছে।

—টেড, মাথা ঠাণ্ডা করো। আমার কথা ভেবে ক্ষমা কর। বলল কাতর স্বরে এট্টি।

ম্যাকমুর্দো বলে—চলুন রাস্তায় যাওয়া যাক মিঃ বল্ডউইন। সামনেই ফাঁকা মাঠও রয়েছে।

—আপনাকে সায়েস্তা করবার জন্য আমাকে হাত নোংরা করতে হবে কেন?

তারপরই আচমকা আস্তিন গুটিয়ে দেখাল একটা অদ্ভুত চিহ্ন। চামড়ার ওপরে দাগিয়ে দাগানো—বৃত্তের মাঝে একটা ত্রিভুজ। বলল, এর মানে জানেন?

—জানি না—দরকারও বোধ করি না।

—জানবেন—শিগগিরই জানতে হবে আপনাকে। এট্টি, তোমাকেও বলে যাচ্ছি, যা করলে তার জন্যে তোমাকেও শাস্তি পেতে হবে।

বলতে বলতে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বল্ডউইন।

ম্যাকমুর্দো বা এট্টি দুজনের কারু মুখে কথা সরল না কিছুক্ষণ। তারপর দু'হাত বাড়িয়ে ম্যাকমুর্দোকে জড়িয়ে ধরে এট্টি বলল, জ্যাক, তুমি পালাও। এখুনি পালাও। তুমি একা—ওর সঙ্গে লজের সমস্ত শক্তি। তুমি পারবে না জ্যাক—

নিজেকে মুক্ত করে, এট্টিকে চেয়ারে বসিয়ে দিলো ম্যাকমুর্দো। তারপর বলল, আমার জন্য ভয় পেয়ো না এট্টি। আমি নিজেও একজন ফ্রীম্যান। তোমার বাবাকেও বলেছি। দেখো, শেষে আমিও একদিন তোমার চক্ষুশূল হয়ে উঠব।

—ও কথা বলো না জ্যাক। তুমি যেই হও—তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না। জ্যাক, তুমি যদি ফ্রিম্যান হও, তাহলে এখুনি গিয়ে ম্যাকগিণ্টির সঙ্গে দেখা কর। তাড়াতাড়ি যাও। আগে গিয়ে তুমি কথা বল—নইলে বুনো কুত্তার দল তোমার পেছনে লাগবে।

—আমিও তাই ভাবছিলাম এট্টি। ঠিক আছে, কাজ পাকা করে নিচ্ছি এখুনি গিয়ে, তুমি ভেবো না। বাবাকে বলো আজ রাতটা এখানেই কাটাব। কাল ভোরে অন্য জায়গা খুঁজে নেব।

মার্কার স্কোয়োরের পুরো একটা দিকই দখল করে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাকগিণ্টির সেলুন।

রোজকার মতন আজও সেখানে আড্ডা জমজমাট।

শহরের যত মার্কামারা গুণ্ডা বদমাসের আড্ডা এই সেলুন।

ম্যাকগিণ্টি নিজে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, জনগণের মাননীয় প্রতিনিধি। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার এবং পথ-কমিশনার।

এটা তার বাইরের মুখোশ।

ভেতরের আসল পরিচয়টাকে ঢাকবার নিপুণ একটা ব্যবস্থা মাত্র।

কর্কশ ও আমুদে স্বভাবের জন্য ম্যাকগিণ্টি জনপ্রিয়।

তা সত্ত্বেও তাকে লোকে ভয় করে। তিরিশ মাইল ব্যাপী শহরের চৌহদ্দীর উপত্যকার সর্বত্র, এমনকি পাহাড়ের দুপাশের বাইরে পর্যন্ত ম্যাকগিণ্টির নামে লোকে কেঁপে ওঠে। তার বিরাগভাজন কেউ হতে চায় না।

সকলেই চায় তার পৃষ্ঠপোষকতা করতে—এ কারণেই তার মদের আড্ডা এত সরগরম।

সকলেই জানে লোকটার গুপ্তশক্তি অমোঘ—অপরিমিত। গণভোটের জোরে সে জনপ্রতিনিধি। তার সাগরেদরাই তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে। জনগণের কাজকর্ম কিছুই হয় না—দ্রব্য মূল্য, ট্যাক্স সবই আকাশ ছোঁয়া—কিন্তু প্রতিবাদ করবার কেউ নেই। মোটা ঘুস দিয়ে ম্যাকগিণ্টি সরকারী হিসাবরক্ষকের মুখ বন্ধ করে রাখে।

এদিকে দিনে দিনে তার জামার হীরের জেল্লা বাড়ছে—পেট মোটা হচ্ছে—সেলুনটা ক্রমশঃ আকারে বড় হচ্ছে।

ম্যাকমুর্দো এলো সেলুনের সামনে। দুলন্ত দরজাটা ঠেলে সবেগে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

লোক গিজগিজ করছে ভেতরে। মদ আর সিগারেটের গন্ধে ভুর ভুর করছে। উজ্জ্বল আলোয় ঝলমলে চারদিক।

সার্টের আস্তিন গুটিয়ে পরিবেশকরা মদ পরিবেশন করছে।

বার কাউন্টারের সামনে মদ্যপিপাসুদের ভিড়।

একপাশে কাউন্টারের ভেতরে বেয়ারারা পিপে থেকে মদ ঢালছে।

স্বনামধন্য ম্যাকগিণ্টি স্বয়ং কাউন্টারে দাঁড়িয়ে—লম্বা কাল ঝাঁকড়া কেশর দেখে মনে হয় একটা দানব।

ইটালিয়ানদের মতই শ্যামলা গায়ের রং। কুচকুচে চোখ দুটো অদ্ভুত। চাহনি সামান্য ট্যারা।

এছাড়া লোকটার চালচলন সম্ভ্রান্ত, আকৃতি নিখুঁত, কথাবার্তা প্রাণখোলা। প্রত্যেকের সঙ্গেই সমবয়সীর মত ঠাট্টা তামাসা করছে।

আবার মিশমিশে কালো ওই চোখেই যখন অনুতাপহীন হিংস্র দৃষ্টি নিয়ে কারুর দিকে তাকায় ভয়ে তার প্রাণ উড়ে যায়।

শক্তি, সাহস আর ধূর্ততার এক জীবন্ত মূর্তি যেন।

দূরে দাঁড়িয়ে ম্যাকমুর্দো তাকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করল।

তারপর শক্ত দুই হাতে সামনের ভিড় ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে এল ম্যাকগিণ্টি সামনে। নিমেষে কুতকুতে চোখদুটি তার ফিরল নবাগতর দিকে।

চশমার ফাঁক দিয়ে ম্যাকমুর্দো নির্ভীক চোখে তাকিয়ে রইল সেই চোখের দিকে।

—ইয়ংম্যান, আপনার মুখ তো মনে করতে পারছি না।

—আমি এখানে নতুন মিঃ ম্যাকগিণ্টি।

—ভদ্রলোকের উপযুক্ত উপাধিটা মনে কর, উচ্চারণ করবার মত নতুন নিশ্চয়ই নয়।

এমন সময় কে যেন পেছন থেকে বলে দিল—ইয়ংম্যান, ইনি কাউন্সিলার ম্যাকগিণ্টি।

—দুঃখিত কাউন্সিলার, আমি এ অঞ্চলের কিছুই জানি না। কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

—এইতো বেশ দেখা হয়ে গেল। কিরকম মনে হচ্ছে আমাকে?

—সবে তো এলাম। তবে আপনার শরীরের মত যদি হৃদয়টাও বড় হয়, মুখের মত মনটাও হয় নিখুঁত, তাহলে তার বেশি কিছু আর চাইব না।

জবাবে কি একটা বলতে গিয়ে যেন ম্যাকগিণ্টি সামলে নিল। বোধহয় নিজের মর্যাদার উপযুক্ত গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—তাই সামলে নিয়ে বলল—আমার শরীরটা পছন্দ হয়েছে তাহলে? আপনাকে কে বলেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে?

—ভারমিস্‌সার ৩৪১ নম্বর লজের ব্রাদার স্ক্যানল্যান।

এমন সময় মদের গেলাস হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল পরিবেশক।

ম্যাকমুর্দো ওপরে তুলে ধরে বলল, কাউন্সিলার, আপনার স্বাস্থ্য পান করছি। আমাদের পরিচয় যেন আরও নিবিড় হয়।

শ্যানদৃষ্টিতে যুবককে নিরীক্ষণ করছিল ম্যাকগিণ্টি।

কালো কালো ভুরু দুটো তুলে এবারে বলল—আচ্ছা এই ব্যাপার—তাহলে তো আপনাকে আর একটু ভাল করে জানা দরকার মিস্টার—

—মিঃ ম্যাকমুর্দো।

—হ্যাঁ, এ তল্লাটে আমরা কেবল মুখের কথায় কাউকে বিশ্বাস করি না। একটু ভাল করে কাছ থেকে দেখে নিয়ে, তারপর—

এই বলে সঙ্গে সঙ্গে বারের পেছন দিকের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল ম্যাকগিণ্টি। তাকে অনুসরণ করল ম্যাকমুর্দো।

সতর্কভাবে দরজাটা বন্ধ করে দিল ম্যাকগিণ্টি।

ঘরের চারদিকে সারি দিয়ে সাজানো মদের পিপে। ম্যাকগিণ্টি একটা পিপের ওপরে বসল। তারপর নীরবে নিরীক্ষণ করতে লাগল আগন্তুককে।

মুখে চিবিয়ে চলেছে চুরুটের গোড়া।

মিনিট দুয়েক এভাবে কাটল।

ম্যাকমুর্দো উৎফুল্লভাবে এই পর্যবেক্ষণ দেখছিল। তার এক হাত কোটের পকেটে, আর এক হাত দিয়ে তা দিচ্ছে বাদামী গোঁফ।

ম্যাকগিণ্টি নিরীক্ষণ শেষ করে বলল, দেখছো তো এটা—যদি বুঝতাম ইয়ার্কি মারতে এসেছো, তবে কিন্তু অনেক আগেই খুলি উড়িয়ে দিতাম।

এই বলে হাতে ধরা একটা রিভলভার দেখাল ম্যাকমুর্দোকে।

—প্রথম পরিচয়টা কি আমাদের একটু বেশি রকম গুরুগম্ভীর হয়ে যাচ্ছে না মিঃ কাউন্সিলার? ফ্রিম্যানদের বডিমাস্টারের মর্যাদার পক্ষে কি শোভন মনে হচ্ছে!

—এটাই তো প্রমাণ করতে চাইছিলাম ছোকরা। ফেল যদি করতে তাহলে তোমাকে কেউ রক্ষা করতে পারত না। কোন লজের মেম্বার?

—লজ ২৯ শিকাগো।

—তারিখ?

—২৪শে জুন ১৮৭২

—বডিমাস্টারের নাম কি?

—জেমস এইচ স্কট।

—জেলাশাসক?

—বার্থোলোমিউ উইলসন।

—কথায় বেশ চটপট দেখছি—হাতও কি চটপট চলে নাকি।

—আমাকে যারা চেনে তারা আমাকে ঐ রকমই বলে।

—বেশ, মহড়ার ব্যবস্থা করা যাবে শিগগিরই। তা এ অঞ্চলের লজ সম্পর্কে কতটা শোনা আছে শুনতে পারি কি?

—শুনেছি যে কেবল পুরুষ মানুষ এই লজের ব্রাদার হতে পারে।

—কথাটা তোমার বেলায় খাটে মিঃ ম্যাকমুর্দো। তা শিকাগো ছাড়লে কেন?

—আপনাকে তা বলতে পারব না।

কথাটা শুনেই চোখের পাতা সবটা খুলে গেল ম্যাকগিণ্টির। মুখের ওপরে এভাবে কথা শুনতে সে অভ্যস্ত নয়। তবু মনোভাব চেপে প্রশ্ন করে—আমাকে বলবে না কেন?

—ব্রাদার হয়ে ব্রাদারকে মিথ্যা বলতে পারব না বলে।

—তাহলে সত্যটা এমনই খারাপ যে মুখে আনা যায় না।

—অনেকটা সেই রকমই।

বলতে বলতে ম্যাকমুর্দো ভেতরের পকেট থেকে একটা খবরের কাগজের কাটিং টেনে বার করে। তারপর বলে—ফাঁস করে দেবেন না তো?

—চড়িয়ে গাল ফাটিয়ে দেব ঐভাবে কথা বললে। চাপা গর্জনে গমগমিয়ে উঠল ম্যাকগিণ্টি।

ম্যাকমুর্দো কুণ্ঠিত ভাবে বলে—মাপ করবেন কাউন্সিলার। কথাটা না ভেবেই বলে ফেলেছি। আমি জানি আপনার আশ্রয়ে আমি কত নিরাপদ—আপনি কাটিংটা পড়ুন।

ম্যাকগিণ্টি কাটিংটা টেনে নিয়ে চোখের ওপর তুলে ধরল।

পড়তে পড়তে তার ভুরু কুঁচকে উঠল, আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

খবরটা মানুষ খুনের।

চুয়াত্তরের নববর্ষের প্রথম সপ্তাহে মার্কেট স্কোয়ারের লেক সেলুনে জোনাস পিন্টোকে কিভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে তার বিবরণ।

চুরুটের গোড়া চুষতে চুষতে ম্যাকগিণ্টি কাগজটা ফিরিয়ে দিল।

—পিণ্টোকে গুলি করেছিলে কেন?

—আমার তৈরি ডলার বাজারে ছড়িয়ে দিত পিন্টো। পরে নিজেই নাকি দল করেছিল। অত খোঁজ নেবার সময় ছিল না আমার। সিসের বুলেটে মগজ ফুটো করে দিলাম।

—বাঃ, প্রথমে ডলার জাল, তারপর মানুষ খুন—তারপর চলে এলে এই কয়লা উপত্যকায়—

—হ্যাঁ, শুনেছি এখানে এসব নিয়ে কেউ খুব একটা মাথা ঘামায় না।

—বাহাদুর বটে। এরকম সঙ্গীই আমার দরকার—অনেকেই আমাদের টিট করতে চায়—এবারে তাদের মোকাবেলা করা যাবে।

ম্যাকগিণ্টির উৎফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে ম্যাকমুর্দো বলে উঠল—নিশ্চয়, স্যাঙাৎদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমিও অনায়াসেই রাস্তা সাফ করে দিতে পারি।

—সে যে তুমি পার, বুঝতে পেরেছি—চোখের পাতা একটুও কাঁপেনি পিস্তল দেখে।

খাটো পুরো ওভার কোটের পাশ পকেট থেকে ট্রিগার তোলা পিস্তল টেনে বার করে ম্যাকমুর্দো, বলে, কাঁপবে কেন, আমি তো প্রস্তুতই ছিলাম, আপনার পিস্তল চোট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার গুলিও আপনার বুকে ঢুকে যেত।

কথাটা শুনে মুহূর্তের জন্য কঠিন হয়ে উঠল ম্যাকগিণ্টির মুখ। পরমুহূর্তে হা—হা করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

বলল—স্পর্ধা আশ্চর্য করবার মতই বটে।

এমন সময় আচমকা দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল টেড বল্ডউইন। জ্বলন্ত চোখে ম্যাকমুর্দোকে নিরীক্ষণ করে রুক্ষকণ্ঠে বলে, আমার আগেই আসা হয়েছে দেখছি। কাউন্সিলার, এই লোকটা সম্পর্কে আপনার সঙ্গে কথা আছে।

সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকমুর্দো বজ্রকণ্ঠে বলে ওঠে—এখানে আমার সামনেই বলা হোক।

বল্ডউইন বলে ওঠে—আমার খুশি মত আমি বলব। বলে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে যেন দগ্ধ করতে লাগল প্রতিদ্বন্দ্বীকে।

ম্যাকগিণ্টি পিপে থেকে নেমে এসে বলল, বল্ডউইন, নতুন ব্রাদারের সঙ্গে এমন ব্যবহার অসঙ্গত, দু'জনে মিটমাট করে নাও।

—অসম্ভব।

ম্যাকমুর্দো বলে, কাউন্সিলার, আমাদের ব্যাপারটা যে কোন ভাবে লড়ে মিটিয়ে নিতে চেয়েছি আমি, আপনিই এবারে বিচার করুন।

—ব্যাপারটা কি নিয়ে?

একটি মেয়েকে নিয়ে দুজনের বিরোধ একথা শুনে ম্যাকগিণ্টি হাসতে হাসতে বলে, লজের ব্রাদারদের মধ্যে যখন ব্যাপারটা তখন আমি বলব, নিষ্পত্তির ভারটা মেয়েটির ওপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বল্ডউইন বলে—এ কি আপনার ঠিক বিচার হল?

—এই আমার বিচার, তোমার কি তাতে আপত্তি আছে?

—কাউন্সিলার, আজ পাঁচ বছর আমি আপনার পাশে পাশে রয়েছি—আর যাকে আজ নতুন দেখছেন, আপনি তার জন্য সব ভুলে গেলেন? মনে রাখবেন, সামনে বডিমাস্টার নির্বাচনের ভোটাভুটির সময়—

বল্ডউইন কথাটা শেষ করে উঠতে পারল না। বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ম্যাকগিণ্টি তার টুঁটি টিপে ধরল। তারপর এক ঝটকায় শূন্যে তুলে পিপের ওপর ছুঁড়ে ফেলেদিল।

ম্যাকমুর্দো ছুটে গিয়ে তাকে আটকালো—নইলে উন্মত্ত ক্রোধে বল্ডউইনকে মেরেই ফেলত।

ঝটকা মেরে টুঁটি ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল ম্যাকগিণ্টি।

বল্ডউইনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত থর থর করে কাঁপছে। খাবি খেতে খেতে কোন রকমে উঠে সে পিপের ওপরে বসল। তার ফ্যাকাসে মুখে ভয়াবহ আতঙ্কের ছায়া।

বজ্রনাদে বলল ম্যাকগিণ্টি—টেড বল্ডউইন, কিছুদিন থেকেই তুমি যে বাড়াবাড়ি শুরু করেছ তা আমার নজর এড়ায় নি মনে রেখো। বডিমাস্টার কে হবে না হবে লজের সদস্যরাই ভোটাভুটিতে তা ঠিক করবে।

কিন্তু যদ্দিন আমি চিফ থাকব, তদ্দিন আমার বিচার নিয়ে কথা বলতে কাউকে দেব না।

বল্ডউইন ক্ষীণকণ্ঠে বলল, আপনার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই বস।

ব্যস, মুহূর্তে ম্যাকগিণ্টির হিংস্র মূর্তি পরিবর্তিত হয়ে গেল। খোলসা মেজাজে বলল, তাহলে তো সব মিটেই গেল। এস সকলে মিলে ঝগড়া মিটিয়ে নেয়ার মদ্য

পান করি।

বল্ডউইন আর ম্যাকমুর্দোকে নিয়ে মদ্য পান করল ম্যাকগিন্টি।

হাতে হাত মেলাল ম্যাকমুর্দো ও বল্ডউইন।

কিন্তু বল্ডউনের চোখের দৃষ্টি ও দৃঢ় চোয়াল দেখেই বোঝা গেল, সে মন থেকে ব্যাপারটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি।

ম্যাকগিন্টি সশব্দে দুজনের কাঁধ চাপড়ে বলল, বডি মাস্টারকে মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িয়ো না—ওসব ঝামেলা ছুঁড়িটাই মেটাক। ব্রাদার ম্যাকমুর্দো—লজ ৩৪১-এ নাম লিখিয়ে নিও।

মনে রেখো শিকাগোর নিয়মে আমরা চলি না—আমাদের কাজ কারবার আলাদা রকমের।

প্রতি শনিবার রাতে আমাদের অধিবেশন বসে—এসো কিন্তু।

সেই রোমাঞ্চকর রাতের চাঞ্চল্যকর ঘটনার পরদিনই ম্যাকমুর্দো বৃদ্ধ জ্যাকব শ্যাফটারের বাড়ি ছেড়ে দিল। উঠে এল শহরের প্রান্তে বিধবা ম্যাকনামারার বাড়িতে। এর কিছুদিন পরেই ট্রেনের বন্ধু স্ক্যানল্যানও এসে উঠল একই আস্তানায়। একই সঙ্গে বাস করতে লাগল দুজনে।

গৃহকর্ত্রী মিসেস ম্যাকনামারা আইরিশ মহিলা। যথেষ্ট উদার এবং সরল। বোর্ডারদের কোন ব্যাপারে নাকগলায় না।

দূরে চলে এলেও এট্টির সঙ্গে মেলামেশায় কিন্তু ভাটা পড়ল না ম্যাকমুর্দোর। বরং এই বিরহ-মধুর দূরত্ব তাদের সম্পর্ক আবো নিবিড় করল—পরস্পরের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হল।

ম্যাকমুর্দো এই নতুন আস্তানায় নির্বিঘ্নে তার কাজ শুরু করে দিয়েছিল। জাল টাকার ছাঁচ তৈরি করে মেকী মুদ্রা বানাতে লাগল। সেগুলো এমনই নিখুঁত হল যে, লজের ব্রাদাররা চুপিচুপি এসে সেসব নিয়ে যেত এবং স্বচ্ছন্দে বাজারে চালাত।

লজের ব্রাদারদের কাছে ব্যাপারটা রহস্যময়ই ঠেকত। এমন মহাগুণের অধিকারী হয়ে কেন যে ম্যাকমুর্দো সামান্য একটা চাকরি নিয়ে মেতে আছে তা তাদের মাথায় ঢুকত না।

ম্যাকমুর্দো বলত, ভায়া, চোখে পড়ার মত একটা কাজ না থাকলে পুলিশের নেক নজরে পড়ে যেতে হয় যে।

ইতিমধ্যে লজে এক সন্ধ্যায় এমন একটা ঘটনা ঘটল যে একদিনেই ম্যাকমুর্দো লজের ব্রাদারদের চোখে বিস্ময় ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠল।

সন্ধ্যার দিকে ম্যাকগিন্টির সেলুনে গিয়ে সে আড্ডা জমাত।

উপত্যকার বিপজ্জনক দুর্বৃত্তরা জমায়েত হয়ে এ সময়ে নিজেদের কীর্তি নিয়ে

গল্পে আর পানভোজনে মেতে থাকত।

মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা নিয়ে থাকে এরা, তাই বেপরোয়া আচার আচরণ আর সাহসিকতা স্বভাবতই তাদের কাছে কদর পেত।

ইতিমধ্যেই ম্যাকমুর্দো নির্ভয়ে কথাবলা ও বেপরোয়া স্বভাবের জন্যে অনেকেরই প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

সেদিন রাতে, সেলুন জমজমাট।

ম্যাকগিন্টি বার কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গল্পগুজবে মত্ত। এমন সময় মোলায়েম নীল রংয়ের ইউনিফর্ম পরা একটা লোক গটগট করে ভেতরে ঢুকল। তার মাথায় কোল অ্যান্ড আয়রন পুলিশের চূড়া-উঁচু টুপি।

রেল আর কয়লা খনির মালিকদের সম্মিলিত উদ্যোগে তৈরি বিশেষ আরক্ষা বাহিনীর এই ব্যাজ। সিভিল পুলিশ সংঘবদ্ধ গুণ্ডামি দমনে অসহায় হয়ে পড়ায় এই বিশেষ বাহিনীর সৃষ্টি।

বিশেষ পোশাকের লোকটি ঘরে ঢুকতেই চারপাশের গুঞ্জন থিতিয়ে গেল ; কৌতূহলী চোখ নিবদ্ধ হল তার দিকে। কাউন্টারে এসে পুলিশ অফিসার বলল, দেখি একটা সোডাছাড়া হুইস্কি।

ম্যাকগিন্টি পাশেই দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। তার দিকে তাকিয়ে অফিসার বলল, কাউন্সিলার, মনে হয় এই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ।

ম্যাকগিন্টি মুখ ফিরিয়ে নির্ভেজাল কণ্ঠে বলল, আপনিই নিশ্চয় নতুন ক্যাপ্টেন?

—ঠিকই ধরেছেন। শহরের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে শীর্ষস্থানীয় নাগরিকদের সহযোগিতা আমাদের দরকার। আমার নাম ক্যাপ্টেন মার্ভিন—কোল অ্যান্ড আয়রনের ক্যাপ্টেন মার্ভিন।

শান্ত শীতল স্বরে ম্যাকগিন্টি বলল, শান্তিরক্ষার ব্যাপারে আমাদের পুলিশই যথেষ্ট ছিল ক্যাপ্টেন। আমদানি করা পুলিশ মানে তো ধনিক গোষ্ঠীর ভাড়াটে মাত্র—সাধারণ নাগরিকরা আর কি সাহায্য পাবে আপনাদের কাছ থেকে!

পুলিশ অফিসার গেলাস খালি করে কাউন্টারে রাখতে রাখতে বলল, আমরা তো কর্তব্য করতে এসেছি কাউন্সিলার, চোখে যেমন দেখব কাজও সেভাবে করব।

বলতে বলতেই অফিসারের চোখ পড়ল জ্যাক ম্যাকমুর্দোর ওপর। ঠিক পাশেই ভ্রূকুটি হয়ে দেখছিল সে। অফিসার বলে উঠল—আরে আরে অনেকদিনের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মনে হচ্ছে!

ধীর পদক্ষেপে সরে এসে ম্যাকমুর্দো বলল, আপনার বন্ধু আমি কোনকালেই ছিলাম না। ছুঁচো টিকটিকিদের সঙ্গে বন্ধুত্বের তো প্রশ্নই আসে না।

—তুমি শিকাগোর জ্যাক ম্যাকমুর্দো না?

—ঠিকই ধরেছেন—নিজের নাম স্বীকার করতে লজ্জা পাব ভেবেছিলেন নাকি?

—জ্যাক, কয়লা গাদায় আসার আগে শিকাগোয় অফিসার ছিলাম অনেক দিন, তোমাকে চিনতে আমার ভুল হয়নি।

ম্যাকমুর্দো এবারে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে বলল—আপনিই কি শিকাগো সেন্ট্রালের মার্ভিন?

—হ্যাঁ, টেডি মার্ভিন, তোমার সেবায় আবার এসেছি। জোনাস পিন্টোকে গুলি করে মারার ঘটনা এখনো ভুলিনি। জাল টাকা তৈরি, মানুষ খুন—এসব অপরাধ সত্ত্বেও—অকাট্য প্রমাণের অভাবে তোমার বিরুদ্ধে কেস খাড়া করা যায়নি—তবে—

—তবে আবার কি?

—এখানে এসেছ বেশ করেছ, তবে যদ্দিন সুবোধ হয়ে থাকবে, তদ্দিন মুখ খুলব না, বেচাল দেখলেই কিন্তু এবারে আর ছেড়ে কথা কইব না মনে রেখো—চলি— গুডনাইট কাউন্সিলার।

ক্যাপ্টেন মার্ভিন চলে গেল। কিন্তু ম্যাকমুর্দোর ডাকাবুকো নামটা ফিরতে লাগল মুখে মুখে। মদ্যশালার বিশৃঙ্খলার মধ্যেও চারদিক থেকে ছেঁকে ধরে সকলে করমর্দন করল তার সঙ্গে।

শনিবার—লজের অধিবেশনের দিন উপস্থিত হল।

ইউনিয়ন হাউসের বড় হলঘরে সমবেত হয়েছে প্রায় জনা ষাট সদস্য। সারা কয়লা জেলায় ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন লজের মোট সদস্য সংখ্যা প্রায় পাঁচ শ জন।

অধিবেশনের দিন নতুন প্রার্থীকে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান মেনে দলভুক্ত হতে হয়। ভারমিসা উপত্যকায় স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরার ছাড়পত্র মেলে দলভুক্তির পর থেকে।

আসাবাবহীন অধিবেশন কক্ষের প্রকাণ্ড লম্বা টেবিলের চারধারে যার যার আসনে বসেছে সদস্যরা। পাশের টেবিলে অসংখ্য বোতল আর গেলাস জড় করা।

ম্যাকগিন্টি বসেছে টেবিলের শীর্ষে। মাথায় কালো মখমলের টুপি, ঘাড়ের ওপর বেগুনি রঙের শাল। তার ডাইনে বাঁয়ে লজের বিশিষ্ট সদস্যরা। টেড বল্ডউইনও রয়েছে তাদের মধ্যে।

পদমর্যাদার প্রতীক স্বরূপ প্রত্যেকেই একটা শাল বা মেডেল চাপিয়েছে গায়ে। এদের অধিকাংশই বয়স্ক। বাঘের মত হিংস্র তাদের চেহারা।

বাদবাকী সকলেরই বয়স আঠোরো থেকে পঁচিশের মধ্যে। এরাই যে বিপজ্জনক মানুষখুনীর দল—বাইরের চেহারা দেখলে অনুমান করাই কষ্ট।

জীবনে যাকে কোন দিন দেখেনি, যে লোক কোনদিন তাদের ক্ষতি

করেনি—পাশবিক উল্লাসে তারা তাকে অবলীলায় খুন করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

কে কার আগে খুন করবে—এই নিয়ে হয় তাদের মধ্যে হারজিতের বাজি। আগে কাজে গোপনীয়তা থাকত। কিন্তু শান্তিরক্ষক পুলিশের আইনের ব্যর্থতা তাদের এমনই সাহসী করে তুলেছে যে এখন খোলাখুলি কাজ চালাতে এরা ইতস্ততঃ করে না।

কোন খুনেরই সাক্ষী পায় না পুলিশ ; এদের অসংখ্য লোক তৈরি থাকে মিথ্যা সাক্ষী দেবার জন্য। তাছাড়া জলের মত টাকা খরচ করে সেরা আইনজীবী নিয়োগ করে এরা লড়বার জন্য। পুলিশ আরও আতান্তরে পড়ে লজের বিশেষ কৌশলের কাছে। এক লজের সদস্য অন্য লজের হয়ে কাজ করে দিয়ে যায়—যাতে স্থানীয় লোক তাদের চিনতে না পারে। দীর্ঘ দশ বছর চলছে স্কোরারদের এই অত্যাচার নির্বিবাদে।

ম্যাকমুর্দোকে যে কি ধরনের আচার অনুষ্ঠানের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে তা তাকে বলা হয় নি। তবু সে সব রকম অবস্থার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে ছিল।

অধিবেশন শুরুর প্রথমেই ভাবগম্ভীর দুজন ব্রাদার ওকে নিয়ে গেল বাইরের একটা ঘরে। তারপর বডিমাস্টারের হুকুমে তার কোট খুলে জামার আস্তিন গুটিয়ে দেওয়া হল। পরে চোখ বেঁধে পুরু কালো কাপড়ের টুপি পরিয়ে ঢেকে দেওয়া হল মুখ। কনুইয়ের পাশ দিয়ে দড়ি গলিয়ে বাঁধা হল শক্ত করে।

এভাবে ম্যাকমুর্দোর জগৎ অন্ধকার করে দিয়ে তাকে আবার নিয়ে আসা হল অধিবেশন কক্ষে!

এমন সময় কাপড়ের আবরণ ভেদ করে ম্যাকগিন্টির গলা ম্যাকমুর্দোর কানে পৌঁছল।

—জ্যাক ম্যাকমুর্দো, তুমি কি এনসেন্ট অর্ডার অব ফ্রীম্যানের সদস্য?

জবাব দেয় ম্যাকমুর্দো—সিকাগোর ২৯ নম্বর লজের মেম্বার।

—অন্ধকার রাত অস্বস্তিকর—

—পথ যে চেনে না তার কাছে—

—আকাশ বড় মেঘলা—

—হ্যাঁ, ঝড় আসছে।

—ব্রাদাররা সন্তুষ্ট?

এবারে সম্মিলিত কণ্ঠে চারপাশ থেকে সম্মতিসূচক কলরব ভেসে আসে।

—ব্রাদার ম্যাকমুর্দো, তোমার পাল্টা ধ্বনি থেকেই বুঝেছি তুমি আমাদেরই একজন। এবার তোমাকে কয়েকটা পরীক্ষা দিতে হবে—তুমি রাজী তো?

—নিশ্চয়ই।

—তাহলে সামনে এক কদম এগিয়ে তার প্রমাণ দাও।

কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাকমুর্দো অনুভব করল সূচের মত তীক্ষ্ণ কিছু যেন তার দুই চোখের ওপরে চেপে বসেছে। এক পা এগোলেই চোখ দুটি হারাতে হবে।

ম্যাকমুর্দো পরোয়া করল না—নির্ভয়ে পা বাড়ালো সামনে। অমনি তীক্ষ্ণ ফলাদুটোর চাপ মিলিয়ে গেল চোখের ওপর থেকে।

চারদিকে সরব হয়ে উঠল প্রশংসার মৃদু গুঞ্জন।

—তোমার কলজের জোর প্রশংসা করবার মত। যন্ত্রণা কেমন সইতে পার ব্রাদার?

—সবাই যা পারে আমিও তা পারি।



—দেখি কতটা পার।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অসহনীয় তীব্র একটা দহন-যন্ত্রণা তার বাহু ভেদ করে যেন শিরা উপশিরা পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

জ্ঞান হারাতে হারাতে কোন মতে ঠোঁটে দাঁত চেপে নিজেকে সামলাল ম্যাকমুর্দো।

অবর্ণনীয় সেই যন্ত্রণা গোপন করে সে কোন মতে বলল—এর চাইতেও বেশি যন্ত্রণা আমি সইতে পারি।

প্রশংসার উচ্চরোল আর করতালিতে হল ঘর যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

একটানে তার মাথার ওপরকার আচ্ছাদন তুলে নেওয়া হল।

ম্যাকগিন্টি এগিয়ে এসে পিঠ চাপড়ে অভিনন্দন জানাল। বলল, ব্রাদার ম্যাকমুর্দো, এর আগেই তুমি আনুগত্য আর গোপনতার শপথ নিয়েছ। এবারে বল, যে কোন পরিস্থিতিতে বডিমাস্টারের শাসন মাথা পেতে নিতে তোমার আপত্তি আছে?

—বিন্দুমাত্র না।

—জান নিশ্চয়, শপথ ভঙ্গের একটাই শাস্তি—মৃত্যু।

—জানি।

—তোমাকে আনন্দের সঙ্গে ভারমিসার ৩৪১ নম্বর লজে স্বাগত জানাচ্ছি।

ইতিমধ্যে ম্যাকমুর্দোর কোট আনা হল। গায়ে গলাবার আগে একবার হাতের অবস্থাটা দেখে নিল।

বাহুর মাংসের ওপর জ্বলন্ত লোহা সেঁকার দাগ—দগদগে একটা চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে আছে—বৃত্তের মাঝে একটা ত্রিভুজ।

পাশ থেকে কয়েকজন ব্রাদার কোটের হাতা গুটিয়ে বাহুর ওপরে একই চিহ্ন দেখালো ম্যাকমুর্দোকে—লজের প্রতীক চিহ্ন।

দীক্ষান্ত অনুষ্ঠান হল মদ্যপান। তারপর শুরু হল সভার কাজ। ম্যাকগিন্টি দাঁড়িয়ে উঠে বলল, আজকের আলোচনা সূচীর প্রথমে রয়েছে একটা চিঠি।

ব্রেস্ট পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে ভাঁজ খুলে চোখের ওপর ধরে আবার বলল, চিঠিটা লিখেছে—মার্টন কাউন্টির ২৪৯ নম্বর লজের ডিভিশন মাস্টার উইন্ডন।

রে অ্যান্ড স্টারমাস নামে একটা কয়লা খনি আছে ওদিকে। মালিকের নাম অ্যানড্রুজ। এর লাশ ফেলতে হবে।

গত বছর ওদের লজের দুজন ব্রাদার এসে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে দিয়ে গিয়েছিল, তার প্রতিদানে এবার আমাদের দুজন এই কাজ করে দেবে। লজের কোষাধ্যক্ষ হিগিন্সের অধিনায়কত্বে করতে হবে কাজটা। আমাদের দুজন পাকা খেলোয়াড়কে গিয়ে হিগিন্সের সঙ্গে দেখা করতে হবে—ঠিকানা আমিই দেব—এখন বল কে ভলান্টিয়ার হবে?

সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকজন তরুণ হাত তুলল।

শ্যেন দৃষ্টিতে তাদের পর্যবেক্ষণ করে ম্যাকগিন্টি বলল—টাইগার করম্যাক, তুমি আর উইলসন যাবে।

গাঁট্টাগোট্টা পাশবিক চেহারার করম্যাক অমানুষিক নৃশংসতার জন্য টাইগার উপাধি পেয়েছে লজ থেকেই।

সে হাতে মুঠি পাকিয়ে দুর্লভ কিছু পাওয়ার মত উল্লাসে বলে উঠল কাউন্সিলার, পুরস্কার-টুরস্কার কিছু মিলবে তো?

—কাজের খাতিরে কাজ করে যাও, পুরস্কার নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না।

উইলসন জিজ্ঞেস করল, অ্যানড্রুজ লোকটার অপরাধ?

—অপরাধের বিচার তো তোমাদের নয়। ওখানকার লজই খতিয়ে বিচার করে সাজার ব্যবস্থা করেছে—আমাদের কাজ ওদের হয়ে জল্লাদগিরি করা। মার্টন লজেরও দুজন সামনের সপ্তাহেই এদিকে আসছে কিছু কাজ সারতে। মুখ বুজে কাজ করে যাওয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

এই সময় বল্ডউইন বলে ওঠে—ফোরম্যান ব্রেকার বড্ড বাড় বেড়েছে—গত সপ্তাহেই আমাদের তিনজন লোককে গলাধাক্কা দিয়েছে। এবার একে ফুলডোজ দেওয়া দরকার।

ম্যাকমুর্দো সব কথাই শুনছিল। পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করল—ফুলডোজটা কিসের।

—বাকশট কার্তুজের। অট্টহেসে বলল লোকটা।

ম্যাকমুর্দোর অপরাধপ্রবণ মন যেন চনমনিয়ে ওঠে উৎসাহে। বলে, লজের কোন কাজে সহযোগিতার সুযোগ পেলে আমি খুশি হতাম।

ম্যাকগিন্টি হেসে বলল, যথাসময়েই তোমার পালা আসবে ব্রাদার। তোমার কাজের উৎসাহ দেখে বুঝতে পারছি, তা তুমি নিখুঁত ভাবেই করতে পারবে। তবে আজ রাতে একটা ছোট্ট কাজ আছে, ইচ্ছা করলে যেতে পার। এব্বারে, কোষাধ্যক্ষ আমাদের ফান্ড সম্পর্কে কিছু বলবেন। মার্লি ক্রীকের চেস্টার উইলকক্সকে খুন করতে গিয়ে গত মাসে গুলি খেয়ে মারা গেছে জিম কারনাওয়ে। তার অসহায় বিধবাকে পেনশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

হিসাবের খাতা সামনে রেখে কোষাধ্যক্ষ জানাল, কোম্পানিগুলো ইদানিং দাদাপত্র ভালই দিচ্ছে। টাকাপয়সা যা আছে, যে কোন দায় দায়িত্ব মেটাবার পক্ষে তা যথেষ্ট।

এই সময় ব্রাদার মরিস নামে এক সদস্য উঠে দাঁড়িয়ে জানাল—কয়েকটি ছোট কোম্পানি কারবার বেচে দিয়ে চলে গেছে। আরও কয়েকটি কারবার গোটাবার তালে রয়েছে। এসব কেম্পানি কে কিনছে তা জানা দরকার আমাদের।

ম্যাকগিন্টি জবাবে বলল, ব্রাদার মরিস, আপনি যেসব খনি আর লোহার কারখানার নাম করলেন তার সবই কিনেছে ওয়েস্ট গিলমারটন জেনারেল মাইনিং কোম্পানি। কিন্তু কে কি কিনছে তা জেনে আমাদের কি লাভ?

মরিস বলল, শ্রদ্ধেয় হুজুর, আমার কথায় দয়া করে ভুল বুঝবেন না। এই কেনাবেচার ব্যাপারটা আমাদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি।

গত দশ বছর ধরে চলছে এই রকম বেচাকেনা। সবকটা ছোট্ট ব্যবসাদার কারবার গুটিয়ে নিচ্ছে। আর রেলরোড বা জেনারেল আয়রনের মত বিরাট বিরাট

কোম্পানি সেগুলো কিনে নিচ্ছে।

ছোট ব্যবসাদাররা আমাদের দাপটে মাথা তুলতে পারত না—আপস রফায় আসত, কিন্তু এই বড় কোম্পানিগুলো আমাদের তোয়াক্কা করবে না। কাড়ি কাড়ি টাকা ঢেলে সর্বশক্তি দিয়ে তারা আমাদের একে একে পাকড়াও করবে।

আমার বক্তব্য—ছোট ব্যবসাদারদের খুব বেশি না নিংড়ে তাদের ব্যবসা করবার সুযোগটাও অন্তত আমাদের রাখা উচিত। এরা প্রত্যেকে যেদিন পালিয়ে যাবে—সেদিন আমাদের সমিতির শক্তিও টাল খাবে।

মরিসের কথাগুলো ছুরির ফলার মত যেন গেঁথে গেল সবার বুকে। ঘরসুদ্ধ লোকের বুক কেঁপে উঠল। ভয়ার্ত মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল সদস্যদের মুখে।

ভ্রূকুটি কুটিল চোখে উঠে দাঁড়িয়ে ম্যাকগিন্টি বলল, ব্রাদার মরিস, ছায়া দেখে চমকে ওটা আপনার স্বভাব। নিজের মনের ভয় দিয়ে অন্যের উৎসাহ নষ্ট করা অপরাধ।

লজের সদস্যরা এককাট্টা থাকলে কোন শক্তিরই আমাদের স্পর্শ করার ক্ষমতা হবে না। এর আগে আদালতে বারবার তা যাচাই হয়ে গেছে।

ছোট কোম্পানিগুলো যেমন টাকা দিয়ে আমাদের সঙ্গে রফা করে নিত, বড় কোম্পানিরাও তাই করবে বলে আমি মনে করি।

বলতে বলতে ম্যাকগিন্টি উপস্থিত সদস্যদের সকলের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে পুনরায় বলল, আজকের মত সভা শেষ। এস, ভাইয়ে ভাইয়ে বন্ধন নিবিড় হোক এই আশা জানিয়ে আমরা খানাপিনা করব।

সেই রাতে খানাপিনার আসরে বসেই কাজের দায়িত্ব পেল ম্যাকমুর্দো।

এক সময় বডিমাস্টার ম্যাকগিন্টি বলল, হেরাল্ড পত্রিকার জেমস স্ট্যানজারকে তোমরা অনেকেই চেন। ইদানিং লোকটা আমাদের নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছে কাগজে। তাকে একটু কড়কে দেওয়া দরকার।

কয়েকদিন আগে সে আমাদের সরাসরি আক্রমণ করে কাগজে রিপোর্ট লিখেছে। তোমরাই বল, তাকে কি ধরনের সাজা দেওয়া উচিত।

—খুন খুন। চারদিক থেকে সরবে চিৎকার উঠতে থাকে।

হট্টগোল থামলে মরিস উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি সকল ব্রাদারকে একবার চিন্তা করে দেখতে বলছি—আমরা কি উপত্যকায় বড় বেশি চাপ সৃষ্টি করে ফেলছি না?

শেষ পর্যন্ত সবাই যদি এককাট্টা হয়ে রুখে দাঁড়ায় আমাদের অবস্থাটা কি হবে? জেমস স্ট্যানজার বৃদ্ধ মানুষ। এই জেলায় সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। এ লোককে খুন করলে শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হতে হবে আমাদের।

ক্রুদ্ধ বাঘের মত এবারে লাফিয়ে উঠল ম্যাকগিন্টি। মরিসের প্রতি জ্বলন্ত দৃষ্টি ফেলে বলল, ধ্বংস করবে কারা? পুলিশ? তারা আমাদের পোষা। আর সকলেই

আমাদের ভয়ে মূর্চ্ছা যায়।

আইন আদালত জজ জুরী—সেখানেও এর আগে অনেকবার আমাদের শক্তি পরীক্ষা হয়ে গেছে। সুতরাং মিথ্যে ভয় পাবার কোন কারণ নেই।

কিন্তু ব্রাদার মরিস, আপনি কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি, বিভিন্ন ভাবে ভয় সৃষ্টি করে আমাদের মনোবল ভেঙে দেখার চেষ্টা করছেন। আলোচনাসূচিতে যেদিন আপনার নাম উঠবে, সেদিন কিন্তু দুর্গতি ঠেকাতে পারবেন না।

ম্যাকগিন্টির এক হুঙ্কারেই কাজ হল। মরিস বিষণ্ণ মুখে সকল সদস্যের কাছে ক্ষমা চেয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন। কাঁপতে লাগলেন থর থর করে।

ম্যাকগিন্টি বলতে লাগল, স্ট্যানজারকে ফুল ডোজ দিলে বড্ড বেশি হৈচৈ হবে। পুলিশ মিলিটারি সব এসে জুটে যেতে পারে। লোকটা যাতে সাবধান হয়, সেভাবে একটু কড়কে দিয়ে এস। ব্রাদার বল্ডউইন—এ ভার তুমিই নাও। সঙ্গে আর কজনকে নিতে চাও?

—জনা ছয় দরকার হবে। বল্ডউইন অন্যসঙ্গী কজনের সঙ্গে ম্যাকমুর্দোকেও নিতে রাজি হল।

অতঃপর হৈ হুল্লোড়, মাতালদের চেঁচামেচির মধ্যে সভা ভঙ্গ হল। কিছু ব্রাদার মদ্যশালায় গিয়ে ঢুকল। কাজের ভার যাদের ওপর পড়েছে তারা দু'তিনজন করে বেরিয়ে গেল।

বাইরে কনকনে হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা।

কুয়াশা-মলিন আকাশ। আধখানা চাঁদ আকাশে।

একটা বড় বাড়ির সামনে উঠোনে গিয়ে জড় হল সকলে। বাড়ির গায়ে বড় বড় হরফে লেখা ভারমিসা হেরাল্ড। আলো ঝলমল চারদিক। বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসছে ছাপাখানার ঘটাঘট শব্দ।

বল্ডউইন সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে বলল, ভয় নেই, এই মুহূর্তে আমরা ইউনিয়নবারে রয়েছি—বারজন সাক্ষী তা বলবার জন্য তৈরি হয়ে আছে। তারপর ম্যাকমুর্দোকে নিচে দরজা প্রহরায় রেখে অন্য সকলকে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল তর তর করে।

পলকের মধ্যেই ওপরের ঘর থেকে বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার ভেসে এলো—সেই সঙ্গে ছুটোছুটির আওয়াজ, চেয়ার উল্টে পড়ার শব্দ।

এরই মধ্যে দৌড়ে চাতালে বেরিয়ে এল এক ভদ্রলোক—তার মাথার চুল সব সাদা। কিন্তু বেশি দূর এগুতে পারল না বৃদ্ধ—পেছন থেকে অততায়ীরা এসে চেপে ধরল তাকে।

ধপ করে একটা আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কঁকিয়ে উঠে মুখ থুবড়ে পড়ল

স্ট্যানজার। ছ ছটা লাঠি তার শরীরে পড়তে লাগল দমাদম। দীর্ঘ শীর্ণ শরীর কুঁকড়ে বেঁকিয়ে কাতরাতে লাগল বৃদ্ধ।

নারকীয় উল্লাসে মাথার ওপর লাঠি চালাচ্ছে বল্ডউইন। রক্তে লাল হয়ে গেছে সাদাচুল।

নিচে দাঁড়িয়ে সবই দেখছে ম্যাকমুর্দো। বৃদ্ধের মৃত্যু আসন্ন। একলাফে দৌড়ে ওপরে উঠে বল্ডউইনের লাঠি চেপে ধরল সে।

—মেরে ফেলবে যে—

হকচকিয়ে গেল বল্ডউইন, কিন্তু পরক্ষণেই মাথার ওপরে লাঠি উঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল—সরে দাঁড়াও—নতুন এসেই আমার কাজে বাগড়া দিচ্ছ—সাহস তো কম নয়।

সঙ্গে সঙ্গে হিপ পকেট থেকে পিস্তল টেনে বার করল ম্যাকমুর্দো।

—লাঠি নামাও, নইলে মুণ্ডু উড়িয়ে দেব। লজের নির্দেশ খুন করা নয়—

সঙ্গীদের একজন সমর্থন করল ম্যাকমুর্দোকে।

ইতিমধ্যে রাস্তায় লোকজনের চেঁচামেচি শোনা গেল। নিচের হল ঘরেও কম্পোজিটর ও টাইপসেটাররা জড়ো হতে শুরু করেছে।

সম্পাদকের নিথর দেহটাকে সেভাবে ফেলে রেখে আততায়ীরা নিচে নেমে এসে রাস্তায় মিলিয়ে গেল।

পরের দিন দেরি করেই ঘুম থেকে উঠল ম্যাকমুর্দো। ব্রেকফাস্ট করে দীর্ঘ পত্র লিখল এক বন্ধুকে।

তারপর ডেলী হেরাল্ড পত্রিকা খুলল। হেরাল্ড অফিসে হামলার খবরটা বেশ গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়েছে।

মিঃ স্ট্যানজার মারাত্মক ভাবে শরীরের বহু জায়গায় জখম হয়েছেন, তবে প্রাণের আশঙ্কা নেই।

ম্যাকমুর্দো কাগজটা সরিয়ে রাখল। এমন সময় টোকা পড়ল দরজায়। গৃহকর্ত্রী একটি চিঠি নিয়ে ঢুকলেন।

—একটা ছেলে এইমাত্র চিঠিটা দিয়ে গেল।

ম্যাকমুর্দো চিঠি খুলে পড়ল ঃ মিলার হিলে যেখানে পতাকা উড়ছে, তার পাশে আমি থাকব। একবার আসবেন, দুজনের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু কথা বলতে চাই।

ম্যাকমুর্দো বুঝতে পারল না চিঠিটা কার। এট্টির লেখা সে চেনে। তবু মনস্থির করে ফেলল।

শহরের ঠিক কেন্দ্রে পাবলিক পার্কের নাম মিলার হিল। এখান থেকে শহরটাকে আগাগোড়া দেখা যায়।

ম্যাকমুর্দো পাতাকাবাহী দণ্ডের কাছে গিয়ে দেখল, একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে—টুপি টেনে নামানো, ওভার কোটের কলার টেনে তোলা। চিনতে পারল ম্যাকমুর্দো লোকটাকে—ব্রাদার মরিস।

লজের প্রতীকধ্বনি বিনিময়ের পর দুজনের কথাবার্তা হল।

মরিস সংসারী সাধারণ মানুষ। ফিলাডেলফিয়ার সোসাইটির মেম্বার ছিল একসময়। পেটের তাড়নায় পরিবার নিয়ে এখানে এসে একটা দোকান করেছে।

কিন্তু লজের সূত্রে গুপ্তঘাতকদের দলে ভিড়ে গিয়ে ভয়ে এবং অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

কাউকে বিশ্বাস করে সে মনের দুঃখ যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করবে তা-ও ভরসা পাছে না। ম্যাকমুর্দোকে তার নির্ভরযোগ্য মনে হওয়ায় তাকে ডেকে এনেছে এখানে।

ম্যাকমুর্দো পরিষ্কারই জানিয়ে দিল, সে মরিসের কোন উপকারই করতে পারবে না। তবে আজকের আলোচনার কথা গোপন রাখবে। সে কেবল একটা পরামর্শই দিল, এই মানসিক অবস্থায় মরিসের পক্ষে লজের সঙ্গে সঠিকভাবে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হবে মনে করছে না, মরিস যেন ব্যবসাপত্র বিক্রি করে দিয়ে দূরে কোথাও চলে যায়।

ফেরার পথে মরিস বলল, ওরা আমাকে সন্দেহ করে। কারুর নজরে আমরা পড়ে যেতে পারি, যদি জিজ্ঞেস করে বলবেন, আমার দোকানে কেরানীর কাজ করবার জন্য বলেছিলাম, আপনি রাজি হননি।

সেদিনই বিকেলে ম্যাকগিন্টির আকস্মিক আবির্ভাব ঘটল ম্যাকমুর্দোর ঘরে। সে তখন চুল্লির পাশে বসে।

প্রতীকধ্বনি বিনিময়ের পর দুজনে বসল মুখোমুখি চেয়ারে।

—একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে নেওয়ার জন্য এলাম ব্রাদার। তা—তোমার হাত কি রকম আছে?

স্থির দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে বলল ম্যাকগিন্টি।

—হাতের ব্যথা কি ভুলবার, তবে আপনাদের কাছ থেকে পাওয়া ভালবাসার তুলনায় কিছুই নয়।

—খুশি হলাম শুনে কথাটা। যারা অনুগত তারা এ ব্যথা হাসিমুখে সহ্য করে। আজ সকালে মিলার হিলে ব্রাদার মরিসের সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল?

ম্যাকমুর্দো একথাটাই আশা করছিল। জবাবটাও তৈরিই ছিল। ব্রাদার মরিস যেভাবে বলেছিল উচ্চ হাস্য সহকারে তাই শুনিয়ে দিল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে।

—এই ব্যাপার। তুমি রাজি না হয়ে ভাল করেছ। আর একটা কথা জানিয়ে রাখি—ব্রাদার মরিসের সঙ্গে বেশি মেলামেশা না করাই ভাল। বিদ্রোহী ব্রাদারের

সঙ্গে মেলামেশা করলে তোমাকেও বিদ্রোহী বলতে বাধ্য হব।

—লোকটাকে আমি মোটেই পছন্দ করি না—কেমন ভীরু স্বভাব, বলে ম্যাকমুর্দো, কাউন্সিলার, আপনি ছাড়া আমাকে বিদ্রোহী কেউ বললে কিন্তু এতক্ষণে মুখের ভূগোল পাল্টে দিতাম।

ম্যাকগিন্টি হেসে বলল, যথেষ্ট বলেছ। সময় থাকতে হুঁশিয়ার করব বলেই এলাম। ব্রাদার মরিসের ওপরে সব সময়ই আমার নজর রয়েছে—ঠিক আছে—

ম্যাকগিন্টির কথার মাঝখানেই আচমকা দরজা খুলে গেল। দেখা গেল টুপি মাথায় তিনজন পুলিশের লোক জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে রিভলভার টেনে বার করতে গেল ম্যাকমুর্দো।

এমন সময় ছ ঘড়া রিভলভার হাতে ইউনিফর্মধারী একজন ঢুকল ঘরে। কোল অ্যান্ড আয়রন কন্সট্যাবুলারির অফিসার ক্যাপ্টেন মার্ভিন। বলল—শিকাগোর বদমাস ম্যাকমুর্দো, টুপি নিয়ে চলে এসো।

এবারে গর্জে উঠল ম্যাকগিন্টি, ক্যাপ্টেন মার্ভিন, আইনভক্ত সজ্জন নাগরিকের বাড়িতে এভাবে হামলা করে আপনি কিন্তু কাজটা ভাল করছেন না।

—কাউন্সিলার ম্যাকগিন্টি, ম্যাকমুর্দোকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি আমরা, কর্তব্যে বাধা দেওয়া আপনার অনুচিত।

—ওয়ারেন্ট কোথায় আপনার? আমার বন্ধু ম্যাকমুর্দোর অপরাধটা কি?

—হেরাল্ড অফিসে চড়াও হয়ে বৃদ্ধ সম্পাদক স্ট্যানজারকে পিটানো।

হেসে উঠে ম্যাকগিন্টি বলল—তাহলে আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না ক্যাপটেন, কাল রাত বারোটা পর্যন্ত আমার সঙ্গে সেলুনে পোকার খেলেছে ম্যাকমুর্দো। ডজনখানেক সাক্ষী আমি হাজির করতে পারি প্রমাণের জন্য।

—যা করবার কাল কোর্টে গিয়ে করবেন। এখন আমাকে আমার কাজ করতে দিন।

ক্যাপ্টেন মার্ভিন কোন কথাই শুনলেন না। ম্যাকমুর্দোকে নিয়ে সদলবলে চলে গেলেন সদর দপ্তরে।

পুলিশ ফাঁড়িতে বল্ডউইন এবং আরও তিনজন অপরাধীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ম্যাকমুর্দোর। ওরা গ্রেপ্তার হয়েছে গতরাতে।

পরদিন দেখা গেল উচ্চতর আদালতে মামলা সুপারিশ করার মত সাক্ষ্য প্রমাণ পেলেন না ম্যাজিস্ট্রেট।

কম্পোজিটররা হানাদারদের দেখেছে বলল বটে, কিন্তু কাউকে সনাক্ত করতে পারল না।

ম্যাকগিন্টি তুখোড় আইনবিদও নিযুক্ত করেছিল, তার জেরার কাছে সাক্ষীদের সব কথাই ঝাপসা হয়ে গেল।

পরের দিন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী কাউন্সিলার স্বয়ং এবং দুজন নাগরিক সকলেই একবাক্যে বলে গেল, ঘটনা যখন ঘটে তারও বেশ কিছুক্ষণ পরে পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রত্যেকে ইউনিয়ন হাউসে তাস খেলছিল।

কেস টিকল না। বেকসুর খালাস পেয়ে কয়েদীরা বাইরে বেরিয়ে এল।

চড়া মেজাজের ফুর্তিবাজ জ্যাক ম্যাকমুর্দো খালাস হওয়ার পর যেন রাতারাতি দলের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে উঠল।

প্রবীণ সদস্যরাও তার মধ্যে এক উদীয়মান সম্ভাবনা দেখে নিজেদের মধ্যে তাকে নিয়ে রীতিমত আলোচনায় মেতে উঠল।

বল, বুদ্ধি, কূট চক্রান্ত—রক্ত ঝরানো যে কোন কাজে সে দলের মধ্যে অদ্বিতীয় হয়ে উঠল। স্বয়ং যে সর্বশক্তিমান বস, অপমান করে কথা বললে, তাঁকেও সে ছেড়ে কথা বলে না।

টেড বল্ডউইন এবং আরো কয়েকজন সদস্য ম্যাকমুর্দোর এই উন্নতি মোটেই ভাল চোখে দেখল না। বিদ্বেষ ও ঈর্ষায় তাদের বুক জ্বলতে লাগল। কিন্তু তাকে ঘাঁটাতে কেউ সাহস পেল না।

ম্যাকমুর্দো ক্রিমিন্যাল বলে পরিচিত হয়ে উঠেছে। এট্টির বাবা তার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে রাজি নয়। এমনকি তাকে বাড়িতে ঢুকতে দিতে নারাজ।

এট্টি নিজেও চিন্তা করে দেখেছে, একজন ক্রিমিন্যালকে বিয়ে করার পরিণতি কি হতে পারে। দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তায় রাত কাটিয়ে একদিন সে এসে হাজির হল ম্যাকমুর্দোর বাসায়।

ম্যাকমুর্দো ঘরেই ছিল। দু'চোখে জল নিয়ে এট্টি বারবার অনুরোধ করে বলল, জ্যাক, তুমি এ কাজ ছেড়ে দাও—চল আমরা দূরে কোথাও চলে যাই।

ম্যাকমুর্দো তাকে শান্ত করে কাছে বসিয়ে বলল, লজের গুপ্ত রহস্য যে জানে, তাকে আর লজ থেকে বেরোতে দেওয়া হয় না। তুমি এ নিয়ে ভেবো না। কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর, আমি সম্মানের সঙ্গে তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছি।

সেদিন ম্যাকমুর্দো এট্টিকে কথা দিল, এক বছর সময়ের মধ্যে সে স্কোরারদের দল থেকে বেরিয়ে আসবে। তারপর উপত্যকা ছেড়ে সকলকে নিয়ে বাইরে চলে যাবে।

এট্টি আশ্বস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

একদিন স্ক্যানল্যান একটা চিঠি পেল ম্যাকগিন্টির কাছ থেকে। ললার আর অ্যানড্রুজ নামে দুজন তাদের আস্তানায় আসছে একটা বিশেষ কাজ সারবার জন্য। সে এবং ম্যাকমুর্দো যেন তাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দেয়।

সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই এসে হাজির হল লজের দুই স্যাঙাৎ। রাতভর তাদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিয়েও ম্যাকমুর্দো তাদের কাজের কথাটা পেট থেকে বার

করতে পারল না।

ওদের একটাই বক্তব্য—কাজ শেষ হবার আগে কাজের কথা ফাঁস করা বারন।

ম্যাকমুর্দো ঠিক করল, আড়ালে থেকে তাদের কাজটা সে লক্ষ করবে। স্ক্যানল্যানকেও রাজি করাল।

দিন দুয়েক পরেই এক ভোররাতে অতিথিরা দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে শুনল ম্যাকমুর্দো।

সঙ্গে সঙ্গে স্কানল্যানকে বিছানা থেকে টেনে তুলল। তারপর দ্রুত জামাকাপড় পরে নিয়ে রাস্তায় নেমে এল।

তখনো ভোর হয়নি। পুরু বরফের আস্তরণ পথের ওপর।

সামনেই দুই মূর্তিমান চলেছে পাশাপাশি। তাদের পেছনে অনুসরণ করে চলল এরা।

শহরের শেষপ্রান্তে বোর্ডিং বাড়িটা। শহর ছাড়িয়ে রাস্তার ক্রসিং-এ আসতেই দেখা গেল সেখানে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে। ললার আর অ্যানড্রুজ তাদের সঙ্গে নিচু স্বরে কি আলোচনা করে নিল। তারপর পাঁচজনেই এগিয়ে চলল ক্রো হিলের দিকে।

ক্রো হিলের কারবার খুবই বড়। নিউ ইংলন্ডের ম্যানেজার জোসিয়া এইচ ডান শক্ত ধাতের মানুষ। এই অরাজক অঞ্চলের উচ্ছৃঙ্খলতা তার খনিতে এখনো ঢুকতে পায়নি।

চেপেবসা কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। সারিবদ্ধ ভাবে শ্রমিকরা কাজে চলেছে।

তাদের ভিড়ে মিশে গেল ম্যাকমুর্দো আর স্ক্যানল্যান।

খনিগর্ভে খাঁচা নেমে যাওয়ার দশ মিনিট আগের স্টীম হুইসল বেজে উঠল।

এগিয়ে এসে ইঞ্জিন হাউসের ছায়ায় ছড়িয়ে পড়ল পাঁচজনের ছোট্ট দলটি। খাদের টিলার ওপরে উঠে দাঁড়াল ম্যাকমুর্দো আর স্ক্যানল্যান।

ওখান থেকে স্পষ্ট দেখা গেল ইঞ্জিন হাউস থেকে বেরিয়ে আসছে খনি ইঞ্জিনিয়ার মেন্‌জিস।

স্কটল্যান্ডের মানুষ, বিশাল চোহারা, মুখভর্তি দাড়ি।

আসার পথেই পাঁচজনের দলটির ওপর চোখ পড়ল মেন্‌জিসের। প্রত্যেকেরই কপালের ওপর টেনে নামানো মাথার টুপি। কোটের কলার উল্টে মুখ পর্যন্ত ঢাকা।

ম্যানেজার এগিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে কেন? কে আপনারা?

কেউ কোন জবাব দিল না। অ্যানড্রুজ ছোকরা নিঃশব্দে দু পা এগিয়ে এসে গুলি করল ম্যানেজারের পেটে। স্তম্ভিত আতঙ্কে দৃশ্যটা দেখল খনি শ্রমিকরা।

গুপ্তঘাতকের দল পরপর গুলি করে পাশের ইট ছাই জঞ্জালের স্তূপে পেড়ে ফেলল ম্যানেজারকে।

মেনজিস এই দৃশ্য দেখে একটা লোহার স্প্যানার যন্ত্র তুলে নিয়ে তেড়ে এল। পর মুহূর্তে দুটি গুলি এসে লাগল তার বুকে ও মাথায়। মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়ল মেনজিস।

খনি শ্রমিকরা চিৎকার করতে করতে দল বেঁধে ছুটে আসতে লাগল। পাঁচমূর্তি তাদের মাথার ওপর দিয়ে পর পর দুবার গুলি বর্ষণ করল।

ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগল ভয়ার্ত শ্রমিকের দল।

এই সুযোগে কুয়াশায় মিলিয়ে গেল গুপ্তঘাতকের দল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জোড়া খুনের দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখল ম্যাকমুর্দো আর স্ক্যানল্যান।

সেই রাতে এই ডবল খুনের সাফল্যের আনন্দে ইউনিয়ন হাউসের লজ রুমে মদ্যপানের উৎসব হয়ে গেল।

ক্রোহিল খনির ম্যানেজার আর ইঞ্জিনিয়ারের পরও গোটা উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্তে পরের পর বেশ কয়েকটা গুপ্ত হত্যা ঘটে গেল।

বল্ডউইনের নেতৃত্বেও খুন হয়েছে একজন—গিলমারটন জেলার জনপ্রিয় খনি মালিক উইলিয়াম হেলম। ভয় আর আতঙ্কে থমথমে হয়ে উঠল উপত্যকার আবহাওয়া।

এর মধ্যে একদিন ম্যাকগিন্টি নিভৃতে ডেকে নিয়ে গেল ম্যাকমুর্দোকে।

—ম্যানডাস আর রিলি—এই দুজনকে সঙ্গে নেবে তুমি। চাকরিতে তাদের ধমকান হয়েছে—চেস্টার উইলকক্সের লাশ ফেলতে হবে। তোমারই উপযুক্ত কাজ। নিজে হাতে পরিষ্কার ভাবে করবে।

চেস্টার আয়রন ডাইক কোম্পানির চীফ ফোরম্যান। আগে যুদ্ধে ছিল। দুঁদে লোক—লোহাপেটা শরীর। লোকটাকে দুবার খতম করতে গিয়েও পারা যায়নি। আমাদের জিম কারনাওয়েকে খুন হতে হয়েছে গুলি খেয়ে।

তিন ছেলেমেয়ে বউ আর একজন ঠিকে কাজের মেয়েছেলে ছাড়া তার বাড়িতে আর কেউ থাকে না। কিছুই না—সদর দরজায় বোমার বারুদ রেখে পলতেতে আগুন ধরিয়ে দিলেই—কাজ হাসিল।

ম্যাকমুর্দো প্রথমে চেস্টার উইলকক্সের কোয়ার্টারের হদিস জেনে নিল। পরে বলল, মেয়েছেলে দুজন আর বাচ্চাদুটোর তো কোন দোষ নেই।

ম্যাকগিন্টি বলল, লোকটাকে ঘায়েল করতে হলে এছাড়া আর পথ নেই। কবে যাচ্ছ বল?

—দু একদিন সময় দিন, বাড়িটা দেখে একটা প্ল্যান তো করতে হবে।

—বেশ, সব ভার তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম। এ কাজটা যদি পরিষ্কার ভাবে সারতে পার তাহলে এই অঞ্চলের প্রত্যেকটি লজে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে তোমার নামে। এর পর আর কেউ মাথা তুলে আমাদের বিরুদ্ধে ট্যা ফোঁ করতে পারবে না।

পার্শ্ববর্তী উপত্যকায় মাইল পাঁচেক দূরে নিরালা বাড়িতে থাকে চেস্টার উইলকক্স। সেই রাতেই একলা বেরিয়ে পড়ল ম্যাকমুর্দো বাড়িটা দেখতে। তারপর শেষ বিকেলে ফিরে এসে কথা বলল দুই স্যাঙাতের সঙ্গে।

ম্যানডাস আর রিলি—দুজনেই চরম উচ্ছৃঙ্খল ছোকরা। খুনের নামে শিকারী বিড়ালের মত লাফিয়ে ওঠে।

দু রাত পরে শহর থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে। প্রত্যেকেই সশস্ত্র। একজনের হাতে একটা থলিভর্তি বোমার বারুদ।

চেস্টার উইলকক্সের বাড়ির সামনে পৌঁছালো রাত দুটোয়। আকাশে ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে শুক্লপক্ষের চাঁদ।

সদর দরজায় পৌঁছে, নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে একজন বারুদের থলি দরজায় ঠেসে দিয়ে রেখে গেল। পরে আর একজন গিয়ে ছুরি দিয়ে থলির গায়ে ফুটো করল—ঢুকিয়ে দিল পলতে। তারপর আগুন লাগিয়ে তিনজন দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নিল দূরে একটা নালার মধ্যে।

কয়েক পলকের মধ্যে ঘটল বিস্ফোরণ। বিকট শব্দ করে গোটা বাড়িটা মুহূর্তে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল।

সমিতির রক্ত-কলঙ্কিত ইতিহাসে এমন পরিষ্কার কাজের নজির খুব কমই আছে। কিন্তু ফলাফলটা হল অভাবনীয়।

পর পর কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়াতে সতর্ক হয়ে গিয়েছিল চেস্টার উইলকক্স। গোটা পরিবার নিয়ে তাই নিরাপদ অঞ্চলে পালিয়ে গিয়েছিল। বোমার বারুদে গুঁড়িয়েছে শূন্য ভবন।

ম্যাকমুর্দো বসকে বলল, চেস্টার উইলকক্সের দায়িত্ব আমাকে ছেড়ে দিন। সুযোগ মত আমি কাজ হাসিল করব। আমি লেগে থাকলে জানবেন ওর নিস্তার নেই।

ভোটের মাধ্যমে লজের প্রত্যেকেই অনুমোদন করল ম্যাকমুর্দোর প্রস্তাব।

তখনকার মত ধামাচাপা পড়ল ব্যাপারটা।

ফ্রিম্যান সমিতির কাজ কারবার কিন্তু থেমে থাকল না।

ম্যাকমুর্দো তখন বিশিষ্ট সদস্যদের একজন। ইনার ডিকন নিযুক্ত হয়েছে সে। তার পরামর্শ ছাড়া কোন কাজই এখন হয় না।

দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েকটা মাস।

মে মাসের শনিবারের এক সন্ধ্যা।

ম্যাকমুর্দো সাপ্তাহিক অধিবেশনে বেরুবার উদযোগ করছে। এমন সময় তার সঙ্গে দেখা করতে এল ব্রাদার মরিস। চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, উৎকণ্ঠায় মুখ কালো হয়ে গিয়েছে।

—মিঃ ম্যাকমুর্দো, আপনি বিশ্বাস রক্ষা করেছিলেন, তাই আবার আপনার কাছে এলাম কটি কথা বলতে।

—নির্ভয়ে বলতে পারেন। আমাকে বিশ্বাস করলে আমি বিশ্বাস ভঙ্গ করি না।

—মিঃ ম্যাকমুর্দো, আমি বুঝতে পারছি, সময় হয়ে এসেছে—কয়লা উপত্যকার ঢাল বেয়ে রক্তস্রোত বইবে। কথাটা না বলতে পেরে বড় কষ্ট পাচ্ছিলাম।

—অধীর হবেন না, খুলে বলুন কি হয়েছে।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে বলে উঠল মরিস—পেছনে আমাদের ডিটেকটিভ লেগেছে—পিনকারটনের নাম শুনেছেন?

—ঐ নামের কিছু লোকের নাম আমি শুনেছি।

—এরা বুনো হায়নার দল। পেছনে একবার লাগলে ছাড়ান পাওয়া অসম্ভব জানবেন।

—খুন করলেই ল্যাঠা চুকে যাবে।

—সে বড় ভয়ানক ব্যাপার হবে মিঃ ম্যাকমুর্দো। একজন খুন হবে—আর চিনিয়ে দিয়ে আমি নিমিত্তর ভাগী হব—এ বড় অসহ্য। কিন্তু আমি এখন কি করি বলুন?

—যা জানেন খুলে বলুন, লোকটা কে? এখন সে কোথায়?

—বলছি মিঃ ম্যাকমুর্দো, সবই খুলে বলছি। পূর্বাঞ্চলে একটা দোকান ছিল আমার। অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবও রয়েছে। তাদেরই একজন কাজ করে টেলিগ্রাফ অফিসে। গতকাল তার কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি—এই নিন চিঠিটা পড়ুন।

মরিসের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে চোখ বোলায় ম্যাকমুর্দো।

ভায়া মরিস,

তোমাদের ওদিককার স্কোরারদের অনেক কাহিনী কাগজে পড়েছি। সম্প্রতি কাজ করতে গিয়ে একটা খবর আমার হাতে পড়ল। পাঁচটা বড় কর্পোরেশন আর দুটো রেল কোম্পানি স্কোরারদের অরাজকতা দমনে উঠে পড়ে লেগেছে। বিখ্যাত পিনকারটন নিযুক্ত হয়েছে—ওঁদের সেরা গোয়েন্দা বর্ডি এডোয়ার্ডস কাজও আরম্ভ করেছেন। আশা করছি শিগগিরই আতঙ্ক-উপত্যকা আতঙ্কমুক্ত হবে। আর শোন, কাজের সূত্রে খবরটা জেনেছি—দ্বিতীয় কেউ যেন আর জানতে না পারে।

অস্থির হাতে চিঠিটা নাড়াচাড়া করে ম্যাকমুর্দো জিজ্ঞেস করে—এ চিঠির কথা আর কেউ জানে?

—কাউকে কিছু বলিনি।

—এভাবে লিখতে পারে আপনার বন্ধু এমন কেউ কি এ অঞ্চলে আছে জানেন?

—চেনাজানা দু-একজন থাকা তো সম্ভবই।

ম্যাকমুর্দোর যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এভাবে বলে উঠল—পিনকারটন ডিটেকটিভ—ঠিক আছে, বুঝতে পারছি লোকটা কে—মরিস, ব্যাপারটা আপনি আমার হাতে ছেড়ে দিন। আপনি সরে দাঁড়ান।

—কিন্তু—

—ভয় নেই, আপনার কোন দায় দায়িত্ব থাকবে না। সব ঝুঁকি আমার—মনে করবেন চিঠিখানা যেন আমিই পেয়েছি। মুখে চাবি দিয়ে রাখুন।

মরিসকে নিশ্চিন্ত করে বিদায় দিয়ে ম্যাকমুর্দো অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নিজেকে দোষী প্রতিপন্ন করা যায় এমন সব কাগজপত্র দ্রুতহাতে টেনে টেনে বার করে এনে সব নষ্ট করে ফেলল। তারপর লজে যাবার পথে ঢুকল বুড়ো শ্যাফটারের বাড়ি। জানলায় টোকা মারতেই এট্টি বেরিয়ে এল।

এট্টি তার মুখ দেখেই উদ্বিগ্ন হল।

—কি হয়েছে জ্যাক তোমার?

—বিশেষ কিছু নয়। শোন, তোমাকে কথা দিয়েছিলাম এ তল্লাট ছেড়ে চলে যাব। সময় উপস্থিত হয়েছে। তুমি বলেছিলে, আমার সঙ্গে আসবে।

—জ্যাক, আমরা সবাই বেঁচে যাব তাহলে এ যাত্রা!

—শোন এট্টি, উপত্যকায় শিগগিরই অনেক কিছু ঘটতে চলেছে—আমাদের অনেককেই পালাতে হবে। দিনে বা রাতে যখনই যাই না কেন—তোমাকে আসতে হবে আমাদের সঙ্গে।

—আসব জ্যাক, আমি আসব, তোমার পাশেই থাকব।

—তাহলে খবর পেলেই সবকিছু ছেড়ে ডিপোর ওয়েটিং হলে চলে আসবে।

—তুমি নিশ্চিন্ত থাক জ্যাক—খবর পেলেই আমি চলে যাব।

নিশ্চিন্ত হয়ে বিদায় নিয়ে ম্যাকমুর্দো চলে এল লজে। অনেকেই তখন এসে গেছে। চুরুটের ধোঁয়ায় দীর্ঘ ঘরের আলো ঝাপসা।

বডিমাস্টার ম্যাকগিন্টি, বল্ডউইন, শকুনিমুখ হ্যারাওয়ে সামনেই ছিল। তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল।

ভাবগম্ভীর মুখে আসনে বসেই উঠে দাঁড়াল ম্যাকমুর্দো। বলল, শ্রদ্ধেয় হুজুর, একটা জরুরী কথা আছে।

ম্যাকগিন্টি বলল—বল কি বলবে।

ম্যাকমুর্দো চিঠিটা পকেট থেকে বার করে বলল, শ্রদ্ধেয় হুজুর এবং লজের

ভাইগণ—একটা খারাপ খবর নিয়ে এসেছি আমি। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আগে খবরটা জেনে প্রস্তুত হওয়া ভাল।

একটা গোপন খবরে জানতে পেরেছি যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচটা অত্যন্ত শক্তিশালী সংস্থা একজোট হয়ে আমাদের নিকেশ করবার জন্য বডি এডোয়ার্ড নামে একজন পিনকারটন ডিটেকটিভ নিযুক্ত করেছে এ অঞ্চলে। সে খবরাখবর সংগ্রহ করতে নেমে পড়েছে। আপনারা প্রমাণ চাইবেন জানি। প্রমাণ আমার এই হাতের চিঠি। তবে এ চিঠি আমি কারু হাতে দিতে পারছি না—সত্যবদ্ধ হয়ে আছি।

বলে চিঠির বয়ানটা পড়ে শোনায় সকলকে।

একজন বয়স্ক ব্রাদার বলল—পিনকারটন সার্ভিসের সবসেরা গোয়েন্দা হিসাবে বডি এডোয়ার্ডসের নাম আমি আগেও শুনেছি।

ম্যাকগিন্টি কুঞ্চিত ভ্রূ তুলে বলল, তার চোহারাটা দেখে চিনতে পারে—এমন কেউ কি আমাদের মধ্যে নেই?

—আমি পারি। চোখে মুখে উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে বলে ম্যাকমুর্দো। আপনারা শুনে নিশ্চিন্ত হবেন—সে এখন আমাদের হাতের মুঠোয়—তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। এখন দরকার চটপট চড়াও হওয়া। আপনারা যদি আমাকে বিশ্বাস করেন আর সময় মত ঠিক ঠিক সহযোগিতা করেন তাহলে আর আমাদের কোন ভয় নেই জানবেন।

—ভয়টা কেন? ম্যাকগিন্টি প্রশ্ন করে।

—কাউন্সিলার, এ লোকের পেছনে ধনকুবেরদের কোটি কোটি টাকা কাজ করছে। আপনি কি বলতে চান টাকায় কেনা যাবে না এমন দুর্বল চিত্ত ব্রাদার আমাদের মধ্যে একজনও নেই? জানি না এতদিনে সব খবরই সে পেয়ে গেছে কিনা।

বল্ডউইন বলল, এ উপত্যকা ছেড়ে তাকে বেরুতে দেওয়া হবে না। কিন্তু তাকে চিনব কি করে?

—ব্রাদার বল্ডউইন, খুশি হলাম তোমার কথা শুনে। তবে শ্রদ্ধেয় হুজুর, ব্যাপারটা গুরুতর। প্রকাশ্যে এ নিয়ে আলোচনা করা আমি সঙ্গত মনে করি না। আমি প্রস্তাব করছি, একটা ট্রাস্টি কমিটি করা হোক—তাতে কাউন্সিলার নিজে, বল্ডউইন এবং আরও পাঁচজন থাকবেন। ট্রাস্টির সামনেই আমি মন খুলে কথা বলতে চাইছি।

প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হল।

চেয়ারম্যান আর বল্ডউইন ছাড়াও কমিটিতে রইল—সেক্রেটারী হ্যারাও, টাইগার করম্যাক, কোষাধ্যক্ষ কার্টার এবং উইলবি ভাই দুজন।

মাথার ওপর বিপদের কালো মেঘ। অনেকেরই বুকে কাঁপন ধরল। তাড়াতাড়ি

করে অধিবেশনের কাজ শেষ করে ট্রাস্টি কমিটি পরামর্শে বসল।

ম্যাকমুর্দো বলল, বডি এডোয়ার্ডস লোকটা স্ট্রীভ উইলসন নাম নিয়ে উঠেছে হবসন্স প্যাচ-এ। আগে কিছুই জানতাম না। চিঠিটা পাওয়ার পরই লোকটার পরিচয় পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে।

গত বুধবার গাড়িতে আলাপ। পেশায় সাংবাদিক বলে পরিচয় দিল আমার কাছে। স্কোরারস সম্পর্কে সব খবরাখবর তার চাই। খবরের কাগজে ছাপাবে।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাকে অনেক প্রশ্নই করল। বানানো গল্প শোনালাম তাকে। শুনে খুশি হয়ে বিশ ডলারের নোট গুঁজে দিল হাতে। বলল, যদি আরো খবর দিতে পারি তাহলে এর দশগুণ পাওয়া যাবে।

একজন জিজ্ঞেস করল, লোকটা যে খবরের কাগজের লোক বুঝলে কি করে?

ম্যাকমুর্দো বলল, কাঁচা কাজ আমি করি না। ও নেমে গেল হবসন্স প্যাচ-এ, আমিও নামলাম।

টেলিগ্রাম বুরোয় আমি যখন ঢুকেছি ও তখন বেরুচ্ছে।

কাউন্টারের ক্লার্কটাকে জপিয়ে জানতে পারলাম, লোকটা রোজ একখানা করে লম্বা টেলিগ্রাম পাঠায়—খবরগুলো পাঠায় এমন উদ্ভট কথায় যে কিছু বোঝার উপায় নেই। বেরুবার আগেই একখানা ফর্ম ভর্তি করে দিয়ে গেছে—অপারেটর দেখাল আমাকে।

ম্যাকগিন্টি খুশি গলায় বলল—বাহাদুর বটে। ধরেছ ঠিক। কিন্তু এখন কি করা উচিত বলে তুমি মনে কর।

কেউ কেউ এ সময় বলে ওঠে, এখুনি গিয়ে খতম করে দিলেই হয়।

ম্যাকমুর্দো বলে, হবসন্স প্যাচ-এ থাকে জানি, কিন্তু বাড়িটা চিনি না। তবে একটা ফন্দী এঁটেছি—আপনারাও শুনুন।

কাল সকালে প্যাচ-এ গিয়ে অপারেটরকে ভজিয়ে ঠিক ঠিকানাটা বার করে নেব। তারপর সোজা গিয়ে হাজির হব, পরিচয় দেব ফ্রিম্যান বলে।

ভাল দাম পেলে গুপ্তকথা ফাঁস করতে রাজী আছি জানাব। টোপ সে গিলবে নিশ্চিত। বলব রাত দশটায় বাড়িতে কেউ থাকবে না—এলে গোপন কাগজপত্র সব দেখাতে পারি।

লোকটা টোপ গিলবে এবং আমরাও তাকে কব্জায় পেয়ে যাব।

—তারপর?

—তারপর যা করবার আপনি করবেন। মিসেস ম্যাকনামারার বাড়ি খুবই নিরিবিলি। লোকটা যদি কথা দেয় আসবে তাহলে আপনাদের জানিয়ে দেব। সেই মত রাত নটার মধ্যেই আপনারা সাতজন হাজির থাকবেন আমার ঘরে।

উল্লসিত কণ্ঠে ম্যাকগিন্টি বলল—উত্তম। ম্যাকমুর্দো, তাহলে এই কথাই রইল। লড়াইটা এবার হবে সেয়ানে সেয়ানে—পিনকারটন সার্ভিসে শিগগিরই একটা পদ খালি হতে যাচ্ছে বলে আমার বিশ্বাস।

ম্যাকমুর্দো বলল—বাড়িতে ঢুকিয়ে খুন করলেই ল্যাঠা চুকে যায়—কেউ টেরও পাবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে তা করলে চলবে না। লোকটা কতটা জেনেছে, কিভাবে জেনেছে, কি কি খবর পাচার করেছে মালিকের কাছে সব তার কাছ থেকে বার করে নিতে হবে।

সব খবরই আমাদের দরকার—নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই। যেভাবেই হোক তাকে বলিয়ে ছাড়ব।

সে-রাতেই বন্দোবস্ত সব পাকা হয়ে গেল।

পরদিন সকালেই প্যাচওয়ে-তে হাজির হল ম্যাকমুর্দো।

তারপর কাজ শেষ করে বিকেলে ইউনিয়ন হাউসে গিয়ে জানাল—সে আসছে—রাত ঠিক দশটায়।

ম্যাকগিন্টি বলল—কিছু বার করতে পারলে? খুব বেশি কিছু কি জেনে ফেলেছে?

ম্যাকমুর্দো মুখ কালো করে বলল, ছ সপ্তাহ সে কাজ করে যাচ্ছে এখানে। অনেক খবরই সংগ্রহ করে পাঠিয়েছে।

ম্যাকগিন্টি চিৎকার করে বলে উঠল, লজে প্রত্যেকেই খাঁটি স্টীল—তবে নরম ধাতের লোক একমাত্র মরিস। যদি কেউ আমাদের পথে বসিয়ে থাকে তবে ঐ মরিস। ওর একটা ব্যবস্থা করা এখুনি দরকার।

ম্যাকমুর্দো বলে, লোকটা ভীরু স্বভাবের ঠিকই। আমার সঙ্গে কথাও হয়েছে কয়েকবার। তবে মনে হয়—এভাবে বেইমানি করার পাত্র নয়। তবে সে-সব বিচারের ভার আপনার।

একটা কথা কেবল বলব, যাই করেন না কেন—কালকের কাজটা শেষ করে করবেন।

এখন এমন কোন কাজ করা আমাদের ঠিক হবে না যাতে শহরের পুলিশে নাড়া পড়ে।

কাউন্সিলার, প্ল্যানমাফিক যাকে যা কাজ দেবার আপনি দেবেন। ঠিক সময়েই আসবেন আপনারা সবাই।

সে আসবে দশটায়। 'তিনবার' দরজায় টোকা দেবে—পাল্লা খুলে ভেতরে নিয়ে আসব আমি।

এরপর বৈঠকখানায় বসিয়ে কাগজপত্র আনতে যাচ্ছি বলে সেখানে বসিয়ে রেখে আপনাদের খবর দিয়ে যাব। তারপর আবার ফিরে যাব বৈঠকখানায়।

যেই পড়তে শুরু করবে—চেপে ধরব পিস্তল ধরার হাতটা। আমার চিৎকার শুনলেই আপনারা ঢুকে পড়বেন ঘরে।

ম্যাকগিন্টি বলল—খাসা প্ল্যান।

বাড়ি ফিরে আসন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য প্রস্তুতি নেয় ম্যাকমুর্দো। নিজের স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন রিভলবার পরিষ্কার করে গুলি ভরে রাখল। জানালার পর্দা ঠিকঠাক করে রাখল। স্কানল্যানকে বলল, ব্রাদার আমি যদি তুমি হতাম তাহলে রাতটা আজ অন্য কোথাও কাটাতাম। ভোর হবার আগে রক্তবন্যা বইবে এখানে।



স্ক্যানল্যান খুনখারাবি সইতে পারে না। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, বলছ যখন তাহলে রাতটা আর বাড়ি ফিরছি না। যা খুশি হোক এখানে।

ম্যাকমুর্দো নিশ্চিন্ত হয়ে ধন্যবাদ জানাল ওকে।

যথাসময়ে সকলেই এসে হাজির হল। প্রত্যেকেই সশস্ত্র। চেহারা এবং কুকীর্তির দিক থেকে কেউই তারা কম নয়। খুনের রক্ত লেগে রয়েছে প্রত্যেকেরই হাতে।

ঘরে বসিয়ে সকলকেই মদ পরিবেশন করল ম্যাকমুর্দো। তারপর জানালাগুলোব সামনে গিয়ে পর্দা এঁটে দিল। বলল, সময় হয়ে এসেছে। চুপ করুন।

কথা বলা সকলেরই বন্ধ হয়ে গেল। গেলাস থেমে রইল ঠোঁটের কাছাকাছি এসে।

ম্যাকমুর্দো কান খাড়া করে কি শুনল। তারপর বলল—খবরদার একদম শব্দ না। বলে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘরের ভেতরে দম বন্ধ করে কান খাড়া করে বসে রইল খুনির দল। ভেতর থেকে একটু পরেই শুনতে পেল, সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে ম্যাকমুর্দো। স্বাগত সম্ভাষণের দু'চারটে কথাও।

তারপর বাড়ির ভেতরে শুনতে পাওয়া যায় একটা অচেনা কণ্ঠস্বর। এরপরই দড়াম করে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ।

শিকার ফাঁদে ঢুকেছে—বুঝতে পারে সকলেই। নারকীয় উল্লাস দীপ্তি ছড়ায় খুনীদের চোখে মুখে। রক্ত ফুটতে থাকে টগবগিয়ে। কান খাড়া করে রাখে সকলেই।

এবারে বিড়বিড় করে কথা বলার শব্দ শোনা যায় পাশের ঘরে। তারপরই দরজা খুলে ঘরে ঢুকল ম্যাকমুর্দো। ঠোঁটে আঙুল চেপে। চশমার আড়ালে তার দুচোখ জ্বলছে প্রচণ্ড উত্তেজনায়। সাগ্রহে সবাই তাকিয়ে থাকে তার দিকে। কিন্তু কোন কথা বলে না ম্যাকমুর্দো।

ম্যাকগিন্টি যেন ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। বলে—কি হল? বাডি এডোয়ার্ডস ঢুকেছে বাড়িতে?

—হ্যাঁ ঢুকেছে, শান্ত স্বরে বলে ম্যাকমুর্দো। বাডি এডোয়ার্ডস তো সামনেই—আমিই বাডি এডোয়ার্ড।

আচম্বিতে ঘরের হাওয়াও যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। নিঃশ্বাস বন্ধ করে নিঃসীম আতঙ্কে কাঠ হয়ে সাত জোড়া চোখ তুলে সাত খুনী তাকায় সামনের মানুষটার দিকে।

অকস্মাৎ ঝনঝন শব্দে জানালার সার্সি ছিটকে গেল। প্রত্যেকটি জানালায় আবির্ভূত হল একটা করে রাইফেলের চকচকে নল।

আহত বাঘের মত গর্জন তুলে আধখোলা দরজার দিকে ঠিকরে গেল ম্যাকগিন্টি। কিন্তু থমকে যেতে হল।

উদ্যত রিভলভার সামনে ধরে দরজা আড়াল করে দাঁড়িয়ে কোল অ্যান্ড আয়রন পুলিশের ক্যাপ্টেন মার্ভিন। কেন্নোর মত কুঁচকে গিয়ে পেছু হটে এসে থপ করে বসে পড়ল চেয়ারে।

ম্যাকমুর্দো নামে এতদিন যে নিজের পরিচয় দিয়েছে—সে এই সময় বলে উঠল—কাউন্সিলার, যেভাবে আছেন সেভাবেই থাকুন। বল্ডউইন, রিভলভারের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নাও। ভুলে যেয়ো না চল্লিশজন সশস্ত্র পুলিশ বাড়ি ঘিরে আছে। মার্ভিন,ওদের পিস্তলগুলো কেড়ে নাও।

অতগুলো রাইফেলের সামনে বুদ্ধিমানের মতই বসে রইল সকলে নিষ্ক্রিয় হয়ে। সহজেই নিরস্ত্র করা হল সকলকে।

রহস্যময় ম্যাকমুর্দো এবারে বলল, কাউন্সিলার, এবারের মত এখানেই দেখা সাক্ষাৎ শেষ। আদালতে ফের দেখা হবে। এই কদিন আমাকে নিয়ে একটু মাথা খেলান। আমিই পিনকারটন ডিকেটিভ বাড়ি এডোয়ার্ডস।

আপনার ঘাতকসংঘ ভাঙবার জন্যই আমার আগমন এখানে। বড় বিপজ্জনক খেলায় নেমেছিলাম।

একমাত্র ক্যাপ্টেন মার্ভিন আর আমার মালিকরা ছাড়া এ দুনিয়ায় কেউ জানত না কী খেলায় আমি নেমেছি। আজ রাতেই খেল খতম করলাম। জিতলাম আমিই।

ঘৃণা ও জিঘাংসায় মুখ বিকৃত করে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সাত খুনী। রক্ত-হিম-করা সেই দৃষ্টি দেখে বাড়ি এডোয়ার্ডস বুঝল—পরিত্রাণ নেই তার এই জীবনে।

বলল, আপনাদের মনের কথা পড়তে পারছি না মনে করছেন? খেল খতম হয়নি যদি মনে করেন, তাহলে সেই চ্যালেঞ্জও নিলাম। আপনারা ছাড়াও আরও ষাটজন আজ শ্রীঘরের মুখ দেখবে।

তবে স্বীকার করতে আমার কুণ্ঠা নেই কাউন্সিলর, কাজে নামবার আগে বিশ্বাসই করতে পারিনি যে এমন একটা গুপ্তঘাতক সংঘের অস্তিত্ব থাকতে পারে। কাগুজে গুজব বলেই ধারণা ছিল আমার গোটা ব্যাপারটা।

শিকাগো গিয়ে তাই ফ্রি ম্যান হলাম আগে। সেখানকার সমিতির কাজ জনহিতৈষণার মত নিতান্তই সাধারণ শ্রেণীর।

শিকাগোর জীবনে কখনো নরহত্যা করিনি আমি। টাকা জালও করিনি কখনো। আপনাদের যা দিয়েছিলাম তার সব কটিই ছিল আসল ডলার।

দু'হাতে টাকাও ওড়াতে হয়েছে আপনাদের কাছের মানুষ হবার জন্য। সর্বদা এমন ভান আমাকে করতে হত—যেন পুলিশ ঘুরছে আমার সন্ধানে। কিন্তু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন—আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও কিছু বদ হয়ে যাইনি।

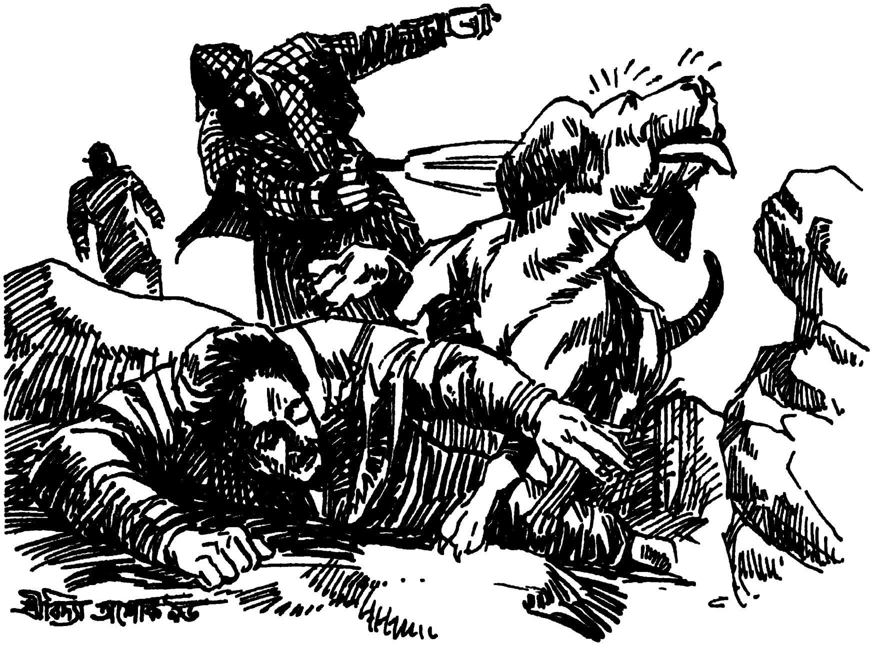
স্ট্যানজারকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল বল্ডউইন। আমিই গিয়ে তাকে আটকাই।

আগে থেকে খবর পাইনি বলে ডানকান আর ম্যানজিসকে বাঁচাতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। তাদের হত্যাকারীকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করব। চেষ্টার উইলকক্স—তাকেও আমি আগে থেকে খবর পাঠিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলাম।

কোন ভাবেই সন্দেহের উদ্রেক না হয়, সে ভাবে দলের মধ্যে মিশে থাকতে হয়েছিল বলে অনেক কুকর্মই বন্ধ করতে পারিনি আমি। তবে মনে করে দেখুন—অনেক ক্ষেত্রে শিকার যেখানে থাকবার কথা ছিল সেখানে থাকেনি। আপনারা ব্যর্থ হয়ে ফিরেছেন। যতটা সম্ভব গোপনে আমিই এসব করেছি।

দাঁতে দাঁত পিষে এসময় বলে উঠল ম্যাকগিন্টি—বিশ্বাসঘাতক।

হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিলস



একটা কাঠের ছড়ি।

মাথাটা কন্দাকৃতি, হাতলের ঠিক নিচেই ইঞ্চিখানেক চওড়া একটা রুপোর পটি—তার ওপরে খোদাই করা—জেমস মার্টিমার, এম. আর. সি. এস—কে. সি. সি. এইচ-এর বন্ধুবর্গ।

গতকাল রাত্রে দেখা করতে এসে এক ভদ্রলোক ছড়িটা ফেলে গেছেন। আজ সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে সেটাই হয়ে উঠল আমাদের দু'বন্ধুর গবেষণার বিষয়।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি। তিনি কে, কি করেন, দেখতে কেমন, কিছুই জানা নেই।

হোমস্ বলল—ছড়ি পরীক্ষা করে ভদ্রলোকের বর্ণনা কী রকম দিতে পারো দেখি।

বন্ধুবরের পদ্ধতি আমার অজানা নয়। সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে—বুঝতে পারলাম, ডক্টর মার্টিমার যথেষ্ট পয়সাওয়ালা চিকিৎসক—বয়স্ক—স্বীকৃতি স্বরূপ পরিচিতেরা শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে তাঁকে দিয়েছে ছড়িখানা।

এক কালের বাহারি ছড়ি এখন অনেক মলিন—ডগায় আঁটা লোহার টুপিও ক্ষয়ে এসেছে—ভদ্রলোক যে ছড়ি হাতে খুবই হাঁটাহাঁটি করেছেন বুঝতে কষ্ট হয় না। শহুরে চিকিৎসকের হাতের ছড়ি এত চোট খায় না—নিশ্চয় তিনি গ্রামের ডাক্তার।

সনাক্ত করণের পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ দেখিয়ে বন্ধুবরকে তাক লাগিয়ে দিয়েছি ভেবে বেশ আত্মপ্রসাদের দৃষ্টিতে তাকালাম হোমসের দিকে।

হোমস্ আমার হাত থেকে ছড়িটা নিয়ে আতস কাচ দিয়ে সেটার গায়ে কি পরীক্ষা করল। তারপর বলল, ভায়া ওয়াটসন, ভদ্রলোক গ্রামের ডাক্তার ঠিকই বলেছ, হাঁটেনও এন্তার। কিন্তু এর পরে তোমার সব সিদ্ধান্তই ভুল। অবশ্য তোমার ভুলগুলোই আমাকে সঠিক সিদ্ধান্তের পথ দেখিয়ে দেয়।

দেখ, উপহার জিনিসটা ডাক্তাররা সাধারণতঃ হাসপাতাল থেকেই পায়। রুগীদের কাছ থেকে বড় একটা ঘটে না।

হাসপাতালের নামের আগে সি পি লেখাটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে—শেরিং-ক্রস হাসপাতাল। তার মানে ভদ্রলোক গ্রামে আসার আগে শহরে প্র্যাকটিস করেছিলেন।

ছড়ির তারিখ দেখে বোঝা যায় হাসপাতাল ছেড়েছেন পাঁচ বছর আগে। শহরে জমজমাট প্র্যাকটিস না থাকলে চাকরি পাওয়া যায় না। আর যাদের প্র্যাকটিস ভাল তারা শহর ছেড়ে গ্রামে আসবেন কোন দুঃখে।

আমার যদ্দুর ধারণা ভদ্রলোক হাসপাতালে মাইনে করা ডাক্তার ছিলেন না। মানে হাউস সার্জন বা হাউস ফিজিসিয়ান হয়েই ছিলেন।

তাহলে দাঁড়াচ্ছেটা কি—ভদ্রলোকের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি।

উচ্চাশাহীন আর অন্যমনস্ক এই ভদ্রলোক গতকাল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসে ফিরে গেছেন। লাঠিটি পরীক্ষা করে আরো জানা গেল টেরিয়ারের চেয়ে একটু বড় এবং মাসটিফের চেয়ে একটু ছোট একটা কুকুরের তিনি মালিক।

হোমসের বিবরণ শুনে মেডিক্যাল ডাইরেকটরী নামিয়ে সহজেই নামটা খুঁজে পেয়ে গেলাম। দেখলাম—হোমসের অনুমানই ঠিক। শেরিংক্রস হাসপাতালে ভদ্রলোক ১৮৮২ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত হাউস সার্জন ছিলেন। প্যাথলজির ওপর প্রবন্ধ লিখে জ্যাকসন পুরস্কার লাভ করেন।

—কিন্তু ভদ্রলোকের কুকুরের হদিস তুমি পেলে কি করে?

—ছড়ির ওপরে কুকুরের দাঁতের দাগ দেখে। মাঝখানের ফাঁকটুকু থেকে চোয়াল কতটা চওড়া তা বোঝা যায়। আমার মনে হয়—কুকরটা স্প্যানিয়াল।

আমাদের আলোচনার মধ্যেই দরজায় বিজ্ঞান-সাধক ডক্টর জেমস মার্টিমারের আবির্ভাব হল।

ছিপছিপে লম্বা চেহারা, পাখির চঞ্চুর মত তীক্ষ্ণ নাক ; চোখে সোনার চশমা—উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

ঘরে ঢুকেই হোমসের হাতের ছড়িটার দিকে চোখ পড়ল। বললেন—বাঁচলাম—কোথায় যে ফেলেছি ছড়িটা ভেবে পাচ্ছিলাম না। বিয়ের পর হাসপাতাল ছেড়ে যাবার সময় বন্ধুরা দিয়েছিল। আমি নিশ্চয় মিঃ শার্লক হোমসের সঙ্গে কথা বলছি?

—হ্যাঁ—ইনি আমার বন্ধু ডক্টর ওয়াটসন—

—আপনাদের যুগল নাম এবং কীর্তি আমার অজানা নয়। পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। মিঃ হোমস্, হঠাৎ একটা গুরুতর সমস্যায় পড়ে আপনার শরণ নিতে হল। ব্যবহারিক বুদ্ধি আমার কম, তাই আপনার সাহায্য আমার দরকার।

—কি ধরনের সমস্যায় আমার সহযোগিতা আপনি চাইছেন?

ডক্টর মার্টিমার যথারীতি আসন গ্রহণ করে তাঁর কোটের পকেট থেকে একটা খাতা বার করে বললেন, এটা একটা পাণ্ডুলিপি—১৭৪২ খ্রীস্টাব্দের। একটা পারিবারিক পাণ্ডুলিপি।

স্যার চার্লস বাস্কারভিল আমার জিম্বায় রেখে গেছেন। আমি ছিলাম তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু এবং চিকিৎসক। মাস তিনেক আগে ডেভনশায়ারে আকস্মিকভাবে তাঁর শোচনীয় মৃত্যু ঘটে।

হোমস্ পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে হাঁটুর ওপর বিছিয়ে ধরল। হলদেটে ফিকে হয়ে আসা কাগজ। মাথায় লেখা বাস্কারভিল হল, ১৭৪২।

তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে দেখতে হোমস্ বলল, বিবৃতি বলে মনে হচ্ছে?

—হ্যাঁ, বাস্কারভিল পরিবারে বংশপরম্পরায় একটা কিংবদন্তী চলে আসছে—এটা সেই কিংবদন্তীর বিবরণী। মিঃ হোমস্, ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী—আমাকে আপনার সিদ্ধান্ত জানাতে হবে, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে। লেখাটা আপনাকে আমি পড়ে শোনাচ্ছি তাহলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন।

কৌতূহলী হোমস্ চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল।

ডক্টর মার্টিমার পড়তে লাগলেন ঃ

আমি হিউগো বাস্কারভিলের বংশধর হিসেবে বাস্কারভিল কুকুরের রহস্যময় উৎপত্তি সম্পর্কে বাবার মুখে যা শুনেছি তাই এখানে লিখে রাখছি।

আমি বিশ্বাস করি আমার পরবর্তী বংশধরগণ এ কাহিনী পড়ে সতর্ক হবে। পাপকর্মের সাজা বিধাতার অমোঘ বিধান। তবুও বিশ্বাস করি প্রার্থনা আর অনুতাপ অভিশাপ থেকে অব্যাহতি দেয়।

আমি আশা করব আমার পুত্রগণ পরিণামদর্শী হবে, যে কর্মফলের অভিশাপ আমাদের পরিবার বহন করে চলেছে, তার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে।

মহাবিপ্লবের সময়ে বাস্কারভিল জমিদারের এই খামারবাড়ি হিউগো বাস্কারভিলের অধিকারে ছিল। তিনি ছিলেন নাস্তিক এবং দুর্দান্ত প্রকৃতির মানুষ। উশৃঙ্খলতা এবং লাম্পট্যের জন্য তিনি গোটা পশ্চিম অঞ্চলে যথেষ্ট কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

বাস্কারভিল জমিদারির পাশেই এক তালুকদারের বসতি ছিল। একদিন হিউগো সেই তালুকদারের একমাত্র মেয়েটিকে খামারবাড়ি থেকে সাঙ্গপাঙ্গ দিয়ে তুলে নিয়ে এলেন। আটকে রাখলেন ওপরের একটি ঘরে। আর নিচে বসল মদ্যপানের আসর।

চিৎকার আর হৈ হট্টগোল শুনে ভাগ্যহীনা বন্দিনী মেয়েটি কিন্তু সাহস হারাল না। সে সাহসী ও তৎপর পুরুষ মানুষের মত বাড়ির দক্ষিণ দেয়ালের আইভী লতা বেয়ে নিঃশব্দে নেমে এল নিচতলায়।

তারপর সেই রাতে জলাভূমির ওপর দিয়ে রওনা হল বাড়ির দিকে। ন মাইল দূরে মেয়েটির বাবার খামার বাড়ি।

কিছুক্ষণ পরে খাদ্য পানীয় নিয়ে হিউগো এলেন ওপরে বন্দিনীর ঘরে। ঘর ফাঁকা দেখে তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না। শয়তান ভর করল তার কাঁধে।

সেই রাতেই মেয়েটিকে মাঝরাস্তা থেকে ধরে আনবার সংকল্প নিলেন তিনি। তার মাতাল বন্ধুরাও উৎসাহিত হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করল।

হিউগোর আদেশে ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া বার করা হল, কুকুরশালা থেকে নেওয়া হল হিংস্র কুকুরের দল। মেয়েটির ফেলে যাওয়া একটা রুমাল তাদের শোঁকান হল।

সারবন্দী হিংস্র কুকুর সঙ্গে নিয়ে হিউগো ঘোড়ায় চেপে চন্দ্রালোকিত জলাভূমির ওপর দিয়ে ছুটে চললেন।

তার পেছনে চলল তের জন বন্ধুর একটা দল ঘোড়ায় চেপে।

মাইল খানেক যাবার পর সেই দলটার সঙ্গে দেখা হল একজন মেষপালকের। তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল—হতভাগিনী মেয়েটিকে সে দেখেছে—পেছনে তাড়া করে চলেছে হিংস্র কুকুরের পাল।

হিউগো বাস্কারভিলকেও কালো ঘোড়ায় চেপে ছুটে যেতে সে দেখেছে—তার পেছনেও ছুটেছে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত একটা প্রকাণ্ড কুকুর।

এই সময়ই তাদের পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল হিউগোর কালো ঘোড়া—তার পিঠের জিন শূন্য—লুটোচ্ছে জলে। সেই দৃশ্য দেখে অজ্ঞাত আতঙ্কে তাদের রক্ত হিম হয়ে গেল।

সেই অবস্থাতেই আরও খানিকটা এগিয়ে গেল তারা।

জলাভূমির ঢালু মতন জায়গাকে আমরা বলি গয়াল। সেরকম একটা জায়গায়

গিয়ে কুকুরগুলোকে পেয়ে গেল তারা।

হিউগো বাস্কারভিলের প্রত্যেকটা কুকুরই সাহসী। কিন্তু সবকটা কুকুরই দল ল বেঁধে কেঁউ কেঁউ করছে সেই গয়ালে।

সবকটি কুকুরই কেমন অস্থির—কেউ ঘন ঘন মুখ তুলে তাকাচ্ছে সামনের বিস্তৃত সংকীর্ণ উপত্যাকার দিকে।

মাতালদের নেশা কেটে গেছে ততক্ষণে। সামনে এগুবার সাহস পাচ্ছে না কেউ। তবু তিনজনের একটা দল গায়ে গা লাগিয়ে খানিকটা আরও এগুলো।

ঢালু জায়গাটা শেষ হয়েই একটা প্রশস্ত চত্বর।

চাঁদের আলোয় ঝকমক করছে সেখানে খাড়া দুটো পাথর। চত্বরটার মাঝামাঝি জায়গায় দেখা গেল মেয়েটির নিষ্প্রাণ দেহ মাটিতে পড়ে রয়েছে।

পাশেই হিউগো বাস্কারভিলের দেহ। আর সেই দেহের পাশে দাঁড়িয়ে টুঁটি কামড়ে রয়েছে একটা অতিকায় জীব—অনেকটা দেখতে কুকুরের মত।

হিউগোর টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে রক্তাক্ত মুখ তুলে তাকাল সেই কুকুরটা। তার চোখে আগুনের গুলি ধকধক করে জ্বলছে।

সাহসী তিন বন্ধু চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখে আর দাঁড়াতে পারল না। বিকট স্বরে চিৎকার করতে করতে জলাভূমির ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

শোনা যায়, সেই অপার্থিব কুকুর আর নারকীয় দৃশ্য দেখে এসে সেই রাত্রেই মারা যায় একজন—অন্য দু' জন পাগল হয়ে যায়।

বাস্কারভিলের প্রেত-কুকুরের এই হল আবির্ভাব-কাহিনী। আর সেই ঘটনার পর থেকেই অনেক উপদ্রবের-কারণ ঘটিয়েছে কুকুরটা। এ বংশের অনেকেরই মৃত্যু ঘটেছে আকস্মিক—রহস্যময় ভাবে। জানি না, এই অভিশাপ এখনো চেপে আছে কি না বংশের বংশধরদের ওপরে।

আমার পুত্র এবং উত্তরপুরুষদের জন্য আমার এই উপদেশ রেখে যাচ্ছি—তোমরা সর্বদা মহান পরমপুরুষকে শরণে রেখো—তাঁর আশীর্বাদ তোমাদের রক্ষা করবে।

আর জলাভূমির মাটিতে সন্ধ্যার পর অশুভ শক্তির অভিশাপ নেমে আসে—ও তল্লাটে সে সময় কেউ যেও না।

[বাস্কারভিল-কুকুরের অভিশপ্ত আবির্ভাবের এই কাহিনী হিউগো বাস্কারভিলের দুই ছেলে রোজার আর জনকে জানানো হয়েছে। নির্দেশ রয়েছে—বোন এলিজাবেথকে যেন কোন কথাই জানানো না হয়।]

রহস্যময় এই বিবরণ পড়া শেষ করে হোমসের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে তাকালেন ডক্টর মারটিমার। হোমস্ সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাই তুলল।

—শুনলাম। তবে যারা রূপকথা সংগ্রহ করে বেড়ায় এ কাহিনী তাদের কাজে লাগবে বলে মনে হচ্ছে।

পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজ বার করে এনে বললেন ডক্টর মার্টিমার, এবারে আপনাকে সাম্প্রতিকতম খবর শোনাচ্ছি মিঃ হোমস্। কাগজটা ডেভন কাউন্টি ক্রনিকল। চোদ্দ জুন তারিখের।

কয়েকদিন আগের স্যার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে এতে।

খবরের কাগজের বিবরণ থেকে জানা গেল—

সুপ্রাচীন বাস্কারভিল যখন দুর্দিনের কবলে সেই সময় স্যার চার্লস বাস্কারভিল বংশের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য উদ্যমী হয়েছিলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই তিনি উদারতা ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। অল্প বয়সে দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়ে ফাটকাবাজিতে প্রভূত ধন অর্জন করেন স্যার চার্লস। মাত্র বছর দুই আগে তিনি বাস্কারভিল হলে এসে বসবাস শুরু করেন।

বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে তিনি সংস্কার ও শ্রীবর্ধনের কাজে হাত দেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সব কাজই আরব্ধ রয়ে গেল।

স্যার চার্লস নিঃসন্তান, তাই চেয়েছিলেন তিনি নিজেই গোটা অঞ্চলের হৃত শ্রী ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ হল না।

তাঁর মৃত্যু আপাতদৃষ্টিতে রহস্যময় মনে হলেও, তদন্তের ফলে প্রকাশ পেয়েছে, ঘটনার পেছনে কোন গোপন ষড়যন্ত্র ছিল না। এমন কি স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে যে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল, তা যে নিতান্তই কুসংস্কার জনিত, তা-ও প্রমাণ হয়েছে। মৃত্যুর কারণ খুবই স্বাভাবিক।

বিপত্নীক স্যার চার্লস খুবই সাদাসিধা রুচির মানুষ ছিলেন। দান যেমন করতেন গোপনে—লোক জানাজানি না করে, তেমনি পছন্দ করতেন না আড়ম্বর বা বিলাসিতা।

বাড়িতে তাঁর সঙ্গে বাস করতো ব্যারিমুর দম্পতি। স্বামী খাস চাকর, স্ত্রী ঘরকন্নার পরিচালিকা।

কয়েক পুরুষ ধরে এই দম্পতি বাস্কারভিল পরিবারে কাজ করছে।

ব্যারিমুর দম্পতি এবং স্যার চার্লসের কয়েকজন বন্ধুর জবানবন্দীতে জানা গেছে, কিছু দিন থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। বিশেষ করে তাঁর হৃদয়ের গোলযোগ দেখা দেওয়ায় তিনি স্নায়বিক অবসাদে ভুগছিলেন। প্রায়ই তিনি শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্টে ভুগতেন।

স্যার চার্লসের এক গৃহ চিকিৎসক ডক্টর জেমস মার্টিমারও তাঁর সাক্ষে এই

কথা বলেছেন।

রাত্রে শুতে যাবার আগে বাস্কারভিল হলের ইউ-বীথিতে বেড়ানোর নিয়মিত অভ্যাস ছিল স্যার চার্লসের।

পাঁচ জুন লন্ডন যাবার কথা ছিল। চার জুন যথারীতি বাগানে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর হাতে ছিল অভ্যাস মত একটা চুরুট।

রাত বারটা নাগাদ হল ঘরের দরজা খোলা দেখতে পেয়ে ব্যারিমুর লণ্ঠন হাতে মনিবের সন্ধানে বেরোন। বৃষ্টিভেজা মাটিতে স্যার চার্লসের পায়ের দাগ স্পষ্ট হয়ে পড়েছিল।

ইউ-বীথির বাগানের মাঝামাঝি জায়গায় পাশের জলাভূমির দিকে একটা ফটক আছে। ওই ফটকের সামনে স্যার চার্লস কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন এমন চিহ্ন পাওয়া গেছে।

তারপর ইউ-বীথি ধরে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তাঁর মৃতদেহ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

ব্যারিমুর তার সাক্ষীতে বলেছেন, জলার দিকে গেট পেরিয়ে আসার পর থেকে স্যার চার্লস নাকি পথের শেষ পর্যন্ত আঙুলে ভর দিয়ে হেঁটেছিলেন।

স্যার চার্লস কেন এভাবে আঙুলে ভর দিয়ে হেঁটেছিলেন, এই ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

মর্ফি নামে এক যাযাবর ঘোড়া ব্যবসায়ী ঘটনার সময় জলার মধ্যে ছিল। জবানবন্দীতে সে স্বীকার করেছে, মদ্যপানের ফলে সে সেই সময় প্রকৃতিস্থ ছিল না। তবে সেই অবস্থাতেই একটা আর্তচিৎকার সে শুনতে পায়—তবে সেটা কোন দিক থেকে আসে বুঝতে পারেনি।

মৃতদেহের গায়ে ধস্তাধস্তির কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি। যদিও মুখভাব ছিল অস্বাভাবিক রকমের বিকৃত।

ঐ অবস্থায় দেখে প্রথমে ডক্টর মার্টিমারই বন্ধুর মৃতদেহ বলে চিনতে পারেন নি। পরে অবশ্য তিনি বলেছেন, দীর্ঘদিন অসুস্থ হৃদযন্ত্র নিয়ে বেঁচে ছিলেন স্যার চার্লস। হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মৃত্যু হলে তীব্র শ্বাসকষ্টের দরুণ মুখভাব বিকৃত হবার সম্ভাবনা থাকে।

ময়নাতদন্তেও অবশ্য এই ব্যাখ্যার সমর্থন মিলেছে। চিকিৎসকের সাক্ষ্যর ভিত্তিতে রায় দিয়েছেন করোনারের জুরীগণ।

স্যার চার্লসের মৃত্যুকে ঘিরে যেসব অতিলৌকিক গুজব চারদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল, তাতে এই সুপ্রাচীন ভবন হয়ত আতঙ্কে আর অভিশাপ বুকে করে শূন্যই পড়ে থাকত। বসবাস এবং আরব্ধ সংস্কার কাজের জন্য উত্তরাধিকারীর সন্ধান পেতে কষ্ট হত।

মৃত্যু সম্পর্কে জুরীদের রায় সেই দুঃখময় আশঙ্কা দূর করল। জানা গেছে, স্যার চার্লসের ছোট ভাই-এর ছেলে মিঃ হেনরী বাস্কারভিল বর্তমানে এই সম্পত্তির মালিক। যদিও তিনি জীবিত কি মৃত তা এখনো জানা সম্ভব হয় নি।

মিঃ হেনরী বাস্কারভিল আমেরিকায় ছিলেন। এখনো পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে এটুকু মাত্র জানা গেছে।

গোটা বিবরণটা ধীর শান্ত ভাবে হোমস্ শুনল। তারপর বলল, ডক্টর মার্টিমার, কৌতূহল জাগানোর মত অনেক বিষয়ই কেসটায় আছে। মৃত্যু সম্পর্কে জনসাধারণ যা জেনেছে, এর বাইরে আর কিছু ঘটনা আছে বলে কি আপনি মনে করেন?

—মিঃ হোমস্, আমি একজন বিজ্ঞানসাধক। প্রচলিত কুসংস্কার উৎসাহিত হয় এমন কোন কথা আমার পক্ষে বলা ঠিক মনে করি না।

বাস্কারভিলকে ঘিরে গা ছমছম কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফিরছে। আমার বক্তব্যে তার সমর্থন কোনভাবে প্রচারিত হলে এ বাড়িতে আর কেউ বাস করতে চাইবে না। এ কারণেই যা জানি তা কাউকে বিশ্বাস করে বলতে পারিনি।

জলাভূমিতে জনবসতি নেই বললেই চলে। বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু পরিবারের বসবাস। প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হত বলে স্যার চার্লসের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল।

বেশ কয়েক মাইলের মধ্যে মেলামেশা করবার মত ছিল প্রকৃতিবিদ মিঃ স্টেপলটন আর ল্যাফটার হিলের মিঃ ফ্রাঙ্কল্যান্ড।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিজ্ঞানের অনেক খবর সংগ্রহ করে এনেছিলেন মিঃ চার্লস সে সব নিয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের কেটে যেত।

যে কিংবদন্তীটা আপনাকে শোনালাম স্যার চার্লস সেটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। সন্ধ্যারাতে নিজের বাগানের মধ্যে পায়চারী করতেন ঠিকই, কিন্তু রাত্রে কখনোই জলায় যেতেন না।

তিনি বিশ্বাস করতেন, এই বংশ একটা ভয়াবহ অভিশাপ বহন করে চলেছে। বংশধর সকলকেই সেই অভিশাপের বলী হতে হবে।

গত কয়েক মাস ধরে লক্ষ্য করেছি—কথা প্রসঙ্গে ঘনঘন শোনাতেন পূর্বপুরুষদের দমবন্ধ হওয়ার মত সব ঘটনা। রাত্রে রুগী দেখতে বেরিয়ে অদ্ভুত কোন প্রাণী আমার চোখে পড়ে কি না প্রায়ই তা জিজ্ঞেস করতেন। তার মনে যেন চেপে বসেছিল একটা উদ্ভট কল্পনা—বিকট দর্শন একটা ভয়ঙ্কর প্রাণী সবসময় তাকে পেছনে অনুসরণ করছে। এসব উদ্ভট চিন্তার ফলে ক্রমশই স্নায়ুর ওপরে অত্যধিক চাপ পড়ছিল।

দুর্ঘটনাটা ঘটার হপ্তা তিনেক আগে এক সন্ধ্যায় গাড়ি নিয়ে গেলাম তার

বাড়িতে। হলঘরের দরজাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি।

আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম, আমার কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন—যেন কোন বিভীষিকা দেখছেন।

কৌতূহলী হয়ে পেছন ফিরে তাকাতেই চোখে পড়ল—ছায়ার মত কি যেন একটা রাস্তার প্রান্তে সরে গেল। কালো একটা বাছুর বলেই মনে হল আমার।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আশপাশে অনেক খুঁজলাম—কিন্তু কিছুই পেলাম না। ঘটনাটা স্যার চার্লসকে এত উত্তেজিত করে তুলল যে তিনি রীতিমত কাঁপছিলেন সেই সময়ে।

সেদিন বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটালাম তাঁর সঙ্গে। উত্তেজনার কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি এই পাণ্ডুলিপিটা সেদিন আমার হাতে তুলে দেন।

আমার জিম্মায় রাখা সেই পাণ্ডুলিপি থেকেই আপনাকে বাস্কারভিল-কুকুরের অভিশপ্ত আবির্ভাবের বিবরণ পড়ে শোনালাম।

মিঃ হোমস্, এই তুচ্ছ ঘটনাটা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মতামত যাই থাক না কেন এখন যেন মনে হচ্ছে পরবর্তী দুঃখজনক ঘটনার সঙ্গে তার একটা যোগসূত্র থাকলেও থাকতে পারে। আপনাকে গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা দেবার উদ্দেশ্যেই বললাম।

স্যার চার্লসের হৃদযন্ত্রের অবস্থা ক্রমশই খুব খারাপ হয়ে পড়ছিল। ক্রমাগত ভয় আর উদ্বেগের মধ্যে থাকলে শরীরযন্ত্রে নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

বাস্কারভিল হল থেকে কিছুদিন দূরে থাকলে অযথা উদ্বেগ থেকে মুক্তি পাবেন এবং ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠবেন—এই ভেবে আমিই তাঁকে লন্ডনে যেতে বলেছিলাম।

প্রকৃতিবিদ মিঃ স্টেপলটন আমাদের দুজনেরই বন্ধু। স্যার চার্লসের ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তিনিও উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁকে লন্ডনে পাঠানোর ব্যাপারটা তাই তিনিও অনুমোদন করেছিলেন।

স্যার চার্লসের মৃতদেহ আবিষ্কার করার পরে সে-রাতেই আমাকে খবর দেওয়া হয়। আমি আসার আগে মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করেনি।

ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি বাস্কারভিল হলে উপস্থিত হই। খবরের কাগজের রিপোর্টে উল্লিখিত তদন্তের সব ঘটনাই আমি নিজে যাচাই করেছি।

বৃষ্টি হওয়ার দরুন ভেজা মাটিতে পায়ের ছাপ বেশ স্পষ্ট হয়েই পড়েছিল। সেই ছাপ ইউ-বীথি দিয়ে জলার দিকে ফটকের যেখানে স্যার চার্লস কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন বলা হয়েছে, সে-জায়গা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি।

সেখান থেকেই পায়ের ছাপের ধরন পাল্টেছে—মনে হয়েছে তিনি আঙুলে ভর দিয়ে হেঁটেছেন—তবে আশপাশে পরীক্ষা করে দেখেছি—নরম কাঁকর জমির

ওপর অন্য কোন পায়ের ছাপ নজরে পড়েনি।

স্যার চার্লস মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে ছিলেন। ছড়ান দু হাতের সবকটি আঙুল দিয়ে মাটি আঁকড়ে ধরা।

প্রচণ্ড খিঁচুনির ফলে অস্বাভাবিক রকমের বিকৃত হয়ে গিয়েছিল মুখভাব। দৈহিক আঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না।

ব্যারিমুর জবানবন্দীতে বলেছিল, মৃতদেহের আশপাশের জমিতে কোন ছাপ পাওয়া যায় নি। ওর চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল কিন্তু আমি একটু তফাতেই বেশ স্পষ্ট আর-একটা ছাপ দেখেছিলাম।

বলতে বলতে ডক্টর মার্টিমার দু সেকেন্ড থেমে আবার বললেন—একটা অতিকায় দানব-কুকুরের পায়ের ছাপ। মৃতদেহ থেকে অন্ততঃ বিশ গজ দূরে পড়েছিল ছাপগুলো, তাই কেউ মাথা ঘামায়নি।

হোমস কৌতূহলী হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল, কাউকে বলেননি একথা?

—বলে কিছু লাভ হত না। কিংবদন্তীটা পড়া ছিল বলেই আমি মাথা ঘামাচ্ছি।

—জলাভূমিতে তো মেষপালকদের অনেক কুকুর থাকে, তাই না?

—তা থাকে। কিন্তু আমি যা দেখেছি, তা ভেড়াসামলান কুকুরের ছাপ নয়।

—ইউ-বীথির এক জায়গায় একটা ফটক আছে বলছিলেন না?

—আছে। মাঝামাঝি জায়গায়, জলাভূমির দিকে।

—তার মানে ইউ-বীথিতে ঢুকতে হলে হয় বাড়ির দিক থেকে নয়তো জলার দিক থেকে আসতে হবে। আচ্ছা ডক্টর মার্টিমার, ইউ-বীথির পথের ঘাসের ওপরে কোন ছাপ ছিল কি?

—ছাপগুলো ছিল জলার দিকের ফটকের রাস্তার ধার ঘেঁষে। ঘাসের ওপর কোন ছাপই পড়েনি।

—গোটা ব্যাপারটা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। ছোট ফটকটা কি সে-সময় খোলা ছিল?

—না, তালা বন্ধ ছিল।

—ফটকটা টপকে পার হবার মত কি?

—হ্যাঁ—

—ফটকের পাশেই স্যার চার্লস কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন—চুরুটের ছাই দেখে আমার মনে হয়েছে।

—চমৎকার। উল্লসিত হয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল হোমস, লোকজনের পা পড়বার আগে সন্ধান করলে কাঁকড়-মাটিতেও কৌতূহলোদ্দীপক কিছু আপনি নিশ্চয় পেতেন ডক্টর মার্টিমার। আমাকে খবর দিলেন না কেন সেই সময়?

—মিঃ হোমস, আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমাকে তাহলে বাধ্য হয়ে এমন অনেক কিছু প্রকাশ করতে হত—যার প্রতিক্রিয়া হত বিভিন্নমুখী।

—কিন্তু ব্যাপারটাকে আপনি অলৌকিক ভাবছেন কেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

—পুরোপুরি তা ভাবছি একথা ঠিক নয়। তবে মিঃ হোমস, আমাদের চক্ষুকর্ণের আওতার বাইরে এমন একটা জগৎ রয়েছে যাকে অস্বীকার করবার মতো যথেষ্ট জোরালো যুক্তি সব সময় পাওয়া যায় না।

দুর্ঘটনা ঘটবার পরে এমন কতগুলো ঘটনা আমার কানে এসেছে, যা আমাদের প্রকৃতির পরিচিত নিয়মের মধ্যে পড়ে না।

চার জুনের ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটবার আগে জলাভূমিতে অনেকেই একটা অদ্ভুত প্রাণী দেখেছে। প্রত্যেকেই স্বীকার করেছে—জানোয়ারটার আকৃতি বিরাট এবং বিকট। যেন মূর্তিমন্ত প্রেত।

প্রত্যক্ষদর্শী তিন জনকে আমি জেরা করেছিলাম। প্রত্যেকেই একবাক্যে বলেছে কিংবদন্তীর পিশাচ-কুকুরের চেহারার ভয়ঙ্কর প্রাণীটি প্রেত-ছায়ার মতই জলাভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গোটা তল্লাটে আতঙ্ক যেন জমাট বেঁধে রয়েছে।

—কিংবদন্তীর গল্প তাহলে সত্য বলে আপনি বিশ্বাস করেন? যদি তাই করেন তবে, এ স্থলে আমার করবার কি আছে বলুন? আমার কাছে আসা নিষ্ফল নয় কি?

—আমি আমার কর্তব্য স্থির করে উঠত পারছি না—সেই কারণেই আপনার পরামর্শের জন্য আসা।

এর পর ঘড়ির দিকে চোখ বুলিয়ে বললেন ডক্টর মার্টিমার, আর এক ঘণ্টা পনের মিনিট পরে ওয়াটারলু স্টেশনে পৌঁছবেন স্যার হেনরী বাস্কারভিল। বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই মুহূর্তে আমার কর্তব্য কি কেবল তাই বলে আমাকে সাহায্য করুন।

—স্যার হেনরীই কি বাস্কারভিল হলের উত্তরাধিকারী হয়ে আসছেন?

—হ্যাঁ। তরুণ এই ভদ্রলোক চাষবাস নিয়ে কানাডায় বসবাস করছিলেন। তার সম্পর্কে খবর নিয়ে যদ্দুর জানতে পেরেছি তাতে তাঁকে স্যার চার্লসের যোগ্য উত্তরাধিকারী বলেই আমার মনে হয়েছে।

স্যার চার্লসের ব্যক্তিগত চিকিৎসক বা বন্ধু হিসেবে নয়, তাঁর উইলের অছি আর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবেই আমার এই মতামত। সেই কারণেই আপনার পরামর্শ চাওয়া।

—ডক্টর মার্টিমার, আপনার এই কেসে ক্রমশঃই আমার আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবিষ্কার করবার মত অনেক রহস্যেরই ইঙ্গিত পাচ্ছি আমি। আচ্ছা, সম্পত্তির

দাবীদার কি আর কেউ নেই?

—না। তবে স্যার হেনরী ছাড়া আর এক জনের সন্ধান পেয়েছিলাম, স্যার চার্লসের কনিষ্ঠ ভাই—রোজার বাস্কারভিল। তিন ভাইয়ের মধ্যে চার্লস ছিলেন জ্যেষ্ঠ। মেজভাই অল্পবয়সেই মারা যান। হেনরী তাঁরই ছেলে। রোজার তৃতীয়—এবং বলতে পারেন হিউগো বাস্কারভিলের মতই বংশের কুলাঙ্গার।

দুজনেরই জীবনধারা প্রায় একই রকম। ইংলন্ডে থাকাকালে যথেষ্টই কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পরে মধ্য আমেরিকায় পালিয়ে যান এবং সেখানেই হলুদ জ্বরে মারা যান ১৮৭৬ সালে।

স্যার হেনরীই বাস্কারভিল বংশের শেষ বংশধর। টেলিগ্রামে জেনেছি আজ সকালেই তিনি সাদামটনে পৌঁছবেন—ওয়াটারলু পৌঁছবেন ঘণ্টাখানেক পরেই। আমার সমস্যাটা এখন তাঁকে নিয়েই।

যারাই বাস্কারভিল হলে বসবাস করতে এসেছেন দুর্ভাগ্য তাদেরই গ্রাস করেছে। স্যার হেনরী যদি সব জেনে এখানে বসবাস করতে রাজী না হন তাহলে এই পল্লী অঞ্চলের সমৃদ্ধির সম্ভাবনা হবে সুদূর পরাহত। স্যার চার্লসের সব সৎকাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে।

অথচ ডার্টমুরের পৈশাচিক এই পরিবেশ বাস্কারভিল বংশধরদের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয় বুঝতে পারছি।

—কিন্তু ডক্টর মার্টিমার, আপনার বর্ণিত অশুভ শক্তি তো লন্ডনেও সক্রিয় হতে পারে? তাহলে আর ভয় করছেন কেন? ওয়াটারলু স্টেশনে গিয়ে তাকে নিয়ে আসুন।

—তারপর?

—আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে পরবর্তী কর্মসূচী জানাতে পারব বলে আশা রাখি। তবে যদি একবার আগামীকাল দশটার মধ্যে স্যার হেনরী বাস্কারভিলকে নিয়ে এঘরে আসেন তাহলে বাধিত হব।

—বেশ, তবে তাই করব। ধন্যবাদ, এবার তাহলে আমি উঠি।

ডক্টর মার্টিমার বেরুবার উদ্যোগ করছেন এমন সময় হোমস জিজ্ঞেস করল, স্যার চার্লসের মৃত্যুর পরে শরীরী প্রেতকে জলায় আর কেউ দেখতে পেয়েছে বলে কিছু শুনেছেন?

—না, তেমন কিছু কানে আসেনি।

ডক্টর মার্টিমার চলে যাবার পরে হোমসকে খুবই চিন্তামগ্ন দেখলাম। কেবল একবার বলল—এমন চমকপ্রদ কেস সচরাচর পাওয়া যায় না।

হোমসের স্বভাব আমার বিলক্ষণ জানা। বুঝতে পারছি—এখন সে কল্পনার

সুতো ছেড়ে বিভিন্ন অনুমান খাড়া করবে—যাচাই বাছাই করবে—সমস্ত ঘটনাগুলো সূত্রবদ্ধ করবার চেষ্টা চলবে তার মগজে।

এরকম সময়ে সে চায় একাকীত্ব। তাই আমি কথা না বাড়িয়ে ক্লাবে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে পড়লাম।

রাত নটা নাগাদ ঘরে ঢুকে দেখলাম, ঘর ধোঁয়াময়, তামাক পোড়ার গন্ধে ঘর ম ম করছে। বন্ধুবর চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কি দেখছে।

আমার সাড়া পেয়েই হোমস বলে উঠল, তুমি যাওয়ার পর স্ট্যানফোর্ডের দোকান থেকে জলার সামরিক ম্যাপ আনিয়েছি। যা দেখছি—বিশাল খাঁ খাঁ করা জলার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটা মাত্র ঘরবাড়ি রয়েছে—সবই পাঁচ মাইল ব্যাসার্ধের বৃত্তের মধ্যে। আর চোদ্দ মাইল দূরে রয়েছে প্রিন্সটাউনের বিরাট কয়েদখানা। জনহীন আশ্চর্য এক বন্য অঞ্চল। শয়তানের খেলা জমাবার উপযুক্ত জায়গাই বটে।

—অতিপ্রাকৃত শয়তানকে নিয়ে তাহলে শেষ পর্যন্ত মাথা ঘামাতে শুরু করেছ?

—দেখ, শয়তান তো কাজ করে মানুষের ওপরে ভর করেই। এখন সেটাই খুঁজে বার করতে হবে—শয়তান যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে থাকে তবে সেটা কি এবং কিভাবে ঘটানো হয়েছে।

—কিন্তু কেসটা খুবই গোলমেলে মনে হচ্ছে আমার। অবশ্য যতটা আমি ভেবে উঠতে পেরেছি।

—ডক্টর মার্টিমারের একটা উক্তি থেকেই আমি শুরু করেছি—পায়ের ছাপের পরিবর্তন। তিনি যাই বলুন না কেন, আমি নিশ্চিত যে স্যার চার্লস ইউ-বীথির ছোট্ট ফটকের কাছ থেকে দৌড়চ্ছিলেন। প্রাণভয়ে দৌড়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন।

এখন প্রশ্ন হল তিনি ভয় পেয়েছিলেন কি দেখে? আর এমনই ভয় যে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে বাড়ির দিকে না দৌড়ে উল্টো দিকে দৌড়েছিলেন।

তাছাড়া চুরুটের ছাই থেকে যা প্রকাশ পাচ্ছে—তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন—কিন্তু ইউ-বীথির মধ্য দিয়ে কার পথ চেয়ে ছিলেন তিনি?

তাঁর মত অসুস্থ অশক্ত শরীরের মানুষ ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়া উপেক্ষা করে নিশ্চয় বিনা কারণে পাঁচ থেকে দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকবার কথা নয়। ডক্টর মার্টিমারের অনুসন্ধানী দৃষ্টি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উদ্ধার করেছে।

ডক্টর মার্টিমার স্পষ্টই বললেন, সন্ধ্যার পর স্যার চার্লস জলাভূমি এড়িয়ে চলতেন। অথচ তিনি জলার দিকের ফটকের কাছেই প্রতীক্ষায় ছিলেন রাতের বেলা। আবার পরদিনই তার লন্ডনে রওনা হবার কথা। ওয়াটসন, যথেষ্ট হয়েছে—আজ আর নয়—বাকিটা নিয়ে কাল সকালে ভাবনা চিন্তা করা যাবে

অতিথিরা এলে পর।

কথা শেষ করে হোমস্ অভ্যস্ত হাতে বেহালা টেনে নিয়ে বসল।

সকাল দশটাতেই হাজির হলেন ডক্টর মার্টিমার। তার পেছনে এলেন তরুণ ব্যারনেট।

ভদ্রলোকের বয়স তিরিশের কাছাকাছি। বলিষ্ঠ গঠন, কালো চোখে সতর্ক দৃষ্টি। পরনে লালচে টুইডস্যুট, ধীর স্থির আচরণে স্পষ্ট আভিজাত্যের ছাপ।

প্রাথমিক পরিচয় পর্বের পর স্যার হেনরী লন্ডনে তাঁর প্রথম আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হিসেবে একটা চিঠি দেখালেন। আজ সকালেই পেয়েছেন।

আমরা সকলেই ঝুঁকে পড়লাম চিঠিটার ওপর। ধূসর রঙের খামের ওপর অসমান ছাঁদে লেখা—স্যার হেনরী বাস্কারভিল, নর্দামবারল্যান্ড হোটেল। দেখলাম শেরিংক্রস ডাকঘরে গতকাল সন্ধ্যায় ফেলা হয়েছে চিঠিটা।

হোমস তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, আপনার এই হোটেলে ওঠার কথা জানাজানি হল কি করে?

—বুঝতে পারছি না। ডঃ মার্টিমারের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই হোটেল ঠিক করি। তিনি আগেই উঠেছেন তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে।

চিঠির লেখার ওপরে চোখ নামিয়ে হোমস বলল, তাহলে বোঝা যাচ্ছে আপনার গতিবিধির ওপর কোন একজনের নজর রয়েছে।

চিঠির কথাগুলো সংক্ষিপ্ত। কতগুলো ছাপা শব্দ কাগজ থেকে কেটে আঠা দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজেব ওপর লাগানো হয়েছে। কথাগুলো হলো—প্রাণের মায়া থাকলে জলার ত্রিসীমানা মাড়াবেন না। একমাত্র জলার শব্দটা কালি দিয়ে হাতে লেখা হয়েছে।

লেখাগুলো খুঁটিয়ে দেখে হোমস বলল, ডক্টর মার্টিমার, জলার ভয়টা যে অতিলৌকিক কিছু নয়, এবার নিশ্চয় আপনি স্বীকার করবেন। স্পষ্টই বুঝতে পারছি, গতকাল সন্ধ্যার টাইমস কাগজ থেকে শব্দ কেটে এই চিঠি লেখা হয়েছে।

গতকালের টাইমস কাগজটা হাতের কাছেই ছিল। হোমস সেটার সম্পাদকীয় প্রবন্ধটা খুলে আমাদের সামনে মেলে ধরল।

সবিস্ময়ে প্রত্যেকেই লক্ষ্য করলাম, প্রবন্ধের মধ্যে একমাত্র জলার শব্দটা বাদে অন্য শব্দগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

হোমস বলল—ছোট্ট কাঁচি দিয়ে কেটে আঠা দিয়ে সেঁটে বাক্য তৈরি করা হয়েছে। টাইমস কাগজের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিশেষ ধরনের টাইপ ব্যবহার করা হয়—এই টাইপ অন্য কোন দৈনিকে ব্যবহৃত হয় না।

আর জলার শব্দটা পাওয়া যায় নি বলে—ওটা পত্রলেখক হাতে লিখতে বাধ্য

হয়েছেন।

আরও কয়েকটা ব্যাপার এ চিঠি থেকে পরিষ্কার হচ্ছে—প্রথমতঃ টাইমস কাগজটা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া সচরাচর কেউ বড় রাখে না। চিঠি যে লিখেছে সে লেখাপড়া জানা মানুষ নিঃসন্দেহে। দ্বিতীয়তঃ পত্রলেখকের হাতের লেখা যাতে চিনতে না পারেন তার জন্য অসমান ছাঁদে ঠিকানাটা লেখা হয়েছে। তৃতীয়তঃ দেখুন, শব্দগুলো আঁটবার সময়ে খুব তাড়াহুড়ো করা হয়েছে—ফলে কাটা শব্দগুলো মাপজোক ঠিক রেখে সমান ভাবে লাগানো সম্ভব হয়নি।

আরো একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট—চিঠিটা সন্ধ্যায় ডাকে ফেলা হয়েছে। পরদিন সকালে বাইরে বেরুবার আগে স্যার হেনরীর হাতে পৌঁছানোর জন্য মাঝরাত পর্যন্ত যে কোন সময়েই ডাকে ফেলা যেত। অনুমান করছি—কেউ বাধা দিতে পারে এমন একটা আশঙ্কা ছিল তাড়াহুড়ো করে চিঠি ডাকে দেবার পেছনে।

হোমসের বিশ্লেষণ শুনে স্যার হেনরীর চোখ ক্রমশই বিস্ময়ে প্রসারিত হচ্ছিল। ডক্টর মার্টিমার বললেন—কিন্তু মিঃ হোমস্, সবই তো আপনার অনুমান—

হোমস হেসে বলল—অনুমান বা কল্পনা অবশ্যই, তবে তার ভিত্তি কিন্তু বাস্তবের বস্তুজগৎ। এর পর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে ঝাড়াই বাছাইয়ের পালা। এটাই হল আমাদের অনুমানের বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগপদ্ধতি।

এবারে আরো দেখুন—খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন, ঠিকানা লিখতে গিয়ে বেশ কয়েকবার কলমের কালি ফুরিয়েছে—নতুন করে কলমে কালি তুলতে হয়েছে। দোয়াতে কালি কম থাকলেই এমনটা হবার কথা।

বাড়ির দোয়াতের অবস্থা এমন থাকে কদাচিৎ। হোটেলের দোয়াতের দুরবস্থা স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মনে পড়তে পারে।

তাছাড়া শেরিংক্রসের আশপাশের হোটেলগুলোর কাগজের ঝুড়ি হাটকালে শব্দ-কাটা টাইমস কাগজ পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। সেই সূত্রে পত্রলেখককে ধরা খুব কষ্টকর বলে মনে হয় না।

স্যার হেনরী, আপনার এই চিঠি থেকে অনেক কিছুই জানা গেল। এবারে বলুন লন্ডনে পৌঁছে আর নতুন কি অভিজ্ঞতা আপনার হল।

স্যার হেনরী কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, বলবার মত তেমন কিছু ঘটেনি। তবে—

—তবে কি—বলুন—

—একপাটি বুট জুতো হারিয়েছে আমার। কাল রাতেই কিনেছিলাম স্ট্র্যান্ড থেকে—ব্যবহার করবার সময় পাইনি—কাল রাতে দরজার সামনে দু'পাটি রেখেছিলাম, সকালে দেখি একপাটি রয়েছে।

—আপনি তাহলে গতকাল লন্ডনে পৌঁছেই জুতো কিনতে হোটেলের বাইরে

গিয়েছিলেন?

—কিছু কেনাকাটা করতে হয়েছিল। ডক্টর মার্টিমার সঙ্গে ছিলেন।

—যাইহোক, মনে হচ্ছে নতুন বুটের পাটি কোন কাজেই লাগবে না। শিগগিরই ফেরত পেয়ে যাবেন।

—কিন্তু মিঃ হোমস, আমাকে নিয়ে এত গোলমালটা কিসের—দয়া করে বলবেন কি?

স্যার হেনরীর কথায় হোমস হেসে ডক্টর মার্টিমারের দিকে তাকাল। বলল, আপনি দয়া করে ঐ পাণ্ডুলিপির বিষয়টা ওঁকে পরিষ্কার করে খুলে বলুন।

ডক্টর মার্টিমার ধীরে ধীরে সবই বিবৃত করলেন। স্যার হেনরী শুনলেন মনোযোগ দিয়ে। শোনা শেষ হলে বললেন, ছেলেবেলায় ধাইমার কাছে এই কুকুরের গল্প শুনেছি। কাকার মৃত্যুটাও পরিষ্কার নয় আমার কাছে। এখন দেখছি—কেবল সম্পত্তি নয় উত্তরাধিকার সূত্রে অভিশাপ আর প্রতিহিংসাও লাভ হয়েছে আমার।

হোমস বলল, চিঠির ব্যাপারটাও মাথায় রাখুন—হয় হিতৈষী নয় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী—দুজনের একজন চিঠিটি পাঠিয়ে আপনাকে সতর্ক করে দিয়েছে। এই অবস্থায় আপনি কি বাস্কারভিল হলে যাওয়া সমীচীন মনে করছেন?

—কোন বাধা তো আমি দেখছি না মিঃ হোমস। পিতৃপিতামহের ভিটেতে যাওয়া আমার শয়তানই হোক আর মানুষই হোক—কারুর সাধ্য নেই ঠেকায়। তবে এ ব্যাপারে আরো একটু চিন্তাভাবনা আমি করতে চাই। আপনার বন্ধুকে নিয়ে আমার ওখানে বেলা দুটো নাগাদ একবার এলে খুশি হব। একসঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া যাবে।

হোমস সানন্দে সম্মতি জানাল।

ডক্টর মার্টিমার আর স্যার হেনরী বিদায় নিয়ে নিচে নেমে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে হোমস যেন স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে উঠল। দ্রুত আমাকে নিয়ে নিচে নেমে এল। দেখলাম অতিথি দুজন গাড়ি নেননি, পায়ে হেঁটেই বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন। কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে আমরা অনুসরণ করলাম তাদের।

অক্সফোর্ড স্ট্রীট পার হয়ে রিজেন্ট স্ট্রীটে ঢুকলেন দুজনে। এমন সময় চোখে পড়ল, রাস্তার উল্টো দিকে দাঁড়ানো একটা দু'চাকার ঘোড়ার গাড়ি, ভেতরে একজন পুরুষ আরোহী।

আমার চোখে পড়তে না পড়তেই গাড়িটা চলতে শুরু করল। গাড়িটার দিকে হোমসও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এবং দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল।

গাড়ীর আরোহী—কালো দাড়িতে আচ্ছন্ন মুখ—সামান্য মুখ বাড়িয়ে যেন আমাদের দেখল, পরক্ষণেই গাড়ির ঠেলে-তোলা দরজা উঠে গেল। গাড়িও

রিজেন্ট স্ট্রীটের ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

হোমস গাড়িটাকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। বলল, ওয়াটসন, আমার প্রথম অনুমান সত্য প্রমাণ হল। স্যার হেনরীর শহরে পা দেবার পর থেকে তার ওপর চোখ রেখে চলেছে কেউ। ঘরে বসে কথা বলবার সময়েই এই অনুসরণের ব্যাপারটা মাথায় এসেছিল। জানালা দিয়ে বাইরে চোখও রেখেছিলাম। এবারে নিঃসন্দেহ হলাম।

—গাড়ির নম্বরটা কিন্তু নিতে ভুল হয়ে গেল। বললাম।

—ভুল হয়নি ভায়া। ২৭০৪—যদিও এই মুহূর্তে সেটা খুব কাজে আসবে না। আর আরোহীর দাড়িও নকল দাড়ি হওয়া অসম্ভব নয়।

কথা বলতে বলতে আমরা আঞ্চলিক বার্তা-বাহকের অফিসে ঢুকলাম। অফিসের কর্তা উইলসন সানন্দ অভ্যর্থনা জানাল।

কার্টরাইট নামে বছর চোদ্দ বয়সের একটা ছোকরাকে খবর দিয়ে আনাল হোমস। ছেলেটি এর আগে হোমসের দু-একটি ছোটখাট কাজ করে দিয়েছে। যথেষ্ট বুদ্ধিমান। কার্টরাইট এলে—হোমস হোটেল ডাইরেক্টরী খুলে দেখিয়ে ওকে বলল—শেরিংক্রসের ধারে কাছে তেইশটা হোটেল হয়েছে দেখেছো?

ছেলেটি স্মিত হেসে সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়ল।

—প্রত্যেকটা হোটেলে তুমি যাবে। হোটেলের বাইরের এবং হল ঘরের দরোয়ানের সঙ্গে কথা বলে গতকালের ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি দেখতে চাইবে। প্রত্যেককে কথা বলার সময়ই একটা করে শিলিং হাতে গুঁজে দেবে। টাইমসের ভেতরের এই পাতাখানা খুঁজে আনতে হবে তোমাকে, দেখবে কাঁচি দিয়ে কতগুলো ফুটো করা রয়েছে কাগজের মাঝখানে। পারবে তো? অবশ্য কাগজটা পাওয়া যাবে বলে আমি মনে করি না, তবু তুমি সবকটা হোটেলেই ভাল করে সন্ধান নেবে।

হোমস কার্ট রাইটকে প্রত্যেক হোটেলের দুই দারোয়ানের জন্য দুই শিলিং হিসেবে এবং তার সঙ্গে আরও বাড়তি দশ শিলিং হিসেব করে গুণে দিয়ে দিল। সন্ধ্যার আগেই বেকার স্ট্রীটে টেলিগ্রাম করে জানাবার কথাও বলে দিল।

ওখান থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটতে হাঁটতে হোমস বলল, এবারে বাকি একটা কাজ—২৭০৪ নম্বর ছ্যাকড়া গাড়ির কোচোয়ান—

যথা সময়ে দুইবন্ধু নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে পৌঁছে গেলাম।

স্যার হেনরীর ঘরে যাবার আগে হোমস ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে হোটেলের রেজিস্টারে একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

স্যার হেনরীর হোটেলে ওঠার পর আরও দুজন হোটেলে উঠেছেন।

স্বভাবসিদ্ধ কৌশলে দারোয়ানের কাছ থেকে বোর্ডার দুজনের সম্পর্কে জেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হল। জানা গেল দুজনেই হোটেলের পুরনো বোর্ডার।

স্যার হেনরীরা ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই নতুন ঘটনার মুখোমুখি হতে হল। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি শোনালেন তাঁর পুরনো বুট জুতোর একপাটি খুঁজে পাচ্ছেন না। কিন্তু সকালের হারানো নতুন বুটটি পেয়েছেন।

হোমস কুঞ্চিত কপালে জুতো চুরির বিবরণ শুনে বলল, স্যার হেনরী, ইতিপূর্বে আমরা প্রায় শ পাঁচেক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেসের ফয়সালা করেছি। কিন্তু আপনার কাকার মৃত্যুর পটভূমিকায় পর পর ঘটনা ঘটছে, যদি সত্য বলে ধরতে হয়, তাহলে আপনার এই কেস সব চাইতে জটিল বলেই আমার মনে হচ্ছে।

তবে ইতিমধ্যেই যেসব সূত্র আমার হাতে এসেছে তা ঝাড়াই বাছাই করে, হয়তো একটু বেশি সময় নষ্ট হবে, সঠিক সূত্রের নাগাল পেয়ে যাব।

এরপর হোমস আজ সকালের অভিজ্ঞতা তাঁকে জানাল। পরে ডঃ মার্টিমারকে জিজ্ঞেস করল, ডার্টমুরে আপনার চেনাজানা বা প্রতিবেশীদের মধ্যে দাড়িওয়ালা কেউ আছে?

কয়েক মিনিট চিন্তা করে ডক্টর মার্টিমার বললেন, স্যার চার্লসের খাস চাকর ব্যারিমুরেরই তো মুখ ভর্তি চাপ দাড়ি।

—ব্যারিমুর এখন কোথায়?

—বাস্কারভিল হল দেখাশুনা করছে—

একথা শোনার পর হোমস তখনি একটা টেলিগ্রাম ফর্ম চেয়ে নিয়ে ডার্টমুরের সবচেয়ে কাছের টেলিগ্রাফ অফিস গ্রিমপেনের পোস্ট মাস্টারকে লিখল—মিঃ ব্যারিমুরের টেলিগ্রামটি তার হাতে দেবেন। বাড়িতে না পেলে নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে স্যার হেনরী বাস্কারভিলের কাছে ফেরত পাঠাবেন।

এরপর আর একটা টেলিগ্রাম এভাবে পাঠানো হল ব্যারিমুরের নামে—স্যার হেনরির ব্যবস্থা কতদূর?

স্যার হেনরী ব্যারিমুরের পরিচয় জানতেন না। ডক্টর মার্টিমার বললেন, বাস্কারভিল হলের আগের কেয়ারটেকারের ছেলে। চার পুরুষ ধরে এই পরিবারে আছে এরা। এদের সম্পর্কে কোন অভিযোগ কখনো শুনিনি। স্বামী স্ত্রী দুজনেই সৎ প্রকৃতির।

স্যার হেনরী বললেন, তাহলে তো বাস্কারভিল হলে কেউ না গেলেই এদের সুবিধা...গোটা বাড়িটা দিব্যি ভোগ করতে পারবে।

হোমস এ কথায় কান না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, ডক্টর মার্টিমার, উইলে ব্যারিমুর কিছু পেয়েছে?

—স্বামী স্ত্রী দুজনেই পাঁচশ পাউন্ড করে পেয়েছে। ওরাও জানে সেটা।

—আর কেউ?

—আমাকেও হাজার পাউন্ড দিয়ে গেছেন। তাছাড়া সামান্য অংকের টাকা অনেককেই দিয়ে গেছেন—কয়েকটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানেও কিছু দান রয়েছে। বাদবাকি সবই পাবেন স্যার হেনরী—

—তার পরিমাণ কত?

—সাত লক্ষ চল্লিশ হাজার পাউন্ড। তাছাড়া জমিদারী—তারও মূল্য ধরুন প্রায় দশ লক্ষ পাউন্ড।

যুগপৎ দুজনেই বিস্মিত হলাম আমরা। হোমস বলল, এ যে দেখছি টাকার পাহাড় জড়িয়ে আছে এই কেসের সঙ্গে—এদিকটা তো আগে জানা ছিল না। আচ্ছা, ডক্টর মার্টিমার, কিছু মনে করবেন না, প্রসঙ্গক্রমে জানা দরকার বলেই জিজ্ঞেস করছি, স্যার হেনরীর অবর্তমানে জমিদারী পাবে কে?

—স্যার চার্লসের ছোটভাই রোজার বাস্কারভিল অবিবাহিত অবস্থায় মারা গেছেন। সে-কারণে দূর সম্পর্কের এক ভাই, জেমস ডেসমন্ড তাঁর নাম, তিনিই জমিদারীর মালিক হবেন।

—তার সম্পর্কে—

—পুরুতগিরি করেন ওয়েস্ট মুরল্যান্ডে। স্যার চার্লসের সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছিলেন—তখন তাকে দেখবার সুযোগ হয়েছিল। সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী—স্যার চার্লসের অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তিনি এক কপর্দকও নিতে রাজি হননি। স্যার চার্লসের উইল অনুযায়ী তিনি জমিদারীর মালিক হবেন। আবার স্যার হেনরী অর্থাৎ বর্তমান উত্তরাধিকারী উইল না করলে টাকাও পাবেন জেমস ডেসমন্ড।

এরপর হোমস্ সরাসরি স্যার হেনরীর দিকে তাকিয়ে বলল, আমার মনে হচ্ছে আর সময় নষ্ট না করে আপনার ডেভনশায়ারে পৌঁছানো দরকার। তবে, কখনোই একলা যাবেন না—এটা আমার বিশেষ অনুরোধ।

—ডক্টর মারটিমার তো রয়েছেন সঙ্গে।

—আপনার সঙ্গে সব সময় থাকবার মত বিশ্বাসী কাউকে সঙ্গে রাখা দরকার। ডক্টর মারটিমারকে রোগী দেখতে বাইরে যেতে হয়—তাছাড়া তাঁর বাড়িও বেশ কয়েক মাইল দূরে। সে-কারণেই একজন সঙ্গী দরকার।

স্যার হেনরী বললেন, আপনাকেই যদি আমি অনুরোধ জানাই মিঃ হোমস্।

হোমস্ হেসে বলল, এই মুহূর্তে কয়েকটা জরুরী কেসের ব্যাপারে আমার লন্ডনে থাকা খুবই জরুরী। তবে তেমন অবস্থা দেখা দিলে অবশ্যই হাজির হতে চেষ্টা করব। তবে—

এই বলে হোমস আমাকেই সুপারিশ করল স্যার হেনরীর সঙ্গে যাবার জন্য।

অতঃপর, সামনের শনিবার যাত্রার দিনক্ষণ স্থির হল। পেডিংটন থেকে আমরা সাড়ে দশটার ট্রেনে ডার্টমুর রওনা হব।

স্যার চার্লসের ঘর থেকে বেরুবার মুখেই ঘটল আর একটা নতুন ঘটনা। একটা ক্যাবিনেটের তলা থেকে স্যার হেনরী নিজেই টেনে বার করলেন একপাটি বাদামী বুট। বললেন, এই তো আমার হারানো বুট—কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও তো আমি তন্নতন্ন করে খুঁজে গেছি। আশ্চর্য।

তখুনি ওয়েটারকে ডাকা হল। কিন্তু সে দিব্যি গেলে বার বারই বলল—এ ব্যাপারে সে কিছু জানে না।

অনেক খোঁজ খবর নিয়েও রহস্য পরিষ্কার হল না।

স্যার চার্লসের মৃত্যুর পর যেন চলেছে ঘটনার ঘনঘটা। ছাপা অক্ষর সাজানো অদ্ভুত চিঠি, কালো দাড়িওয়ালা রহস্যময় চর, নতুন বাদামী বুটের অন্তর্ধান, আবার এখন বাদামী বুটের বিস্ময়কর প্রত্যাবর্তন—একটার পর একটা—সব ঘটনাই রহস্যময়।

ঘটনাগুলোর পরস্পর সম্বন্ধ অতল অন্ধকারে। এসব নিয়ে চিন্তা করতে করতেই ফিরে এলাম আমরা।

ডিনারে বসবার আগেই দুটো টেলিগ্রাম এল।

স্যার চার্লস জানিয়েছেন—ব্যারিমুর বাস্কারভিল হলে আছে—এই মাত্র খবর পেলাম।

দ্বিতীয়টা কার্টরাইটের—তেইশটা হোটেলেই ঘুরেছি কিন্তু টাইমসের কাটা কাগজ পাইনি।

দুটো সূত্র নাকচ হতে না হতেই—তৃতীয় সূত্রের সন্ধান এসে হাজির হল।

সরকারী রেজিস্ট্রিতে ছ্যাকড়া গাড়ির কোচোয়ানের নাম ঠিকানা খুঁজে বার করবার জন্য হোমস্ কর্তৃপক্ষকে আগেই টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছিল। টেলিগ্রাম পাবার খানিক পরেই স্বয়ং কোচোয়ান সশরীরে এসে উপস্থিত হল।

হেড অফিস থেকে তাকে পাঠানো হয়েছে।

হোমসের প্রশ্নের উত্তরে কোচোয়ানের কাছ থেকে জানা গেল—বেলা সাড়ে নটার সময় ট্রাফালগার স্কোয়ারে দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক গাড়ি ভাড়া করেন।

প্রথমে সে গাড়ি নিয়ে আসে নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে। সেখান থেকে স্যার হেনরী এবং ডক্টর মারটিমার-এর গাড়ি অনুসরণ করে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়।

ঘন্টা দেড়েক পরে আবার তাদের অনুসরণ করে রিজেন্ট স্ট্রীটে গিয়ে আচমকা ভদ্রলোক ঠেলা দরজা তুলে দিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি ওয়াটারলু স্টেশনে যেতে।

ভাড়া মিটিয়ে যাবার সময় ভদ্রলোক পরিচয় দিয়ে বললেন, তার নাম শার্লক

হোমস্ একজন ডিটেকটিভ, কোচোয়ান যেন তার কথা কাউকে না বলে।

কোচোয়ানের কাছ থেকে আরও জানা গেল, তথাকথিত এই ডিটেকটিভ শার্লক হোমসের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, উচ্চতা মাঝারি, ফ্যাকাশে মুখ, মুখে চৌকোনা কালো দাড়ি।

একটা আধগিনি বকশিস দিয়ে কোচোয়ানকে বিদায় করা হল। তারপর হাসতে হাসতে হোমস বলল, ভায়া ওয়াটসন, লোকটা সাধারণ নয়—মস্ত ধড়িবাজ। ঠিক বুঝতে পেরেছিল, কোচায়ানকে আমরা পাকড়াও করতে পারব। আর সেই বুঝেই তার মুখে এই উদ্ধত সংবাদটি পাঠিয়ে দিয়েছে। একটা চ্যালেঞ্জও বটে। দেখা যাক।

ডক্টর মারটিমার এবং স্যার হেনরীর সহযাত্রী হয়ে ডেভনশায়ার রওনা হবার আগে হোমস্ আমাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে দিল।

স্যার হেনরীর পরবর্তী ওয়ারিশ জেমস ডেসমন্ডকে সে তার তদন্তের আওতা থেকে বাদ দিয়েছে। ডক্টর মারটিমারও সন্দেহমুক্ত ব্যক্তিদের একজন।

এছাড়া স্যার হেনরীর সকল প্রতিবেশী সম্পর্কেই খুঁটিয়ে বিচার করে আমাকে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

স্যার চার্লসের মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে জড়িত যে কোন খবর বা ঘটনা যেন আমি বাদ না দিই।

বাস্কারভিল হলের খাস চাকর ব্যারিমুর দম্পতি, প্রকৃতিবিদ স্টেপলটন এবং তার সুন্দরী বোন, এ ছাড়া শ্যাফটার হলের মিঃ ফ্রাঙ্কল্যান্ড এবং আরো দু-একজন প্রতিবেশীর যারা স্যার চার্লসের বিশেষ পরিচিতের গণ্ডীর মধ্যে ছিল তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কেই আমার দৃষ্টি সজাগ রাখার জন্য সতর্ক করে দিল।

আর, আমি যেন স্যার হেনরীকে কখনো একা রেখে কোথাও না যাই।

যাত্রার আগে স্টেশনে হোমস্ স্যার হেনরীকে বলল, ডঃ ওয়াটসনের চাইতে বেশি নির্ভরযোগ্য সঙ্গী আপনার আর কেউ হতে পারত না।

আশা করছি আপনাদের দিনগুলো ভালই কাটবে। তবে আমার একটা অনুরোধ, কখনো কোন অবস্থাতেই একলা রাস্তায় বেরুবেন না। তাহলে কিন্তু দুর্বিপাক ঠেকানো যাবে না। আর সন্ধ্যার পর জলাভূমির দিকে কখনোই যাবেই না।

যথাসময়ে আমাদের গাড়ি ছাড়ল।

ক্রমশঃই দুপাশের মাটির রঙ বাদামী থেকে লালচে হয়ে এল। আরও পরে ইটের রাজত্ব ছেড়ে গ্রানাইটের রাজ্যে প্রবেশ করলাম।

সবুজ ছাওয়া চৌকোনা মাঠ, গাছপালা—ধু ধু প্রান্তর—মাঝে মাঝে পাহাড়ের পাথুরে চুড়া দেখতে দেখতে মুগ্ধ হতে হল। ডেভনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যি

অতুলনীয়।

ছোট্ট একটা স্টেশনে গাড়ি থেকে আমরা নামলাম। তারপর টাট্টু ঘোড়ায় টানা খোলা গাড়িতে চাপলাম। স্টেশনেই চোখে পড়ল সেপাইদের মত গাঢ় ইউনিফর্ম পরা দুজন বন্দুকধারী লোক।

কোচোয়ান লম্বা সেলাম ঠুকে আমাদের গাড়িতে তুলে নিল। দেখলাম, স্যার হেনরী বাস্কারভিলের সংবাদ এখানে সকলেই জেনে গেছে।

পাশে টানা লম্বা পশুচারণের তৃণভূমি। গাছপালার ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ছে বাড়ির তেকোনা ছাদ।

জনবসতির পেছন দিকে বিভীষিকাময় জলাভূমির ঢেউ খেলানো আভাস—মাঝে মাঝে মাথা জাগিয়ে দাঁড়ানো পাহাড়।

চারপাশের দৃশ্য দেখছেন আর স্যার হেনরী থেকে থেকে হর্ষধ্বনি করছেন। একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন ডক্টর মার্টিমারকে।

আমার মত এ অঞ্চলে স্যার হেনরীও একেবারেই নতুন। তাঁর মুখেই শুনলাম, পিতৃবিয়োগের পর নিতান্ত কিশোর বয়সেই বাস্কারভিল ত্যাগ করে আমেরিকায় এক বন্ধুর কাছে চলে যান তিনি। তারপর এই প্রথম এদিকে আসা।

রহস্যময় জলাভূমির দৃশ্য দেখতে দেখত আমরা এগুচ্ছি। সহসা গুল্মচ্ছন্ন একটি পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ডক্টর মার্টিমার। দেখলাম, চূড়ার ওপর রাইফেল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন অশ্বারোহী সৈন্য।

কোচোয়ানকে প্রশ্ন করে জানা গেল, প্রিন্সটাউনের জেলখানা থেকে একজন কয়েদী আজ তিনদিন হল পালিয়েছে। তাকে ধরবার জন্যই স্টেশন আর রাস্তায় পাহারা দিচ্ছে সেপাইরা। আসামী নটিংহিল-খুনী সেলডন। তার খবর দিতে পারলেই পাঁচ পাউন্ড বকশিস।

চলতে চলতে ঢাল বেয়ে উঠে পড়ল আমাদের খোলা গাড়ি। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত জলাভূমি, এবড়োখেবড়ো প্রস্তর স্তূপ আর ছোট ছোট অদ্ভুত পাহাড়। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া ছুটে আসছে জনশূন্য প্রান্তরের দিক থেকে।

আমাদের গাড়ি মাঝে মাঝে পাশ কাটিয়ে চলেছে জলাভূমির কুঁড়ে ঘর। দেওয়াল আর ছাদ পাথর দিয়ে তৈরি। কর্কশ গায়ে লতার কোন আস্তরণ নেই।

দেখতে দেখতে গাড়ি মোড় ঘুরে উপস্থিত হল বাস্কারভিল হলের সামনে।

ঢালাই লোহার ওপর অদ্ভুত রকমের কারুকার্য করা ফটক। দু'পাশে রোদ জলে বিবর্ণ থাম, মাথায় বাস্কারভিল বংশের প্রতীক—শূকর মুণ্ড।

ফটক পার হয়ে দীর্ঘ বীথি-পথ—পথের প্রান্তে ঘাস ছাওয়া প্রশস্ত চত্বর।

দিনের পড়ন্ত আলোয় প্রাচীন প্রাসাদের সামনাটা দেখা যাচ্ছে—আইভিলতায় ঢাকা। বাড়ির মাঝের অংশ থেকে টাওয়ার উঠে গেছে আকাশে।

খাঁজকাটা দেয়াল সংলগ্ন গ্রানাইট পাথরের আধুনিক বাড়িটা পরবর্তীকালে তৈরি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। মোটা মোটা গরাদ ঢাকা জানালা। কালো ধোঁয়া উঠছে খাড়া ছাদের চিমনি থেকে।

এখান থেকেই বিদায় নিলেন ডক্টর মার্টিমার। একই গাড়িতে ফিরে গেলেন।

ব্যারিমুর দম্পতি আমাদের মালপত্র নামিয়ে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল।

ডিনার শেষ হলে শুভরাত্রি জানিয়ে আমরা যে যার ঘরে চলে এলাম।

আমার ঘরের দরজায় বাইরের ঘাসছাওয়া প্রশস্ত চত্বর। জানলা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। আকাশে মেঘের ফাঁকে চাঁদ—সেই আলোতে দূরের গাছের মাথা হাওয়ায় দুলছে। বৃক্ষসারির অনেক পেছনে এবড়োখেবড়ো শৈলশ্রেণী এবং লম্বা তরঙ্গায়িত জলাভূমি।

শরীরে অপরিসীম ক্লান্তি। কিন্তু তবু বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে হচ্ছে। ঘুম আসছে না। নিঝুম নিস্তব্ধ চারপাশ।

সহসা একটা কান্নার শব্দ কানে এল। নারী কণ্ঠের।

চমকে বিছানায় উঠে বসলাম। কান খাড়া করে রইলাম। স্পষ্ট ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। মনে হল এই বাড়ির ভেতর থেকেই কান্নার শব্দটা উঠছে।

সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে রাতের অভিজ্ঞতাটা জানালাম স্যার হেনরীকে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যারিমুরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—গভীর রাতের কান্না সম্পর্কে সে কিছু জানে কিনা।

ব্যারিমুরের মুখ যেন অকস্মাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কিন্তু বলল, স্যার হেনরী, বাড়িতে স্ত্রীলোক বলতে দুজন। রান্নাঘরের পেছনে একজন থাকে—বাসন ধোয়া মোছা করে—অন্যজন আমার স্ত্রী। কিন্তু গভীর রাতে ফুঁপিয়ে কাঁদবার মত কোন কারণ তো আমাদের দিকে ঘটেনি কিছু।

ব্যারিমুরের কথাটা শুনে বুঝতে পারলাম সে মিথ্যা কথা বলছে। সকালেই মিসেস ব্যারিমুরকে আমি দেখেছি—দোহারা গড়নের মহিলা। লালাভ চোখের পাতা ফোলা আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি।

কালরাতে যে মিসেস ব্যারিমুরই কেঁদেছেন, তাতে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। কিন্তু মিথ্যাকথাটা বলবার কি কারণ থাকতে পারে?

ব্যারিমুরকে ঘিরে আমার মনে রহস্য দানা বেঁধে উঠতে লাগল। স্যার চার্লসের মৃতদেহ সেই প্রথম আবিষ্কার করেছিল।

মৃত্যু সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাও তারই দেওয়া। বিদ্যুৎ চমকের মত আমার মনে উদয় হল, রিজেন্ট স্ট্রীটে ছ্যাকড়াগাড়ির মধ্যে তারই দাড়িওলা মুখ আমরা দেখিনি তো?

গ্রিমপেন পোস্টমাস্টারের নামে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল ব্যারিমুরকে

দেবার জন্য। সেখানে গিয়ে একবার খবর নিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

ব্রেকফাস্টের পরেই দেখলাম একগাদা কাগজপত্র নিয়ে বসেছেন স্যার হেনরী। হাতের কাজ শেষ করে উঠতে যথেষ্ট সময় লাগবে। সুযোগ বুঝে বেরিয়ে পড়লাম।

জলার ধার দিয়ে মাইল চারেক হাঁটতে হল। গ্রামের ছোট ছোট কুঁড়ের পাশে বড় দুটো বাড়ি—তার মধ্যে একটা ডঃ মার্টিমারের, পাশেই পোস্টমাষ্টারের মুদিখানা। টেলিগ্রামের কথাটা তার বেশ মনে আছে দেখলাম।

তার কাছ থেকে জানা গেল, গত সপ্তাহে তার ছেলে জেমস বাস্কারভিল গিয়ে ব্যারিমুরের স্ত্রীর হাতে টেলিগ্রামটা দিয়ে এসেছে। সেই সময় ব্যারিমুর মাচায় উঠে কি কাজ করছিল।

হতাশ হয়েই ফিরতে হল। ব্যারিমুর সে সময়ে লন্ডনে ছিল কি বাড়িতে ছিল তা পরিষ্কার বোঝা গেল না। তবে কি সে লন্ডনেই ছিল?

মৃত বাস্কারভিলকে মৃত্যুর পূর্বে সর্বশেষ সেই দেখেছে—মৃতদেহ আবিষ্কারও সেই করেছে।

এই বংশের শেষ উত্তরাধিকারী লন্ডনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তবে কি সে-ই পেছু নিয়েছে? অদ্ভুত চিঠি পাঠাবার পেছনেও কি কাজ করেছে তারই হাত?

কিন্তু কী তার উদ্দেশ্য? সে কি নিজেই কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, না পেছন থেকে কেউ তাকে দিয়ে এসব করাচ্ছে?

স্যার হেনরী বলেছিলেন, পরিবারের লোকজনকে বাড়ি থেকে দূরে রাখতে পারলে ব্যারিমুর দম্পতিই গোটা বাড়ি ভোগ দখল করতে পারবে।

চিন্তা ভাবনাগুলো নানাভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে হাঁটছিলাম। সহসা পেছন থেকে কার ডাক শুনে চমকে উঠলাম। আমার নাম ধরে এখানে কে ডাকছে?

ডক্টর মার্টিমারের বাড়ি ছাড়িয়ে এসেছি। তিনি ডাকছেন কিনা ভেবে পেছনে ঘুরে দাঁড়ালাম, কিন্তু দেখলাম ছোটখাট আকারের ছিপছিপে এক ভদ্রলোক প্রায় ছুটে আসছেন আমার দিকে।

পরিষ্কার কামানো মুখ, শনের মত একমাথা চুল, পাতলা চোয়াল। তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে বয়েস। পরনে ধূসর স্যুট, মাথায় হাল্কা হ্যাট।

গাছ-গাছড়ার নমুনা সংগ্রহের একটা টিন কাঁধে ঝোলান ; হাতে সবুজ রঙের প্রজাপতি ধরার জাল।

ভদ্রলোক কাছে এসে বললেন, মাপ করবেন, ডঃ ওয়াটসন, আপনাকে দেখেই ছুটে এলাম আলাপ করব বলে। আমি মেরিপিট হাউসের স্টেপলটন—ডঃ মার্টিমারের বন্ধু। বন্ধুর মুখে নিশ্চয় আমার নামও আপনি শুনে থাকবেন।

বললাম—প্রকৃতিবিদ মিঃ স্টেপলটনের নাম আমার শোনা। কিন্তু আমাকে আপনি চিনলেন কি করে?

—ডঃ মার্টিমারের ওখানে গিয়েছিলাম, উনিই আপনাকে দেখিয়ে দিলেন। একই পথে আমাকেও যেতে হবে—তাই দৌড়ে এসে আপনাকে ধরলাম। স্যার হেনরী এসেছেন জেনে খুবই খুশি হয়েছি। আশঙ্কা ছিল তিনি শেষ পর্যন্ত এখানে আসতে চাইবেন কিনা। পিশাচ-কুকুরের গল্প এখানে লোকের মুখে মুখে। দুরন্ত অভিশাপে ভুগছে পরিবারটা।

—এখানকার কিংবদন্তীটা শুনেছি আমিও।

—এ এক অদ্ভুত রহস্য মশায়। এখানকার চাষীরা প্রত্যেকেই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে গল্পটা। ওরা অনেকে নাকি দেখেওছে সেই বীভৎস প্রাণীটাকে এই জলায়। স্যার চার্লসও বিশ্বাস করতেন—মৃত্যুটাও হল শোচনীয়ভাবে। হৃদপিণ্ডের অবস্থা এমনিতেই ভাল ছিল না। তার ওপর উদ্ভট প্রাণীটার কল্পনা করতে করতে স্নায়ুও যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

আমার মনে হয় সেই রাতে সত্যিই কিছু একটা দেখে উনি হার্ট ফেল করেছিলেন। ডঃ মার্টিমারেরও তাই ধারণা, এই নির্জন জলাদেশে আমরা সকলেই কাছের মানুষ ছিলাম।

—আপনার ধারণা তাহলে পিশাচ-কুকুরের তাড়া খেয়েই ভয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন স্যার চার্লস?

—তাছাড়া আর কি ভাবা যায় বলুন? মিঃ শার্লক হোমসও আপনাদের সঙ্গে এসছেন কি?

প্রশ্ন শুনেই চমকে উঠলাম। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকালাম স্টেপলটনের মুখের দিকে। তিনি একইভাবে বলতে লাগলেন, কথাটা এভাবে জিজ্ঞাসা করলাম বলে কিছু মনে করবেন না। আপনার ডিটেকটিভ কাহিনী আমার অজানা নয়। তাই আপনার আগমন থেকেই অনুমান হল, মিঃ হোমসও এ কেস সম্পর্কে আগ্রহী।

আমি শান্ত স্বরে বললাম, তিনি অন্য কেস নিয়ে খুবই ব্যস্ত, এই মুহূর্তে লন্ডন ছেড়ে তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়।

—আমার বিশ্বাস, তিনি এলে সব রহস্যই পরিষ্কার হয়ে যেত। যাই হোক, যদি কোন সাহায্য সহযোগিতার দরকার হয় বলতে দ্বিধা করবেন না।

আমি হেসে বললাম, তার প্রয়োজন হবে না। কেননা আমি আমার বন্ধু স্যার হেনরীর সঙ্গে দিন কয়েক কাটাতে এসেছি—কোন রকম তদন্তের কাজ নিয়ে আসিনি।

কথা বলতে বলতে একসময় ঘাস-ছাওয়া রাস্তায় পৌঁছে গেলাম আমরা। রাস্তাটা এঁকেবেঁকে এগিয়ে জলার মধ্যে ঢুকে গেছে।

স্টেপলটন বললেন—জলার এই রাস্তা দিয়ে সামান্য এগুলেই মেরি পিট হাউস। আসুন না, আস্তানাটা দেখে যাবেন—আমার বোনের সঙ্গেও আলাপ হবে।

কথাটা শুনে মনে পড়ল, স্যার হেনরীকে অনেকক্ষণ একা রেখে এসেছি। হোমস তার কাছ ছাড়া হতে বারণ করেছিল। কিন্তু জলার প্রতিবেশীদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া আমার দরকার, তাই দ্বিধা না করে স্টেপলটনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

সামনেই দীর্ঘ সবুজ ঘাসের তরঙ্গ—মাঝেমাঝে গ্রানাইট পাথরের স্তূপ।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে স্টেপলটন বলতে লাগলেন—এক আশ্চর্য জায়গা এই জলাভূমি। উত্তরের প্রান্তরটা দেখুন—বিক্ষিপ্তভাবে কতগুলো পাহাড়ের মাথা দেখা যাচ্ছে—তারই ফাঁকে ফাঁকে ঝকঝকে সবুজ জায়গাগুলো—ওই হল গ্রিমপেন কর্দমভূমি—জলার মরণ ফাঁদ।

একটু অসতর্ক পা পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে তলায় টেনে নিয়ে যাবে। গতকালই আমার চোখের সামনে গেল একটা টাট্টু ঘোড়া।

আমি কিন্তু এরই মধ্য দিয়ে পথ করে ঠিক মাঝখান ধরে এগিয়ে যেতে পারি।

কথা বলতে বলতে এগুচ্ছি, মাঝ মাঝে ভয়ঙ্কর জলাটার দিকে তাকাচ্ছি। সহসা সামনের নল খাগড়ার মধ্যে বাদামী মত কি যেন একটা গড়াগড়ি দিচ্ছে মনে হল।

চমকে উঠে তাকালাম—ভয়াবহ আর্তনাদ উঠল সেখান থেকে। একটা লম্বা গলা দু একবার ঠেলে উঠবার চেষ্টা করে স্তব্ধ হয়ে গেল। বীভৎস আর্তনাদে কেঁপে কেঁপে উঠল জলার ওপর দিয়ে বয়ে চলা হাওয়া।

—গেল—তলিয়ে গেল। গ্রিমপেন কাদা আরও একটা প্রাণী নিয়ে গেল। এখানকার প্রতিদিনকার ঘটনা মশায়। আমি কিন্তু খুঁজে খুঁজে পথ চিনে নিয়েছি—এর মধ্য দিয়েই যেতে পারি।

—আপনি এখানে কতদিন এসেছেন?

—বেশিদিন নয়, বছর দুই। স্যার চার্লস আসবার কিছুদিন পরেই।

চলতে চলতে দূরের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন—ওগুলো কাদার সমুদ্রে যেন দ্বীপ—যুগ যুগ ধরে একইভাবে রয়েছে—প্রজাপতি খুঁজতে আমাকে ওখানে যেতে হয়।

এই সময়ই গম্ভীর একটা গোঙানির মত শব্দ জলার ওপর দিয়ে ভেসে এল। শব্দটার উৎস বোঝা গেল না।

কান পেতে রইলাম—প্রথমে কেমন একটা গজরানি—এরপর গভীর গর্জন—

তারপর গোঙানীর শব্দ হয়ে ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে এল।

অদ্ভুত একটা দৃষ্টি নিয়ে স্টেপলটন তাকালেন আমার মুখের দিকে। বললেন—এখানকার চাষীরা বলে—বাস্কারভিল-কুকুরের গর্জন। এর আগে আরও দু'একবার আমি এ ডাক শুনেছি।

ভয়ে উত্তেজনায় বুক টিপ টিপ করছিল আমার। বললাম—এসব আজগুবি গল্প আপনি বিশ্বাস করেন? এতো জীবন্ত কোন প্রাণীর স্বর বলেই মনে হলো।

—এখানকার রহস্য নিয়ে বুক ঠুকে কোন কথাই বলতে পারব না মশায়। সবই অদ্ভুত। এখানে সবই সম্ভব।

আমাদের ডান দিকে পাহাড়ের ঢালে বিস্তর প্রস্তর বলয়—মনে হল ভেড়ার খোঁয়াড়। স্টেপলটনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শোনালেন অদ্ভুত ইতিহাস।

বললেন, খোঁয়াড় নয়—আমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘরবাড়ি ওগুলো। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বসতি ছিল ওই জলায়। প্রস্তর যুগের সময়ে এখানকার আদিম বাসিন্দারা গরু ভেড়া চরাতো, আরে ওইতো একটা সাইক্লোপাইডস—

বলতে বলতে প্রজাপতি-ধরা জালটা বাগিয়ে অদ্ভুত ক্ষিপ্র বেগে ধাওয়া করলেন একটা মথ পোকার পেছনে।

পোকাটা সেই পাঁকের রাজত্বে উড়ে চলেছে—আর আশ্চর্য কৌশলে লাফিয়ে ডিঙিয়ে—ছুটে চললেন সেটার পেছনে। সভয়ে বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

এমন সময় পেছনে পায়ের শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি একজন মহিলা। কেন জানি দেখেই মনে হল মিস স্টেপলটন। আশ্চর্য রূপসী মহিলা। তন্বী দীর্ঘাঙ্গী। নিখুঁত মুখাবয়ব। চুল কালো—কালো চোখ জোড়াও।

প্রথম দর্শনেই মোহিত করবার মত সৌন্দর্য। মহিলা ভাই-এর দিকে একপলক তাকিয়ে নিয়ে আচমকা বলে উঠলেন—লন্ডনে ফিরে যান। একমুহূর্তও থাকবেন না এখানে।

আমি হকচকিয়ে গেলাম। বোবা বিস্ময়ে তাকালাম তার চোখের দিকে। বললাম—ফিরে যাব? কেন?

—দোহাই আপনার। প্রশ্ন করবেন না। এক মুহূর্ত দেরী না করে লন্ডনে ফিরে যান। জীবনে কখনো আসবেন না এ জলায়। চুপ। ভাই আসছে। ওর সামনে কোন কথা তুলবেন না। কী সুন্দর—ওই অর্কিডটা—আমাকে এনে দেবেন?

হাঁপাতে হাঁপাতে ততক্ষণে ফিরে এসেছেন স্টেপলটন। এসেই বলে উঠলেন, বেরিল, এসে গেছ—

—জ্যাক, তোমার মুখ তেতে লাল হয়ে গেছে।

বিস্ময় কৌতূহল সব আমার মধ্যে। ভাইবোনের পরস্পরের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকাতে লাগলাম আমি। কেন জানি আমার মনে হল ভাই বোনের

মধ্যে কথাগুলো কেমন প্রাণহীন—

—বেরিল, বলতো ইনি কে?

—নিশ্চয় স্যার হেনরী।

—না, না, আমি বলে উঠলাম, নিতান্তই সাধারণ মানুষ—আমার নাম ডক্টর ওয়াটসন।

মেয়েটির মুখে যেন অপ্রস্তুত ভাব ছায়া ফেলল। তারপর সামলে নিয়ে বলল, ডক্টর ওয়াটসন বেড়াতে এসেছেন বুঝিনি আমি। ভালই হল, মেরিপিট হাউসটা তাহলে দয়া করে ঘুরেই যান।

ততক্ষণে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ফল ফুলের বাগান ঘেরা বাড়িটার সামনে পৌঁছে গেলাম। দেখেই মনে হল কেমন একটা বিষণ্ণতার ছায়া যেন ঘিরে রেখেছে বাড়িটাকে।

একজন বয়স্ক পরিচারক এসে দরজা খুলে দিল।

বাড়ির ভেতরটা একেবারে অন্যরকম। রুচিসম্মত আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো। ভেবে পেলাম না, এই আদিম জলাভূমিতে উচ্চ শিক্ষিত এই ভদ্রলোক এবং পরমা সুন্দরী মহিলা কিসের আকর্ষণে রয়েছেন?

জলাভূমিতে একটা ঘোড়ার শোচনীয় মৃত্যু চোখের সামনেই ঘটেছে, বাস্কারভিল-কুকুরের ভৌতিক গর্জনও নিজ কানে শুনেছি—ঘটনাগুলো মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

ওদিকে স্যার হেনরী বাড়িতে একা রয়েছেন। তারপর মিস স্টেপলটনের আকস্মিক হুঁশিয়ারি—সব মিলিয়ে ভেতরটা কেমন অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠল।

এই গোপন হুঁশিয়ারির কারণটা হাতড়ে ফিরছিলাম, তাই মন খুলে এদের সঙ্গে কথা বলার মুড পাচ্ছিলাম না।

এদিকে স্টেপলটন বলে চলেছেন—উত্তর অঞ্চলে একটা স্কুল করেছিলেন। আকস্মিক মড়কে তিনটে ছেলে মারা যাবার পর স্কুল তুলে দিয়ে উদ্ভিদতত্ত্ব আর প্রাণীবিদ্যার চর্চা নিয়ে এখানে নিরিবিলিতে বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছেন।

কথায় কথায় স্যার চার্লসের প্রসঙ্গে এসে গেলেন। আমিও একটু সজাগ হলাম। বললেন—আশ্চর্য উদার মনের মানুষ। যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল আমার সঙ্গে। তাঁর মৃত্যু আমার বুক ভেঙ্গে দিয়েছে। এখানে বসবাসের একটা বড় বন্ধন আমার সরে গেল।

স্যার হেনরীকে জানাবেন দয়া করে, আজ বিকেলে একবার যাব তার সঙ্গে দেখা করতে।

বললাম—আসুন খুবই খুশি হবেন তিনি।

মিস স্টেপলটন লাঞ্চের অনুরোধ জানালেন। ক্ষমা প্রার্থনা করে তাড়াতাড়ি

বিদায় নিতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

সরু পথ অতিক্রম করে মূল রাস্তায় পৌঁছে অবাক হয়ে দেখলাম মোড়ের মাথায় আমার আগেই এসে দাঁড়িয়ে আছেন মিস স্টেপলটন।

কাছে যেতে বললেন, আপনাকে ধরব বলেই দৌড়ে অন্য পথ দিয়ে এলাম। ফিরতে হবে এখুনি—নইলে ভাই ধরে ফেলবে।

আপনাকে স্যার হেনরী ভেবে যা বলেছি, তার জন্য ক্ষমা করবেন। ওই কথার সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক নেই।

—স্যার হেনরী আমার বন্ধু—তাঁর ভাল মন্দ নিয়ে আমি খুবই উদ্বিগ্ন। আপনি চান তিনি লন্ডনে ফিরে যান—কিন্তু কেন?

—ওটা খেয়ালের বশে বলা ডক্টর ওয়াটসন।

—আমার কিন্তু নিছক খেয়াল বলে মনে হয়নি। চোখে পড়বার মত আবেগ আপনার মধ্যে আমি দেখেছি তখন। নিশ্চয়ই আপনার কিছু বক্তব্য আছে। যা জানেন নির্দ্বিধায় বলুন। আপনার প্রতিটি কথা স্যার হেনরীকে পৌছে দেব।

—দেখুন, স্যার চার্লসের মৃত্যুতে আমরা দুই ভাইবোন খুবই অঘাত পেয়েছি। বংশের মাথায় একটা অভিশাপ ঝুলছে—উনি এই অভিশপ্ত বাড়িতে থাকলে আবার কি ঘটে যায়—এমন একটা আশঙ্কা থেকেই কথাটা বলা—

—ওসব পিশাচ-হাউন্ডের গালগল্প আপনি বিশ্বাস করেন?

—আমি করি। যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয়, তাহলে ওঁকে সরিয়ে নিয়ে যান। এমন বিপদের জায়গায় কেন উনি থাকবেন?

—কেবল কি পিশাচ-হাউন্ডের জন্যই আপনি এই প্রাচীন ভবনকে বিপদের জায়গা মনে করছেন—না অন্য কিছু?

—কেবল সেই কারণেই।

—মিস, একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন? আপনার ভাইকে গোপন করে এভাবে কথাটা আমাকে জানালেন কেন?

—আমার ভাই অন্তর দিয়ে চান, বাস্কারাভিল হলে কেউ এসে বসবাস করুক। তাহলে অঞ্চলের মানুষ উপকৃত হবে নানাভাবে। যদি শোনেন আমি স্যার হেনরীকে চলে যাওয়ার মত প্ররোচনা দিয়ে কথা বলছি তাহলে দুঃখ যেমন পাবেন—আমার ওপর অসন্তুষ্টও হবেন। যাক, আর দাঁড়াব না।

বলতে বলতে সামনের প্রস্তররাশির আড়ালে বেগে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিন্তু আমার মনে মহিলা গেঁথে দিয়ে গেলেন রহস্যময় জিজ্ঞাসা আর অজানা এক আতঙ্ক।

আর অপেক্ষা না করে দ্রুত পা চালালাম বাস্কারভিল হলের দিকে।

হোমস বলেছিল, এখানকার সবরকম খবরাখবর আমি যা দেখছি—উপলব্ধি

করছি—যা শুনছি নিয়মিত এখান থেকে জানাতে। আমিও সেভাবেই তাকে জানিয়েছি সব। চিঠিতে, কখনো টেলিগ্রাম করে।

তেরো অক্টোবরের চিঠিতে যা জানিয়েছিলাম, তার অনুলিপি হুবহু তুলে ধরছি—

প্রিয় হোমস,

আমার আগের পাঠানো চিঠি এবং টেলিগ্রাম নিশ্চয়ই তোমার হাতে পৌঁচেছে।

গত কদিন, পাাঠাবার মত গুরুত্বপূর্ণ কোন খবর ছিল না বলে লিখিনি।

এখানে এক অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে আমার দিন কাটছে। বসবাস অভিশপ্ত এক প্রাচীন ভিটেতে। সে আবার এমন এক জায়গায় যার চারিদিকে ন্যাড়া গ্রানাইট পাথরের পাহাড়, ঝোপ জঙ্গল আর এক ভয়াবহ জলাভূমি।

তুমি শুনে অবাক হবে জলার বুকে সংখ্যাহীন পাথরের স্তূপের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক মানবের বসবাস আর কাজকর্মের নিদর্শন।

প্রকাণ্ড পাথরের ছাদহীন কুটিরগুলো দেখলে মনে হয়—এই বুঝি পাথরের কুঠার হাতে ভেতর থেকে কেউ বেরিয়ে আসবে। এই ঊষর ভূমিতে এত ঘন বসতি কি করে হল তা প্রত্নতত্ত্ববিদদের গবেষণার বিষয় হতে পারে।

জেলখানার পলাতক কয়েদির কথা তোমাকে জানিয়েছিলাম। গত পনের দিনে একবারের জন্যও তার আভাস এখানে মেলেনি। সকলেই ভেবেছিল পাহাড়ে পাথরের ঘরের মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। এখন বোঝা যাচ্ছে সে এখানে এসেও পরে অন্য কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে। এখানে পালিয়ে থাকা হয়তো যায় কিন্তু খিদে মেটাবার কোন উপায় নেই।

একটা মজার সংবাদ হল এই যে, স্যার হেনরী তার সুন্দরী প্রতিবেশিনীর প্রতি ক্রমেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন বুঝতে পারছি।

প্রকৃতিবিদ স্টেপলটনের বোনের কথা বলছি। মহিলা যথার্থ সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তাই। তবে ভাইকে যে মহিলা খুবই ভয় পান সেটাও বোঝা যায়।

প্রথমদিনেই বোনকে নিয়ে এ বাড়িতে এসেছিলেন স্টেপলটন। আর প্রথম দিনেই দুজন দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। এখন প্রায় প্রতিদিনই ভাই বোনের কারুর না কারুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যাচ্ছে।

আজ রাত্রে এখানে খাবেন ওঁরা। সামনের সপ্তাহে আমাদের যাবার কথা আছে।

স্টেপলটন কিন্তু লক্ষ করেছে বোনের মনোভাব। তাই একটু ঘনিষ্ঠ কথাবার্তা হতে দেখলেই তার চোখ মুখের ভাবে অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করি।

প্রেম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে বোনটি কাছছাড়া হয়ে গেলে তিনি একা হয়ে পড়বেন, হয়তো সেকারণেই বোনকে আড়াল করে রাখতে চান। দু চারবার

সাক্ষাৎকারও বানচাল করে দিয়েছেন।

দুষ্ট হিউগোর কিংবদন্তীর উৎস যেখানে স্টেপলটন সে জায়গাটা আমাদের দেখিয়ে এনেছেন।

জলার ভেতরে মাইল কয়েক ভেতরে জায়গাটা। এবড়ো- খেবড়ো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে এসে খা-খা ঘাস-ছাওয়া প্রান্তর সেটা। পরিবেশটাই কেমন ভয় ধরানো।

স্যার হেনরী কৌতূহলী হয়ে স্টেপলটনের কাছে অনেক কথাই জানতে চাইছিলেন। স্টেপলটন বিজ্ঞানী হলেও দেখলাম, গুজবে যথেষ্ট বিশ্বাসী।

অশুভশক্তির প্রকোপে সর্বনাশ হয়েছে এমন অনেক ঘটনা তিনি আমাদের শোনালেন।

গত বৃহস্পতিবারে ডক্টর মার্টিমার লাঞ্চ খেয়ে গেলেন আমাদের সঙ্গে। সম্প্রতি লঙডাউনে তিনি একটা কবর খুঁড়ে প্রাগৈতিহাসিক করোটি উদ্ধার করেছেন। এখন একরকম মেতে আছেন সেটা নিয়ে।

সেদিনই কিছু পরে স্টেপলটনরাও এসেছিলেন। সকলে একত্র হলে স্যার হেনরীর অনুরোধে ডাক্তার আমাদের নিয়ে সেই অভিশপ্ত ইউ-বীথিতে এলেন যেখানে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখালেন।

গোটা জায়গাটাতে কেমন গা ছমছম করা ভাব। বীথির মাঝামাঝি জায়গায় জলার দিকে হুড়কো লাগানো সাদা কাঠের ছোট ফটক। তার ওপাশেই বিশাল জলাভূমি।

স্যার চার্লস এখানে দাঁড়িয়ে চুরুটের ছাই ঝেড়েছিলেন। তোমার থিওরী মনে পড়ল। বৃদ্ধ কারুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন—এমন সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউ-বীথি ধরে প্রাণভয়ে দৌড়েছেন। কিন্তু কিসের ভয়ে?

ভেড়া তাড়ানো কুকুর দেখে এমন ভয় পাওয়া কি স্বাভাবিক?

তাহলে কি সত্যিই কোন পিশাচ-কুকুর তাকে তাড়া করেছিল?

শরীরী প্রেতের সেই ভয়াল ভয়ংকর রূপ দেখেই কি আতঙ্কিত হয়েছিলেন স্যার চার্লস?

ব্যারিমুর বা ঐ জাতীয় কোন দুষ্ট মানুষের হাত নেই তো এই ঘটনার পেছনে?

ব্যারিমুরের প্রতি সন্দেহটা ক্রমেই যেন ঘনীভূত হচ্ছে। ওর সব কিছুই যেন মনে হচ্ছে রহস্যময়।

ল্যাফটার হিলের মিঃ ফ্রাঙ্কল্যান্ডের সঙ্গে আলাপ হল। এ এক মজার প্রতিবেশী। হল থেকে মাইল চারেক দক্ষিণে ভদ্রলোকের বাড়ি।

মাঝামাঝি বয়সের মানুষ—চুল ধবধবে সাদা, মুখের রং লাল, অল্পেতেই রেগে যান।

মামলাবাজ বলতে যা বোঝায় ভদ্রলোক তাই। মামলা করবার জন্যই মামলা লড়েন। এই করে সম্পত্তির অর্ধেক ফুঁকে দিয়েছেন। কারণে অকারণে চ্যালেঞ্জ করে বসেন।

সাধারণের চলাচলের ন্যায়সঙ্গত পথ বন্ধ করে দিয়ে মিথ্যা মামলা জুড়ে দেন। এই মুহূর্তে ভদ্রলোকের হাতে সাত সাতটি মামলা ঝুলছে।

এমনিতে কিন্তু ভদ্রলোক অমায়িক, আলাপি। মনটাও ভাল। ইনি আবার সখের জ্যোতির্বিজ্ঞানীও বটে। বাড়ির ছাদে একটা টেলিস্কোপ বসিয়েছেন।

টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে কদিন পলাতক কয়েদীর সন্ধানে জলাভূমি একরকম চষে ফেলেছেন।

শোনা যাচ্ছে লণ্ডডাউনে কবর খোঁড়ার আগে প্রতিবেশীর সম্মতি নেননি বলে ইনি ডক্টর মার্টিমারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন।

এবারে কালরাতের একটা বিস্ময়কর ঘটনার বিবরণ তোমাকে দিচ্ছি। খবরটা ব্যারিমুর দম্পতিকে কেন্দ্র করে।

ইতিমধ্যে লন্ডন থেকে বেশভূষা এসে যাওয়ায়—পুরনো পরিচ্ছদগুলো স্যার হেনরী বাতিল করেছেন। দান করে দিয়েছেন ব্যারিমুরকে।

মিসেস ব্যারিমুরের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছি। এবাড়িতে এসে প্রথম রাতেই বুকফাটা কান্নার শব্দ শুনেছিলাম। তারপরেও একাধিকবার ভদ্রমহিলার চোখে অশ্রুর দাগ লক্ষ্য করেছি।

বুঝতে পারছি না কি ব্যাপার। ব্যারিমুর বউকে কষ্ট দেয় কিনা জানি না। লোকটা খুবই সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে আমার।

কাল রাতের ঘটনার পর লোকটার সম্পর্কে আমি আরও সতর্ক হয়েছি।

রাত প্রায় দুটোর সময়ে আচমকা আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। শুনতে পেলাম আমার দরজার বাইরে করিডরে পা টিপে চলার শব্দ। সন্তর্পণে দরজা খুলে উঁকি মেরে দেখলাম, একটা লোক আলতো হাতে মোমবাতি নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

উচ্চতা দেখে চিনতে পারলাম—ব্যারিমুর। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হাঁটছে। পায়ে জুতো বা চটি কিছুই নেই। নিঃশব্দে পেছন নিলাম।

বারান্দা ঘুরে একটা ঘরে গিয়ে সে ঢুকল। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

ঘরে ঢুকে কাচের সার্সির গায়ে মোমবাতি ধরে জানলার ওপর যেন হুমড়ি খেয়ে রইল। বাইরের জমাট অন্ধকারের বুকে কিছু লক্ষ্য করছে বলে মনে হল।

তারপর কেমন গুঙিয়ে উঠে মোমবাতি নিবিয়ে দিল। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে ফিরে এলাম ঘরে।

কিছুক্ষণ পরে পায়ের শব্দে টের পেলাম—ফিরে যাচ্ছে ব্যারিমুর।

ব্যাপারটা মাথায় রেখেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

তন্দ্রামত এসেছিল—তলার ফোকরে চাবি ঘোরানোর ক্লিক আওয়াজ কানে যেতে তন্দ্রা ভেঙে গেল। শব্দটা কোনদিক থেকে এল বুঝতে পারলাম না।

বিষাদঘেরা এই প্রাচীন প্রাসাদপুরীতে কিসের যেন একটা ষড়যন্ত্র চলেছে—সাঙ্গোপনে—তার আভাস পাচ্ছি।

ঘটনা যেমন ঘটছে তাই হুবহু জানালাম—এ থেকে বাড়ির রহস্য উন্মোচনের সন্ধান তুমি করবে।

আজ সকালে স্যার হেনরীর সঙ্গে বসে খোলাখুলি আলোচনা করে একটা নৈশ অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ফলাফল পরবর্তী চিঠিতে তোমাকে জানাতে পারব।

প্রিয় হোমস,

ঘটনার ঘনঘটা চলেছে আমার চারপাশে। তোমাকে রাতে জানালায় ব্যারিমুরের রহস্যজনকভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কথা জানিয়েছিলাম। এবার তার পরবর্তী পর্যায় শোন।

যে ঘরে ব্যারিমুর ঢুকেছিল, পরদিন সকালে সে ঘরে ঢুকেছিলাম। পশ্চিমের যে জানলা দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল ব্যারিমুর, লক্ষ্য করলাম এখান থেকে জলার খুব কাছের চেহারা দেখা যায়।

অন্য যে কোন জানলায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে জলার দূরের দৃশ্য।

এ জানলায় দাঁড়িয়ে দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে জলার ভেতর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়।

তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে। নিশ্চয় জলার বুকে কিছু দেখবার আশায় সে দাঁড়িয়েছিল। পরে পেয়েছিলাম তালায় চাবি ঘোরানোর আওয়াজ।

স্যার হেনরী বলেছিলেন, ব্যারিমুর রাতে বাড়ি টহল দেয়—এর আগেও দু'দিন উনি টের পেয়েছেন।

তুমি থাকলে নিশ্চয় গোপনে পেছু নিয়ে জানবার চেষ্টা করতে—রোজ রাতে ঐ বিশেষ জানালায় গিয়ে আলো হাতে দাঁড়ায় কিনা।

আমরাও স্থির করলাম, এবারে পায়ের আওয়াজ পেলেই পেছন নেব।

ব্যারিমুর সম্পর্কে আলোচনার পরেই স্যার হেনরী জলার দিকে যাবেন বলে উঠে দাঁড়ালেন। তাকে একা যেতে দিতে পারি না আমি শুনে তিনি যা বললেন তাতে বুঝলাম, গোপন অভিসারের ব্যাপার। এক্ষেত্রে আমার উপস্থিতিটা না ঘটলেই তিনি খুশি হন।

আমি এ অবস্থায় কি করব ভেবে স্থির করতে করতেই তিনি টুপি তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

এভাবে তাঁকে জলার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না—আমার কর্তব্যে অবহেলার জন্য পরে অনুশোচনা হতে পারে মনে হতেই দৌড়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়।

কিন্তু স্যার হেনরীকে চোখে পড়ল না। তখন ওপর থেকে দেখবার উদ্দেশ্যে একটা পাহাড়ের ওপরে উঠলাম।

দেখলাম প্রায় সিকি মাইল দূরে জলার রাস্তায় হাঁটছেন—পাশে একটি নারীমূর্তি। বুঝলাম মিস স্টেপলটন—সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ নিশ্চয় স্থির করাই ছিল আগে থেকে।

কী অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল হোমস। দু'জনের চলা কথা বলার ভঙ্গী ঘনিষ্ঠতা দূরের পাহাড়ের ওপর থেকে যা চোখে পড়ল তাতে বুঝতে কষ্ট হল না দুজন মনের দিক থেকে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন ইতিমধ্যেই।

হাত নাড়া এবং কথা বলার ভঙ্গী দেখে বুঝতে পারলাম মিস স্টেপলটন কি একটা বিষয় ব্যাকুল ভাবে বোঝাতে চাইছেন স্যার হেনরীকে।

তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে যেন মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাচ্ছেন ব্যারনেট।

দুজনে এভাবে গভীর আলোচনায় তন্ময় হয়ে রয়েছেন—এমন সময় প্রজাপতি-ধরা জাল নিয়ে সেখানে কোত্থেকে এসে হাজির হলেন মিঃ স্টেপলটন। তাকে দেখতে পেয়েই দু'জন দুদিকে ছিটকে সরে গেলেন।

ভদ্রলোক দুজনকে এই জায়গায় এভাবে দেখতে পাবেন আশা করেননি বোধহয়। পাগলের মত লাফাতে লাগলেন আর উত্তেজিত ভাবে কি বলতে লাগলেন।

স্যার হেনরী বারবার বোঝাতে চেষ্টা করছেন কিন্তু স্টেপলটন কিছুই বুঝতে চাইছেন না। খেপে উঠছেন। শেষে অভিভাবকের গম্ভীর চেহারায় বোনকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন স্টেপলটন।

আর মাথা হেঁট করে মূর্তিমান বিষাদের মত ফেরার পথ ধরলেন মিঃ হেনরী।

দৌড়ে পাহাড় থেকে নেমে এলাম। আমাকে দেখে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলেন ব্যারনেট।

তাকে এভাবে একা ছেড়ে দিয়ে আমার পক্ষে যে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নয় তা বোঝালাম এবং এও বললাম ওর পেছন পেছন এসে পাহাড়ের ওপর থেকে কি কি দেখলাম।

প্রথমে ক্রোধ দপ করে জ্বলে উঠল তার চোখে। কিন্তু আমার সরল স্বীকারোক্তিতে পরক্ষণেই জল হয়ে গেলেন। তখন সব কথাই খুলে বললেন।

বোনের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে খুবই আপত্তি প্রকাশ করেছেন স্টেপলটন।

আজই নিরিবিলি মন খুলে কথা বলার সুযোগ এসেছিল।

স্যার হেনরী বললেন, একটা ব্যাপার তার কাছে রহস্য ঠেকেছে—প্রেম বা আবেগের কথা এড়িয়ে সুযোগ পেলেই মহিলা বারবার একটা কথাই তাকে শুনিয়েছেন, এ জায়গা অতি ভয়ঙ্কর—এখান থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পাবেন না।

দেখ খেতাব, সম্পত্তি, বয়স, চরিত্র, আকৃতি—কোনদিক থেকেই ব্যারনেট মিস স্টেপলটনের অযোগ্য নন—তথাপি তার সঙ্গে বোনের মেলামেশায় ভদ্রলোকের এত আপত্তি কেন বুঝতে পারছি না।

বংশের দুর্ভাগ্যর সঙ্গে তিনি বোনের ভাগ্যকে জড়াতে দিতে চান না, না অন্য কোন কারণ বুঝে উঠতে পারলাম না আমরা দুজনের কেউই।

সারা দিন খুবই বিমর্ষ হয়ে রইলেন স্যার হেনরী।

সেদিন বিকেলেই কিন্তু আকাশের মেঘ কাটল। স্টেপলটন এলেন এবং স্যার হেনরীর সঙ্গে একান্তে বসে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে সামনের সপ্তাহে রাতের আহারের নিমন্ত্রণ জানিয়ে চলে গেলেন।

স্যার হেনরীর কাছে জানলাম, ভদ্রলোক সকালের ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে গেলেন।

ভাই বোন মিলে থাকেন—বিয়ে হয়ে বোন চলে যাবে—তিনি সংসারে একা হয়ে পড়বেন—সেই নিঃসঙ্গ স্নেহ মমতাহীন জীবনের কথা মনে পড়লে নাকি তার মাথায় সব গোলমাল হয়ে যায়।

তবে বোনকে সারাজীবনের জন্য তো আর কাছে কাছে রেখে দেওয়া ঠিক হবে না। সেটা হবে চরম স্বার্থপরতা। তাই তাকে যদি পাত্রস্থ করতে হয় তবে স্যার হেনরীর মত সজ্জন প্রতিবেশীর জন্যই করবেন।

কিন্তু ভবিষ্যৎ একাকীত্বের এই আঘাত সামলে ওঠার প্রস্তুতির জন্য ভদ্রলোক কিছুদিন সময় চেয়েছেন। স্যার চার্লসকে কথা দিতে হল—মাস তিনেক তিনি মিস স্টেপলটনের সঙ্গে মিশবেন কেবলই বন্ধুর মত, এর চাইতে বেশি এগুবেন না।

স্টেপলটনের ব্যবহার নিয়ে আমাদের মনে যে একটা রহস্য উঁকি মেরেছিল তার নিরসন হল এভাবে।

হোমস, এবারে তোমাকে জটপাকানো কিছু ব্যাপার পরিষ্কার করছি।

নিশীথ রাতে ফোঁপানো কান্না, মিসেস ব্যারিমুরের কান্নাফোলা মুখ, গভীর রাতে পশ্চিমের জানালায় খাস চাকরের গোপন অভিযানের রহস্য একে একে বিবৃত করছি।

এই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য আমাদের দুটো রাত ব্যয় করতে হয়েছে। প্রথম রাতে স্যার হেনরীর ঘরে তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করে থেকেও বারান্দায় পায়ের

শব্দ শুনতে পাইনি।

হতাশ না হয়ে পরদিন আবার শিকারের জন্য ওঁৎ পেতে বসলাম।

রাত দুটো বেজে যাবার পরে কানে এলো বারান্দার ওপরে পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে।

দুজনেই নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরুলাম—দেখলাম মোম হাতে দাড়িওয়ালা ব্যারিমুর এগিয়ে যাচ্ছে।

আগের দেখা সেই বিশেষ ঘরটিতে গিয়ে ঢুকল। অন্তরালে থেকে আমরা উঁকি মেরে রইলাম।

দেখলাম, আজও সে একই ভাবে জানালার সামনে জ্বলন্ত মোমবাতি ধরে সার্সির ওপরে মুখ চেপে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে অপলকে।

স্যার হেনরী, আর দেরি না করে সরাসরি ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। জানালার সামনে থেকে ছিটকে সরে গিয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল ব্যারিমুর। মুখ ফ্যাকাশে।

স্যার হেনরী জিজ্ঞেস করলেন, কি করছ তুমি এখানে?

ব্যারিমুর দুরন্ত উত্তেজনা চেপে শান্তভাবে বলবার চেষ্টা করল—জানালাটা দেখছিলাম স্যার। সব জানালা বন্ধ আছে কিনা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম।

কড়া গলায় এবার বললেন স্যার হেনরী, মিথ্যা বাদ দিয়ে সত্যি কথাটা বলে ফেল—কি করছিলে জানালায়—

ব্যারিমুর একই কথার পুনরাবৃত্তি করল।

জানালার গোবরাটে মোমটা রেখেছিল ব্যারিমুর। আমি সেটা তুলে নিয়ে ও যেভাবে ধরেছিল ঠিক সেভাবে ধরলাম।

চোখ তুলে ধরলাম সামনে—গাছের আবছা কালো রেখা আর দিগন্ত বিস্তৃত জলার রেখা, অস্পষ্ট নজরে এল।

সহসা সেই নিঃসীম অন্ধকারের বুকে জেগে উঠল একটা হলুদ আলোর বিন্দু।

স্যার হেনরীকে ডেকে দেখালাম—স্পষ্ট সংকেতের লক্ষণ। হাতের আলোটা নাড়ালাম, সঙ্গে সঙ্গেই দূরের হলুদ বিন্দুও নড়ল। সংকেত ছাড়া এ কিছু নয়। নিঃসন্দেহ হলাম।

সে রাতে এর পর অনেক পীড়াপীড়িতেও ব্যারিমুর একটা কথাই বারবার বলল—সে নিজ মুখে কিছু বলতে পারবে না। গোপন এই রহস্যটা তার নয়—কাজেই সে কিছু ফাঁস করতে পারবে না।

স্যার হেনরী অবশেষে ছাঁটাইয়ের ভয় দেখালেন। এমন সময় মিসেস ব্যারিমুর উপস্থিত হল।

একটা নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হল এবং যে কাহিনী শুনলাম তা শুনব বলে

স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

শোন বলছি, জেল পলাতক কয়েদী সেলডন মিসেস ব্যারিমুরের ছোট ভাই। ছেলেবেলা থেকেই আদরে আদরে উচ্ছন্নে গেছে। বড় হয়ে কুসঙ্গে পড়ে কুকর্মে লিপ্ত হয়ে জেল খাটছিল।

বাইরে যতই সে কুখ্যাত হোক না কেন মিস ব্যারিমুরের কাছে ছিল সেই ছোট আদরের ভাইটি। জেল পালিয়ে সে জলায় গা ঢাকা দিয়েছিল।

একদিন রাতে অনাহারে ক্লান্তিতে ধুঁকতে ধুঁকতে এখানে আশ্রয় নিতে আসে। স্নেহকাতর দিদি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারে নি। আহার ও আশ্রয় দিয়ে কয়েকদিন তার শুশ্রূষা করল।

এই সময়েই উপস্থিত হলেন স্যার হেনরী। তখন সেলডন গিয়ে আশ্রয় নিল পাহাড়ী গুহায়। এক রাত অন্তর জানালায় আলো জ্বেলে দেখা হয় সেখানে আছে কিনা।

যদি জবাব আসে, মিঃ ব্যারিমুর কিছু রুটি আর মাংস দিয়ে আসে।

সেলডন দূরে কোথাও চলেও যাবে সে কথাই বলেছিল—যদি না যায়, খাবার না দিয়ে বোনের মন শান্তি পায় কি করে?

মিসেস ব্যারিমুর ধর্মভীরু খৃস্টান। তার প্রত্যেকটা কথা ছিল সুগভীর আন্তরিকতা মেশানো। অবিশ্বাস করবার সাধ্য আমাদের হল না।

স্বামী-স্ত্রী দুজনকে শান্ত করে ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

জানালা দিয়ে আমরা তাকালাম বাইরে। জলার কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া নাকেমুখে যেন ঝাপটা মারছে। দেখা গেল, অনেক দূরে—টিমটিম করে জ্বলছে হলদে আলোর ক্ষুদ্র বিন্দুটা। মনে হল দু-এক মাইলের মধ্যেই রয়েছে আলোটা।

সেদিকে তাকিয়ে স্যার হেনরী বললেন, ওয়াটসন, সেলডন লোকটা জেল পলাতক খুনী আসামী—সমাজের শত্রু। একে এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। যে কোনো সময় যে কোন প্রতিবেশীর ওপর হামলা করতে পারে। স্টেপলটন ভাইবোনও বিপদে পড়তে পারে। ওকে ধরা দরকার।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সশস্ত্র হয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা।

জলায় নেমেই শুনতে পেলাম—জলার বুকে সেই ভয়াল ভয়ঙ্কর গজরানি। এর আগে দিনের বেলায় শুনেছি। এখন এই গভীর রাতে বিস্তীর্ণ গ্রিমপেন কর্দমভূমির ওপর দাঁড়িয়ে রক্ত হিম-করা সেই গর্জন শুনে মনে হল যেন নরকের দ্বারপ্রান্তে হাজির হয়েছি।

স্যার হেনরীও উদ্‌গ্রীব কৌতূহল, বিস্ময় ও ভয় নিয়ে শুনতে লাগলেন দাঁড়িয়ে। নিশীথ রাতের কনকনে হাওয়ায় ভর করে যেন জলার গভীর থেকে ভেসে আসতে লাগল সেই পৈশাচিক শব্দ—একটানা গভীর গজরানি—তারপর

হিংস্র গর্জন।

ধাপে ধাপে বেড়ে গিয়ে ক্রমে গোঙানির শব্দের মত হয়ে মিলিয়ে গেল।

একবার নয়—

বারবার একইভাবে নিশীথ রাতের নিথর বুক ফালাফালা করে দিতে লাগল সেই অপার্থিব চিৎকার।

স্পষ্ট দেখতে পেলাম তীব্র ভয়ে আতঙ্কে মুখ সাদা হয়ে গেছে স্যার হেনরীর।

এক সময় একেবারেই থেমে গেল সেই ভৌতিক গর্জন। স্যার হেনরী অন্ধকারের দিকে মুখ রেখে বললেন—এতো স্পষ্ট হাউন্ডের ডাক। এই কি সেই বাস্কারভিল-কুকুরের ডাক? মনে হয় বহু মাইল দূর থেকে ভেসে এল।

আমারও মনে হল গ্রিমপেন জলায় বিপজ্জনক কাদার সমুদ্র যেদিকে, ডাকটা ভেসে এল সেদিক থেকেই।

কিন্তু রাতের অজানা আতঙ্ক আমাদের বাধা হয়ে উঠতে পারল না। সোৎসাহে এগিয়ে চললেন স্যার হেনরী জলার পাঁক ভেঙে।

দূরের আলোটা অন্ধকারের বুকে এখনো জেগে রয়েছে। চলতে চলতে কখনো মনে হচ্ছে দূরে, কখনো কাছে। অনেকটা পথ পার হয়ে আসবার পর আলোটা কোথায় জ্বলছে স্পষ্ট চোখে পড়ল।

আমাদের সামনেই পাহাড়ের খাঁজে বসানো একটা মোমবাতি। দু'পাশে পাথরের আড়াল। ফলে আলোটা হাওয়ায় নিবছে না—আর বাস্কারভিল হলের দিক থেকে ছাড়া অন্য দিক থেকে দেখার সম্ভাবনাও নেই।

গোলাকার একটা গ্রানাইট পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে সংকেত-বাতিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম আমরা।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। যাকে দেখব বলে ছুটে এসেছি—সহসা সেই খাঁজের ওপর আবির্ভূত হল তার ভয়ঙ্কর মুখটা।

জট পাকানো চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর মুখময় নোংরা পাঁকের দাগ। যেন প্রস্তর যুগের কোন বর্বর মানুষের অবয়ব।

অন্ধকারে মুখ বাড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে চোখ ঘুরিয়ে কি যেন দেখছে লোকটা। হয়তো কোন কারণে সন্দেহের উদ্রেক ঘটেছে। মনে হল, যে কোন মুহূর্তে লোকটা পালিয়ে অন্ধকারে মিশে যেতে পারে।

সময় নষ্ট না করে সবেগে ধেয়ে গেলাম সামনে। স্যার হেনরীও আসতে লাগলেন পেছনে। সেই মুহূর্তে তীক্ষ্ণগলায় গালাগাল দিয়ে সে একটা পাথর ছুঁড়ে মারল—চকিতের জন্য দেখলাম বেঁটেখাটো গাট্টাগোট্টা একটা মূর্তি লাফ দিয়ে পড়ে দুর্দান্ত বেগে নেমে যেতে লাগল।

পাথরে পাথরে পা দিয়ে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রগতিতে লাফাতে লাফাতে কয়েক

মিনিটের মধ্যে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রাণপণ দৌড়েও তার নাগাল পেলাম না আমরা। ক্লান্ত হয়ে দুজনে দুটো পাথরের ওপরে বসে হাঁপাতে লাগলাম।

খানিক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে উঠতে যাব ঠিক সেই সময়েই চোখে পড়ল অপ্রত্যাশিত এক দৃশ্য।

চাঁদের আলোর উজ্জ্বল পটভূমিকায় মিশমিশে কালো একটা মূর্তি—দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের ওপর। মূর্তিটা পুরুষ মানুষের—দীর্ঘকায়, ছিপছিপে। বুকের ওপর দুহাত ভাঁজ করে মাথা হেঁট অবস্থায় দাঁড়ান। যেন শরীরী মূর্তিতে কোন অশরীরী আত্মা।

পলাতক কয়েদীটি সে নয়—সে যেখানে অদৃশ্য হয়েছে—তারও অনেক দূরে এই মূর্তি।

স্যার হেনরীকে আঙুল তুলে দেখালাম। কিন্তু তিনি ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই চোখের নিমেষে অদৃশ্য হল মূর্তি। বললেন, কোন ওয়াচারকে হয়তো আমি দেখেছি।

জেল পলাতক আসামীকে ধরবার জন্য জলায় প্রহরা বসিয়েছে পুলিশ।

হয়তো তিনি ঠিকই বলেছেন। আমি আর এ নিয়ে বিশেষ ভাবিনি।

হোমস, দরকারী অদরকারী সব কথাই খুঁটিয়ে লিখলাম। এবারে তুমি ঝাড়াই বাছাই করে তোমার সিদ্ধান্ত প্রস্তুত কর।

এখানে আসার পর প্রতিদিনই ডায়েরী লিখতে শুরু করি। সেই ডায়েরীর কটা পাতা এবারে তুলে দিচ্ছি।

কয়েদী সেলডনকে তাড়া করবার ঘটনার পরের সকাল থেকেই শুরু করছি।

অক্টোবর ১৬

আজ সকালে ব্রেকফাস্টের পর ব্যারিমুর এসে জানাল সে স্যার হেনরীর সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলতে চায়।

স্যার হেনরী তাকে নিয়ে পড়ার ঘরে চলে আসেন। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর স্যার হেনরী আমাকে ডেকে বললেন, ব্যারিমুরের ধারণা তার আত্মীয়কে তাড়া করে আমরা আঘাত করেছি।

ব্যারিমুর বলল, এমনিতেই বেচারী সেলডনকে অনেক ধকল সইতে হচ্ছে। আমার দ্বারা তার দুর্ভোগ আরো বাড়ল—একথাটা ভাবতে খুব খারাপ লাগছে।

স্যার হেনরী বললেন, এটা তো সত্যি কথা, লোকটা তোমার আত্মীয় হলেও এখন সমাজের শত্রু। সাধারণের কাছে বিপজ্জনক। জলায় যে কোন বাড়িতে যে কোন সময় সে হামলা করতে পারে।

—কারো বাড়িতেও ঢুকবে না। বিশ্বাস করুন স্যার হেনরী। কদিনের মধ্যেই সে দক্ষিণ আমেরিকা রওনা হবে। দয়া করে আপনারা সে যে জলায় আছে এ কথাটা পুলিশকে জানাবেন না। তা হলে জাহাজ না আসা পর্যন্ত কটা দিন সে নিশ্চিন্তে জলায় কাটাতে পারবে। পুলিশকে জানালে, আমি আর আমার স্ত্রীও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারি।

এই সময় স্যার হেনরী আমার মতামত জানতে চাইলে বললাম, দেশ ছেড়ে গেলে অবশ্য আর কোন কথা থাকে না।

—কিন্তু ইতিমধ্যে যদি কারো কোন ক্ষতি করে বসে?

—স্যার, আমি শপথ করে বলতে পারি, নতুন করে আর কোন অপরাধ সে করবে না। তা হলেই পুলিশ তার অবস্থান জেনে যাবে।

—ঠিক আছে ব্যারিমুর, তুমি নিশ্চিন্ত হও।

ব্যারিমুর কৃতজ্ঞতায় বারবার ঈশ্বরের কাছে তার মনিবের কল্যাণ প্রার্থনা করে বিদায় নিল।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার ফিরে এসে কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়াল। বলল, স্যার, আপনার দয়ার কথা আমাদের মনে থাকবে। প্রতিদানে আমারও কিছু করা উচিত। একটা ব্যাপার আমি জানি—তদন্ত শেষ হয়ে যাবার পরে আমি জেনেছি, তাই আগে জানাতে পারিনি। ব্যাপারটা স্যার চার্লসের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু সম্পর্কে।

কথাটা শুনেই আমি আর ব্যারনেট লাফিয়ে উঠলাম।

—কি ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে সেটা তুমি জান?

—তা জানি না, ঐরকম একটা সময়ে কেন গেটে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তা জানি। তিনি একজন মহিলার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

এরপর ব্যারিমুরের কাছ থেকে যা জানা গেল তা খুবই চমকপ্রদ।

মহিলাটির নাম সে বলতে পারে নি। নামের প্রথম অক্ষর L. L.—এটুকুই কেবল জানাল।

প্রতিদিনই অনেক চিঠি আসত স্যার চার্লসের নামে। দুঃখ দুর্দশায় সাহায্য সহযোগিতা চেয়ে মানুষ চিঠি লিখত। সেদিন এসেছিল একটিই মাত্র চিঠি। তাই খামটা নজরে এসেছিল।

কুমবেট্রেসি থেকে একজন মহিলা লিখেছেন। মনে করে রাখবার মত এমন কিছু ঘটনা নয়। কিন্তু স্যার চার্লসের মৃত্যুর পর এই চিঠির ব্যাপারটা একটু অন্য রকম ঠেকল তার কাছে।

সপ্তাহখানেক আগে পড়ার ঘর সাফ করতে গিয়েছিল মিসেস ব্যারিমুর। আগুনের চুল্লির পেছনে একটা পোড়া চিঠির ছাই তার নজরে পড়ে। সেটা সরাতে গিয়ে দেখা গেল খানিকটা অংশ কালো হয়ে রয়েছে—ভালভাবে পোড়েনি।

লেখার খানিকটা অংশ দেখে মনে হল—পুনশ্চঃ অংশের লেখা। পড়তে অসুবিধা হল না ঃ 'দয়া করে এই চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলবেন। ঠিক দশটার সময় গেটে উপস্থিত থাকবেন'।

তলার সইতে রয়েছে নামের দুটো আদ্য আক্ষর—L. L. লেখা অংশটা রক্ষা করা যায়নি—গুঁড়িয়ে গেছে।

ব্যারিমুর ওই অক্ষর দিয়ে কোন নাম মনে করতে পারল না।

এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লসিত হবার মত হলেও গোটা ব্যাপারটা এতে আরও ঘোলাটে হল। এ সময় হোমস উপস্থিত থাকলে নিশ্চয় কোন সূত্র বার করতে পারত।

L. L. নামধারী মহিলাটিকে খুঁজে বার করতে হবে—অনেক ঘটনাই মহিলাটির কাছে পাওয়া সম্ভব।

তখুনি ঘরে এসে হোমসকে পাঠাবার জন্য রিপোর্ট তৈরি করলাম।

অক্টোবর ১৭

আজ সারাদিনই বৃষ্টি হচ্ছে। খোলা জলাভূমির বুকে দামাল হাওয়ার মাতন চলছে।

নানান চিন্তা মাথায় খেলা করছে। দুজনের পরিচয় এখনো অজ্ঞাত রয়েছে।

ছ্যাকড়া গাড়ির সেই দাড়িওয়ালা লোকটা। আর জলার পাহাড়ের ওপরে স্ট্যাচুর মত সেই মূর্তি। পলাতক কয়েদীর সন্ধানেই কি এই মূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে?

ক্রমে সন্ধ্যা হল। গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে জলার দিকে বেরিয়ে পড়লাম।

পায়ে-চলার সরু রাস্তা কাদা প্যাঁচপেঁচে। খোলা জলাভূমির উন্মত্ত হাওয়ায় বৃষ্টির ফোঁটা আছড়ে পড়তে লাগল মুখে।

সাবধানে পা চালিয়ে গিয়ে হাজির হলাম নিরেট কালো পাহাড়টার তলায়। তার ওপরেই গভীর রাতের সেই অজানা প্রহরীকে দেখেছিলাম।

বৃষ্টির জলে পিচ্ছিল পাহাড়ের গা, সতর্ক পা ফেলে বহু কষ্টে শীর্ষদেশে গিয়ে উঠলাম।

সামনে ধূ ধূ বৃষ্টিধোয়া জলাভূমি—বহুদূর বিস্তৃত। অনেক দূরে ঝাপসা ভাবে চোখে পড়ছে বাস্কারভিল হলের জোড়া টাওয়ার।

যথাসম্ভব খুঁটিয়ে নজর করলাম—কিন্তু দু'রাত আগের দেখা সেই অজানা প্রহরীর চিহ্ন কোনদিকে নজরে পড়ল না।

ফেরার পথে ডক্টর মার্টিমারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ফাউল মায়ারের এক চাষীবাড়ি থেকে ফিরছিলেন। গাড়িতে টেনে তুলে বাড়ির দিকে নিয়ে চললেন।

ভদ্রলোক নিয়মিত প্রতিদিনই আমাদের খোঁজখবর নেন। কথায় কথায় খুব

বিচলিত আর বিষণ্ণভাবে জানালেন তার প্রিয় স্প্যানিয়েল কুকুরটা খুঁজে পাচ্ছেন না। বাদায় গিয়েছিল আর ফেরেনি।

সঙ্গে সঙ্গে গ্রিমপেন কাদার বুকে তলিয়ে যাওয়া টাট্টুর কথা মনে পড়ল। বুঝলাম, জলার রাক্ষুসে পাঁকই কুকুরটাকে গ্রাস করেছে—কখনো আর ফিরে আসবে না।

গাড়িতে চলতে চলতেই ডক্টর মার্টিমারকে জিজ্ঞেস করলাম—এদিককার অনেক জায়গাতেই তো রুগী দেখতে যেতে হয় আপনাকে। আচ্ছা নামের আদ্যক্ষর—L. L. কোন মহিলাকে জানেন?

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে চিন্তা করলেন ডক্টর মার্টিমার। পরে সহাস্যে বললেন—পেয়েছি—লরা লায়ন্সের নামের অদ্যক্ষর—থাকে কুমবেট্রেসি। ফ্রাঙ্কল্যান্ডের মেয়ে।

—সেই মামলাবাজ ফ্রাঙ্কল্যান্ড?

—মামলাবাজ এবং ছিটিয়াল। লায়ন্স নামের এক আর্টিস্টকে বিয়ে করেছিল মেয়েটি। কিন্তু বেশিদিন ঘর করতে পারেনি। লোকটা ছিল আর্টিস্ট আর অসাধু প্রকৃতির। হঠাৎ একদিন বউকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

আগে থেকেই কি একটি কারণে মেয়ের ওপরে চটে ছিল ফ্রাঙ্কল্যান্ড। স্বামী পরিত্যক্তা দুর্ভাগা মেয়ের প্রতিও কোন দয়া দেখাল না। বাপ মেয়েতে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

—মহিলার তাহলে চলে কি করে?

—ফ্রাঙ্কল্যান্ড কিছু সাহায্য করে কিনা সঠিক বলতে পারব না। মেয়েটা এভাবে কষ্টে পড়ায় অনেকেই সাহায্য সহযোগিতা করে—স্টেপলন, স্যার চার্লস এবং আমিও সহযোগিদের মধ্যে রয়েছি। মেয়েটি হালে টাইপ রাইটিং কারবার করছে।

ডক্টর মার্টিমারকে কিছু ভাঙলাম না। তিনিও L. L. নামের মানুষ সম্পর্কে আমার কৌতূহলের কারণ আর জিজ্ঞেস করেন নি। কাল সকলেই কুমবেট্রেসি খুঁজতে বেরুব। লরা লায়ন্স-এর সঙ্গে কথা বলা জরুরী।

বর্ষণ ক্লান্ত আজকের দিনে আর একটা ঘটনা ঘটল।

ডিনার খেয়ে গেলেন ডক্টর মার্টিমার। খাওয়া দাওয়ার পর স্যার হেনরীর সঙ্গে তাস খেলতে বসেছিলেন। আমি গিয়ে লাইব্রেরীতে বসেছিলাম। এমন সময় কফি নিয়ে ঘরে ঢোকে ব্যারিমুর।

জিজ্ঞেস করলাম তার আত্মীয়টি জলা থেকে বিদায় নিয়েছে কিনা।

ব্যারিমুর বলল, বলতে পারছি না স্যার। তিন দিন আগে খাবার রেখে এসেছিলাম, তারপর থেকে আর খবর পাইনি। তবে একদিন গিয়ে দেখেছি খাবার নেই। অন্য একটা লোকও রয়েছে সেখানে। সে নিয়ে গেল কিনা বুঝতে পারলাম

না।

থমকে যেতে হল কথাটা শুনে। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, অন্য লোক বলতে কার কথা বলছ?

—বাদায় আরও একটা লোক থাকে—বেশ কয়েকদিন আগে সেলডনও বলেছিল। লোকটা লুকিয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু কয়েদী নয়। এসব যে কি হচ্ছে—আমার কিছুই ভাল লাগছে না ডক্টর ওয়াটসন।

আমার খালি মনে হচ্ছে কোথাও একটা ষড়যন্ত্র চলছে—স্যার হেনরী লন্ডনে গিয়ে থাকলে একটু নিশ্চিন্ত থাকতাম।

—ষড়যন্ত্রের কথা মনে হচ্ছে কেন তোমার?

—পুলিসের তদন্ত যাই বলুক—স্যার চার্লস যেভাবে মারা গেলেন—তার ওপর জলাভূমির বুকে গভীর রাতে কিরকম ভয়াবহ শব্দ ওঠে নিশ্চয় শুনেছেন। তারপর এই লোকটা, ঘাপটি মেরে সব দিকে যেন নজর রাখছে। সব মিলিয়ে—একটা অশুভ খেলা যেন চলছে।

শয়তান খেলায় নেমেছে ডক্টর ওয়াটসন—বাস্কারভিল বংশের কারুর নিস্তার নেই। স্যার হেনরীকে নিয়ে নতুন করে দুর্ভাবনায় ভুগছি।

—সেলডনের মুখে আর কিছু শুনেছ—লোকটা কোথায় থাকে—কি করে?

—দু' একবার লোকটাকে চোখে পড়েছে তার। লুকিয়ে বেড়াচ্ছে দেখেই বুঝতে পেরেছে পুলিশের লোক নয়। সেলডন বলল—ভদ্দরলোক—কিন্তু কি করছে বুঝতে পারেনি। পাহাড়ের গায়ে যেখানে পাথরের কুটিরগুলো, সেখানেই লুকিয়ে থাকে।

—তারপর? খাবার দাবার?

—সেলডন দেখেছে—এক ছোকরা লোকটার জিনিসপত্র এনে দেয়—

আর বিশেষ কিছু জানবার ছিল না। কিন্তু ধাঁধাঁ আরো ঘোরালো হল। ব্যারিমুর চলে গেলে উঠে গিয়ে জানালার সামনে দাঁড়ালাম।

বাইরে ঝড় আর বৃষ্টির মাতন। দুর্যোগ চলছে—এরই মধ্যে নিশ্চয়ই পাথরের কুটিরে রয়েছে লোকটা। কিন্তু এত কষ্ট সহ্য করছে কি উদ্দেশ্যে?

নিতান্ত সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কেউ এভাবে কষ্ট স্বীকার করে না। বিষয়টার একটা নিষ্পত্তি আশু হওয়া দরকার। স্থির করলাম আগামীকালের মধ্যে এই রহস্যের একটা কিনারা করব।

১৮ অক্টোবরের পরের থেকে ঘটনা পরপর যেভাবে ঘটে গেছে—তার বিবরণ দিতে আর ডায়েরীর শরণ নেবার দরকার হবে না। স্মৃতিতেই সব তাজা হয়ে রয়েছে।

রহস্যের তলা থেকে যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথা উঁচিয়েছে তা হল ঃ

(১) স্যার চার্লস যে জায়গায় যে সময়ে মারা গেছেন, ঠিক সেই জায়গায় সেই সময়ে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন কুমবেট্রেসির মিসেস লরা লায়ন্স।

(২) বাদার পাহাড়ের গায়ে প্রস্তর কুটিরে ওঁৎ পেতে থাকা অজ্ঞাত পরিচয় 'ভদ্দরলোক' আততায়ী।

আমার বিশ্বাস রহস্যাচ্ছন্ন এই দুই ঘটনায় আলোকপাত করতে পারলে অনেক প্রশ্নেরই জট খুলে যাবে।

লরা লায়ন্স সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার জন্য কুমবেট্রেসিতে যাওয়া দরকার। স্যার হেনরীকে জানালাম সব কিছু খুলে। যুক্তিটা তিনিই দিলেন—আমার একা যাওয়াই অনুমোদন করলেন তিনি। তাহলে নানাভাবে চেষ্টা করে তার কাছ থেকে কিছু খবর সংগ্রহ করা যাবে।

কুমবেট্রেসি পৌঁছে মিসেস লরা লায়ন্সের আস্তানা খুঁজে পেতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। বসবার ঘরে রেমিংটন টাইপরাইটারের সামনে বসেছিলেন মহিলা।

ঘরে ঢুকে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করল মহিলার সৌন্দর্য। চুল আর চোখ দুইই উজ্জ্বল পিঙ্গলবর্ণ। দেহবর্ণে গোলাপের আভা। তবে শিথিল ঠোঁটে যেন কিছুটা রুক্ষতা বিরাজ করছে—খুঁতের মধ্যে এটুকুই যা নজরে পড়ল।

কোনরকম ভূমিকা না করেই বললাম—আমি আপনার বাবার বিশেষ পরিচিত।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা দৃঢ় স্বরে বলে উঠলেন—বাবার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। বাবার বন্ধুদেরও আমি বন্ধু বলে মনে করি না। সদাশয় স্যার চার্লস বাস্কারভিল এবং আরও কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি সাহায্য না করলে আমাকে অনাহারে মরতে হত।

—স্যার চার্লসের ব্যাপারেই আপনার কাছে আমার আসা।

মনে হল যেন কথাটা শুনে কেঁপে উঠলেন মহিলা।

সঙ্গে সঙ্গে বললাম—বুঝতেই পারছি বিশেষ ভাবেই চিনতেন আপনি তাঁকে—নিজেই স্বীকার করলেন। আপনি নিশ্চয় চিঠিও লিখতেন তাঁকে?

ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ফুটে উঠল তার চোখে—এসব প্রশ্নের মানে কি?

—মানে, বিষয়টা দশ কান হয়ে আর কেলেঙ্কারীর পর্যায় পৌঁছবে না।

ভদ্রমহিলার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, বলুন কি জানতে চান—ওঁর বদান্যতা আমাকে নতুনভাবে বাঁচতে সাহায্য করেছে—কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সৌজন্যমূলক চিঠি দু-একবার লিখেছি।

—দেখা সাক্ষাৎ কখনো হয়েছে?

—কুমবেট্রাসিতে যখন এসেছিলেন সেই সময় দু-একবার হয়েছে।

—চিঠিতে যোগাযোগ এবং দেখাসাক্ষাৎ এত কম বলছেন—তাহলে আপনার এত উপকার করবার মত খবরাখবর উনি পেলেন কি করে?

একটুও দমে না গিয়ে মিসেস লরা লায়ন্স বললেন, আমার দুরবস্থার কথা স্যার চার্লসের ঘনিষ্ঠদের দু-একজন রাখতেন। মিঃ স্টেপলটন আমার প্রতিবেশী এবং স্যার চার্লসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমার দুঃখের কাহিনী এঁর মুখেই উনি শুনেছিলেন।

—তা সম্ভব। আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য স্যার চার্লসকে কখনো লিখেছিলেন কি?

দপ করে জ্বলে উঠে ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন—কখনোই না।

—স্যার চার্লস যেদিন মারা যান সেদিন ও না? মনে হয় দিনক্ষণ আপনার ভুল হয়ে যাচ্ছে—একটু চেষ্টা করলেই মনে করতে পারবেন—আপনার লেখা চিঠির পুনশ্চ অংশের একটা লাইন আমি শুনিয়ে দিচ্ছি—অনুগ্রহ করে এই চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলবেন এবং ঠিক দশটার সময়ে গেটে থাকবেন—দেখা হবে।

শুষ্ক ফ্যাকাশে ঠোঁটে জিব বুলিয়ে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলেন মহিলা। পরে অস্ফুটে বললেন—তিনি কি আমার অনুরোধ রক্ষা করেন নি?

—অভিযোগ করবার মত কাজ করেন নি স্যার চার্লস। চিঠিটা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবে অনেক সময় পোড়া চিঠিও পড়া যায়। তাহলে চিঠি লিখেছিলেন স্বীকার করছেন?

ভদ্রমহিলা যেন মরিয়া হয়ে উঠলেন। অস্বাভাবিক দ্রুততায় বলে উঠলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ লিখেছিলেম স্বীকার করছি। এতে লজ্জার কি আছে? অসুবিধার কথা সাক্ষাতে তাঁকে বুঝিয়ে বলব ভেবেছিলাম—

—কিন্তু ঐ রকম সময়ে বাড়ির বাইরে কেন?

—পরের দিন সকালেই তাঁর লন্ডনে রওনা হবার কথা। আগেভাগে দেখা করে উঠতে পারিনি। ওই সময়ে একজন ব্যাচেলারের কোয়ার্টারে যাওয়া সঙ্গত মনে হয়নি আমার। তাছাড়া—সেদিন আমি যাই-ই নি।

ভদ্রমহিলার চোখে তীক্ষ্ণ চোখ রেখে দৃঢ়স্বরে বলে উঠলাম—মিসেস লায়ন্স—অযথা জটিলতা সৃষ্টি করে কোন লাভ হবে না—

—আমি মিথ্যা বলছি না—ব্যাক্তিগত কারণে যাওয়া হয়নি। যদিও এই সময়ে যাব বলে লিখেছিলাম ঠিকই।

—মিসেস লায়ন্স, ব্যাপারটা পুলিশের হাতে চলে যায় এমন কোন ঝুঁকি নেবেন না দয়া করে। আমার কথার যথাযথ উত্তর দিয়ে সহাযোগিতা করুন। চিঠির ব্যাপারটা প্রথমে অস্বীকার করলেন কেন?

—পাছে কোন কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে পড়ি সেই ভয়ে।

—পুড়িয়ে ফেলার জন্য এভাবে অনুরোধ করেছিলেন কেন? কি এমন লেখা ছিল চিঠিতে?

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শান্ত স্বরে বললেন, শুনেছেন কিনা জানি না, বাবার অমতে হুট করে বিয়ে করে ফেলে পরে ঘোর বিপাকে পড়ে যাই।

স্বামীর কাছ থেকে নিগ্রহ আর নির্যাতন ছাড়া আর কিছু পাইনি। নিজেকে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখলেও ভয় ছিল আইনের আশ্রয় নিয়ে তার সঙ্গে সংসার করতে বাধ্য করতে পারে।

জানতে পেরেছিলাম, কিছু টাকা পয়সা খরচ করলে তার খপ্পর থেকে উদ্ধার পেতে পারি। আত্মসম্মান নিয়ে স্বাধীনভাবে বাস করবার বাধা থাকবে না।

নিজের মুখে আমার এই সংকটের কথা স্যার চার্লসকে জানাতে চেয়েছিলাম। সেকারণেই চিঠিটা লিখে পুড়িয়ে ফেলতে বলেছিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অন্য জায়গা থেকে সাহায্য পেয়ে গেলাম বলে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

ভদ্রমহিলার কাছ থেকে সেই মুহূর্তে বিশেষ কিছুই আর জানবার ছিল না। চিঠিটা লিখবার পরে পরেই যদি সাহায্য পেয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে খোঁজ নেওয়া দরকার—বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করা হয়েছে কিনা।

যেভাবে শক্ত যুক্তির গাঁথুনিতে পোক্ত করে গল্প শোনালেন, তার সত্যমিথ্যা যাচাইয়ের এই একটাই পথ খোলা রয়েছে।

ফেরার পথে ভদ্রমহিলার কথাগুলো নিয়েই চিন্তা করতে করতে ফিরলাম। জোর করে স্বীকারোক্তি বার করতে হয়েছে। গোছানো কথাগুলো যেন মনে হচ্ছে আগে থেকেই তৈরি করে রাখা। কিন্তু কী গোপন করছেন মহিলা?

বিশেষ কিছু উদ্ধার করা গেল না যা মূল রহস্যে আলোকপাত করতে পারে। এবারে রইল—প্রস্তরকুটিরের রহস্যময় সেই মূর্তি।

প্রস্তরকুটির অসংখ্য। তার যে কোন একটায় তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। রিজেন্ট স্ট্রীটে ঘোড়ার গাড়িতে পলকের জনা দেখা সেই লোকই নিশ্চয় বাদায় আত্মগোপন করে নজর রেখে চলেছে স্যার হেনরীর ওপর।

এবার রিভলভার ধরে তার উদ্দেশ্য জেনে নেবার সুযোগ প্রশস্ত। তার. আস্তানার সন্ধানটা একবার করতে পারলেই হয়।

গাড়ির কোণে বসে ভাবতে ভাবতে আসছি। মিঃ ফ্রাঙ্কল্যান্ডের বাড়ির পাশ দিয়েই গাড়ি আসছে। দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন—আমাকে দেখতে পেয়েই খুশি হয়ে যেন টেনে নামিয়ে নিয়ে গেলেন।

গাড়ি ছেড়ে দিলাম। হেঁটেই ফিরব স্থির করলাম। ডিনারের আগে বাড়ি পৌঁছলেই হবে।

মেয়ের প্রতি নির্দয় ব্যবহারের কথা জানবার পর থেকে ফ্রাঙ্কল্যান্ডের ওপর মনটা খিঁচড়ে ছিল। এর মধ্যে ঘরে ঢুকতেই শুরু করল ক্ষ্যাপামী।

কোন মামলায় কাকে কিভাবে জব্দ করেছেন—আরও কি সব প্ল্যান করছেন—সেই গল্প।

পিকনিক করতে লোকে যেত একটা বনে। মামলাতে লড়ে সেখানে পিকনিক করা বন্ধ করে দিয়েছেন। স্যার জন মরল্যান্ড বলে এক ভদ্রলোক নিজের জমিতেই খরগোশ মারতেন—গুলি করে, ইনি অপরের জমিতে অবৈধ প্রবেশের মামলা তার বিরুদ্ধে ঠুকে দিয়েছেন।

বেশ গর্বের সঙ্গেই বললেন—নিজের স্বার্থে কিছুই করছেন না। সবই করছেন জনসাধারণের জন্য—জনসাধারণের প্রতি স্বাভাবিক কর্তব্যবোধ থেকে।

একঘেয়ে বিষয়ের টানা বিবরণ কত শোনা যায়। কেটে পড়বার সুযোগ খুঁজতে লাগলাম।

এমন সময় এমন একটা কথা তার মুখ থেকে বেরুলো—যা না শুনে পারলাম না।

প্রচণ্ড বিরক্তি প্রকাশ করে ফ্রাঙ্কল্যান্ড একসময় বলে উঠলেন—এলাকায় চাষীগুলো আমার ওপর মাঝে মাঝে ক্ষেপে যায়—কুশপুত্তলিকা দাহ করে।

কতবার পুলিশকে বলেছি—এসব দমন করতে। সব মশায় ঘুঘু—আমার প্রাপ্য স্বাভাবিক সহযোগিতা আমি পাই না। এবারে ফাঁদে পড়েছে—মাথার ঘাম পায়ে পড়ছে—আমি স্বচ্ছন্দেই হেনস্থা কমাতে পারি—কিন্তু করব না।

পাছে কথার তোড়ে পড়ে যাই সেই আশঙ্কায় কেবল চোখে মুখে প্রবল কৌতূহলের ভাব প্রকাশ করে তাকালাম তার দিকে। ওতেই কাজ হল।

বললেন, বাদায় পালিয়ে যাওয়া সেই কয়েদীর কথা মনে আছে তো—ইচ্ছে করলেই তাকে ধরিয়ে দিতে পারি।

—কোথায় থাকে, জানেন নাকি আপনি?

—হুঁ হুঁ মশায়—ছাদে কি টেলিসকোপটা এমনি এমনি বসিয়ে রেখেছি নাকি। একটা ছোকরা প্রতিদিন তার জন্য খাবার নিয়ে যায়—নিজের চোখে দেখেছি। এই রাস্তা দিয়ে একই সময় যায় রোজ।

ব্যারিমুরও বলেছিল একটা ছোকরা জলার আগন্তুককে খাবার সরবরাহ করে। চমকে উঠলাম এবারে কথাটা শুনে। কিন্তু মুখভাব নির্বিকার রেখে বললাম—কোন মেষপালকের ছেলে হয়তো বাবার জন্য খাবার নিয়ে যায়।

ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে বললেন—পাগল নাকি মশায়—তাকিয়ে দেখুন দূর জলার প্রায় মাঝ বরাবর কালো পাহাড়টা—তার পাশে যে নিচু পাহাড়—নিরেট পাথুরে জায়গা—মেষপালক ওখানে যাবে কি জন্যে?

রোজ দেখি ছোকরাকে—কোন কোন দিন দুবারও যেতে দেখেছি—দাঁড়ান দাঁড়ান—কি যেন নড়ছে ওখানটায়—

বলতে বলতে ঝড়ের বেগে ছাদে গিয়ে উঠলেন। আমিও চললাম পেছন পেছন।

তিন পায়ার ওপর বসানো টেলিস্কোপটা। হাতের তেলো ও আঙুল দিয়ে চোখের ওপর ঠুলি করে যন্ত্রে চোখ রেখেই বলে উঠলেন—চটপট আসুন ডক্টর ওয়াটসন—আড়ালে চলে গেলে আর দেখতে পাবেন না।

এগিয়ে গিয়ে চোখ লাগালাম। দেখলাম, যথার্থই—রোগা চেহারার ছেঁড়া পোশাক পরা এক ছোকরা কাঁধের ওপর একটা বান্ডিল নিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠছে।

বললাম—সত্যই তো—অমন চুপিসারে কোথায় যাচ্ছে?

—কোথায় যাচ্ছে—তা বুঝবার জন্য এক মুহূর্তও ভাববার দরকার হয় না। পুলিশ শত প্রলোভন দেখালেও আমি বলব না—ডক্টর ওয়াটসন, আপনিও কিন্তু মুখ খুলবেন না।

হেসে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানালাম।

ভেতরে ভেতরে তখন প্রচণ্ড অস্থিরতা বোধ করছি। দু'একটা কথায় পাশ কাটিয়ে অনেক কষ্টে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম ফ্র্যাঙ্কল্যান্ডের বাড়ি থেকে।

সোজা রাস্তায় খানিকটা হাঁটলাম, তারপরই নেমে পড়লাম জলায়।

ছোঁড়াটাকে যে পাহাড়ের ওপর অদৃশ্য হতে দেখলাম, দ্রুত পা চালালাম সেই দিকে। দৈবক্রমে পেয়ে যাওয়া এই সুযোগের সদ্ব্যবহার আমাকে করতে হবে।

ধীরে ধীরে খাঁজ বেয়ে চূড়ায় পৌঁছলাম।

দূরে বহুদূরে আকাশ এসে মিশেছে মাটিতে।

চারপাশে ধূ ধূ নিস্তব্ধ জলাভূমি। আকাশের সূর্য ডুবুডুবু।

সতর্ক চোখে চারদিকে তাকাচ্ছি। ছেলেটিকে চোখে পড়ল না কোথাও।

আমার পায়ের নিচে পাহাড়ের খাঁজে বৃত্তাকারে সাজানো অনেকগুলো পাথরের কুটির। মাঝখানে একটি কুটিরের মাথায় ছাদ অটুট রয়েছে।

এই কুটিরকেই লক্ষ্য করলাম, জল হাওয়া থেকে মাথা বাঁচানোর পক্ষে উপযুক্ত জায়গা। রহস্যময় সেই আগন্তুককে এখানেই পাওয়া সম্ভব।

আমি গুটিগুটি পায়ে চারদিক দেখতে দেখতে এগুতে লাগলাম। গোলাকার বিরাট বিরাট চাঁইয়ের মধ্য দিয়ে পায়ে-চলা একটা সরু রাস্তা এগিয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে কুটিরের হাঁ-করা ভাঙাচোরা প্রবেশপথে। অ্যাডভেঞ্চারের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে আমার সারা শরীরে!

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রিভলভারটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরলাম।

তারপর এক ঝটকায় ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

আশ্চর্য! ভেতরটা শূন্য। কিন্তু আগন্তুকের বসবাসের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। কুটিরের কোণের দিকে পাথরের ওপর কয়েকটা কম্বল একটা বর্ষাতি মুড়ে পাকিয়ে রাখা।

একটা চুল্লীমত জায়গা, ছাইভর্তি। পাশেই রান্নার বাসন আর আধবালতি জল। আরো চোখে পড়ল কোণে কোণে জড় করা বেশ কিছু খালি টিন।

মানষ বসবাসের স্পষ্ট প্রমাণ। চ্যাটালো একটাপাথরের ওপরে কাপড়ে বাঁধা একটা পুঁটলি—এই পুঁটলিই টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে দেখেছিলাম।

এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, পুঁটলির ভেতরে একটা পাঁউরুটি, একটিন মাংস, আর দুটি পীচফলের মোরব্বা।

পুঁটলিটা সরাতেই সহসা চোখে পড়ল একটুকরো কাগজ। পুঁটলির তলায় চাপা দেওয়া ছিল। কাগজটা তুলে দেখলাম মোটা হরফে লেখা রয়েছে—ডক্টর ওয়াটসন কুমবেট্রেসি গেছেন।

চুলের ডগা পর্যন্ত শিউরে উঠল লেখাটা পড়ে।

এই রহস্যময় আগন্তুক তাহলে স্যার হেনরী নয়—লেগেছে আমার পেছনে। কোথায় যাচ্ছি কি করছি—সব খবর সংগ্রহ করছে এই পাথরের নিভৃত কুঠুরিতে বসে।

আশ্চর্য! ক্ষণেকের জন্যেও মনে উদয় হয়নি আমার পেছনে চর ঘুরছে। ওই ছোকরাই তাহলে নজরে নজরে রাখছে আমাকে। অনুভব করলাম একটা অতি সূক্ষ্ম জাল সুকৌশলে পাতা হয়েছে আমার চারপাশ ঘিরে।

আরও কিছু এধরনের সূত্রের সন্ধানে আশেপাশে খুঁজলাম। কিছুই পেলাম না। তাছাড়া লোকটার মতিগতি হাব ভাবের আভাস পাওয়া যেতে পারে এমন কিছুও পেলাম না।

গ্রীষ্মদেশের স্পার্টানদের মত কষ্ট সহ্য করে আমার পেছনে লেগে আছে—লোকটা কে? বন্ধু নিশ্চয়ই নয়। এসে যখন পড়েছি ডেরায় আজ একটা বোঝাপড়া করে তারপর উঠব।

ততক্ষণে অন্ধকার নেমেছে জলার বুকে।

সূর্য ডুবছে। বাইরে দুরের দৃশ্য সবই ঝাপসা।

দুরুদুরু করছে বুক। কি জানি এখুনি হয়তো জলার বুকে শুরু হবে ভয়াল ভয়ঙ্কর শয়তানের খেলা।

রিভলভার মুঠিতে চেপে অন্ধকার কোণে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম।

অশুভ প্রতীক্ষায় কাটল কয়েক মিনিট। সহসা সজাগ হয়ে উঠল কান। এসেছে—সে আসছে—পদশব্দ পাচ্ছি তার। দুরে বুটজুতোর ঠকাৎ ঠকাৎ শব্দ

উঠল।

ক্রমশ এগিয়ে আসছে সেই শব্দ। উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকার কোণে পাথরের দেয়াল সেঁটে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

পদশব্দ থেমে গেল হঠাৎ। খানিক বিরতির পর আবার এগিয়ে আসতে লাগল। স্পষ্ট উপলব্ধি করলাম—কুটিরের দরজায় একটা ছায়ার আভাস।

সমস্ত শরীর টান টান করে উন্মুখ হয়ে রয়েছি।

সহসা কানে এল অতি পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর—ভায়া ওয়াটসন, বাইরে এস—



চমকে উঠলাম কেবল নয়—যেন আগাপাশতলা কেঁপে উঠলাম।

তবু দম বন্ধ করে অপেক্ষা করে রইলাম কয়েক সেকেন্ড। তারপরই যেন সম্বিত ফিরল। তীক্ষ্ণ নিরুত্তাপ ওই কণ্ঠস্বর পৃথিবীতে একজনেরই হয়। আশ্চর্য একটা স্বস্তি যেন সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল।

উল্লাসে চিৎকার করে উঠলাম—কে, হোমস?

—দয়া করে রিভলভারটা সামলে বাইরে এস।

এবড়োখেবড়ো পাথরের ফোকর গলে বাইরে এলাম। একটা পাথরের ওপর বসে আছে হোমস—চোখের দৃষ্টিতে খেলা করছে তরল কৌতুক। টুইড স্যুট

পরনে, মাথায় কাপড়ের ক্যাপ।

নির্ভেজাল টুরিস্টের পোশাক। দাড়িগোঁফ কামান। বেকার স্ট্রীটে যেমন থাকে, তেমনই ফিটফাট।

হাসতে হাসতে বলল, আমার আস্তানার হদিস পেয়ে গেছ জানতাম। কিন্তু একেবারে যে ঘরে ঢুকে ঘাপটি মেরে থাকবে তা ভেবে উঠতে পারিনি। পোড়া সিগারেটটা নজরে পড়েছিল—ব্রাডলী অক্সফোর্ড স্ট্রীট ছাপা রয়েছে গায়ে—সেই দেখে বুঝলাম শুভাগমনটা তোমারই। আমাকে ক্রিমিন্যাল ঠাউরে নিশ্চয় হাতিয়ার বাগিয়ে ভেতরে বসেছিলে?

—আজ প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম সাক্ষাৎকারটা শেষ করব।

—সেদিন একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল, বোকার মত রাতে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তখনই বোধহয় আস্তানার সন্ধানটা পেয়েছ—সেই কয়েদীর পেছনে ধাওয়া করবার সময়ে—

—আস্তানার সন্ধান পেলাম তোমার ছোকরা বয়টাকে দেখে—

—ওই বুড়োর টেলিস্কোপের মধ্য দিয়ে নিশ্চয়? লেন্সের ঝিলিক চোখে পড়েছিল, কিন্তু কোন দিক থেকে এল বুঝতে পারিনি।

বলতে বলতে হোমস কুটিরে ঢুকে পুঁটলি চাপা কাগজটা নিয়ে বাইরে এল—কুমবেট্রেসি—মিসেস লরা লায়ন্সের সঙ্গে কথা হল?

—কথা হয়েছে কিছু। এবারে তুমি এসেছ—আমি নিশ্চিন্ত। কিন্তু এখানে এসে উঠেছ কিভাবে? আমি তো ভেবে রেখেছি লন্ডনেই কাজের চাপে রয়েছ।

—ভায়া ওয়াটসন, সামান্য একটু চালাকি তোমার সঙ্গে করতে হয়েছে, ক্ষমা করে দিও। তোমাকে সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে শান্ত হয়ে ঘরে বসে থাকতে পারিনি। এসে আত্মগোপন করে ছিলাম। তা নইলে আমাদের দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষ সতর্ক হয়ে যেত।

আর বাস্কারভিল হলে তোমাদের সঙ্গে থাকলে প্রয়োজন মত বেরুতে পারতাম না। এখানে সে অসুবিধা নেই। অথচ সব খবরই রাখতে পারছি—অপেক্ষায় আছি সুযোগ মত ঝাঁপিয়ে পড়ব।

—এখানে এভাবে এত কষ্ট করে রয়েছ—ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলাম না আমি—

—ভায়া, ভুল বুঝো না—যে কাজে নেমেছি তার জন্যই এই গোপনীয়তার দরকার ছিল। তুমি জানলে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারতে না—তাতে নানান রকম ঝুঁকি নিতে হত। কার্টরাইট এখানে কোন অসুবিধাই রাখেনি আমার।

এক্সপ্রেস অফিসের সেই কার্টরাইট। ওকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম—নিয়মিত খাবার আর কাচা জামাকাপড় এনে দিত। তাছাড়া ছোকরার চোখও খুব

ধারাল—খুব কাজে লাগছে।

এমনভাবে হোমস তার গতিবিধি আমার কাছে গোপন করল—কথাটা মনে করে একটা সূক্ষ্ম অভিমান ভেতরে খচ খচ করছিল। বললাম—আমার পাঠানো রিপোর্টগুলো তাহলে মাঠে মারা গেল?

—তোমার সব রিপোর্টই সঙ্গে রয়েছে। প্রতিটা লাইন খুঁটিয়ে পড়েছি। এখানে যাতে ঠিকমত হাতে পাই সেই ব্যবস্থা করেই এসেছিলাম। একদিন যা দেরি হত।

মিসেস লায়ন্সের কাছে অনেক খবরই পাওয়া যাবে জানতাম, আজই যে তুমি যাবে সেটাও অনুমান করেছিলাম। অসাধারণ জটিল এই কেসে তুমি আশ্চর্য রকমের উদ্যম আর চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছ। ভায়া, এবারে শুনি তোমার অভিযান-কাহিনী।

সামনের প্রান্তর ততক্ষণে অন্ধকারে ঢেকে গেছে। কনকনে বাতাস ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠছে। দুজনে উঠে কুটিরের ভেতর গিয়ে বসলাম। তারপর শোনালাম মিসেস লরা লায়ন্সের বিবরণ।

শুনে খুশি হয়ে বলল, এবারে একটা জট খুলল। এই ভদ্রমহিলা আর স্টেপলটনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া আছে স্পষ্টই বুঝতে পারছি।

—কিন্তু সেরকম তো কিছু মনে হল না।

—আমি কিন্তু প্রমাণের অভাবে এখানটাতেই থমকে ছিলাম। তোমার বিবরণ থেকে নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম ওদের দুজনের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ চিঠি আদান প্রদান সবই হয়। দুজনের মধ্যে একটা বোঝাবুঝি রয়েছে। এবারে ওর কাছ থেকে স্ত্রীকে সরিয়ে নিতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না।

চমকে উঠলাম কাথাটা শুনে। অবাক হয়ে বললাম—কে ওঁর স্ত্রী?

—ভায়া, এবারে তাহলে একটা চমকপ্রদ খবর তোমাকে দিচ্ছি। মিস স্টেপলটন—যাকে সকলে উদ্ভিদবিদের বোন বলে জানে, আসলে তিনি তার স্ত্রী।

—একী অদ্ভুত কথা। কিন্তু তাই যদি হয় তবে স্যার হেনরীকে বউর প্রেমে পড়তে দেখেও প্রশ্রয় দিলেন কেন?

—ওতে স্যার হেনরী ছাড়া ক্ষতি আর কারো হবে না। তোমার সন্দেহ দূর কর ভায়া ; তুমি তো নিজেও দেখেছ, প্রেমের ঘনিষ্ঠতা যাতে শরীর পর্যন্ত গিয়ে না পৌঁছায় সেদিকে তার সতর্ক নজর ছিল।

—এতো রীতিমত প্রতারণার খেলা। উদ্দেশ্য কি এর?

বলতে বলতে প্রকৃতিবিদ স্টেপলটনের উদাস চেহরাটা ভেসে উঠল চোখের ওপর। মুখে হাসি আর মনে ষড়যন্ত্র নিয়ে লোকটা সাদাসিদাভাবে প্রজাপতির জাল কাঁধে ছুটে বেড়াচ্ছে আমাদের চোখের সামনে। এ যে দেখছি এক মহাভয়ংকর শয়তান। হোমসকে বললাম—স্ত্রীকে বোন সাজিয়ে সহজেই অনেক কাজ হাসিল

করছিল লোকটা—তাহলে কি এই-ই আমাদের আসল শত্রু?

—ঠিক—ঠিক জায়গায় এসে পৌঁচেছ। ফেউ-এর মত গোড়া থেকেই আমাদের পেছনে লেগে আছে। আর হুঁশিয়ারিটাও তারই লেখা।

—ভদ্রমহিলা যে তার স্ত্রী এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত হলে কি করে?

—তোমার রিপোর্টে স্টেপলটনের হঠাৎ বলে ফেলা আত্মজীবনীর কয়েকটা টুকরো ছিল। প্রথম আলাপের দিনে তার বাড়িতে তোমাকে শুনিয়েছিলেন—ইংলন্ডে এককালে স্কুলমাষ্টার ছিলেন ভদ্রলোক। ওটুকুকেই কাজে লাগিয়েছি।

শিক্ষাবিদদের একটা প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের দারস্থ হলে যে কোন শিক্ষাব্রতী সম্পর্কে খোঁজখবর পাওয়া যায়। আমিও সামান্য চেষ্টাতেই জানতে পারলাম—ছাত্রদের প্রতি বর্বরোচিত ব্যবহারের জন্য একটা স্কুলের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। ফলে স্কুলের মালিক সস্ত্রীক উধাও হয়ে যান।

সেই সময় তার নাম অন্য ছিল। কিন্তু চেহাবার বিবরণে মিল পেয়ে গিয়েছিলাম। তবে ভদ্রলোকের কীটবিদ্যার অসাধারণ প্রতিভার সংবাদটুকুই আমার সনাক্তকরণ সম্পূর্ণ করেছে।

—কিন্তু এর সঙ্গে মিসেস লরা লায়ন্সের সম্পর্কটা কোথায়?

—ভদ্রমহিলার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকারের রিপোর্টই এই প্রশ্নের জবাব। স্বামীর সঙ্গে ভদ্রমহিলার বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা চলছে—এই অবস্থায় স্টেপলটনকে আবিবাহিত মনে করে তার স্ত্রী হওয়ার একটা স্বপ্ন মনে থাকা খুবই স্বাভাবিক।

তার এই স্বপ্নভঙ্গ করেই তাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে ভায়া। কাল আমরা দুজনেই তার সঙ্গে দেখা করব। ওয়াটসন, কথায় কথায় কিন্তু তুমি তোমার দায়িত্বের কথা বিস্মৃত হয়ে আছ। স্যার হেনরীকে একা রেখে বাইরে রয়েছ অনেকক্ষণ।

সত্যিই তাই। মূল দায়িত্ব থেকে দূরে সরে আছি অনেক সময়। উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু লোকটার এত সব কারসাজির মূল উদ্দেশ্যটা কি? কী চায় সে?

—একটাই উদ্দেশ্য। সে হল নরহত্যা। সুস্থ মাথায় পরিকল্পনামাফিক সুকৌশলে মানুষ খুন করবার উদ্দেশ্যেই স্যার হেনরীর চারপাশে জাল বিস্তার করেছেন তিনি। আমার জাল গুটানোর কাজ আগেই শুরু হয়েছিল, তোমার সহযোগিতায় তাকে এবারে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলাম।

আর দিন দুই তুমি স্যার হেনরীকে দুহাতে আগলে রাখ। এর মধ্যে যেন স্টেপলটন আর নতুন আঘাত হানতে না পারেন। তুমি অনেকক্ষণ তাঁর কাছ

ছাড়া—ও কি—

বীভৎস একটা আর্তচিৎকারে সহসা কেঁপে কেঁপে উঠল বাদার বাতাস।

লাফিয়ে উঠে দুজনেই গিয়ে বাইরে উঁকি দিলাম।

নিঃসীম আতঙ্কের কলজে-ছেঁড়া ভয়াল আর্তনাদ এবারে যেন ফেটে পড়ল কানের গোড়ায়। ব্যাকুল ভাবে যেন একদিক থেকে আর একদিকে ছুটোছুটি করছে। নিস্তব্ধ রাতের বুক বিদীর্ণ করা আর্তনাদের সঙ্গে এবারে কানে এল—অনুচ্চ গভীর গর গর শব্দ—

অন্ধকারের বুকে চোখ রেখে আর্তস্বরে বলে উঠল হোমস—ওয়াটসন, হাউন্ড—শিগ্‌গির বেরিয়ে চল। আর দেরি নয়—সর্বনাশ হতে চলেছে বোধহয়—

বলতে বলতে তীরবেগে জলার ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল হোমস। রুদ্ধশ্বাসে ছুটলাম আমিও।

সহসা আমাদের সামনেই এবড়োখেবড়ো পাথুরে জমির ওপরে আর্ত চিৎকারের শেষ করুণ রেশটুকু শোনা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ঝপাস করে একটা শব্দ। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কান খাড়া করে রইলাম দুজনে।

না, বাতাস আবার শান্ত হয়ে গেছে—কোন সাড়াশব্দ পেলাম না।

—ওয়াটসন, সামান্যর জন্য হেরে গেলাম আমরা। হাত গুটিয়ে কয়েকটা ঘণ্টা বসে থাকার কী করুণ পরিণতি ঘটল কে জানে, চল।

অনেকক্ষণ স্যার হেনরীকে ছেড়ে আছি—অনুতাপে অনুশোচনায় বুকের ভেতরটা দগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। অন্ধভাবে ছুটলাম আমরা।

কখনো গোলাকার পাথরের ওপর দিয়ে, কখনো পাশ কাটিয়ে—কাঁটাঝোপ মাড়িয়ে—দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছি।

উঁচু জায়গায় উঠে জলার কালো একটা চাপা গোঙানি ভেসে এল কানে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

বাঁদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে নজরে পড়ল এবড়োখেবড়ো খোঁচা খোঁচা পাথুরে শিরার ওপর কালো একটা কি পড়ে রয়েছে। সেইদিকে লক্ষ্য করে বেগে নিচে নামতে লাগলাম।

কাছে গিয়ে যা দেখলাম তাতে শরীর যেন অবশ হয়ে এল।

হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা লোক। ঘাড়টা ভেঙ্গে গেছে—মাথাটা ঢুকে রয়েছে দেহের নিচে—গোটা শরীরটা ধনুকের মত বেঁকে দুমড়ে মুচড়ে রয়েছে।

বুঝতে পারলাম গোঙানির শব্দটা আর কিছুই নয়—মুমূর্ষুর কাতরানি। যতক্ষণ দেহে প্রাণ ছিল, শব্দটা ছিল।

এগিয়ে এসে নিথর দেহটার গায়ে হাত রেখেই ভয়-ব্যাকুল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল হোমস। ত্বরিৎ গতিতে দেশলাই জ্বালাল।

চাপ চাপ রক্ত লেগেছে হোমসের আঙুলে। কঠিন পাথরের বুকে থক থক করছে রক্ত—আর দলা দলা মগজ।

পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে দেশলাইর আলোতে স্পষ্ট দেখলাম, হতভাগ্য স্যার হেনরী বাস্কারভিলের দেহ নিথর হয়ে আছে।

লালচে রঙের টুইড স্যুটটা পরনে। বেকার স্ট্রীটে এই স্যুট পরেই প্রথম দিন গিয়েছিলেন—তাই পরিষ্কার মনে আছে। দেশলাইর আলোয় ক্ষণিকের জন্য হলেও পরিষ্কার দেখতে পেলাম সেই বেশ।

অন্ধকারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে অব্যক্ত বেদনায় বলে উঠলাম, হোমস, আমার জন্যই আজ প্রাণ হারাতে হ'ল স্যার চার্লসকে।

—তোমার চাইতে বড় অপরাধ আমার ওয়াটসন। কেসটাকে দ্রুত সম্পূর্ণ করতে গিয়ে মক্কেলের দিকে অমনোযোগী হয়ে পড়েছিলাম। আমার কর্মজীবনের সবচাইতে বড় আঘাত। কিন্তু আমার সমস্ত বারণ অগ্রাহ্য করে তিনি এভাবে জলায় বেরিয়ে পড়লেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আমার।

—আর্তনাদ শুনে ছুটে এসেও কিছু করতে পারলাম না—এত দ্রুত ঘটনাটা ঘটে গেল। কিন্তু হাউন্ড পালাল কোথায়? স্টেপলটনও নিশ্চয় আশপাশে ঘাপটি মেরে রয়েছে।

দাঁতে দাঁত চেপে বলল হোমস—যেখানেই থাকুক—আমি রেহাই দেব না তাকে। একজন খুন হলেন বীভৎস জানোয়ারটাকে দেখে—আর একজন তাড়া খেয়ে প্রাণ ভয়ে পালাতে গিয়ে ঘাড় গুঁজে পড়ে মরলেন।

হাউন্ড তাড়া করে এনেছে প্রমাণ করতে হলে মানুষ আর জানোয়ারটার মধ্যে সম্পর্ক-সূত্রটা প্রমাণ করতে হবে আমাদের। আওয়াজটুকু কেবল আমরা শুনেছি হাউন্ডের, কিন্তু তা প্রমাণ করব কি করে?

—এখুনি গ্রেপ্তার করছি না কেন?

—সম্ভব নয়। অপরিসীম ধূর্ত লোকটা। নিজেকে ধবা ছোঁয়ার বাইরে রেখে চলেছে। যা জেনেছি তা প্রমাণ করতে পারার মত যথেষ্ট তথ্য এখনো হাতের বাইরে ওয়াটসন। কিন্তু দেরি করলে চলবে না, আগামী কালের মধ্যেই জাল গুটোতে হবে।

দুমড়োন মোচড়ান বন্ধুর দেহটার দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা কুঁকড়ে উঠছিল। বললাম, চল—লোকজন ডেকে আনা যাক।

হোমস মৃতদেহের ওপরে ঝুঁকে ছিল। হঠাৎ পাগলের মত সোল্লাসে চিৎকার করে উঠে বাচ্চা ছেলের মত লাফাতে লাগল। লাফাতে লাফাতে আমার হাত

মুচড়ে দিয়ে বলতে লাগল—দাড়ি—লোকটার দাড়ি আছে।

—দাড়িওয়ালা?

—ওয়াটসন, আমাদের বন্ধু স্যার হেনরী নন। আমার প্রতিবেশী সেই পলাতক আসামী।

ক্ষিপ্তের মত ছুটে গিয়ে চিৎ করে দিলাম দেহটা। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল রক্ত-চোয়ানো দাড়ির গুচ্ছ উঁচু হয়ে আছে—এই তো—কাল রাতে দেখা চেহারা—কোটরপ্রবিষ্ট চোখ—ঠেলে বেরুনো কপাল, পলাতক সেলডন।

মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। মনে পড়ল, লন্ডন থেকে নতুন বেশভূষা আসায় স্যার হেনরী পুরনো পরিচ্ছদ দিয়ে দিয়েছিলেন ব্যারিমুরকে। পালানোর সুবিধার জন্য সে সেই পোশাক দিয়েছিল সেলডনকে, বুট, ক্যাপ,—

বিধির বিধানে পাপের শাস্তি শেষ পর্যন্ত এভাবেই নেমে এল। আনন্দে কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠল।

হোমসকে খুলে বললাম সব। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, তাহলে রহস্যটা এই। স্যার হেনরীর ব্যবহার করা কোন জিনিসের গন্ধ শুঁকিয়ে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল হাউন্ডটাকে।

এবারে পরিষ্কার হয়ে গেল—হোটেল থেকে হারিয়ে যাওয়া পুরনো বুট জুতো দিয়েই ঘটানো হয়েছে ব্যাপারটা। হাউন্ড সেই গন্ধ পেয়ে তাড়া করেছিল সেলডনকে। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে বুঝল কি করে যে হাউন্ড তাড়া করেছে?

—কেন ডাক শুনে।

—ওর মত এমন দুর্দান্ত খুনী জলার বুকে একটা হাউন্ডের ডাক শুনে আর্তনাদ করে দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটবে—এ কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার নয়।

চিৎকার করলে লোক জড়ো হবে এ ভয় সে কাটিয়ে উঠবে কি করে? অথচ আর্তনাদ শুনেই বুঝতে পারা গেছে, অনেক দূর থেকেই তাড়া খেয়ে এদিকে ছুটে এসেছে। রহস্যটা খুবই গভীর ওয়াটসন।

—কিন্তু তাই যদি হয়, কেবল রাতেই তাহলে হাউন্ডটাকে ছেড়ে দেওয়া হয় কেন? দিনের বেলা সেটা থাকে কোথায়? আমার তো মনে হচ্ছে—সকলেই যা বলে—

—যা বলে তা মাথা ঘামাবার মত নয়। আপাততঃ ওসব চিন্তা থাক—বডিটা কি করা যায় বল।

দুজনে পরামর্শ করে পাথরের কুটিরের মধ্যে মৃতদেহটা রেখে দেওয়াই স্থির করলাম। কিন্তু কাজটা করবার আগেই আমাদের দুজনের দৃষ্টি আটকে গেল দুরে জলার বুকে।

—দেখ ওয়াটসন, লোকটার স্পর্ধা। চুরুটের ধোঁয়া উড়িয়ে এ দিকেই আসছে।

ওয়াটসন, সাবধান, একদম যেন সন্দেহ করতে না পারে।

চাঁদের আলোয় প্রকৃতিবিদের আকৃতিটা পরিষ্কার দেখা গেল। জ্বলন্ত চুরুটের লাল আভাও নজরে পড়ছে। দ্রুত হেঁটে এগিয়ে আসছেন। আমাদেরও চোখে পড়েছে মনে হল—কাছে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। পরক্ষণেই এগিয়ে এলেন।

—ডক্টর ওয়াটসন যে, এত রাতে এই নির্জন বাদায়? একি—কি সর্বনাশ—কে জখ—ম—স্যার হেনরী মনে হচ্ছে?

আমাদের পাশ দিয়ে বেগে বেরিয়ে গিয়ে মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়লেন স্টেপলটন। চুরুট খসে পড়ল আঙুলের ফাঁক থেকে। তেমনি উপুড় হয়ে থেকেই জড়িত স্বরে বললেন—এ—একে?

—প্রিন্সটাউন জেলের পলাতক আসামী সেলডন।

মুখভাব পরিষ্কার দেখতে পেলাম না—কিন্তু কয়েক মুহূর্ত থমকে রইলেন। মনের আকস্মিক প্রতিক্রিয়া সামাল দিলেন অনেক কষ্টে বুঝতে পারলাম। ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন—কি সর্বনাশ—মারা গেল কিভাবে?

—এদিকেই তো আত্মগোপন করে ছিল, পা ফসকে হয়তো পাহাড় থেকে পড়ে গেছে। বাদায় বেড়াচ্ছিলাম দুই বন্ধু—চিৎকার শুনে এসে দেখি—

—আমার কানেও পৌঁচেছিল চিৎকারটা। স্যার হেনরীর কথা ভেবে ছুটে না এসে পারলাম না।

—চিৎকার শুনেই স্যার হেনরীর কথা বিশেষভাবে মনে পড়ল আপনার? অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

—আমার ওখানে আসবার কথা ছিল। বাদার বুকে বিকট আর্তনাদ শুনে ভয় হল উনিই কোন বিপদে পড়লেন কি না।

বলতে বলতে হোমসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আবার বললেন,—চাষীরা বলাবলি করে পিশাচ-কুকুর নাকি জলায় টহল দেয় রাত্রে—গভীর রাতে গর্জন শোনা যায়—তেমন কিছু কি শুনেছেন?

—সেরকম কিছু তো কানে আসেনি। বলল হোমস।

—দুর্বল শরীরে পাহাড়ে পা ফসকে পড়েই তাহলে মারা গেল লোকটা, মিঃ হোমস কি বলেন?

—চিনতে ভুল করেননি দেখছি।

—ডক্টর ওয়াটসনের আসবার পর থেকেই আমরা প্রায় প্রতিদিনই আপনাকে আশা করছিলাম যে। এসেই এমন একটা মর্মন্তুদ ঘটনার সাক্ষী হতে হল?

—তাই তো দেখছি, আবার এই বিষণ্ণ করুণ স্মৃতি নিয়েই কাল ফিরে যেতে হবে।

—কালই ফিরবেন? এদিককার স্যার চার্লসের মৃত্যু সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন সূত্রের সন্ধান—

—কিছুই না—তদন্ত করব তেমন ঘটনা কোথায়? কাল্পকাহিনী আর কিংবদন্তীর তদন্ত কি করব!

হোমসের নির্লিপ্ত স্বর শুনে আমার দিকে ফিরলেন স্টেপলটন। বললেন, বোনটা অমন দৃশ্য দেখলে সহ্য করতে পারবে না। নইলে আমার বাড়িতেই লাশটা তুলে নিয়ে যেতাম। অবশ্য এই পাথুরে পাহাড়ে রাতটা কোন অসুবিধা হবে না।

কথা না বাড়িয়ে তখনই ধরাধরি করে মৃতদেহটা পাথরের চাঙড়ের পাশে সরিয়ে রাখা হল।

মিঃ স্টেপলটন অনুরোধ জানালেন তাঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্য। সবিনয়ে তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে দুই বন্ধুতে বাস্কারভিল হলের দিকে হওনা হলাম।

নিস্তব্ধ রাতের বুকে হাওয়ার শনশন আর ঘাসের ওপর আমাদের পায়ের শব্দ ছাড়া কোন দিকে কোন শব্দ নেই। চাঁদের অস্বচ্ছ আলোয় ঝাপাসা হয়ে আছে চারদিক। দূরে একটা দুটো আলোর রেখা। তার একটা নিশ্চয়ই মিঃ স্টেপলটনের বাড়ি। তার বাড়িতে এখানো আলো থাকাই স্বাভাবিক। গৃহস্বামী বাইরে।

—লড়াইটা এবারে মুখোমুখেই শুরু হল ওয়াটসন। যাকে মৃত দেখবে আশা করে এসেছিল—অন্য একজনকে দেখে কী আশ্চর্য দ্রুততায় সামলে নিল নিজেকে। লোকটা জাত ক্রিমিন্যাল। আমাকেও ঠিক চিনে ফেলেছে।

—এখন ষড়যন্ত্র কোন দিকে মোড় নেবে কে জানে?

—হয় আমাদের বোকা বানিয়েছে ভেবে অত্যধিক আত্মবিশ্বাসে কিছু একটা দুম করে করে বসবে, না হয় সতর্ক হবে।

আজ রাতে গ্রেপ্তার করলেই তো হয়।

—সে উপায় কোথায়? তার বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার মত কোন প্রমাণই তো আমাদের হাতে নেই। স্যার চার্লসের মৃতদেহে কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না। হাউন্ডের ভয়ে তিনি প্রাণ হারিয়েছেন প্রমাণ করবে কি করে?

আজকের ঘটনাও নাগালের বাইরে। লোকটার মৃত্যুর সঙ্গে হাউন্ডের সরাসরি কোন সম্পর্ক প্রমাণ করা যাবে না।

· আমরাও ডাক শুনেছি—চোখে দেখিনি। লোকটাকে হাউন্ড তাড়া করেছিল—তেমন প্রমাণ কোথায়? এখনো পর্যন্ত মিঃ স্টেপলটন ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

ওয়াটসন, এমন শক্ত পাল্লায় আগে কখনো পড়তে হয়নি।

—তাহলে কি করবো ভেবেছো?

—উপায় নেই, কেস পাকা করবার জন্য যে কোন ঝুঁকি নিয়ে আরো একটু

অপেক্ষা করতে হবে। তবে মিসেস লরা লায়ন্স অনেকটাই সুরাহা করতে পারেন আমাদের। তাছাড়া দেখি আর একটু চিন্তা ভাবনা করে কি করা যায়।

এর বেশি কিছু ভাঙল না হোমস। ততক্ষণে আমরা বাস্কারভিল হলের কাছাকাছি এসে গেছি।

হোমস বলল, বাইরে থেকে আর কাজ নেই, ভেতরেই যাব চল। তবে হাউন্ড সম্পর্কে কোন কথা স্যার হেনরীকে বলবে না।

স্টেপলটন যে ভাবে আমাদের বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন—সে ভাবেই বক্তব্য থাকবে আমাদের। আর একটা কথা ওয়াটসন, তোমার রিপোর্টে লিখেছিলে মনে আছে নিশ্চয়ই আগামীকাল স্টেপলটনদের বাড়িতে স্যার হেনরী এবং তোমাদের ডিনারের নিমন্ত্রণ রয়েছে। কোন একটা অছিলায় তোমার যাওয়া হবে না। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে স্যার হেনরী একাই যাবেন।

হোমসের আকস্মিক আবির্ভাবে খুবই খুশি হলেন স্যার হেনরী। ওঁর পক্ষে যতটা জানা দরকার খুলে বললাম।

ব্যারিমুরকে ডেকেও দুঃসংবাদটা জানাতে হল। ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে খুবই কান্নাকাটি করল মিসেস ব্যারিমুর।

স্যার হেনরী নিজেই জানালেন, স্টেপলটন খবর পাঠিয়েছিলেন বিকেলে ওদের ওখানে যাবার জন্য। কিন্তু একলা কোথাও বেরুবেন না বলে আমাদের কথা দিয়েছিলেন তাই আর যাননি। তবে ওর ধারণা, স্টেপলটনদের ওখানে গেলে সন্ধ্যাটা ভালই কাটত।

হোমসকে কাছে পেয়ে কেসের ব্যাপারে অগ্রগতি জানতে চাইলেন স্যার হেনরী।

হোমস বলল, পরিস্থিতি খুবই জটিল। এমন জটপাকানো কঠিন কেস আগে আমার হাতে আসেনি।

—মিঃ হোমস, ডক্টর ওয়াটসন নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছেন, আমার দুজনেই একদিন হাউন্ডের ডাক শুনেছি জলায়। কিংবদন্তীর ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়।

কুকুরের ডাক চিনতে পারি—স্পষ্ট হাউন্ডের ডাক। একে কি করে কব্জা করবেন বুঝতে পারছি না।

—আপনার একটু সহযোগিতা পেলে ওই হাউন্ডের গলায় চেন পরানো খুব কষ্টকর বলে মনে করি না।

—কি করতে হবে বলুন?

—বিশেষ কিছুই না, যা করতে বলব, প্রশ্ন না করে অন্ধের মত তাই করে

যাবেন—

বলতে বলতে থেমে গেল হোমস। তাকিয়ে দেখি আমার কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনের দেওয়ালে নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে তার দৃষ্টি। মুখে কোন কথা নেই। মুহূর্তের মধ্যে যেন অন্য জগতে চলে গেছে, যেন প্রস্তরমূর্তি।

—কি হল?

আমাদের দুজনের মুখ দিয়েই বিস্মিত জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হল।

চোখ নামিয়ে সংযত কণ্ঠে হোমস বলল, দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো দেখছিলাম। চমৎকার—সত্যিই প্রশংসা করবার মত।

পেছনের দেয়ালে সারি সারি প্রতিকৃতি ঝোলানো রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে হেনরী বললেন, ভাল লাগল আপনার প্রশংসা। সবই আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতি।

হোমস বলল—অনেক কয়টাই তো পরিচিত। নীল সিল্ক পরা ভদ্রমহিলা নিশ্চয় নেলার—পাশে মোটাসোটা ভদ্রলোক রেনল্ডস বলেই মনে হচ্ছে—নাম জানেন সকলের?

—ব্যারিমুরের কাছ থেকে জেনে নিয়েছি।

—মুখোমুখি ওই যে অশ্বারোহী সৈনিক—গায়ে কালো মখমল আর লৈস—ইনি কে?

স্যার হেনরী স্মিত হেসে বললেন—বাস্কারভিল-হাউন্ডের অভিশাপ বংশধরদের কাঁধে চাপিয়ে গেছেন ইনিই—হিউগো বাস্কারভিল।

ধীর শান্ত চোখ প্রতিকৃতির দিকে ধরে রেখে হোমস বলল, আশ্চর্য ভদ্রলোকের চেহারা, আপাতদৃষ্টিতে খুবই শান্ত বলে মনে হয়—কিন্তু চোখ দুটো ভয়াবহ। মনে হয় শয়তান ওঁৎ পেতে রয়েছে।

রাতের আহার শেষ করতে করতে যতক্ষণ তিনজন এক সঙ্গে রইলাম, লক্ষ্য করলাম, বংশের প্রাচীন প্রতিকৃতিগুলো সম্পর্কে খুবই আগ্রহ নিয়ে কথা বলল হোমস্।

এক সময় বিদায় নিয়ে ঘরে চলে গেলেন স্যার হেনরী। আমরাও শোবার ঘরে ফিরে এলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ঘরের মোমবাতি হাতে নিয়ে হোমস খাবার ঘরে এসে হাজির হল। হিউগো বাস্কারভিলের ছবিটার সামনে আলো তুলে ধরে বলল,—খেয়াল করে দেখ ওয়াটসন—এরকম চেহারার দেখতে চেন কাউকে?

পালক গোঁজা চওড়া-কিনারা টুপি পরা মুখটার দিকে তাকালাম, কানের পাশে কোঁকড়ানো চুল, সাদা লেসের কলার দিয়ে ঘেরা কঠিন একটি মুখ। দৃঢ় সংবদ্ধ কঠিন ঠোঁট—দু'চোখের দৃষ্টি শীতল। ওরকম চেহারার দেখতে কারুর কথা মনে পড়ল না। বললাম—চোয়ালটা যেন স্যার হেনরীর মত।

এবারে চেয়ার টেনে উঠে দাঁড়াল হোমস। তারপর বাঁহাতে আলো ধরে ডান হাত দিয়ে চাপা দিল টুপি আর কোঁকড়া চুল।

—একি—আশ্চর্য! এ যে স্টেপলটনের মুখ হুবহু—

হেসে হোমস বলল, তাহলে এবারে চিনতে পেরেছ! ছদ্মবেশের ভেতর থেকে আসল চেহারা বার করার জন্য ট্রেনিং দরকার ভায়া—অপরাধ তদন্তকারীর এই গুণ অপরিহার্য।

—স্টেপলটনের ছবি বলে স্বচ্ছন্দে চালিয়ে দেওয়া যায়।

—ভায়া, আত্মিক ও শারীরিক দোষগুণ নিয়ে পুর্ব পুরুষের ধারায় এভাবেই বংশধরদের জন্মাতে দেখা যায়। এসব জন্মান্তরবাদীদের বিশেষ গবেষণার বিষয়। এই প্রতিকৃতি থেকে আমি নিশ্চিত হতে পেরেছি—এই স্টেপলটন ভদ্রলোক বাস্কারভিল বংশেরই একজন কেউ।

—সেই কারণেই কি সম্পত্তি দখলের চক্রান্ত করছেন? কিন্তু তাহলে এভাবে কেন?

—সব রহস্যই আগামীকালের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ভদ্রলোক এখন আমার হাতের মুঠোয়। জাল গুটনোর অপেক্ষা মাত্র।

সকালে আমি ঘুমে থাকতেই হোমস উঠে বেরিয়ে গিয়েছিল। সেলডনের মৃত্যু সংক্রান্ত ব্যাপারে যাতে ব্যারিমুর দম্পতি বা স্যার হেনরীকে কোন ঝামেলা পোয়াতে না হয় সে জন্য গ্রিমপেন থেকে প্রিন্সটাউনে টেলিগ্রাম পাঠাল। তারপর তার পরম বিশ্বাসী বয় কার্টরাইটকে খবর পাঠাল। তা না হলে বেচারা তার প্রতীক্ষাতেই পাথরের কুটির আগলে বসে থাকত।

বন্ধুবর ফিরে এলে ব্রেকফাস্ট টেবিলে তিনজন একসঙ্গেই বসলাম।

হোমস স্যার হেনরীকে বলল, আজ রাতে তো যদ্দুর শুনেছি, স্টেপলটনের বাড়িতে আপনার আহারের নিমন্ত্রণ। আমি ও ওয়াটসন যেতে পারলে খুশিই হতাম। ওঁদের বুঝিয়ে বলবেন, বিশেষ কাজে আজই ফিরে যাওয়া বিশেষ জরুরী।

স্যার হেনরী খুবই হতাশ হলেন শুনে। বিমর্ষভাবে বললেন, এ ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত দেখে গেলে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। আমার পক্ষে বাস্কারভিল হলে থাকাটা—

—দুর্ভাবনার কিছু নেই স্যার হেনরী। আমি নিজেই আপনাকে রেখে যাচ্ছি। তাছাড়া শিগ্‌গিরই আবার ফিরে আসার ইচ্ছা আছে।

তবে একটা কথা—আপনাকে যে ভাবে যা করতে বলে যাচ্ছি দয়া করে তার নড়চড় করবেন না। কখন যাবেন ঠিক করেছেন?

—ব্রেকফার্স্টের পরেই রওনা হব।

আপনি স্টেপলটনদের বাড়িতে যাবার সময় গাড়ি নিয়ে যাবেন। পৌঁছেই গাড়ি

বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। হেঁটে বাড়ি ফিরবেন—এবং আপনার এই ইচ্ছেটা ওঁদেরও জানিয়ে দেবেন।

—কিন্তু মিঃ হোমস, বাদার ওপর দিয়ে আসবার ব্যাপারে আপনি আমাকে বহুবার নিষেধ করেছন।

—হ্যাঁ, কিন্তু এখন আপনি নিরাপদে আসতে পারবেন। তবে সোজা রাস্তা ছেড়ে বাদার রাস্তায় ভুলেও পা বাড়াবেন না। মেরিপিট হাউস থেকে গ্রিমপেন রোড ধরে সোজা পথে বাড়ি ফিরবেন।

যথাসময়ে স্যার হেনরীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা কুমবেট্রেসি স্টেশনে পৌঁছালাম। কার্টরাইট ছোকরা স্টেশনেই অপেক্ষা করছিল।

হোমস তাকে কাছে ডেকে বলল, এই ট্রেনেই লন্ডন চলে যাও। পৌঁছেই আমার নামে স্যার হেনরীকে একটা টেলিগ্রাম করে দেবে। বলবে, ভুল করে পকেট বইটা ফেলে এসেছি। উনি যেন রেজেস্ট্রি ডাকে বেকার স্ট্রীটে পাঠিয়ে দেন। আর ফেরার পথে স্টেশন অফিসে খোঁজ নিয়ে এস—আমার নামে কোন চিঠি এসেছে কিনা।

হোমসের কার্যকলাপের পরম্পরা কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না। যে সংকটপূর্ণ সময়ে আমাদের এখানে থাকা একান্ত দরকার—সে সময়েই আমাকে শুদ্ধ টেনে নিয়ে চলল লন্ডনে। তবে মাথায় একটা প্ল্যান যে ওর কাজ করছে সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি।

কার্টরাইট স্টেশন অফিস থেকে একটা টেলিগ্রাম নিয়ে ফিরে এল। হোমস পড়ে আমার হাতে দিল। টেলিগ্রামটা এরকম ঃ টেলিগ্রাম পেয়েছি—গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে পাঁচটা চল্লিশে পৌঁছব।—লেসট্রেড।

টেলিগ্রামটা পড়ে ওর পরিকল্পনাটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। সকালেই সরকারী গোয়েন্দা লেসট্রেডকে টেলিগ্রামে এখানে চলে আসবার কথা জানিয়েছিল। এদিকে আবার আমরা যে সত্যিই লন্ডন ফিরে গেছি তা ব্যারনেটকে পাঠানো টেলিগ্রাম দিয়ে স্টেপলটনদের বিশ্বাস করাচ্ছে।

আসলে আমরা থেকেই যাচ্ছি। এবং যথাসময়ে যথাস্থানে সরকারী গোয়েন্দা সঙ্গে করে হাজির হব। উত্তম। মনটা হাল্কা হয়ে উঠল মুহূর্তে।

হোমস বলল—এবারে চল মিসেস লরা লায়ন্সের সঙ্গে সাক্ষাৎটা সেরে আসি।

অফিসেই পাওয়া গেল মিসেস লায়ন্সকে। হোমস সোজাসুজিই কথা আরম্ভ করল তার সঙ্গে।

বলল, ম্যাডাম, স্যার চার্লসের মৃত্যু সংক্রান্ত ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছি। এ ব্যাপারে আমার বন্ধু ডক্টর ওয়াটসনকে আপনি যা বলেছেন তা আমি

জানি—তবে আমি বুঝতে পারছি আপনি কিছু চেপেও গেছেন।

—কোন কথা চেপে রাখিনি আমি। ঝিলিক খেলে গেল ভদ্রমহিলার চোখে।

—রেখেছেন। রাত দশটায় স্যার চার্লসকে গেটে আসতে বলেছিলেন, ঠিক সেই সময় সেই জায়গাতেই মারা গেছেন তিনি। এই দুটো ঘটনার মধ্যের যোগসূত্রটা চেপে গেছেন।

—যোগসূত্রটা নিতান্তই কাকতলীয়।

—আমার কিন্তু বিশ্বাস অন্যরকম। আপনি না বললেও সেটা আমরা খুঁজে বার করবই। এবং এও আপনাকে খোলাখুলি জানিয়ে রাখছি—এটা একটা খুনের কেস। এখন পর্যন্ত সাক্ষ্য প্রমাণ যা পাওয়া গেছে তাতে আপনার বন্ধু স্টেপলটন এবং তাঁর স্ত্রী নিঃসন্দেহে অপরাধী প্রতিপন্ন হবেন।

কথাটা শুনেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন ভদ্রমহিলা।

—তাঁর স্ত্রী? তিনি তো বিবাহিত নন।

—বোন বলে যাকে পরিচয় দিচ্ছেন, তিনিই তাঁর স্ত্রী। এই দেখুন।

পকেট থেকে একগাদা কাগজ টেনে বার করল হোমস।

—চার বছর আগে ইয়র্কে তোলা হয়েছিল এই ফোটো, স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে—অবশ্য নাম লেখা রয়েছে মিঃ এবং মিসেস ভ্যানডেলর। দুজনকেই আপনি চিনতে পারবেন।

বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীর লেখা তিনটি দৈহিক বিবরণও আমাব কাছে রয়েছে। তখন ওঁরা সেন্ট অলিভার্স নামে একটা প্রাইভেট স্কুলে ছিলেন।

এগুলো পড়ে দেখুন—ভদ্রলোককে সনাক্ত করতে অসুবিধা হয় কিনা।

ছবি দেখলেন মিসেস লায়ন্স। দ্রুত গতিতে বিবরণগুলোতেও চোখ বোলালেন। উত্তেজনায় কাঁপছেন তিনি। আড়ষ্ট মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—ভণ্ড—শয়তান! স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করলে আমাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিল। লোকটা যে জালিয়াত আগেই আমার সন্দেহ করা উচিত ছিল।

স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমাকে হাতের যন্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করতে চেয়েছিল। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ—শয়তান লোকটা তার কুকর্মের ফল ভোগ করুক।

বলুন আমাকে কি করতে হবে, কিছু গোপন করব না আমি। স্যার চার্লসকে চিঠিটা লেখবার সময়ে আমি কল্পনাও করতে পারিনি আমার সবচেয়ে উপকারী বন্ধুর সর্বনাশ করতে যাচ্ছি।

—ম্যাডাম, আমি বিশ্বাস করি আপনার কথা। ষড়যন্ত্রটা খুবই নিখুঁত ছিল সন্দেহ নেই।

—চিঠিটা ও বলে গিয়েছিল, আমি লিখে নিয়েছিলাম। বলেছিল, বিবাহ-

বিচ্ছেদের মোকদ্দমার যা খরচ—চিঠি লিখলে সেটা স্যার চার্লসের কাছ থেকে পাওয়া যাবে।

—চিঠিটা পাঠানোর পরে উনিই আবার তো আপনাকে যেতে নিরস্ত করেছিলেন?

—হ্যাঁ, বলেছিল, আমাদের বিয়ের জন্য অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিতে তার সম্মানে বাঁধছে। আর বলেছিল—স্যার চার্লসের সঙ্গে এই অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারে কেউ যেন জানতে না পারে।

—খবরের কাগজে মৃত্যু সংবাদটা আপনার চোখে পড়েছিল?

—না, ও-ই জানিয়েছিল। আমাকে ভয় দেখিয়ে বলেছিল, অত্যন্ত রহস্যজনক মৃত্যু, কোনভাবে চিঠির কথা জানতে পারলে পুলিশ আমাকেই সন্দেহ করবে। এখন বুঝতে পারছি, আমাকে সামনে রেখেই হত্যাকাণ্ডটা ও ঘটিয়েছে।

—আপনিও রক্ষা পেয়ে গেছেন ভাগ্যের জোরে। তার কুকর্মের একমাত্র সাক্ষী আপনিই, এটা তিনি জানতেন, তারপরেও যে কোন কারণেই হোক মনোযোগটা সাময়িক আপনার দিক থেকে সরে গিয়েছিল বলে প্রাণে বেঁচে গেছেন। যাই হোক অনেক ধন্যবাদ, আজ উঠি, আবার দেখা হবে।

সোজা চলে এলাম আমরা স্টেশনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝম ঝম শব্দে এসে পৌঁছল লন্ডন এক্সপ্রেস।

প্রথম শ্রেণীর একটা কামরা থেকে নেমে এসে আমাদের সঙ্গে সহাস্যে করমর্দন করলেন লেসট্রেড।

—এ দিককার খবর কি?

—খবর শুভ। বছরের সবচেয়ে বড় খবর আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। ঘণ্টা দুই পরেই কাজে নেমে পড়তে হবে। চলুন এই ফাঁকে ডিনারটা সেরে নেওয়া যাক।

একটার পর একটা কাজ করে যাচ্ছে হোমস। সবই তার পরিকল্পনা মাফিক। কিন্তু পাশাপাশি থেকেও কিছু জানতে পারছি না আগে থেকে। অন্ধের মত কেবল তাকে অনুসরণ করে যেতে হচ্ছে।

এক অদ্ভুত স্বভাব শার্লক হোমসের। পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে সফল না হওয়া পর্যন্ত বিন্দুমাত্র আভাস তার কাছ থেকে পাবার উপায় নেই।

ভেতরটা উৎকণ্ঠায় ছটফট করতে থাকলেও ওর স্বভাবের কথা ভেবে চুপ করে থাকতে হয়।

হোটেল থেকে বেরিয়ে দু-চাকার খোলা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া হল। বাস্কারভিল হলের ইউ-বীথির গেটে গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হল। তারপর আমরা চললাম

মেরিপিট হাউসের দিকে।

গ্রীমপেন মায়ারের ওপর কুয়াশা ক্রমশঃ ঘন হতে শুরু করেছে। দূরের পাহাড়ের আভাস এখনো অদৃশ্য হয়ে যায়নি। তার মধ্যেই মেরিপিট হাউসের আলোটা চোখে পড়ল।

চলতে চলতে হোমস বলল—ওখানেই আমাদের যাত্রার শেষ। এবারে প্রস্তুতি নিন। সশস্ত্র হয়ে এসেছেন কিনা, মিঃ লেসট্রেড, নিশ্চয়ই আপাকে একথা জিজ্ঞেস করতে হবে না। এখান থেকে যথাসম্ভব পা টিপে হাঁটতে হবে আমাদের—কথা একদম জোরে নয়।

মেরিপিট হাউসের শ দুই গজ আগেই হোমস দাঁড় করিয়ে দিল আমাদের।

গোলাকৃতি কয়েকটি পাথরের আড়ালে নিজেদের অস্তিত্ব গোপন করে দাঁড়ালাম আমরা। সামনের বাড়িটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

হোমস সেদিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, ওয়াটসন, তুমি তো আগে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছিলে—জানালায় আলো ঝলমল করছে—ওটা কিসের ঘর?

চিনতে পারলাম, খাবার ঘরে আলো জ্বলছে। খড়খড়ি তোলা। হোমসের নির্দেশে ঘরের ভেতরের দৃশ্যটা দেখবার জন্য পা টিপে টিপে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলাম।

পাঁচিল ঘেরা পুরো বাড়িটা। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে পাঁচিলের পাশ দিয়ে একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। এখানে থেকে পর্দাহীন জানালার মধ্য দিয়ে সোজাসুজি ভেতরের দৃশ্য দেখা যায়।

গোল টেবিলের পাশে বসে স্টেপলটন আর স্যার হেনরী। টেবিলে রয়েছে কফি আর মাছের বোতল। স্টেপলটন উৎসাহের সঙ্গে কি বকবক করে চলেছেন।

হঠাৎ কথা বন্ধ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। স্যার হেনরী চেয়ারে হেলান দিয়ে চুরুট টানতে লাগলেন।

আমি যে পাঁচিলের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি তার অন্য পাশে কাঁকরের ওপরে বুট জুতোর আওয়াজ উঠল। সন্তর্পণে মুখ তুলে দেখলাম, বাগানের কোণে একটা আউট হাউসের দরজার সামনে থমকে দাঁড়ালেন স্টেপলটন।

চাবি দিয়ে তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা খড়মড় আওয়াজ শোনা গেল ঘরের ভেতরে।

মিনিট খানেক ভেতরে থেকে বেরিয়ে এসে তালা বন্ধ করলেন। তারপর আমার সামনে দিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। চেয়ারে বসে আবার আগের মত কথা জুড়লেন অতিথির সঙ্গে।

এতক্ষণের মধ্যে মিসেস স্টেপলটনকে কোথাও দেখতে পেলাম না। অতিথির সামনে তার অনুপস্থিত থাকবার কোন কারণ বোঝা গেল না।

ফিরে এসে সঙ্গীদের সব জানালাম। ভদ্রমহিলা ঘরে নেই শুনে হোমসের মুখে চিন্তার ছাপ পড়ল।

ইতিমধ্যে আকাশে জমে থাকা কুয়াশার স্তর ক্রমশ নিচে নেমে আসছিল। আচ্ছাদিত হচ্ছে গ্রিমপেন জলাভূমি। সেদিকে তাকিয়ে শঙ্কিত গলায় হোমস বলল—সর্বনাশ, ওয়াটসন দেখ, স্যার হেনরীর বেরিয়ে আসার সময় হয়েছে—এদিকে কুয়াশা রাস্তা ঢেকে ফেলছে। এখনই না বেরুলে, ওঁর প্রাণ বাঁচাতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।

আমরা উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছি সামনের মেরিপিট হাউসের দিকে। আলোর চওড়া রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে জানলা থেকে।

কুয়াশাপ্রাচীর ক্রমশই এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢাকা পড়ে যাবে সামনের দৃশ্য।

বাদার অর্ধেক চাপা পড়ে গেছে পশমের মত কুয়াশার প্রাচীরে।

অস্থির হয়ে উঠল হোমস। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল—আর মিনিট পনেরোর মধ্যে না বেরুলে রাস্তা ঢেকে যাবে—কিছুই দেখা যাবে না চোখে। চল আমরা পেছিয়ে গিয়ে একটা উঁচু জমিতে দাঁড়াই।

হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছুটা দূরে চলে এলাম আমরা।

গাঢ় কুয়াশার কিনারা চাঁদের আলোয় রুপোর মত ঝকঝক করছে। ক্রমশই এগিয়ে আসছে যেন শ্বেত-সমুদ্র।

আধমাইল মত দূরে এসে থামলাম আমরা। হোমস বলল, আর নয়, আমাদের কাছে আসার আগেই স্যার হেনরীর নাগাল ধরে ফেলুক এটা হতে দেয়া যায় না। এখানেই অপেক্ষা করব আমরা।

বলতে বলতে হোমস হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল। তারপর জমিতে কান পেতে বলে উঠল—তৈরি হও, উনি আসছেন।

পাথরের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে পড়লাম আমরা। কিছুক্ষণ পরেই দ্রুত পায়ে চলার শব্দ পাওয়া গেল।

নিস্তব্ধ বাদার বুকে কাঁপন জাগিয়ে পদশব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল। একটু পরেই আমাদের পরিচিত স্যার হেনরীর মূর্তি চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

চারপাশে দেখলেন একবার ঘাড় ঘুরিয়ে। দ্রুত এগিয়ে এসে আমাদের খুব কাছে দিয়ে পেছনের দীর্ঘ ঢাল বেয়ে উঠতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে থেকে থেকে পেছনে ফিরে দেখছেন।

—সামনে তাকাও—পেছনে সে আসছে।

বলতে বলতে পিস্তলের ঘোড়া তুলল হোমস।

কানে ভেসে এল একটা একটানা মচমচ খসখস শব্দ।

ঘন কুয়াশার স্তর এসে গেছে খুব কাছাকাছি। আতঙ্কবিস্ফারিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে আছি তিনজনে।

আচম্বিতে যেন কুয়াশা ভেদ করে বেরিয়ে এল এক শরীরী বিভীষিকা—জ্বলন্ত আগুন ঠিকরনো দুটি চোখ—

মুহূর্তে ভুল হয়ে গেল পরিবেশ। বিস্ফারিত বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। বিকট গলায় ভয়ার্ত চিৎকার ছেড়ে লেসট্রেড মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

ঘন কুয়াশার পটভূমিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সামনে কয়লাকালো অতিকায় এক হাউন্ডের চেহারা। নিঃন্দেহে হাউন্ড—কিন্তু আমাদের পরিচিত জগতের হাউন্ড এ নয়।

গলগল করে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে খোলা মুখবিবর থেকে, লকলকে অগ্নিশিখায় নাক মুখ ঘাড় প্রকট হয়ে উঠেছে, সে এক নারকীয় মূর্তি।

লম্বা লম্বা পা ফেলে ঢাল বেয়ে আসছ—স্যার হেনরী খানিক আগে যে পথে গেছেন, পদক্ষেপ অনুরসণ করে চলতে লাগল সেই পথে।

ক্ষণেকের জন্য যেন পঙ্গু করে দিয়েছিল এই প্রেতমূর্তি।

সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর সম্বিৎ ফিরল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার আর হোমসের পিস্তল গর্জে উঠল—যুগপৎ।

বিকট প্রাণ কাঁপান শব্দে গর্জে উঠল প্রাণীটা। দীর্ঘ টানা আর্তনাদে কঁকিয়ে উঠল জলার শব্দহীন বাতাস।

গুলি খেয়েও থামল না সেই জ্যান্ত বিভীষিকা। চোখের পলকে লাফ মেরে এগিয়ে গেল সামনে।

লাফ দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছি আমরাও। চাঁদের আলোয় নজরে পড়ল দূরে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন স্যার হেনরী। আতঙ্ক কুটিল মুখাবয়ব—দুহাত তুলে অসহায় ভাবে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

উর্ধশ্বাসে ছুটলাম দুজনে। কিন্তু ছুটতে ছুটতেই কানে এল স্যার হেনরীর প্রাণান্তকর আর্তনাদ আর হাউন্ডের গুরুগম্ভীর গলার ক্রুদ্ধ গর্জন।

চোখে পড়ল, শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাউন্ড মাটিতে আছড়ে ফেলেছে—

মুহূর্তের মধ্যে গর্জে উঠল হোমসের হাতের পিস্তল। পরপর পাঁচটা গুলি জানোয়ারটার দেহে বিদ্ধ হল।

যন্ত্রণাবিকৃত আর্তনাদে আকাশ কাঁপিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল দানব-কুকুর। সেই অবস্থাতেই প্রচণ্ড আক্রোশে কটাস কটাস শব্দে শূন্যে কামড় বসিয়ে দিল।

পরক্ষণেই মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে নিথর হয়ে গেল দেহ।

কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে—মাথায় চেপে ধরলাম পিস্তল। কিন্তু গুলি করবার আর দরকার হল না। ততক্ষণে প্রাণ ছেড়ে গেছে দানব-হাউন্ডের।

স্যার হেনরী খানিক তফাতে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে ছিলেন। দৌড়ে গিয়ে টান মেরে কলার খুলে ফেলল হোমস।

কম্পিত শান্ত স্বরে বলে উঠল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—গলায় দাঁত বসাতে পারেনি। আমরা জীবন্ত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছি তাঁকে।

লেসট্রেড তার ব্রান্ডির ফ্লাসক খুলে ব্যারনেটের মুখে গুঁজে ধরল। কিছুক্ষণের মধ্যে ভয়ার্ত চোখ মেলে তিনি তাকালেন আমাদের দিকে। তারপর চাপাস্বরে বললেন—মিঃ হোমস, কি ওটা?

—বাস্কারভিল পরিবারের অভিশাপ—ভুতুড়ে হাউন্ড—চিরতরে শুইয়ে দিয়েছি— আর কখনো তার আবির্ভাব হবে না।

আমাদের সামনেই পড়ে আছে ভয়ঙ্কর প্রাণীটা। একটা সিংহীর মতই বিরাট আকৃতি। মরেও তার ভয়াবহতা প্রকট।

উন্মুক্ত চোয়াল চুঁইয়ে পড়ছে নীলচে আগুন। কোটরে গাঁথা ক্রূর চোখ ঘিরে আগুনের বলয় যেন লকলক করছে।

প্রাণীটার জ্বলন্ত নাক মুখে হাত বুলিয়ে চমকে উঠলাম—আমার আঙুলেও দপদপ করে জ্বলছে উত্তাপহীন আগুন।

হোমসের দিকে ফিরে বললাম—ফসফরাস।

হোমস বলল—কেবল ফসফরাস নয় ফসফরাস দিয়ে তৈরি একটা মলম। গন্ধহীন। গন্ধ শুঁকে শিকারের পেছনে ধাওয়া করতে তাই কোন অসুবিধে হয় না। স্যার হেনরী, এরকম একটা ভয়ঙ্কর প্রাণীর জন্য আমরা তৈরি ছিলাম না। আমরা দুঃখিত। আপনাকে এভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য ক্ষমা করবেন।

—মিঃ হোমস, আমার জীবন রক্ষা করেছেন আপনারা। এর বেশি আর কি বলব।

ধীরে ধীরে সুস্থতা ফিরে পেলেন স্যার হেনরী। হাত পা কাঁপছে ঠকঠক করে। ধরাধরি করে তাঁকে একটা পাথরের ওপরে বসিয়ে দিলাম।

হোমস বলল, বিপদের ভয় আর নেই, তবে লোকটাকে বাড়িতে ধরা দরকার। আপনাকে এখন এখানেই ছেড়ে যাব আমরা। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান।

কোন কথা না বলে দু'হাতে মুখ গুঁজে বসে রইলেন ব্যারনেট। আমরা দ্রুত পায়ে এগুতে লাগলাম।

চলতে চলতে হোমস বলল—এতক্ষণে নিশ্চয় পালিয়েছেন ভদ্রলোক। গুলির আওয়াজ শুনেই বুঝতে পেরেছেন তার খেলা শেষ হয়েছে। গোটা বাড়িটা তল্লাশ

করা দরকার।

হাট করে খোলা দরজার ভেতর দিয়ে আমরা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লাম। করিডরে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ ভৃত্য।

খাবার ঘর ছাড়া কোন ঘরে আলো নেই। ঘরের কোণ থেকে ল্যাম্পটা তুলে নিয়ে সবকটা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল হোমস।

কিন্তু কোথাও প্রকৃতিবিদকে পাওয়া গেল না।

ওপরে গিয়ে দেখলাম শোবার ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। লেসট্রেড দরজায় কান পেতেই চেঁচিয়ে উঠলেন—ঘরে লোক আছে, নড়াচড়ার শব্দ পাচ্ছি। একটা গোঙানির শব্দ আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে পায়ের চেটো দিয়ে তালার ওপর সজোরে লাথি হাঁকিয়ে দরজা খুলে ফেলল হোমস। উদ্যত পিস্তল হাতে তিন জনই ঢুকলাম ঘরে। কিন্তু এখানেও নেই কেউ।

মিউজিয়মের মত করে সাজান ঘরটা। সারি সারি কাচের আধারে প্রজাপতি আর মথ পোকার সংগ্রহ।

ঘরের মাঝ বরাবর খুঁটির সঙ্গে পুঁটলির মত করে কাপড় জড়িয়ে বাঁধা একটা মূর্তি। মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে হোমস বাঁধন খুলে দিল।

চমকে উঠলাম মূর্তির মুখ দেখে। এমন দৃশ্য আমাদের কল্পনাতেও ছিল না। মিসেস স্টেপলটন। বুকের ওপর মাথা ঝুলে পড়েছে—ঘাড়ে পিঠে কশাঘাতের দগদগে লাল দাগ।

—লেসট্রেড ব্রান্ডি দেখি। উৎপীড়নে আর ক্লান্তিতে সংজ্ঞা হারিয়েছেন মহিলা।

আমাদের চেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখ মেলে তাকালেন মিসেস স্টেপলটন প্রথমেই বললেন, স্যার হেনরী—উনি নিরাপদ তো।

—হ্যাঁ—

—আর হাউন্ড—

—নেই—মারা গেছে।

ভদ্রমহিলা যেন পরিপূর্ণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

—নরপিশাচ—দেখুন আমার কি অবস্থা করেছেন। দিনের পর দিন কেবল অত্যাচার উৎপীড়ন আর ধাপ্পা। ভালবাসা পেলাম না কখনো। তবু আশা নিয়ে বসে ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানলাম—লোকটার সব আশ্বাসই ধাপ্পা—তার কাছে আমি উদ্দেশ্য সিদ্ধির একটা টোপ মাত্র।

বলতে বলতে আকুল ভাবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

হোমস এগিয়ে এসে বলল, ম্যাডাম, মিথ্যা আশায় শয়তানের দুষ্কর্মের

সহযোগিতা যদি কখনো করে থাকেন—এই তার প্রায়শ্চিত্তের সময়। বলুন, কোথায় গেলে তাকে পাওয়া যাবে।

কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে মিসেস স্টেপলটন বললেন, এই সময়ে একটা জায়গাতেই সে যেতে পারে। জলায় মাঝ বরাবর পাঁকঘেরা একটা দ্বীপ আছে, সেই দ্বীপে একটা টিনের পুরনো খনি। হাউন্ডটাকে রাখত সেখানে। পালিয়ে সেখানেই গেছে সে।

জানালার ওপাশেই দুলছে সাদা কুয়াশার প্রাচীর। সেদিকে হাতের ল্যাম্প উঁচু করে ধরে হোমস বলল, দেখেছেন বাইরের অবস্থা। এ অবস্থায় রাতে গ্রিমপেনের পাঁকে কারুর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

—খুঁজে খুঁজে যেতে ঠিক পারবে—বলে উঠলেন মিসেস স্টেপলটন, কর্দম-ভূমির মাঝ দিয়ে পথ চিনে যাবার জন্য ও আর আমি সরু লম্বা কাঠি পুঁতে দিয়েছিলাম। তবে আজকের রাতে সেই কাঠিগুলো দেখতে পাবে না।

কুয়াশা সরে না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়, বুঝতে পারলাম। লেসট্রেডকে বাড়ি পাহারায় রেখে আমি আর হোমস স্যার হেনরীকে নিয়ে বাস্কারভিল হলে ফিরে এলাম।

অত্যধিক মানসিক চাপে স্নায়ু বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল ব্যারনেটের। শেষ রাতের দিকে প্রবল জ্বরের ঘোরে আবোল তাবোল বকতে লাগলেন। ডক্টর মার্টিমারকে খবর দেওয়া হল। তিনি এসে চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন।

সকাল হতেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। মিসেস স্টেপলটন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন—জলাভূমির মাঝে পাঁকে ঘেরা দ্বীপের দিকে।

বাদার দিক থেকে ক্রমশ সরু হয়ে একটা জমি নেমে গেছে কর্দম-রাজ্যের মধ্যে।

পচা উদ্ভিদে প্যাচপেচে শক্ত মাটি যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে কতগুলো সরু লম্বা কাঠি এদিক সেদিক সারি দিয়ে বসানো কাদার মধ্যে।

অর্থাৎ পচা আগাছা আর নোংরা দুর্গন্ধ পাঁকের মধ্য দিয়ে আমাদের এগুবার পথ।

চলতে গিয়ে বারবার উরু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে—পায়ের তলায় কেঁপে কেঁপে উঠছে কাদার স্তর। এ যেন এক জীবন্ত নরক-পথ। পা টেনে টেনে ধরছে এঁটেল কাদা—পচপচ শব্দে উঠছে দুর্গন্ধযুক্ত পচা গ্যাস।

সামনেই কাদার মধ্য থেকে তুলো ঘাসের একটা পটির গায়ে কালো মতন কি একটা ঠেকে রয়েছে। পথ থেকে সরে গিয়ে বস্তুটা ধরতে গিয়ে বিপদ ঘটালো হোমস।

কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল তার। সঙ্গে সঙ্গে আমরা টেনে না ধরলে নির্ঘাৎ তলিয়ে যেত। ওই অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে একটা পুরনো বুট জুতো তুলে আনল।

ভেতরের চামড়ায় ছাপ রয়েছে—মেয়ার্স টরোন্টো।

সামলে দাঁড়িয়ে হেসে ফেলল হোমস—এই সেই হারানো বুট—স্যার হেনরীর।

—এখানে এলো কি করে? পালানোর সময় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছেন মনে হচ্ছে?

—ধরেছ ঠিক। হাউন্ড লেলিয়ে দেবার জন্য শুঁকিয়েছিলেন এটা। সেই থেকে হাতেই ধরা ছিল—হয়তো পেছন পেছন এগুচ্ছিলেনও—কিন্তু গুলির শব্দ শোনার পর হাতে নিয়েই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটতে আরম্ভ করেন।

এ পর্যন্ত নিরাপদে এসেছিলেন বোঝা যাচ্ছে—এখানে এসে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

স্থির হয়ে দু'দণ্ড দাঁড়াবার উপায় নেই কোথাও। ভুর ভুর করে কাদা উঠছে—পা নেমে যাচ্ছে নিচে। এরই মধ্যে অবর্ণনীয় কষ্টে এক সময় কাদার রাজ্য পার হয়ে শক্ত জমিতে পা দিতে পারলাম আমরা।

কাদার ওপর পায়ের ছাপ মিলিয়ে যাচ্ছে দেখতে দেখতে। মিঃ স্টেপলটন কোন পথে কিভাবে এগিয়েছেন বুঝবার উপায় ছিল না।

কেবল পুরনো বুট জুতোর পাটিই সাক্ষ্য দিল তিনি এ পথে এসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত দ্বীপের ঘরে পৌঁছাতে পেরেছেন—একথা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আমরা।

কুয়াশা ঢাকা রাতে—গ্রিমপেনের এই বীভৎস কর্দমভূমিই হয়তো তাকে টেনে নিয়েছে মাটির তলায়। নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রী কুটিল মানুষটির চির সমাধি হয়তো ঘটেছে—এখানেই নিঃশব্দে।

বিস্তীর্ণ কর্দমভূমি বেষ্টিত দ্বীপে পা দিয়েই হিংস্র ভয়াবহ শ্বাপদটিকে লুকিয়ে রাখার অনেক চিহ্নই পাওয়া গেল।

প্রকাণ্ড একটা চাকাকল পড়ে রয়েছে মাটিতে। পাশেই আবর্জনায় বোঝাই একটা পাতাল-কূপ—পরিত্যক্ত টিনের খনির শেষ স্বাক্ষর।

খানিকটা তফাতে শ্রমিকদের ধ্বংসপ্রাপ্ত কুটিরের চিহ্ন।

একটা ভেঙ্গেপড়া কুটিরের দেয়ালে একটা আংটা দুমাথা গেঁথে বসানো। আংটা থেকে ঝুলছে একটা শেকল।

আশপাশে ছড়িয়ে রয়েছে চিবিয়ে গুঁড়ো করা কিছু হাড়। জানোয়ারটাকে বেঁধে রাখার জায়গা এটাই বোঝা গেল।

পাশেই জঞ্জালের মধ্যে পড়ে আছে একটা পশুর কংকাল। কংকালের গায়ে কয়েক গোছা বাদামী লোম এখনো লেগে রয়েছে।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে হোমস বলে উঠল—এ যে কোঁকড়া চুলের কুকুরের

কংকাল! স্প্যানিয়েলটা নিশ্চয়—ডক্টর মার্টিমারের হারিয়ে যাওয়া প্রিয় পোষা কুকুরটা। নাও, ফেরো এবারে—এখানে খুঁজে দেখবার আর কিছু নেই।

নোংরা গন্ধের জন্য দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল। একপাশে সরে এসে হোমস বলল, স্টেপলটন হাউন্ডটাকে এখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু জানোয়ারটার হাঁকডাক চেপে রাখতে পারেন নি। তাই রাত বিরেতে—দিন দুপুরে অমন রক্ত-হিম-করা ডাক শোনা যেত জলার বুকে।

চরম ঘটনা ঘটাবার আগে বাগানের আউট হাউসে সাবধানে নিয়ে গিয়ে তুলতেন। এই তো—এইতো সেই মলমের টিনের কৌটো—শেকল ছাড়বার আগে জন্তুটার গায়ে মুখে লেপ্টে লাগিয়ে দিতেন।

ফন্দিটা ভালই খেলিয়েছিলেন বলতে হবে। কল্পনার পিশাচ কুকুরকে জ্যান্ত অবস্থায় নামিয়ে এনেছিলেন। অমন মুখ চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুনো একটা প্রাণীকে অন্ধকারে চোখের সামনে দেখলে অতি বড় সাহসীরও দাঁতকপাটি লেগে যাবার কথা।

স্যার চার্লস দৌড়েছিলেন, দুর্ধর্ষ অমন খুনে কয়েদী সেলডন, সেও দৌড়েছিল—স্যার হেনরীও প্রাণ ভয়ে আর্তনাদ করে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন।

চাষীদের মধ্যে অনেকেই দেখে ফেলেছে প্রাণীটাকে—কিংবদন্তীর গুজবটা তাতে আরও পোক্ত হয়েছে—খোঁজখবর নেবার কথা কারুর মাথায় আসেনি।

হাউন্ডের ভয়ে ভয় পাইয়ে প্রমাণহীন ভাবে মানুষ খুন করবার নিখুঁত নিটোল পরিকল্পনা। ওয়াটসন, অমন ধুরন্ধর বন্ধুটি শেষপর্যন্ত এই জলার মাটিতেই কর্দম-শয়নে একাকী পড়ে রইলেন। তবে জয় আমাদেরই হল। রহস্যের তলা পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছি আমরা।

আভিশপ্ত বাস্কারভিল পরিবারের অভিশাপ, ভয় ও বিভীষিকা চিরতরে দূর হয়েছে।

স্যার হেনরী শারীরিক সুস্থতা ফিরে পেলেও মানসিক দিক থেকে বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ডক্টর মার্টিমারকে সঙ্গে নিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরুতে হয়েছিল তাকে।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে এখন তিনি সুস্থ দেহে ও সুস্থ মনে ফিরে এসে বাস্কারভিল হলেই বাস করছেন।

বাস্কারভিল কুকুর-রহস্যের অনেক ঘটনাই আমার জনার বাকি ছিল—যা ছিল

বন্ধুবর হোমসের নিজস্ব তদন্তের ফলাফল।

লন্ডনে ফিরে এসে একদিন প্রসঙ্গক্রমে তার মুখ থেকে সব শুনলাম।

হোমসের তদন্তের ফলাফল খুবই চমকপ্রদ নিঃসন্দেহে।

তার মুখের বিবরণই হুবহু তুলে দিচ্ছি এখানে।

হোমস বলেছিল—বাস্কারভিল পরিবারেরই একজন যে স্টেপলটন নামের ছদ্মপরিচয়ে ভয়ঙ্কর চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছে, গোড়ার দিকে তা ধরতে পারিনি।



ঘটনাগুলো আংশিকভাবে আমাদের গোচরে আসছিল। তাই খুবই জটিল বলে মনে হয়েছিল কেসটা। পরে মিসেস স্টেপলটনের সঙ্গে দুবার কথা বলার সুযোগ হয়েছিল আমার। তার পর সব কুয়াশাই কেটে গিয়েছিল সামনে থেকে।

পারিবারিক প্রতিকৃতি আমাকে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ করেছিল।

স্যার হেনরী বাস্কারভিল লন্ডন থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন কুখ্যাতি মাথায় নিয়ে। তিনি ছিলেন স্যার চার্লসের ছোট ভাই।

প্রবাসে গেলেও পরিবারের বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে একটা ভাবনা তার মাথায় নিশ্চয়ই ছিল। শোনা যায়, অবিবাহিত অবস্থায় তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় মারা যান।

আসল ঘটনা কিন্তু তা নয়—তিনি বিয়ে করেছিলেন—একটি ছেলেও হয়েছিল তার। স্টেপলটন পরিচয়ের লোকটিই সেই ছেলে—আসল নাম বাপের নামে।

কস্টারিকার বিখ্যাত সুন্দরী বেরিল গারসিয়াকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। বিয়ের পর অনেক টাকাকড়ি আত্মসাৎ করে বৌকে নিয়ে পালিয়ে চলে আসেন ইংলন্ডে। নাম পাল্টে তখন তিনি মিঃ ভ্যানভেলর।

ফেরার পথে ফ্রেজার নামে ক্ষয় রোগাক্রান্ত একজন প্রবীণ শিক্ষকের সঙ্গে তার আলাপ হয়। ভদ্রলোকের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ইয়র্কশায়ারের পূর্বে স্কুল ব্যবসায় নেমে পড়েন এবং যথেষ্ট উন্নতিও করেন।

কিন্তু সেই ফ্রেজার ভদ্রলোক মারা যাবার পরে ধীরে ধীরে স্কুল সুনাম হারিয়ে কুখ্যাতি অর্জন করে। শেষপর্যন্ত ভ্যানভেলর দম্পতি স্টেপলটন নতুন নাম নিয়ে স্কুলের সম্পত্তি পকেটস্থ করে পালিয়ে চলে আসেন দক্ষিণ ইংলন্ডে।

ভদ্রলোক বারবার নাম বদল করলেও একটা বিষয় পাল্টাতে পারেন নি। সেটা হল কীটবিদ্যার সখ। এই সূত্র ধরেই ব্রিটিশ মিউজিয়ামে খোঁজখবর নেই। জানতে পারি—এক্ষেত্রে তিনি একজন স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ।

ইয়র্কশায়ারে থাকার সময়েই বিশেষ একটা মথ পোকাকে তিনি বিজ্ঞানের গবেষণার আওতায় আনেন। পরে পাকাপাকি ভাবে ভ্যানডেলর নামকরণ হয়েছে পোকাটার।

অভিশপ্ত বাস্কারভিল পরিবারের ভূসম্পত্তির খোঁজখবর যে তিনি রাখতেন তাতে সন্দেহ নেই।

তিনি ইতিমধ্যেই সন্ধান নিয়ে জেনেছিলেন বিশাল এই জমিদারির মালিক হওয়ার অন্তরায় দুটি ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গে একটা পরিকল্পনা মাথায় ছকে নিয়ে, স্যার চার্লস বাস্কারভিল হলে অবসর জীবন যাপন করতে আসার কিছুদিন পরেই ডেভনশায়ারে উপস্থিত হন।

জমিদারিটাই ছিল তার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে কোন ঝুঁকি নিতেই তিনি মনে মনে প্রস্তুত ছিলেন।

স্ত্রীকেও যন্ত্র হিসাবে কাজে লাগানোর নিখুঁত একটা পরিকল্পনা করে নিয়েছিলেন। এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টির জন্য পূর্বপুরুষদের ভিটের কাছাকাছিই আস্তানা নিলেন ভদ্রলোক। স্ত্রীর পরিচয় দিলেন বোন বলে।

নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে কিছুদিন মেলামেশার পরে স্যার চার্লসই তাকে পারিবারিক অভিশাপ পিশাচ-হাউন্ডের গল্প শোনান।

এই ঘটনা শোনবার পরই উর্বর মস্তিষ্ক স্টেপলটন পাকাপাকি ভাবে একটা পরিকল্পনা ছকে ফেলেন। কিংবদন্তীর হাউন্ডকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা

নিলেন।

লন্ডনের ফুলহ্যাম রোডের রস অ্যান্ড ম্যাঙ্গলস-এর দোকান থেকে সবচাইতে শক্তিমান ও হিংস্র কুকুরটাকে নিয়ে যান তিনি। খুবই গোপনে প্রাণীটাকে বাড়িতে এনে তুলেছিলেন—কাক-পক্ষীতেও কুকুরের কথা জানতে পারে নি।

অথবা এও হতে পারে—একটা হাউন্ড আমদানীর প্ল্যানটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই আগে থেকেই গ্রিমপেন কর্দম-ভূমির মাঝে কুকুরের জন্য একটা নিরাপদ আস্তানার সন্ধান বার করে ফেলেছিলেন।

কীটপতঙ্গ খুঁজতে দিন দুপুরে ঘুরে বেড়াতেন জলাভূমিতে।

কর্দমবেষ্টিত নিরালা দুর্গম দ্বীপটাকে তাই কুকুরশালা বানিয়ে সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলেন।

স্যার চার্লস প্রচলিত কিংবদন্তীটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই কোন অবস্থাতেই রাত্রে বাড়ির বাইরে বেরুতেন না।

কয়েকজন চাষী হাউন্ডটাকে দেখেছিল। তাতে মনে হয় তিনি সেটাকে নিয়ে বেশ কয়েকবার সুযোগের সন্ধানে টহল দিয়েছিলেন। এতে তারই লাভ হয়েছিল—কিংবদন্তী যে নিছক কুসংস্কার নয়—আগাগোড়া সত্যি—মুখে মুখে তা প্রচার হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু স্যার চার্লসকে রাত্রে বাড়ির বাইরে ধরতে পাচ্ছেন না—খুবই অসুবিধায় পড়ে গেলেন স্টেপলটন।

ঠিক করলেন, এ ব্যাপারে স্ত্রীকে কাজে লাগাবেন। তিনি কোন এক সময় ভুলিয়ে ভালিয়ে বৃদ্ধকে কাছে এনে দেবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্ত্রী এ কাজে বেঁকে বসলেন।

একজন নিরপরাধ বৃদ্ধকে মৃত্যুর মুখে টেনে আনতে বিবেকের পীড়া বোধ করলেন ভদ্রমহিলা। ফলে ভাগ্যে ঘটল নিদারুণ নির্যাতন। কিন্তু নিঃশব্দে সবই সহ্য করলেন তিনি।

শয়তানের সুযোগ শয়তানই হাজির করে। স্ত্রীর দিক থেকে সহযোগিতা না আসার ফলে একটা বিকল্প সুযোগের সন্ধানে ছিলেন স্টেপলটন।

একসময়, স্যার চার্লসের মাধ্যমেই সেই যুযোগ উপস্থিত হল।

স্যার চার্লস দানধ্যান করতেন গোপনে—নাম প্রচার না করে। দুর্ভাগিনী মিসেস লরা লায়ন্সকেও সাহায্য পাঠাতেন স্টেপলটনেরই হাত দিয়ে।

এই সুযোগটা কাজে লাগালেন তিনি। নিজেকে অবিবাহিত পরিচয় দিয়ে ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হলেন এবং এক সময় কথা দিলেন, মিসেস লায়ন্স যদি স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারেন তাহলে তাকে বিয়ে করবেন। ভদ্রমহিলা একেবারে কব্জায় এসে গেল তার।

ইতিমধ্যে ডক্টর মার্টিমারের পরামর্শে স্যার চার্লস লন্ডন গিয়ে কিছুদিন থাকবেন স্থির করলেন। স্টেপলটনও পরামর্শদাতাদের মধ্যে একজন ছিলেন—তবে সেটা ছিল তার ভান। তাই শিকার নাগালের বাইরে যাওয়ার আগেই কাজ সারতে উদ্যোগী হলেন।

চাপ দিয়ে মিসেস লায়ন্সকে দিয়ে চিঠি লেখালেন। লন্ডন রওনা হবার আগের রাত্রে দেখা করার জন্য কাকুতি মিনতি করে চিঠি গেল। কিন্তু পরে আবার নানা রকম যুক্তি দিয়ে রাতে ভদ্রমহিলার যাওয়া বন্ধ করলেন।

এবারে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত সুযোগ এসে গেল। পরিকল্পনা মাফিক সব ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখা ছিল। কুকুরশালায় গিয়ে ফসফরাস মেশানো নির্গন্ধ মলম লাগালেন সেটার গায়ে।

তারপর কুকুরটাকে নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন ফটকের গায়ে। মিসেস লায়ন্সের জন্য এখানেই দাঁড়াবার কথা বৃদ্ধের। সরল হৃদয় স্যার চার্লস এখানেই তাড়া খেলেন হাউন্ডের।

সেটা তখন কেবল একটা হাউন্ড নয়—লেলিহান আগুনঘেরা চোয়াল—লকলকে আগুন ঠিকরনো চোখ নাক সমেত এক ভয়াবহ ভৌতিক মূর্তি।

এমন একটা ভয়াবহ নারকীয় প্রাণীর তাড়া খেয়ে আর্তস্বরে ইউ-বীথি ধরে পালাতে লাগলেন বৃদ্ধ। কিন্তু দুর্বল হৃদযন্ত্র আর আতঙ্ক নিয়ে বেশিদূর যেতে পারলেন না—প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

তাড়া খেয়ে স্যার চার্লস দৌঁড়েছিলেন ইউ-বীথির রাস্তা বরাবর—হাউন্ড দৌঁড়েছিল রাস্তার ধারের ঘাসের পটি বরাবর। তাই বৃষ্টিভেজা মাটিতেও স্যার চার্লসের পায়ের ছাপ ছাড়া অন্য কোন ছাপ পাওয়া যায়নি।

হাউন্ড মড়া ছোঁয় না। তাই প্রাণহীন স্যার চার্লসের দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। নিশ্চয় হুমড়ি খেয়ে পড়া শরীরটার কাছে এগিয়ে গিয়েছিল—দেহে প্রাণ নেই বুঝতে পেরে ফিরে আসে।

এই সময় পথের ওপর হাউন্ডের যে পায়ের ছাপ পড়ে তাই চোখে পড়েছিল ডক্টর মার্টিমারের।

নির্বিঘ্নে কার্য সিদ্ধি করে কুকুর নিয়ে ফিরে যান স্টেপলটন। আর এই রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল গোটা তল্লাটে। রহস্যের কিনারা করতে না পেরে স্থানীয় পুলিশ চোখে অন্ধকার দেখলেন।

এখান থেকেই কেসটা এল আমাদের হাতে।

স্যার বাস্কারভিলের মৃত্যুটা এমন নিখুঁত ভাবে ঘটানো হয়েছে যে খুনীর বিরুদ্ধে কোন কেসই দাঁড় করানো সম্ভব নয়। তিনি জানতেন মিসেস লায়ন্স

কখনোই তাকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করবে না। সেদিক থেকে তাই নিশ্চিন্ত ছিলেন তিনি।

চিঠি এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট সংক্রান্ত ব্যাপারটা একমাত্র মিসেস লায়ন্সই জানতেন।

হাউন্ডের খবর উনি জানতেন না। তাই বৃদ্ধের মৃত্যুসংবাদ জানবার পরেও স্টেপলটনের ওপর সন্দেহ দানা বাঁধতে পারেনি।

স্ত্রীর সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত ছিলেন স্টেপলটন। বৃদ্ধকে ঘিরে তার ষড়যন্ত্রের কথা মিসেস জানতেন, হাউন্ডের অস্তিত্বও অজানা ছিল না তার, কিন্তু চিঠি ইত্যাদির কোন বিষয়ই তিনি জানতেন না।

নানা কৌশলে এই দুই মহিলাকেই কব্জা করে রেখেছিলেন স্টেপলটন এবং জানতেন তাদের দিক থেকে কোন আশঙ্কার কারণ নেই।

বাস্কারভিল জমিদারীর একজন উত্তরাধিকারী কানাডায় রয়েছেন সে খবর স্টেপলটন জানতেন কিনা তা বোঝা যায় না। তবে খবরটা তিনি পেয়েছিলেন ডক্টর মার্টিমারের কাছ থেকে। তাই তরুণ আগন্তুককে লন্ডনেই শেষ করে দেবার মতলব ছিল তার।

সেই উদ্দেশ্যেই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে লন্ডনে এসে উঠেছিলেন। কাজের সহযোগী না হওয়ায় স্ত্রীকে বিশ্বাস করতে পারতেন না। তাই তাকে কাছছাড়া করতে ভরসা পেতেন না। লন্ডনে হয়তো সেই কারণেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন।

স্টেপলটন দম্পতি উঠেছিলেন ক্র্যাভেন স্ট্রীটের মেক্সবরো প্রাইভেট হোটেলে। আমার বিশ্বস্ত চর এ হোটেলে খবর নিয়ে জেনেছিল, হোটেলের ঘরে স্ত্রীকে আটকে রেখে গালে দাড়ি লাগিয়ে ছদ্মবেশে ডক্টর মার্টিমারকে অনুসরণ করে বেকার স্ট্রীটে গিয়েছিলেন। পরে স্টেশনে ফিরে এসে আবার নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে গিয়েছিলেন।

স্বামীর বদমতলবের কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন ভদ্রমহিলা—নরদামবারল্যান্ড হোটেলের নামটাও নিশ্চয় স্বামীর মুখ থেকেই শুনেছিলেন।

কিন্তু বিপদাপন্ন মানুষটিকে সতর্ক করে দেবার সাহস ছিল না। তবুও তিনি চেষ্টা করেছিলেন, খবরের কাগজ থেকে শব্দ কেটে নিয়ে স্বামীর অগোচরে স্যার হেনরীকে আসন্ন বিপদের হুঁশিয়ারি পাঠিয়েছিলেন।

লন্ডনে বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে স্টেপলটন কর্মক্ষেত্র ডার্টমুরে পিছিয়ে নিতে বাধ্য হন।

শেষ পর্যন্ত কুকুরটাকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই তিনি হোটেল থেকে কোন পরিচারিকাকে হাত ধরে একপাটি বুট সরিয়ে ফেলেন।

ভদ্রলোকের কাজের ক্ষিপ্রতা এবং সাহস সত্যই প্রশংসা করবার মত। এতটুকু

সময় অযথা নষ্ট হতে দেন নি।

প্রথমের বুট জুতোটা ছিল আনকোরা—হাউন্ডকে গন্ধ শুঁকিয়ে পেছনে লেলিয়ে দেবার উপযুক্ত ছিল না।

তাই নতুন পাটি ফেরত দিয়ে পুরনো বুট জুতো হস্তগত করলেন।

হাউন্ড সংক্রান্ত পটভূমি এবং পুরনো বুট জুতো অপহরণ—দুটি ঘটনার যোগাযোগই আমাকে সঠিক সূত্রের সন্ধান দেয়।



স্পষ্টই বুঝতে পারলাম—লড়াইটা হবে আমাদের কিংবদন্তীর পিশাচ হাউন্ড নয়—আসল হাউন্ডের সঙ্গে। এছাড়া দুরকম বুট চুরির ঘটনার অন্য কোন ব্যাখ্যা হয় না।

সকালে যেদিন ডক্টর মার্টিমারের সঙ্গে স্যার হেনরী আমাদের এখানে আসেন—পেছনে ছায়ার মত লেগে ছিলেন গাড়ি নিয়ে স্টেপলটন।

এই বাড়ির হদিস তিনি জানতেন, কোচওয়ানের কথা থেকে তা জানতে পাবি। এ থেকেই বুঝতে পারি—আগেও কুকীর্তি কিছু কম করেন নি তিনি।

গত তিন বছরে পশ্চিম ইংলন্ডে চারটে বড় রকমের চুরির ঘটনা ঘটে—যার কিনারা পুলিশ এখনো করতে পারেনি। আমার বিশ্বাস—চুরিগুলি স্টেপলটনেরই কীর্তি—টাকার অভাব তিনি এভাবে পূরণ করেছেন।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমারই কিছুটা তাৎক্ষণিক বুদ্ধির ভুলে আমাদের হাত ফস্কে পালাতে পেরেছিলেন। এবং গাড়োয়ানোর হাতে উদ্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে

দিয়ে গিয়েছিলেন।

কেসটা আমি গ্রহণ করেছি বুঝতে পেরে লন্ডনে আর অপেক্ষা করেন নি—ডার্টমুরে ফিরে গিয়ে ওৎ পেতে রইলেন।

হোমসের দেওয়া পর পর ঘটনার বিবরণ মনোযোগ সহকারে শুনছিলাম। এতটা শুনবার পর একটা প্রশ্ন জাগল মনে।

জিজ্ঞেস করলাম—ভদ্রলোক লন্ডনে গিয়ে কয়েকদিন কাটালেন—এই সময়ে তার গোপন আস্তানায় হাউন্ডের দেখাশোনা তাহলে কে করত?

স্মিত হেসে হোমস বলল, প্রশ্নটা যথার্থই প্রাসঙ্গিক—এবং এ পর্যন্ত আমি অনুল্লেখ রেখেছি। সন্দেহ নেই যে, স্টেপলটনের একজন সহযোগী ছিল। একার পক্ষে সবদিক সামলান একটা মাত্র মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

কাজের সুবিধার জন্য যতটা জানানো নিরাপদ নিশ্চয় ততটুকু জানিয়েছিলেন এই সহযোগীকে। আমার বিশ্বাস মেরিপিট হাউসের অ্যান্টনি নামের বৃদ্ধ ভৃত্যটিই এই দোসর।

আমি খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছি—স্কুল জীবন থেকেই অ্যান্টনি রয়েছে তার সঙ্গে। মনিব দম্পতির সম্পর্কটা সে ভাল ভাবেই জানত।

কাজেই স্ত্রীকে বোন বলে পরিচিত করাবার আগে, তাকে মতলবের কিছুটা আঁচ অবশ্যই দিতে হয়েছিল।

গ্রিমপেন কর্দমভূমির মাঝখান দিয়ে চলবার জন্য কাঠি বসিয়ে যে গোপন চিহ্ন রেখেছিলেন স্টেপলটন, আমি একদিন বুড়োকে সেই রাস্তায় ভেতরে যেতে দেখেছি।

হাউন্ডকে নিয়ে মনিবের সঠিক উদ্দেশ্য হয়তো সে জানত না—কিন্তু মনিবের অনুপস্থিতিতে হাউন্ডটার দেখাশোনা সেই করত। এখন সে পলাতক। দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

যথারীতি স্টেপলটন ডেভনশায়ারে ফিরে গেলেন—পরে পরে স্যার হেনরীকে নিয়ে তুমিও পৌঁছালে বাস্কারভিল হলে। আর এই সময়টা আমি মেতে রইলাম গোপন তদন্তে। এবারে সেই পর্ব শোন।

ছাপা শব্দ সাঁটা যে চিঠিটা প্রথম সতর্কবার্তা বহন করে এনেছিল—সেটার গায়ে আমি হাল্কা একটা সুগন্ধ পেয়েছিলাম যুঁই ফুলের।

অপরাধ বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিভিন্ন সেন্টের গন্ধ আলাদা ভাবে চিনবার ক্ষমতা আমি বিশেষ চেষ্টায় আয়ত্ব করেছি। অপরাধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অসাধারণ কাজে আসে এই ক্ষমতা।

বাজারে পঁচাত্তর রকমের সেন্ট আছে—তার প্রত্যেকটার গন্ধ আলাদাভাবে আমি চিনতে পারি। চিঠির কাগজের গায়ের গন্ধ থেকেই বুঝতে

পেরেছিলাম—একজন মহিলাও এ কেসে জড়িয়ে আছেন।

তখন থেকেই স্যার হেনরীর প্রতিবেশীদের মধ্যে স্টেপলটনদের ঘিরে ছিল আমার চিন্তা ও চোখ।

হাউন্ড সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলাম—আগেই বলেছি। পশ্চিম ইংলন্ড রওনা হবার আগেই অপরাধী নির্ণয় করা হয়ে গিয়েছিল আমার। তাই সকলের চোখের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকলেও সতর্ক নজর রইল স্টেপলটনের ওপর। আমার উপস্থিতি টের পেলে সাবধান হয়ে যেত।

বেশির ভাগ সময়টাই থাকতাম কুমবেট্রেসিতে। দরকার মত পাহাড়ের পাথরের ঘরে চলে আসতাম। নির্ভেজাল গ্রাম্য বালকের ছদ্মবেশে কার্টরাইট অনেক সহযোগিতা করেছে আমাকে। তোমার খবরাখবরও সেই জানাত। তোমার পাঠানো রিপোর্টগুলো একদিন অন্তর কুমবেট্রেসির ঠিকানায় পেয়ে যেতাম। ফলে স্টেপলটন সম্পর্কে ধারণা আমার স্পষ্ট হয়ে গেল এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটাও আর গোপন রইল না।

জলার কুটিরে তোমার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হল, তখন আমার দিক থেকে চেষ্টা চলছে প্রমাণ সংগ্রহের।

স্যার হেনরীকে মারতে গিয়ে কয়েদী ডানহিলের মৃত্যু ঘটানোর পরও স্টেপলটনকে জড়ানোর মত কোন প্রমাণ পেলাম না। মুখোমুখি নামবার সিদ্ধান্ত তখনই নিতে হল।

স্যার হেনরীকে নৈশভোজের নিমন্ত্রণে একা পাঠাবার ব্যবস্থা করে ফাঁদ পাততে হল। ফাঁদে শিকার ধরা পড়ল—কিন্তু তার জন্য বড় বেদনাদায়ক মূল্য দিতে হল।

এমন একটা দানবীয় প্রাণী যে স্টেপলটন লেলিয়ে দেবে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। এ কেসে সাফল্যের কথা মনে হলেই স্যার হেনরীর প্রতি কৃত ব্যবহারের জন্য কাতর হয়ে পড়ি।

তাঁর স্নায়ুর ওপরে অবশ্য সব চেয়ে বেশি চাপ পড়েছে মিসেস স্টেপলটনের ব্যাপারে। ভদ্রমহিলাকে উনি আন্তরিক ভাবে ভালবেসে ফেলেছিলেন। তাই তার প্রতারণা বড় হয়ে বেজেছে তার বুকে।

ভদ্রমহিলাকে অবশ্য নিরুপায় হয়েই এই অভিনয় করতে হয়েছিল। স্বামীর প্রভাব—সেটা নিজের দিক থেকে ভালবাসারও হতে পারে, ভয়েরও হতে পারে—সহজে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

স্টেপলটন সেকারণে নিশ্চিন্তই ছিলেন। কিন্তু চিনতে ভুল করেছিলেন তিনি স্ত্রীকে। স্পেনীয় রক্ত যার ধমনীতে বইছে, সহজে সে অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে কি করে।

খুনের ব্যাপারে স্টেপলটনের সঙ্গে তিনি হাত মেলান নি। স্বামীকে বিপন্ন না করে তিনি গোড়া থেকেই বারবার সাবধান করে দিতে চেষ্টা করেছেন স্যার হেনরীকে।

নিজের পরিকল্পনা মতই স্টেপলটন স্ত্রীকে স্যার হেনরীর কাছাকাছি এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুজনকে পরস্পর আকৃষ্ট হতে দেখে আবার ঈর্ষায় ফেটে পড়েছিলেন।

সেই সুযোগেই তার ভেতরের ভীষণ প্রকৃতি সংযমের মুখোশ ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই পরে সংযত হন এবং দুজনের ঘনিষ্ঠতাকে প্রশ্রয় দেন।

তার উদ্দেশ্য ছিল, মেরিপিট হাউসে ঘন ঘন যাতায়াত ঘটুক স্যার হেনরীর। তারপর সুযোগ মত তিনি উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবেন।

কিন্তু চরম ঘটনার সেই দিনটিতে ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। কয়েদীর মৃত্যুর আগে হাউণ্ডটাকে আউট হাউসে এনে রাখা হয়েছিল। কয়েদীর মৃত্যু কিভাবে হয়েছিল তা তিনি জেনেছিলেন।

স্যার হেনরী যে রাত্রে ডিনার খেতে এলেন সেই সময়ও হাউন্ডকে আউট হাউসে রাখা হয়েছিল। উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

স্টেপলটন প্রমাদ গুণলেন। তাই স্যার হেনরীকে যাতে কোন ভাবে সাবধান করতে না পারেন সেজন্য ওপরের শোবার ঘরে বেঁধে রাখলেন স্ত্রীকে।

মনে হয় মারধোর করবার সময় স্টেপলটন স্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা বলেও ফেলেছিলেন তাকে। ফলে ভদ্রমহিলার অন্তরের ভালবাসা পর্যবসিত হয়েছিল অপরিসীম ঘৃণায়।

স্বামীর প্রতি এই ঘৃণাই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কর্দমভূমির দ্বীপের দিকে।

এই একটি জায়গাতেই হিসেবে ভুল করে ফেলেছিলেন স্টেপলটন। স্যার হেনরীর মৃত্যুটাকে নিরাপদে পিশাচ-হাউন্ডের কাঁধে চাপাতে সক্ষম হলেও এই ভুলই তাকে শেষ পর্যন্ত নরকে পাঠিয়ে ছাড়ত।

স্যার হেনরীকে সরাতে পারলেই সম্পত্তি দখলের সব বাধা অপসারিত হত স্টেপলটনের। তার পর কিভাবে দাবী আদায় করবেন সে পথও নিশ্চয় ভাল ভাবে ভেবে রেখেছিলেন।

ভবিষ্যতের পথ নিষ্কন্টক না করে তার মত বুদ্ধিমান মানুষ জীবন-মৃত্যুর এমন খেলায় মরিয়া হয়ে নামতেন না।

ভায়া ওয়াটসন, আমার বিবরণের সঙ্গে এবার ঠাণ্ডামাথায় ঘটনাগুলো মিলিয়ে নাও।

অ্যাডভেঞ্চার্স অব শার্লক হোমস



এ স্ক্যান্ডাল ইন বোহেমিয়া

মেয়েদের সম্পর্কে ব্যঙ্গবিদ্রূপের অভ্যাসটা শেষপর্যন্ত ছাড়তে হল হোমসকে।

ঘড়ির কাঁটার মত সংযত হিসেবী মন আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মানুষটা—যাঁর কাছে কিনা আবেগ আর ভাবালুতা বিভ্রান্তিকর দুর্বলতা ছাড়া কিছু নয়—সেই মানুষ শেষ পর্যন্ত পঞ্চমুখ প্রশংসায় আইরিন অ্যাডলারকে মহিলা পদবাচ্য শ্রেষ্ঠ স্ত্রীলোক বলে স্বীকার করতে বাধ্য হল।

বিয়ের পর থেকে আমার শার্লক হোমসের তদন্তকার্য পর্যবেক্ষণের সুযোগ আর তেমন ছিল না। আলাদা বাসাবাড়ি নিয়ে সংসার গুছিয়ে বসেছি। নতুন করে ডাক্তারীও শুরু করতে হয়েছে। কাজেই যোগাযোগটা আর আগের মত ছিল না।

আর হোমস, তার তো সামাজিকতার বালাই নেই! বেকার স্ট্রীটের আস্তানার রাশিরাশি বই, গোয়েন্দাগিরি আর কোকেনের নেশা—এই নিয়েই তার জগৎ। বাইরের কিছুর ধার সে ধারে না।

মার্চের শেষাশেষি। রাত্রে রুগী দেখে বেকার স্ট্রীট ধরে বাড়ি ফিরছি। এমন সময় চোখ পড়ল পুরনো আস্তানার ওপরের ঘরে। পর্দার গায়ে রোগা লম্বা

শরীরের ছায়া দেখে বুঝতে পারলাম—বন্ধুবর দু'হাত পেছনে রেখে মাথা ঝুঁকিয়ে পায়চারী করে চলেছে। বিশেষ ওই ভঙ্গী আমার পরিচিত—সমস্যার জট ছাড়াচ্ছে।

ওপরের ঘরে উঠে এলাম। দেখে খুশি হল। চুরুটের বাক্স এগিয়ে দিয়ে বসতে ইঙ্গিত করে, তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

এতদিন পরে দেখা—কিন্তু কোন উচ্ছ্বাস নেই। খানিক পরে মৃদু হেসে বলে উঠল—বিয়ে করে সুখী হয়েছ বোঝা যাচ্ছে—সাড়ে সাত পাউন্ডের মত ওজন বাড়িয়েছ।

—তা বেড়েছে—সাত পাউন্ড মত।

—ডাক্তারিও শুরু করেছ।

—জীবিকা, করতেই হবে। অতি সাধারণ ব্যাপার।

—সম্প্রতি ভিজেছ খুব বৃষ্টিতে? উটকো আপদ অকম্মার ধাড়ি ঝিও দেখছি জুটেছে একটা বাড়িতে।

হোমসের প্রচ্ছন্ন অহমিকার এই হল স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। প্রথমেই নিজের ক্ষমতা প্রকাশের চিরাচরিত অভ্যাস।

খুশি হয়ে বললাম, সেকাল হলে অন্ততঃ কয়েকশবার এর মধ্যে তোমাকে পুড়িয়ে মারা হত—ডাইনী অভিযোগে। দেখামাত্র হুবহু সব বলতে শুরু করলে! গত বেস্পতিবার গাঁয়ে যেতে হয়েছিল হেঁটে—ফিরেছিও অতি কষ্টে। কিন্তু কাদামাখা জামাকাপড় তো পাল্টানো হয়েছে, কি দেখে বললে বলতো? অকম্মা ঝিটাকেও অবশ্য বিদেয় করেছে স্ত্রী।

মৃদু হাসল হোমস, বলল তোমার বাঁ পায়ের জুতোয় পাশাপাশি দুটো আঁচড়ের দাগই যথেষ্ট প্রমাণ। বাদলার দিনে রাস্তায় বেরিয়ে কাদা লাগিয়েছিলে, আনাড়ি হাতে কাজের ঝি কাদা সাফ করতে গিয়ে দাগ ফেলেছিল।

আর, তোমার গায়ে আয়োডোফর্মের গন্ধ ভুর ভুর করছে, সিলভার নাইট্রেটের কালচে দাগও পড়েছে ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলে—তাছাড়া মাথার টুপির উচ্চতাও প্রমাণ করে—ওটা স্টেথস্কোপ রাখার জন্যই করা হয়েছে। এইতো হিসেব।

বলতে বলতে চেয়ারে বসে চুরুট ধরালো।

হেসে বললাম—তোমার মুখের বিশ্লেষণ শুনলে মনে হয়—খুবই সহজ। আমারই বলা উচিত ছিল।

—ভায়া গোলমালটা তো সেখানেই। তুমি কেবল দেখ—আমি পর্যবেক্ষণ করি—খুঁটিয়ে দেখি। আচ্ছা, এই ঘরে ওঠার সিঁড়ি তো অনেক দিন দেখছো। কটা ধাপ আছে বলতে পার?

—সেভাবে তো আমি দেখিনি কখনো।

—তোমার সঙ্গে তফাতটা আমার এখানেই। সতেরটা ধাপ আছে সিঁড়িতে। য়া দেখবে ঠাহর করে দেখবে। তাহলে, এই যে আমাকে নিয়ে তুমি লেখালেখি করছ সেটাও বাস্তবসম্মত হবে। একটা জিনিস দেখাচ্ছি তোমাকে—জোরে পড়।

টেবিলের ওপর থেকে একটা গোলাপী চিঠি এগিয়ে দিল আমার দিকে।

বেশ পুরু দামী কাগজ—কিন্তু সম্বোধন তারিখ সই ঠিকানা কিছুই নেই। চিঠিটা পড়লাম ঃ একটা অত্যন্ত গোলমেলে ব্যাপারে পরামর্শের জন্য আজ পৌনে আটটায় মুখোশপরা এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করবেন, ঘরে থাকবেন।

বললাম, রহস্যের ইঙ্গিত রয়েছে—তবে দামী কাগজ দেখে বোঝা যাচ্ছে উঁচু রুচির অবস্থাপন্ন কারুর লেখা।

—ঠিকই ধরেছ—ইংল্যান্ডে এ কাগজ পাওয়া যায় না। এবারে কাগজটা আলোর সামনে ধর।

চিঠিটা আলোর সামনে ধরে জলছাপটা স্পষ্ট দেখা গেল—GE. P. GT.

হোমস বলল, শোন তাহলে বলছি—জি-এর সঙ্গে টি মানে হল গেসেল শাফট। জার্মান শব্দ— কোম্পানির সংক্ষিপ্ত রূপ সি-এর পাশে ও বসিয়ে যেভাবে লিখি এ হলো তাই। পি মানে পেপার।

বলতে বলতে কন্টিনেন্টাল গেজেটিআর টেনে নিয়ে পাতা উল্টে বলতে লাগল—এই তো—ইগ্রো, ইগ্রোনিৎস, ইগ্রিয়া—এই হল বোহেমিয়া—ভাষা জার্মান। কাচ আর কাগজের জন্য জায়গাটা বিখ্যাত।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে—কাগজটা বোহেমিয়ার তৈরি। আর জার্মানরাই বাক্যের শেষে ক্রিয়া বসায়। পত্র লেখার ধরন থেকেই বোঝা যাচ্ছে—জার্মান মেড কাগজে চিঠিটা লিখেছেন একজন জার্মান। এই তো—এসে গেছেন ভদ্রলোক।

বলতে না বলতেই গাড়ির চাকার শব্দ কানে এল এবং দোরগোড়ায় ঘণ্টাধ্বনি।

—দু'ঘোড়ায় টানা ব্রুহাম মনে হচ্ছে—বলে জানলা দিয়ে উঁকি দিল, হ্যাঁ, ঠিক ধরেছি—জব্বর দামী ঘোড়া হে ডাক্তার—এ কেস পয়সা দেবে। বসো—কেসটা শোন।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ধীর স্থির ভারিক্কি চালের পদশব্দ সিঁড়ি থেকে দরজার সামনে এসে থামল। পরক্ষণেই বেশ জোরে আঙুলের গাঁট ঠোকার ভারিক্কি আওয়াজ হল দরজায়।

হোমসের সাদর আহ্বানে ঘরে ঢুকলেন দীর্ঘকায় সুপুরুষ চেহারার এক মূর্তি। পরনে দামী এবং মাত্রাতিরিক্ত জমকালো পোশাক। মাথায় টুপি—মুখের আধখানা কালো মুখোশে ঢাকা। মুখের নিচের অংশে সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের ছাপ। মোটা ঠোঁট ও থুৎনিতে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব।

—একটা চিঠি পাঠিয়েছিলাম। বলে পর্যায়ক্রমে আমাদের দু'জনের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন ভদ্রলোক।

হোমস আসন দেখিয়ে বলল, বসুন—ইনি আমার বন্ধু এবং সহযোগী ডক্টর ওয়াটসন। কিন্তু—

—আমার নাম কাউন্ট ফন্ ক্র্যাম—বোহেমিয়ার বনেদী মানুষ আমি—আলোচনাটা গোপনীয়। কোন ভাবে অন্ততঃ বছর দুয়েকের আগে ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়লে ইউরোপের ইতিহাস অন্যরকম দাঁড়াতে পারে।

আমি উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলাম, হোমস কাঁধ চেপে বসিয়ে বলল, যা বলবার দুজনের সামনেই বলুন। শঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই।

—আমার পরিচয় গোপন করবার জন্যই মুখোশ পড়তে হয়েছে। একই কারণে আসল নামও বলতে পারিনি আপনাকে।

হোমস বলল—জানি।

—বোহেমিয়ার আর্মস্টাইন রাজবংশের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যেই যত সাবধানতা।

—তাও জানি। তবে মহারাজ যদি মন খোলসা করে সব কথা আমাকে বলেন আমার দিক থেকে পরামর্শ দিতে সুবিধা হয়।

হোমসের একথার পর অদ্ভুত কাণ্ড করলেন বিশাল দেহী আগন্তুক। সড়াৎ করে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে।

তারপর মুখ থেকে মুখোশটা টেনে ছুঁড়ে ফেলে বললেন, হ্যাঁ, আমিই রাজা—প্রাহা থেকে এই ছদ্মবেশ ধরে আছি। আর দরকার আছে মনে করি না।

—এবারে দয়া করে শুরু করুন মহামান্য গ্র্যান্ড ডিউক।

—অভিনেত্রী আইরিন অ্যাডলারের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?

নামী ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লিখে রাখত হোমস একটা খাতায়। অভিনেত্রীর নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ইশারায় খাতাটা ওলটাতে বলল।

একজন ইহুদি প্রোফেসার আর মিলিটারি অফিসারের নামের মধ্যে পাওয়া গেল আইরিন অ্যাডলারের নাম। হোমস খাতাটা টেনে নিয়ে বলল—হুঁ—এইতো—জন্ম নিউজার্সিতে ১৮৫৮ সালে। ইম্পিরিয়াল ভার্সেই রঙ্গমঞ্চের প্রধান গায়িকা। বর্তমানে থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে লন্ডনে আছেন। বছর পাঁচেক আগে ভার্সেই শহরে এর সঙ্গে আমার আলাপ হয়।

—ব্যাপারটা বোঝা গেল। চিঠিপত্র যা লিখেছিলেন এঁকে—এখন সব ফেরত চান এইতো?

—হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন আপনি।

—তাহলে কয়েকটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করবার আছে। ব্যাপারটা বিয়ে

পর্যন্ত গড়িয়েছিল কি?

—না—না—

—দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এমন কিছু বা কোন প্রশংসাপত্র কি তার কাছে আছে?

—কিছুই না।

—তাহলে আর চিঠির জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? হাতের লেখা জাল করে অমন অজস্র চিঠি তৈরি করা যায়।

—কিন্তু সিলমোহর, প্যাডের কাগজ, সবই যে আমার।

—দোষ কি। ওসব চুরি করে বা নকল করে কাজ হাসিল করা যায়।

—দুজনের একটা যুগল ছবি ওর কাছে আছে।

—সর্বনাশ! খুবই ছেলেমানুষী কাজ হয়ে গেছে।

—তখন আমি যুবরাজ—কাঁচা বয়স—অত শত মাথায় আসেনি। বুঝতে পেরে ফটোটা নানাভাবে সরাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি।

—ছবি নিয়ে কি করতে চান উনি?

—স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজকন্যার সঙ্গে শিগগিরই বিয়ে হবে আমার। সেখানে পাঠিয়ে আইরিন বিয়ে ভাঙবার চেষ্টা করবে। সামনের সোমবার আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের কথা ঘোষণা করা হবে—

হোমস চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিয়ে বলল—সোমবার—মানে হাতে মাত্র তিনটে দিন—

—এই কদিন লন্ডনেই আছি—ল্যাংহামে পাবেন আমাকে।

—বেশ। খবরাখবর সেখানেই জানানো যাবে। পারিশ্রমিকের ব্যাপারটা কি হবে?

—যা বলবেন তাই হবে—ছবির দাম হিসেবে দরকার হলে রাজ্যের খানিকটা দিতে পারি। হাত খরচ হিসেবে আপাততঃ এটা রাখুন—

একটা চামড়ার ব্যাগ বার করে টেবিলে রাখলেন গ্র্যান্ড ডিউক ; এতে তিনশ মোহর আর সাতশ পাউন্ডের নোট আছে।

যথারীতি ধন্যবাদ জানিয়ে একটা রসিদ লিখে দিল হোমস। তারপর আইরিন অ্যাডলারের ঠিকানাটা ডিউকের কাছ থেকে জেনে লিখে নিল।

—ফটোটা কি ক্যাবিনেট সাইজের?

—হ্যাঁ।

এরপর শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেলেন গ্র্যান্ড ডিউক। হোমস আমার দিকে ঘুরে বলল, তুমি এখন সংসারী মানুষ—রাত হয়ে যাচ্ছে—কাল বিকেল তিনটে নাগাদ চলে এসো।

পরদিন তিনটে নাগাদ বেকার স্ট্রীটে হাজির হলাম। ও তখন বাড়ি ছিল না। সকাল আটটায় বেরিয়ে আর ফেরেনি। চুল্লীর পাশে গিয়ে বসলাম।

ঠিক চারটে নাগাদ দরজা খুলে আচমকা ঘরে ঢুকল একটা সহিস। কদাকার চেহারা—মুখ ভর্তি দাড়ি গোঁফ। পোশাকও যাচ্ছেতাই রকমের নোংরা—চোখ লাল। নেশা করে আছে নির্ঘাৎ।

আগেও দেখেছি—সমাজের সর্বশ্রেণীর মধ্যে হোমসের মক্কেলরা ছড়িয়ে রয়েছে। তাই সহসা এরকম একজনকে ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক হলাম না। লোকটার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে গিয়ে হেসে উঠতে হল—বহুরূপী হোমসকে চিনতে পারলাম!

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই টুইড-স্যুট পরা ভদ্রলোকের চেহারায় বেরিয়ে এসে হোমস আগুনের সামনে পা ছড়িয়ে বসে উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগল।

—কি ব্যাপার। অত উল্লাস কিসের? বেরিয়েছিলে কোথায়?

—বলছি বলছি। গাড়োয়ান আর সহিসে খুব মাখামাখি সম্পর্ক থাকে জানতো? বাড়ির অনেক খবরাখবর ওদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। সেকারণেই সহিস সেজে সকালে বেরুতে হয়েছিল।

আইরিন অ্যাডলারের ব্রায়োনি লজ বাড়িটা দোতলা। রাস্তার ওপরেই। পেছনে বাগান। ডানদিকে বসবার ঘর। জানালা বেশ বড় বড়।

বাগানের পাঁচিল বরাবর একটা নোংরা গলি দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখলাম সেখানে সহিসরা ঘোড়া দলাইমলাই করছে। ভিড়ে গেলাম তাদের সঙ্গে। লাভটা নেহাত মন্দ হয়নি। নগদ দুটো পেনি আধ বোতল মদ আর তামাক পাওয়া গেল কাজের বিনিময়ে। সেই সঙ্গে খবরাখবরও।

আইরিন অ্যাডলার নিতান্তই পরিচ্ছন্ন নির্ঝঞ্ঝাট মহিলা। বাড়িতেই থাকেন সারাক্ষণ। ভোরে বেড়াতে যাওয়া আর বিকেলে কনসার্টে গান গাইতে যাওয়া বাইরের কাজ বলতে এই। পুরুষ বন্ধু একজনই—গডফ্রে নর্টন। পেশায় উকিল। সুপুরুষ, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর।

প্রতিদিনই আসেন। চিন্তা করে দেখলাম দুজনের মধ্যে নিছক উকিল-মক্কেলের সম্পর্ক যদি হয় তাহলে ফটোটা উকিলের হেফাজতেই থাকবার কথা। সেক্ষেত্রে এই অল্প সময়ে কতটা কি করতে পারব ভেবে চিন্তিত হলাম।

দৈব সহায় বলতে হবে। ঠিক সেই সময়েই গডফ্রের গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। গাড়োয়ানকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে ঝড়ের বেগে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলেন। অনায়াস সাবলীল যাতায়াত। দেখেই বুঝলাম—সম্পর্কটা কেবল উকিল মক্কেলের নয়। আরও গভীর।

জানালা দিয়ে দেখলাম—উত্তেজিতভাবে পায়চারী করতে করতে হাত পা

নেড়ে কথা বলছেন। মিনিট ত্রিশেক পরেই নেমে এলেন ব্যস্তসমস্ত ভাবে। গাড়োয়ানকে বললেন—বিশ মিনিটের মধ্যে রিজেন্ট স্ট্রীট হয়ে সেন্ট মনিকা চার্চে যেতে হবে—আধপেনি বখশিস পাবে।

কি করব ভাবছি। এমন সময়েই ঝকঝকে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। একরকম দৌড়েই হলঘর থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলেন আইরিন। হেঁকে বললেন, কুড়ি মিনিটের মধ্যে সেন্ট মনিকা গির্জায় যেতে হবে—আধ পাউন্ড বখশিস পাবে।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে ছ্যাকড়া গাড়ি ধরে পেছু নিলাম। একইভাবে গাড়োয়ানকে আধ পাউন্ডের বখশিস কবুল করে।

গির্জায় পৌছে দেখলাম, পাদ্রী আর পাত্র-পাত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে তিনজনে। আমার দিকে চোখ পড়তেই সবাই মিলে দৌড়ে এসে টানতে টানতে আমাকে বেদীর কাছে নিয়ে গেল। সাক্ষী দরকার যে—সাক্ষী না থাকলে আইনের ফাঁক থেকে যাবে। এদিকে সময় আর মাত্র তিন মিনিট।

বাইরে থেকে সাক্ষী আনতে গেলে অনেক সময়ের দরকার। এক পাউন্ড পারিতোষিক জুটে গেল দিব্যি। কল্পনা কর ব্যাপারটা, তদন্তে বেরিয়ে আইরিন অ্যাডলার আর গডফ্রে নর্টনের বিয়েতে মধ্যস্থতা করে এলাম মন্ত্র পড়ে। ব্যাপারটা যত ভাবছি ততই হাসি সামলাতে পারছি না।

গির্জা থেকে বেরিয়ে দুজন দুদিকে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার আগে গডফ্রে নর্টন বলে গেলেন—রোজকার মত সন্ধ্যায় আসছেন।

•কনে বাড়িতে ঢুকতেই আমিও ফিরে এলাম।

—চমৎকার নাটক, বললাম আমি, তা এখন কি করবে ভাবছ?

—আরে সেজন্যই তো তোমাকে আসতে বলা। তবে বিকেলের অভিযানে কিন্তু ঝুঁকি আছে ভায়া—কাজটা বেআইনি—ধরা পড়বারও ভয় আছে।

—তা উদ্দেশ্য যখন মহৎ, তখন আর চিন্তার কি। তুমি এবারে খেয়ে নাও।

খাবার এসে গিয়েছিল। খেতে খেতে হোমস বলল, উদ্দেশ্য সত্যিই মহৎ। এখন বেলা পাঁচটা। সাতটার মধ্যে ব্রায়োনি লজে পৌছতে হবে আমাদের। আইরিন অ্যাডলার সে-সময় কনসার্ট থেকে ফিরে আসেন।

—আমাদের কাজটা কি হবে?

—আমি ভেতরে ঢুকব। তুমি বসবার ঘরের জানালার পাশে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে। একটা স্মোক বোমা হাতে রাখবে—ছুঁড়ে দিলেই আপনা থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠবে। এই নাও ধর—;

চুরুটের সাইজের একটা বস্তু আমার দিকে এগিয়ে দিল। তারপর হাতের একটা বিশেষ মুদ্রা দেখিয়ে বলল—জানলা খুললে আমার হাতে এই সঙ্কেত দেখতে

পাবে—সঙ্গে সঙ্গে এই বোমাটা জানলা গলিয়ে ভেতরে ছুঁড়ে দিয়ে আগুন আগুন বলে চেঁচিয়ে উঠবে। লোকজন জমে উঠলেই রাস্তার অন্য পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। কি পারবে তো?

—খুব।

খাওয়া শেষ করে শোবার ঘরে ঢুকল হোমস। মিনিট কয়েক পরে ঘর থেকে বেরুল এক পাদ্রী। তীক্ষ্ণ শাণিত চোখে শান্ত ধীর দৃষ্টি। অবাক হয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, অপরাধতাত্ত্বিক এই যুক্তিবাদী বিশ্লেষক যদি নট হত, অভিনয় জগৎ তার সেরা প্রতিভাকে পেয়ে ধন্য হত।

ছটা বেজে পনের মিনিটে বেরুলাম বেকার স্ট্রীট থেকে। ব্রায়োনি লজের সামনে পৌঁছে দেখলাম ল্যাম্প পোস্টের আলো জ্বলে উঠেছে—বাড়িটার সামনে এদিক সেদিক কিছু লোকজন ঘোরাফেরা করছে—আড্ডা মারছে।

হোমস বলল, বিয়েটা হয়ে যাওয়াতে আমার কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে। ডিউকের ফটোটা গডফ্রে নর্টনের চোখের আড়ালেই রাখবেন আইরিন অ্যাডলার। কিন্তু কোথায় রাখতে পারেন বলতো? ক্যাবিনেট সাইজের ছবি পোশাকের ভেতরে রাখা সম্ভব নয়।

—কয়েকদিনের মধ্যেই তো দরকার হবে ছবিটার।

—ঠিকই বলেছ—এ অবস্থায় বাইরে কারো কাছে—না না—মেয়েদের এক বিচিত্র স্বভাব—যখন কিছু লুকোয় নিজেরাই কাজটা করে—কারো সাহায্য নেয় না। ফটোটা নাগালের মধ্যে বাড়িতেই থাকা সম্ভব।

—কিন্তু খুঁজবে কি করে?

—আরে না, আমি খুঁজতে যাব কেন! দেখিয়ে দেবেন উনি নিজেই। ওয়াটসন—মোড়ের মাথায় আলো দেখা যাচ্ছে—ওই বোধহয় গাড়ি—

বলতে না বলতেই বাড়িব সামনে গাড়িটা এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে বখশিসের আশায় একজন ভিখিরি শ্রেণীর লোক দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়াল। অমনি হুড়মুড় করে আরো কয়েকজন ছুটে গিয়ে ভিড় জমাল।

বখশিস নেবার প্রতিযোগিতায় দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল ঠেলাঠেলি ঝগড়া। ছুটে এলো আরো অনেকে—দুটো দল হয়ে গেল দেখতে দেখতে—সে কী ঘুষোঘুষি মারামারি—এক তুলকালাম কাণ্ড।

পাদ্রী বেশী হোমস দৌড়ে গেল আইরিন অ্যাডলারকে রক্ষা করতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লাঠি পড়ল মাথায়—রক্তাক্ত মুখে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ব্যাপার দেখে কয়েকজন ছুটে এসে ঘিরে দাঁড়ল হোমসকে—বাকি সবাই পালিয়ে গেল ভয়ে।

আইরিন অ্যাডলার ততক্ষণে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়েছেন। ঘাড় ফিরিয়ে

জিজ্ঞেস করলেন—খুব বেশি লেগেছে?

—মনে হয় শেষ হয়ে গেছে। কে একজন বলল।

আর একজন বলল—না—এখনো নিঃশ্বাস পড়ছে—ম্যাডাম, ভেতরে নিয়ে যাব?

—নিশ্চয়ই। নিয়ে এসো—বসবার ঘরে সোফায় এনে শুইয়ে দাও।

ধরাধরি করে হোমসকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল। ঘরে আলো জ্বলল। দেখলাম, নিজেই শুশ্রূষায় হাত লাগিয়েছেন আইরিন। আমি বোমা হাতে প্রস্তুত হয়ে রইলাম।

মিনিট কয়েক পরে কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসল হোমস—হাঁপানি রোগীর মত দম টানতে লাগল—যেন বাতাসের অভাবে এখুনি বুক ফেটে যাবে।

একজন ঝি এগিয়ে এসে জানালা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশেষ মুদ্রায় হাত তুলল হোমস। আমিও ধোঁয়া-বোমা টিপ করে ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে আগুন আগুন বলে চিৎকার করে উঠলাম।

আমার গলা শুনে রাস্তার লোকজন তারস্বরে চিৎকার আরম্ভ করল। কেউ ছুটে এল, কেউ ছুটে পালাল। ওদিকে গল গল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে জানালা দিয়ে। প্রচণ্ড হৈ হট্টগোলের মধ্যে হোমসের গলা শোনা গেল—আগুন টাগুন কিছু না—কেউ নিশ্চয় ভয় দেখিয়ে মজা করছে।

ফাঁক বুঝে আমি সরে এলাম রাস্তার পাশে। মিনিট কয়েক পরেই হোমস দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে টেনে নিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

—সাবাস ডাক্তার! যেভাবে ভেবে রেখেছিলাম, কাজটা ঠিক সেভাবেই করতে পেরেছ। আমার কাজও হাসিল।

—এনেছ?

—আনা হয়নি—তবে কোথায় রেখেছেন দেখে এসেছি!

—আচ্ছা হোমস, রাস্তার লোকগুলো কি—

—সন্দেহটা তোমার মিথ্যা নয়। সবই আমার ভাড়াটে লোক। আমিও আগে থেকেই লাল রঙ হাতে মেখে রেখেছিলাম। জানতাম, চোখের সামনে জখম মানুষ দেখলে ভদ্রমহিলা বসবার ঘরে না ঢুকিয়ে পারবেন না। তাই গোলমালের মধ্যে ঢুকে পড়েই দু'হাত রগড়ে নিয়েছিলাম। ফটোটা কোন ঘরে তা জানবার জন্যেই এই নাটকের আয়োজন।

ধোঁয়া দেখে ভয় পেয়ে গেলেন আইরিন অ্যাডলার। বাড়িতে আগুন লাগলে মেয়েরা আগে নিজের দামী জিনিস সামলাতে ছুটে যায়। কুমারীরা ছোটে গয়নার দিকে—মায়েরা সামলায় বাচ্চা। আগুন লেগেছে ভেবে উনিও ছুটে গিয়ে দাঁড়ালেন ঘণ্টার দড়ির ওপরকার একটা আলগা তক্তার কাছে।

আধখানা টেনে সরাতেই ভেতরের ফাঁকে ফটোটা চোখে পড়ল। আগুন

লাগেনি বলে চেঁচিয়ে উঠতেই ফটোটা যথাস্থানে রেখে দিলেন। তারপর ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফটোটা সরাবার সেই ছিল সুযোগ কিন্তু তখুনি কোচোয়ান লোকটা ঘরে ঢুকে আমার দিকে এমনভাবে কটমট করে তাকিয়ে রইল যে কিছু আর সম্ভব হল না।

—সময়ও তো ফুরিয়ে আসছে—এবার তাহলে কি করবে?

—আমার ইচ্ছে মহারাজ নিজের হাতেই ফটোটা উদ্ধার করুন। কাল সকাল আটটা নাগাদ তাকে সঙ্গে করে বসবার ঘরে এসে বসব। ওপরে খবর পাঠিয়ে আইরিন অ্যাডলারের নেমে আসবার আগেই কাজ হাসিল করে সটকান দেব আমরা। তিনি এসে দেখবেন খুপরি ফাঁকা। মহারাজকে এখুনি খবরটা লিখে জানাব।

বেকার স্ট্রীটে পৌঁছে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে চাবি বার করছে হোমস। এমন সময় কানের কাছে শুনতে পেলাম—গুড নাইট মিঃ শার্লক হোমস।

চমকে ঘুরে দাঁড়াতেই মনে হল অলস্টারধারী দীর্ঘকায় এক ছোকরা আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে পথের ভিড়ে মিশে গেল।

লোকটাকে আমরা কেউই চিনতে পারলাম না।

রাতে আর বাড়ি ফেরা হল না। হোমসের সঙ্গেই থেকে গেলাম। পরদিন সকালেই বোহেমিয়ার গ্র্যান্ড ডিউক হাজির হলেন। তাঁর ব্রুহামে চেপেই রওনা হলাম তিনজনে।

যেতে যেতে কথা বলতে লাগল হোমস। গতকাল আইরিন অ্যাডলারের বিয়ে হয়ে গেছে শুনে গোটা রাস্তা কথা বলতে ভুলে গেলেন গ্র্যান্ড ডিউক মশায়—গুম হয়ে বসে রইলেন।

ব্রায়োনি লজে ঢোকার মুখে সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিল একজন বুড়ি ঝি। আমাদের দেখেই জিজ্ঞেস করল—আপনিই কি শার্লক হোমস?

চমকে উঠে হোমস নিজের নাম বলল।

—তাহলে ওপরে আসুন—দিদিমনি বলে গেছেন আপনার কথা।

—সেকী, কোথায়? হোমসের কণ্ঠস্বর যেন ক্ষীণ শোনাল।

—আজই সকালের ট্রেনে স্বামীকে নিয়ে ইংল্যান্ডের বাইরে চলে গেছেন, আর ফিরবেন না।

গ্র্যান্ড ডিউক ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন। কোনরকমে বললেন—আমার কাগজপত্রগুলো!

ততক্ষণে হোমস দৌড়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে। ঘর ফাঁকা। কোনদিকে না তাকিয়ে ঘন্টার ওপরের তক্তাটা নামিয়ে ভেঙে ফেলল। ভেতর থেকে বেরুলো আইরিন অ্যাডলারের একটা ফটো আর একটা চিঠি। খামের ওপরে শার্লক হোমসের নাম

লেখা। তার তলায় আবার একটা লাইন ঃ শার্লক হোমস না আসা পর্যন্ত এ চিঠি এখানেই থাকবে।

একটানে খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা বার করল হোমস। রাত বারোটায় লেখা—তিনজনেই একসঙ্গে পড়তে লাগলাম ঃ

প্রিয় মিঃ শার্লক হোমস,

আপনার কর্মপদ্ধতি সত্যিই অদ্ভুত। কিছুদিন আগেই কানে এসেছিল ছবি উদ্ধারের জন্য মহারাজ আপনার দ্বারস্থ হতে পারেন। তাই মোটামুটি সতর্ক ছিলাম। আগুন আগুন চিৎকারটা শুনে খটকা লাগল। সেকারণেই কোচোয়ানকে আপনার পাহারায় রেখে ওপরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের ছদ্মবেশ নিলাম। আপনার অজানা নেই নিশ্চয়ই—অভিনয় ব্যাপারটা যত্ন করেই রপ্ত করেছি। আপনার পেছন ধরে বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে নিশ্চিত হলাম যে শার্লক হোমসই ফাঁদটা পেতেছেন। এমন দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষকে বারবার ফাঁকি দেওয়া যায় না। তাই তখুনি স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করলাম—বিদেশে পাড়ি দেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

গুড নাইট আগেই জানিয়ে রেখেছি। কাজেই সকালে যখন আসবেন তখন আর দেখা হবে না। ফটো নিয়ে গ্র্যান্ড ডিউককে অযথা আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না। ভালবেসে যিনি আমাকে জীবনসঙ্গী করেছেন তিনি ওঁর চাইতে উঁচু জাতের মানুষ। রাজাকে পাল্টা আঘাত আমি করব না। তবে রাজা হয়ে যে আঘাত উনি দিয়েছেন, তার কথা মনে রেখেই, ভবিষ্যতের রক্ষাকবচ হিসেবে ফটোটা আমার কাছেই রাখব। বদলে অন্য একটা ছবি রেখে গেলাম—ইচ্ছে হলে উনি রাখতে পারেন।

—আপনার বিশ্বস্ত

আইরিন নর্টন (অ্যাডলার)

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন গ্র্যান্ড ডিউক—চমৎকার! আমার আর কোন ভয় নেই মিঃ হোমস। আইরিন অ্যাডলার এমন মেয়ে যে কখনো দু'কথা বলে না। ছবি নিয়ে আর আমার মাথাব্যথা নেই। বলুন, কি পুরস্কার চাই আপনার।

বলতে বলতে আঙুল থেকে মরকত খচিত আংটি খুলে নিলেন গ্র্যান্ড ডিউক।

আইরিন অ্যাডলারের ফটোটার দিকে তাকিয়ে হোমস বলল, আংটির চেয়েও দামী জিনিস আপনার কাছে রয়েছে অবশ্য।

ইচ্ছাটা বুঝতে পেরে খুশি মনেই ফটোটা তুলে দিলেন হোমসের হাতে।

সকৃতজ্ঞ হেসে প্রতি অভিবাদন জানালেন গ্র্যান্ড ডিউক।

এই সেই ঘটনা, যার পর থেকে মেয়েদের বুদ্ধি সম্পর্কে উন্নাসিক মন্তব্য করা ছেড়ে দেয় হোমস।



রেড হেডেড লীগ

হোমসের কাজকারবারে আমি উৎসাহী, কেবল তাই নয়—ওকে নিয়ে লেখা আমার কাহিনীর সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তথাপি হোমসের বক্তব্য, সব দেখে শুনেও আমার কাহিনী বাস্তবসম্মত হয়ে ওঠেনি--সবই কল্পনার মিশেলে অতিরঞ্জনদুষ্ট। বাস্তব ঘটনা নাকি কল্পনার চাইতেও চমকপ্রদ।

মতামত জানিয়েই যে খালাস তা নয়—মাঝে মাঝেই এমন সব ঘটনার মধ্যে ফেলে দেয়—কেবল নিজের বক্তব্য প্রমাণ করবার জন্য!

গতবছর শরৎকালেও এরকম একটি ঘটনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল আমাকে।

আমি যখন দেখা করতে গেছি—সেই সময় মিঃ জাবেজ উইলসন নামে এক ভদ্রলোক হোমসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। ভদ্রলোকের মাথার চুল আশ্চর্য রকমের লাল—বলা ভাল, একেবারে আগুন-লাল।

আমাকে দেখেই হোমস সহাস্যে পরিচয় পর্ব শেষ করে বলে উঠল—বাস্তব কত অসাধারণ তা আর একবার প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ এসেছে তোমার। আমাকে নিয়ে লেখালেখি কর বলেই বলছি—এখন যে কেসটা শোনাচ্ছি এমন বিচিত্র মামলা ইদানীংকালে হাতে আসেনি।

অতি সাধারণ নির্দোষ ঘটনার পেছনেও যে কত বড় অপরাধ লুকিয়ে থাকতে পারে তা শুনলেই বুঝতে পারবে—কল্পনায় এমন ঘটনা তৈরি করা কখনও সম্ভব নয়। মিঃ উইলসন্, আপনার অদ্ভুত কেসটা আর একবার গোড়া থেকে বলুন, ডক্টর ওয়াটসনের শোনা দরকার।

কারবারী ইংরেজদের মত ঢিলেঢালা পোশাক পরিচ্ছদ ভদ্রলোকের। চেহারার মধ্যে একমাত্র বৈশিষ্ট্য চুলের লাল রঙটা।

মিঃ উইলসন তার হাতের কাগজটার একটা বিজ্ঞাপনের প্রতি আমার দৃষ্টি আকষণ করলেন। দুমাস আগেকার মর্নিং ক্রনিকল। বললেন—যত গণ্ডগোল এই বিজ্ঞাপন থেকেই—পড়লেই বুঝতে পারবেন।

বিজ্ঞাপনটায় চোখ রাখলাম ঃ

যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্গতঃ হপকিন্সের ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী লোহিত-কেশ সমিতিতে আর একটা সদস্যপদ শূন্য হয়েছে। কাজ খুবই সামান্য—সাপ্তাহিক মাইনে চার পাউন্ড। চুলের রং আগুন-লাল এবং বয়স একুশ বছরের উর্ধ্বে—এমন প্রার্থী আবেদনপত্র নিয়ে বেলা এগারটায় ফ্লীট স্ট্রীটের সাত নম্বর পোপস কোর্টে সমিতির কার্যালয়ে ডানকান রসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

অদ্ভুত বিজ্ঞাপন। হতভম্ব হয়ে বললাম—এ তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না দেখছি।

—তবেই বোঝ—মামুলী বিজ্ঞাপন নয়। এরপর বলুন মিঃ উইলসন, বলল হোমস।

—আমার একটা ছোটখাট বন্ধকী কারবার আছে। একাই দেখাশোনা করি—খানিকটা সহযোগিতা করে হাফ মাইনের একজন কর্মচারী।

—কি নাম?

—ভিনসেন্ট স্পলডিং। আধা বয়সী সাদাসিধে মানুষ। ফটো তোলার বাতিক আছে। দিনরাত ঘুরে ঘুরে ফটো তোলে আর আমার নিচের অন্ধকার ঘরে ডেভালপ করে। আমি বিপত্নীক মানুষ। একটা বছর চোদ্দ বয়সের মেয়ে সংসারের কাজকর্ম করে দেয়।

ভালই ছিলাম আমরা, মাস দুই আগে স্পলডিং বিজ্ঞাপনটা এনে যত গণ্ডগোল পাকাল। আমাকে দেখিয়ে বলল—বছরে দুশ পাউন্ডের একটা চাকরি। আমার মত লালচুল থাকলে এখুনি সে আবেদনপত্র নিয়ে দেখা করত।

তার কাছেই শুনলাম, লাল চুলের এক আমেরিকান কোটিপতি লোহিত-কেশ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ভদ্রলোকের নিজের লাল চুল ছিল বলে সহানুভূতি বশতঃ লন্ডনের লাল চুলের মানুষগুলো যাতে অল্প পরিশ্রমে দুটো পয়সা হাতে পায় তার জন্য এই ব্যবস্থা তিনি করেছেন। টাকাটা দেওয়া হয় তাঁর সম্পত্তির সুদ থেকে।

কিছুদিন ধরেই কারবার মন্দা যাচ্ছিল। এই অবস্থায় বছরে দুশ পাউন্ডের একটা নিশ্চিত ব্যবস্থা চোখের সামনে দেখে কার না লোভ হয় বলুন। তার ওপরে স্পলডিং বলল, সমিতি বিশেষভাবে আগুন-লাল চুল দেখেই কর্মী নির্বাচন করে। দৈবক্রমে আমার চুলের রঙও আগুন-লাল। সুতরাং দরখাস্ত করলেই চাকরিটা আমি পেয়ে যেতে পারি।

লোহিত-কেশ সমিতির অনেক খবরই দেখলাম স্পলডিং রাখে। শেষ পর্যন্ত ওকে সঙ্গে নিয়েই সমিতির কার্যালয়ে গিয়ে হাজির হলাম। কাতারে কাতারে লালচুলো মানুষ মশায়, কী বলব। তবে তার মধ্যে চুলের রঙটা আমারই সরেস—একেবারে আগুন-লাল, দেখতেই তো পাচ্ছেন। স্পলডিংই আমাকে কায়দা কানুন করে ভিড় ঠেলে নিয়ে গেল অফিস ঘরের সামনে। ভিড় সেখানেও।

অফিস ঘরে একজন লালচুলো চেয়ার টেবিল নিয়ে বসে। প্রার্থীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তৎক্ষণাৎ নাকচ করে দিচ্ছে।

কিন্তু আশ্চর্য, আমার চুলের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোকেব চোখ চকচক করে উঠল। ভেতরে গিয়ে বসতেই দরজা বন্ধ করে দিলেন। দু'চারটে কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তারপরই আচমকা চুল খামচে ধরে হ্যাঁচকা টান মারলেন। যন্ত্রণায় কাতরে উঠলাম আমি।

ভদ্রলোক ক্ষমা চেয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না। নকল চুল কিনা দেখলাম। রং করা চুল নিয়েও অনেকে আসছে তো।

আমিই মনোনীত হলাম। ভদ্রলোকের নাম ডানকান রস—ওখানকার ম্যানেজার। জিজ্ঞেস করে জানলাম—কাজের সময় সকাল দশটা থেকে দুটো—মাত্র চার ঘণ্টা। মাইনে হপ্তায় চার পাউন্ড। সকালের দিকে আমার বিশেষ কোন কাজ থাকে না। স্পলডিংই সে সময়টা সামলাতে পারবে। আমার বাড়তি রোজগারে কোন অসুবিধাই দেখলাম না।

কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে ডানকান রস বলল, কাজ খুবই হাল্কা। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে নকল করে যাবেন। কাগজ কলম কালি নিজেকে নিয়ে আসতে হবে অবশ্য। কিন্তু ঘর ছেড়ে একদম বেরুতে পারবেন না। আর অসুখ-বিসুখ কি কাজের চাপ—কোন অছিলাতেই কামাই করা চলবে না। তাহলে চাকরি কিন্তু থাকবে না উইলের সর্তটা সেভাবেই আছে।

পরের দিন থেকেই কাজে বহাল হয়ে গেলাম। বাড়ি এসে অনেক ভেবেছি—সামান্য এই কাজের জন্য এতগুলো টাকা দেওয়ার কোন কারণ খুঁজে পাইনি। সপ্তাহের শেষে টাকাটা পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে খানিকটা সন্দেহ ছিল। স্পলডিং অবশ্য বরাবরই আমাকে মনের বল জুগিয়ে গেছে।

সমিতির কার্যালয়ে পৌঁছে দেখি ডানকান রস আগেই হাজির হয়েছে। আমাকে

A অক্ষর থেকে শব্দকোষ নকল করতে দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু মাঝে মাঝে এসেই তদারক করে গেল। ঠিক দুটোর সময় ছুটি পেলাম।

এ ভাবেই প্রথম সপ্তাহটা কাটল। শনিবারে যথারীতি মাইনেটা পেলাম। কাজের উৎসাহ বাড়ল ঠিকঠিক টাকাটা পেয়ে।

নিয়মিত দশটা থেকে দুটো হাজিরা দিয়ে চললাম। ডানকান রসের হাজিরা ক্রমশঃ কমে যেতে লাগল।

প্রতিদিন একবার আসাও শেষকালে বন্ধ হয়ে গেল। আমি কিন্তু যথারীতি নকলনবিশি চালিয়ে গেলাম।

এ ভাবেই আটটা সপ্তাহ কাটল। লেটার A প্রায় শেষ করে এনেছি। এমন সময়েই আচমকা শেষ হয়ে গেল ব্যাপারটা। আজ অফিসে গিয়ে দেখি এই পিচবোর্ডের টুকরোটা দরজায় ঝুলছে।

চৌকোনা একটা পিচবোর্ড এগিয়ে দিল জাবেজ উইলসন। তাতে লেখা :

লোহিত-কেশ সমিতি উঠে গেল।

অক্টোবর ৯, ১৮৯০

ভদ্রলোকের করুণ বিষণ্ণ ত্রস্ত মুখভাবের দিকে চোখ পড়তে আর হাসি সামলাতে পারা গেল না। আমি আর হোমস যুগপৎ হো হো শব্দে পেটফাটা হাসি হেসে উঠলাম।

মিঃ উইলসন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। লালচুলের দৌলতে পাওয়া অমন চাকরিটা তার গেল, আর আমরা কিনা মজা করে হাসছি!

অপ্রস্তুত মুখে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন, হোমস হাত ধরে বসাল। বলল—কিছু মনে করবেন না—আপনার কেস আমি নিলাম। এবারে পরের ঘটনা বলে যান।

সামলে নিয়ে মিঃ উইলসন বললেন, মশায় অমন একটা কাজ দিয়ে আবার কেড়ে নেয়া—একটা মানুষের ভাগ্য নিয়ে অমন রসিকতা কি কেউ করে? কি দরকার ছিল বলুন?

এই বোর্ডটা দেখে মাথা ঘুরে গেল আমার। ছুটলাম বাড়িওয়ালার কাছে—নিচ তলায়। তিনি তো লোহিত-কেশ-সমিতির নামই আমার কাছে প্রথম শুনলেন। ডানকান রস নামটা জীবনে শোনেন নি। তবে লাল চুল আর চেহারার বিররণ দিতে চিনতে পারলেন।

বললেন—উনি তো উইলিয়াম মরিস—সলিসিটর। নিজের অফিস গোছানো না হওয়া পর্যন্ত আমার অফিসে বসতেন। কালকেই চলে গেছেন তো। ১৭ নম্বর কিং এডওয়ার্ড স্ট্রীটে অফিস করেছেন—সেখানে গেলেই দেখা পাবেন।

আশা নিয়ে ছুটলাম এডওয়ার্ড স্ট্রীট। কিন্তু কোথায় কে! একটা কারখানা সেখানে। উইলিয়াম মরিস বা ডানকান রসের নাম-গন্ধও নেই। বাড়ি ফিরে

স্পলডিংকে সব খুলে বললাম। ও বলল, হতাশ হবেন না। দু-চারদিন অপেক্ষা করুন—নিশ্চয় চিঠিপত্র কিছু আসবে।

কিন্তু চিঠি এসে আমার কি লাভ হবে বলুন। চাকরিটা তো ফিরে পাব না। এ অবস্থায় কি করব বুঝতে পারছিলাম না। সেজন্যেই আপনার পরামর্শ নিতে এলাম। শুনেছি গরীব-দুঃখীদের অনেক সাহায্য আপনি করেন।

হোমস বলল, এসে ভালই করেছেন। তবে ব্যাপারটা যতটা সাদামাটা দেখাচ্ছে আসলে তা নয়।

—আমারও তাই ধারণা। নইলে দেখুন, খামোকা আমার পেছনে বত্রিশটা পাউন্ড খরচ করবার কোন মানে হয় না। আমারও মনে হচ্ছে ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

হোমস জিজ্ঞেস করল, স্পলডিং আপনার কাজে বহাল হয়েছে কদ্দিন?

—তা মাস তিনেক হবে।

—ওকে জোগাড় করলেন কিভাবে?

—বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। অনেকেই এসেছিল—সবচেয়ে কম চাহিদা ছিল ওর।

—স্পলডিং-এর চেহারাটা একটু বলুন তো।

—খাটোখোটো চেহারা—তবে বেশ গাট্টাগোট্টা, পরিষ্কার গাল। কপালে একটা সাদা গাদ—অ্যাসিডে পুড়ে গিয়েছিল।

—বয়স?

—তিরিশের কাছাকাছি।

হোমস সহসা উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল—দু'কানের লতিতে কি ফুটো আছে?

—হ্যাঁ আছে। ছেলেবেলায় নাকি এক বেদে জোর করে কান বিঁধিয়ে দিয়েছিল।

—স্পলডিং এখন কোথায়?

—আমার আস্তানাতেই রয়েছে।

হোমস টেনে টেনে বলল, আজ শনিবার—সোমবার নাগাদ একটা কিছু করা যাবে মনে হচ্ছে।

জাবেজ উইলসন বিদায় নিল।

কিন্তু আমার মাথায় জট পাকাতে লাগল অদ্ভুত এই মামলাটা। বললাম—খুবই গোলমেলে মামলা দেখছি—কিছুই তো আন্দাজ করা যাচ্ছে না।

হোমস হেসে বলল, ওয়াটসন, তোমাকে তো অনেক আগেই বলেছি—যে মামলা বেশি গোলমেলে মনে হয়—তাতেই বরং গোলমাল কম থাকে। যা সরল সহজ বলে মনে হয়—রহস্য বেশি তাতেই।

এরপর কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে পাইপ ধরিয়ে টানতে লাগল।

চুপচাপ বসে ওর কাণ্ড দেখতে লাগলাম। মনে হচ্ছে পর পর কয়েক পাইপ

টানবার আগে নড়াচড়া করবে না। চিন্তার ভূত মাথায় চেপেছে।

সহসা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল—চল—ঘণ্টা কয়েক সেন্ট জেমস হলে জার্মান বাজনা শুনে আসা যাক।

বেরুতে হল। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ে হোমস প্রথমে গেল স্যাক্স কোবার্গ স্কোয়ারে। কোণের একটা বাড়ির বোর্ডে লেখা জাবেজ উইলসনের নাম। বন্ধকী কারবারের দোকানটা নিশ্চয়। হোমস চোখ কুঁচকে খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দু পাশের ইটের বাড়িগুলো খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে মোড় পর্যন্ত এগুলো।

ফিরে এল আবার দোকানের সামনে। দু তিনবার লাঠি ঠুকল দরজার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে সামনে দাঁড়াল একজন যুবা। দাড়িগোঁফ পরিষ্কার করে কামান।

হোমস জিজ্ঞেস করল—স্ট্যাণ্ডে যাওয়ার রাস্তাটা বলতে পারেন?

ঝটিতি পথের হদিস বলে দিয়ে দুম করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল লোকটা।

হোমস বলল, কি রকম চটপটে দেখলে তো? তা আমি যা দেখবার ওর মধ্যেই দেখে নিয়েছি।

—চেহারাটা দেখলে তো?

—না, ট্রাউজার্সের হাঁটুটা দেখলাম।

—মেঝেতেও দেখলাম লাঠি ঠুকে কী পরীক্ষা করলে?

—করলাম। রাস্তার এদিকটা দেখা হয়েছে—চল পেছনের দিকটা দেখে আসি।

পেছনের রাস্তায় যানবাহন আর পথচারীর ভিড় সামনের তুলনায় অনেক বেশি। দুপাশে সারি সারি ঝলমলে দোকানে। তীক্ষ্ণ চোখে সেদিকে তাকিয়ে থেকে হোমস আপন মনে বলতে লাগল—হুঁ তামাকের দোকানের পরেই খবরের কাগজ—ব্যাঙ্ক—তারপর—রেঁস্তোরা—এদিকে গাড়ির কারখানা। ওয়াটসন চল। এদিকের কাজ শেষ।

বাজনার আসরে গিয়ে যেন হোমস অন্য মানুষ হয়ে গেল। নিজে সে ভাল বেহালা বাজায়—ভাল বাজনা তাই শুনতেও ভালবাসে। কিন্তু এই সব অলস মুহূর্তেই তার মন তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের ছুরি দিয়ে রহস্যের ব্যবচ্ছেদ সম্পূর্ণ করে। হোমসের এ এক আশ্চর্য দ্বৈত রূপ।

বাজনা শেষ হলে রাস্তায় বেরিয়ে এসে হোমস বলল, ওয়াটসন, আজ শনিবার—কেসটার গুরুত্বও বেড়েছে একারণেই। সাংঘাতিক এক চক্রান্ত চলছে এই কোবার্জ স্কোয়ারে। এখুনি আমাকে এক জায়গায় যাওয়া দরকার। কিন্তু রাতে তোমার সাহায্য তো দরকার।

—কটায় আসব?

—দশটা নাগাদ—আর মিলিটারি রিভলভারটাও সঙ্গে নিয়ে এসো।

বলতে বলতে রাস্তার ভিড়ে মিলিয়ে গেল হোমস।

ঘোর ষড়যন্ত্র চলছে, হোমসের এই কথাটা তখনো বাজছিল কানের গোড়ায়। ও যে ষড়যন্ত্রের কোথায় কি দেখল—ওই জানে। ওর বুদ্ধির নাগাল ধরা কোনদিনই আমার পক্ষে সম্ভব হল না।

তার তো সেই এক কথা—পর্যবেক্ষণ আর বিশ্লেষণ। এই কেসের লোহিত-কেশ সমিতির কাণ্ডকারখানা সম্পর্কে ও যা জেনেছে আমিও তাই জেনেছি—আমি যা দেখছি ও তাই দেখেছে—কিন্তু এর মধ্যে ঘোর ষড়যন্ত্রের আভাস ও পেয়ে গেল! চিন্তা করেও মাথায় কিছু আসছে না। কিন্তু হোমসের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় আমার নেই।

যথাসময়ে বেকার স্ট্রীট উপস্থিত হলাম। বসার ঘরে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা পিটার জোন্সকে দেখেই চিনতে পারলাম।

আর একজন দামী পোশাক পরা ভদ্রলোকও রয়েছেন। ব্যাজার মুখ করে বসে আছেন। হোমস পরিচয় করিয়ে দিল—মিঃ মেরিওয়েদার—আজকের নৈশ অভিযানে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন।

মিঃ মেরিওয়েদার বললেন, যাচ্ছি বটে—কিন্তু কোন কাজ হবে বলে তো মনে হচ্ছে না। মাঝখান থেকে আমার শনিবারের তাস খেলাটা মাটি হল। গত সাতাশ বছরে এই প্রথম নিয়ম ভঙ্গ হচ্ছে।

হোমস হেসে বলল, বাজি জেতার কথা যদি বলতে হয় আজ রাতে তাহলে লোকসান আপনার হবে বলে মনে হয় না। তিরিশ হাজার পাউন্ড কি কম কথা হল? লাভ মিঃ জোন্সেরও কম হবে না—দীর্ঘদিন যাকে হন্যে হয়ে খুঁজছেন, তাকে পেয়ে যাবেন হাতের কাছে।

চমকে উঠে জোন্স বলল, সেকী—কার কথা বলছেন?

—জন ক্লে—স্বনামধন্য পুরুষ। খুন ডাকাতি চুরি-চামারি—জালিয়াতি সব বিদ্যেতেই রীতিমত প্রতিভাধর। রাজবংশের ছেলে—বয়সও বেশি নয়—উচ্চ শিক্ষা পেয়েও সঙ্গদোষে অন্ধকারের পেশা নিয়ে রয়েছে। আজ রাতেই তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব আপনার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পথে নেমে পড়লাম আমরা। দুটো গাড়ির একটাতে উঠেছি আমি আর হোমস। শিকারের ছোট্ট চাবুক নিয়ে নিয়েছে হাতে। যেতে যেতে বলল—মিঃ মেরিওয়েদারকে সঙ্গে নিতে হয়েছে ওর নিজেরই স্বার্থে। যদিও ব্যাপারটা এখনো পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেন নি। ভদ্রলোক একটা ব্যাঙ্কের ডিরেকটার। জোন্সকে না-হলেও চলত—তবে আমাদের পরিশ্রম কমবে ওর

আসাতে।

দিনের আলোয় যে দোকানগুলো দেখে গিয়েছিল হোমস—সেখানেই গাড়ি থেকে নামলাম আমরা। মিঃ মেরিওয়েদার পথ প্রদর্শক হলেন।

একটা সরু গলির ভেতর ঢুকে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকালেন। করিডর পেরিয়ে সেখান থেকে লোহার ফটক খুলে ঘোরানো পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নামলাম মাটির তলায় লোহার গেট লাগানো পাতাল ঘরে। ঘরভর্তি বড় বড় কাঠের বাক্স।

একটা লণ্ঠন জ্বেলে নিয়েছিলেন মেরিওয়েদার। থেকে থেকে গজ গজ করছিলেন ঘরে ঢুকে।

হোমস বলল, আপনি বাক্সের ওপর উঠে বসুন—এবারে আমার কাজ আমাকে করতে দিন। বিপদটা এলে আসবে পায়ের তলা থেকে।

বলতে বলতে লণ্ঠনের আলোয় আতস কাঁচ নিয়ে মেঝের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাথরের জোড় পরীক্ষা করল।

পরে বলল—ওয়াটসন, আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি মিঃ মেরিওয়েদারের ব্যাঙ্কের ভল্টের মধ্যে। আরও কিছু সময় আমাদের অপেক্ষা করতে হবে এখানে। জাবেজ উইলসন ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত ওদের কাজ শুরু করার সুবিধে হবে না। কিন্তু লন্ডনের ডাকসাইটে ক্রিমিনাল গ্রুপ হঠাৎ এই ব্যাঙ্কের ভল্ট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কেন বুঝতে পারছি না। মিঃ মেরিওয়েদার, ব্যাপারটা কিছু আঁচ করতে পারছেন?

—সোনা মশাই, ফরাসী সোনা। বেশি লাভের আশায় ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স থেকে আনিয়ে রাখা হয়েছে এইসব ব্যাঙ্কে। আমাদের এখানে পড়ে আছে মাসখানেক থেকে। আমি যে বাক্সে বসে আছি—এর মধ্যেও রয়েছে সীসের পাতে মোড়া বাঁট। এত সোনা অন্য কোন ব্যাঙ্কে নেই।

—পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা। ঠিক আছে—এবারে বাক্সের আড়ালে গা ঢাকা দিন সকলে। আমি লণ্ঠনে ঢাকা দেব। আলো ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু বেরিয়ে আসবেন। ওয়াটসন, বেগতিক বুঝলে নির্দ্বিধায় গুলি চালাবে।

বলতে বলতে হোমস লণ্ঠনে ঢাকা দিয়ে দিল।

নিঃসীম অন্ধকারে ঢেকে গেল ঘর।

হোমস ফিস ফিস করে বলল—মিঃ জোন্স—এখান থেকে পালাবার পথ কিন্তু একটাই—স্যাক্স কোবার্গের সেই বাড়ি—সেখানকার ব্যবস্থা সব ঠিক আছে তো?

জোন্স বলল—দু'জন চৌকিদার নিয়ে একজন ইন্সপেক্টরকে রেখেছি সেখানে—পালাবার পথ বন্ধ।

—উত্তম।

ওঁৎ পেতে প্রতীক্ষা চলল আমাদের। সময় যেন আর কাটতে চায় না।

পাতালপুরীর নিস্তব্ধ ঘরে হৃদপিণ্ডের শব্দ ছাড়া আর কিছুই মালুম হচ্ছে না।

ঘণ্টা খানেক কাটল এই দুঃসহ উৎকণ্ঠায়। এক সময় একটা আলোর রেখা জেগে উঠল—মেঝের পাথরের জোড় ভেদ করে। কিন্তু কোন শব্দ নেই।

ক্রমে হলদেটে আলোর রেখা বেড়ে গেল—স্পষ্ট হয়ে উঠল একটা গর্ত। রুদ্ধশ্বাসে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইলাম সেদিকে।



একটা সাদা সরু হাত বেরিয়ে এল ফুটো দিয়ে। পরক্ষণেই হাত অদৃশ্য হল। কিন্তু সশব্দে উল্টে পড়ল একটা বড় পাথর। চৌকোনা গর্ত দিয়ে লণ্ঠনের আলো ঠিকরে এলো ঘরে।

একটু পরেই একটা ছোটখাট মাথা ঠেলে উঠল গর্তের মুখে। এদিক সেদিক মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে মেঝের ওপর উঠে এল একজন—তারপর টেনে তুলল আর একজনকে। হাল্কা চেহারা—চুল লাল লোকটার।

লোকটা সাড়ে সেয়ানা—বেলচা আর থলি চেয়ে হাত বাড়িয়েই চেঁচিয়ে উঠল—মরেছে—আর্চি—শিগগির লাফিয়ে পড়।

কিন্তু সে সময় আর পেল না লোকটা। তার আগেই বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে পিঠের জামা খামচে ধরল হোমস। লোকটার হাতে রিভলভারের নল চকচক করে উঠতে না উঠতেই সপাং শব্দে হাঁকড়াল চাবুক।

ঠিকরে গেল ক্ষুদে অস্ত্রটা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পড় পড় আওয়াজ—জোন্সের হাত ফসকে জামা ছিঁড়ে লাফিয়ে পড়ল আর্চি।

ততক্ষণে শিকার কায়দা করে নিয়েছে হোমস। ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলল, জন ক্লে—আর কেন, খেলা তো শেষ হল। সুড়ঙ্গের মুখে তোমার স্যাঙাতটিরও এতক্ষণে হাতে গয়না পরা হয়ে গেছে।

জোন্স এগিয়ে এসে বলল, দেখা হয়ে যাবে শিগগিরই—বাছাধন তুমিও হাতটা বাড়াও, গয়নাটা পরিয়ে দিই।

সঙ্গে সঙ্গে খ্যাক করে উঠল জন ক্লে—খবরদার—ভুলে যাবেন না আমার ধমণীতে রাজরক্ত রয়েছে—সমীহ করে কথা বলবেন।

—নিশ্চয় নিশ্চয়—হুজুর, বলতে বলতে হাতকড়া পরিয়ে দিল জোন্স, দয়া করে এবারে থানায় চলুন।

—হ্যাঁ এভাবেই বলবেন। বলে হাওয়ায় মাথা ঠুকে সকলকে অভিবাদন জানিয়ে জোন্সের পেছন পেছন বেরিয়ে গেল জন ক্লে।

এতক্ষণ বাদে কথা ফুটল মিঃ মেরিওয়েদারের মুখে। গদ গদ স্বরে বললেন—কি আশ্চর্য, ঘুণাক্ষরেও ষড়যন্ত্র টের পেতে দেয় নি। মিঃ হোমস, আপনার জন্যই আজ অত বড় সর্বনাশের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে গেলাম আমরা।

হোমস বলল, জন ক্লের সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া বাকি ছিল—হিসেবটা মিটিয়ে নিলাম। সেইসঙ্গে লোহিত-কেশ সমিতির অসাধারণ মামলারও নিষ্পত্তি হল। কিন্তু এবারে আমার খরচপত্রের হিসেবটা আপনার ব্যাঙ্ক মিটিয়ে দিলেই বাধিত হব।

পরদিন সকালে বেকার স্ট্রীটের ঘরে বসে লোহিত-চুল সমিতির জের টেনে কথার খেই ধরিয়ে দিলাম। হোমস তখন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে হেঁয়ালি ব্যাখ্যা করতে বসল।

বলল—খুবই সরল সোজা কেস। মোটিভ বিচার করেই লোহিত-কেশ সমিতির বিজ্ঞাপনের রহস্য ভেদ হয়ে গেল। শব্দকোষ নকলের কাজ দিয়ে চার ঘণ্টা বসিয়ে রাখার একটাই উদ্দেশ্য—লাল-চুল বন্ধকের কারবারীকে তার নিজের বাড়ি থেকে সরিয়ে রাখা। আইডিয়াটা জব্বর খেলিয়েছে জন ক্লে।

জাবেজ উইলসনের মাথার লাল চুল দেখেই সপ্তাহে চার পাউন্ডের ফাঁদটা পেতেছিল স্যাঙাতকে নিয়ে। এর পরেই দেখতে হল—অমন দু'পয়সার কারবারীকে সরিয়ে রেখে কি কাজ হাসিল করতে চাইছে শয়তানরা? তার বাড়িতে এমন কিছু ধন-দৌলত পাবার কথা নয়। বুঝতে কষ্ট হল না, আসল লক্ষ্যটা আশপাশেই কোথাও। কিন্তু ষড়যন্ত্রটা চলছে এ বাড়িতে—বাড়িতে মালিককে

সরিয়ে রাখার মতলব সেকারণেই।

সূত্রও পেয়ে গেলাম। হাফ-মাইনের কর্মচারী মাটির তলার ঘরে ডার্করুম বানিয়েছে ফটো ডেভেলপ করবার জন্য। লন্ডনের বড় মাপের অপরাধীদের চেহারা আমার প্রায় মুখস্থই বলতে পার। চেহারার বর্ণনা আর লোহিত-কেশ সমিতিতে মাথা মোটা জাবেজ উইলসনকে কাজে নিয়ে যাবার আগ্রহ—এ থেকেই বুঝলাম—অভিনেতাটি শহরের বড় অপরাধীদেরই একজন। রোজ চার ঘণ্টা সময় নিয়ে দু মাস ধরে মাটির তলার ঘরে সুড়ঙ্গ কাটা ছাড়া আর কি কাজ হতে পারে?

তোমার মনে আছে নিশ্চয়, বন্ধকী কারবারের দোকানের সামনে গিয়ে লাঠি ঠুকেছিলাম। সুড়ঙ্গটা বাড়ির পেছন দিকে না সামনে উদ্দেশ্য ছিল সেটা দেখা। কাজটা যে চলছে পেছন দিকে নিরেট আওয়াজ শুনেই তা মালুম হল।

কর্মচারীটি বেরিয়ে আসতেই তাকালাম প্যান্টের হাঁটুর দিকটায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাটিতে হাঁটু চেপে থাকলে প্যান্টের যা অবস্থা হয়—দেখলাম অবিকল সেই হাল।

এখানে একটু ঝুঁকি নিতেই হয়েছিল—অবশ্য জানতাম—আমরা পরস্পরের কাছে অপরিচিত। এরপর বাকি রইল একটাই কাজ। বাড়ির পেছন দিকটায় গিয়ে দেখলাম রাস্তা পেরিয়েই ব্যাঙ্ক। আমার সব সন্দেহের নিরসন হল। নিশ্চিন্ত হয়ে তোমাকে বাড়ি পাঠিয়ে চলে গেলাম স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে। তারপরে ব্যাঙ্ক ডিরেক্টরের কাছে।

—কিন্তু ঠিক ঠিক শনিবার দিনেই যে ওরা ভল্টে হানা দেবে সেটা জানলে কি করে?

—খুবই পরিষ্কার। সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়ে যেতেই জাবেজ উইলসনকে বাড়ি থেকে সরিয়ে রাখার প্রয়োজনও ফুরোলো—সমিতিও উঠে গেল।

নোটিশটা দেখেই আন্দাজ করলাম—এবারে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ হাসিল করে চম্পট দেবে ওরা। সেদিক থেকে শনিবারই প্রশস্ত সময়। তাহলে গা ঢাকা দেবার জন্য দুটো দিন হাতে পাওয়া যাবে। এই ভাবনা থেকেই শনিবারের ফাঁদ পাতা।

—অসাধারণ! তোমার কথাতেই বলছি—একেবারে নিখুঁত যুক্তির আর বিশ্লেষণের সেকল—পরের পর সাজানো। তোমার এই যুক্তিবিজ্ঞানের তুলনা হয় না হোমস।



এ কেস অব আইডেনটিটি

বেকার স্ট্রীটে চুল্লির সামনে বসে কথা হচ্ছে হোমসের সঙ্গে।

হোমস বলছে—বুঝলে ভায়া, কল্পনার পক্ষে যতই ওকালতি কর-না কেন, বাস্তবের সত্য ঘটনাকে টেক্কা দিতে পারবে না কখনো। তুচ্ছ সাধারণ বিষয়ের মধ্যেই অসাধারণ সব চমক লুকিয়ে থাকে।

—তোমার সঙ্গে একমত হতে পারতাম যদি কল্পনার রঙ চড়িয়েও পুলিশ কোর্টের কেসগুলিকে নিছক কেলেঙ্কারীর ঘটনার উর্ধ্বে তোলা যেত। হাতে হাতেই প্রমাণ দিচ্ছি দেখ না—;

বলে মেঝে থেকে সেদিনের কাগজটা তুলে নিয়ে একটা রিপোর্টের দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। অবলা স্ত্রীর ওপর স্বামী পুঙ্গবের অত্যাচারের বিবরণ।

বললাম—তোমার কথা মত জীবন থেকে নেওয়া নিছক বাস্তব ঘটনা এটা। কিন্তু ঘটনাটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে যা লেখা হয়েছে—যে কোন নিকৃষ্ট লেখকও ওর চাইতে চমকপ্রদ ঘটনা মন থেকে বানিয়ে লিখতে পারে।

মোক্ষম অস্ত্র ছেড়েছি। দেখা যাক এবারে ও কি বলে। হোমস কাগজে চোখ বুলিয়ে বলল—ভায়া টেক্কা কিন্তু দিতে পারলে না। নিজের অস্ত্রে নিজেই ঘায়েল হলে। কেসটা অসাধারণ। আমি নিজেই তদন্ত করেছিলাম। তাহলে সঠিক ব্যাপারটা

তুলে ধরছি শোন।

স্বামীটি বদ চরিত্রের লোক মোটেই নন। নিজে মদ স্পর্শ করেন না—মদ খাওয়া বরদাস্ত করেন না। ঘরের স্ত্রীকে বাদ দিয়ে পরকীয়া ব্যাপারটাও যথার্থই ঘৃণার চক্ষে দেখেন। তা সত্ত্বেও কিন্তু তার বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা রুজু করা হয়েছে। কি না, তিনি খাওয়ার শেষে বাঁধানো দাঁত ছুঁড়ে স্ত্রীকে মারতেন। তাহলেই বোঝ এবারে—কল্পনায় আসবে কোন লেখকের? নাও—সাফ কর মাথাটা এবারে।

বলে দামী অ্যামেথিস্ট পাথর বসানো সোনার নস্যি ডিবে এগিয়ে দিল হোমস। বলল—তোমাকে বলা হয়নি—বোহেমিয়ার সেই গ্র্যান্ড ডিউকের উপহার এটা।

—ওটা?

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে অনামিকার হীরের আংটিটির দিকে তাকিয়ে বলল, একটা গোপন ব্যাপারে সাহায্যের জন্য হল্যান্ডের রাজপরিবারের উপহার।

বলতে বলতে সাগ্রহ দৃষ্টি নিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আমিও পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। চোখে পড়ল জমকালো সাজ-পোশাকের এক মহিলা ও-পাশের ফুটপাত থেকে হন্তদন্ত হয়ে রাস্তা পার হয়ে এপাশে আসছেন।

পরক্ষণেই ঢং ঢং শব্দে বেজে উঠল দরজার ঘণ্টা। একটু পরেই চাকরের পেছনে হাজির হলেন ভদ্রমহিলা। পরিচয় দিলেন—মিস সাদারল্যান্ড।

প্রত্যাভিবাদনের পর বসতে ইঙ্গিত করে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল হোমস, বলল—ওরকম চোখের অবস্থায় টাইপের কাজ করেন কি করে?

ভদ্রমহিলা জবাবটা আগে দিলেন—গোড়ায় অসুবিধা হত এখন অভ্যাস হয়ে গেছে—কোথায় কোন টাইপ মুখস্থ হয়ে গেছে। পরক্ষণেই চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?

—ওটাই যে আমার কাজ, হেসে বলল হোমস, অন্যের চোখে যা ধরা পড়ে না আমি তা দেখতে পেয়ে যাই। এই যেমন আপনি হন্তদন্ত হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছেন।

—ঠিকই বলেছেন। মিঃ হসমার এঞ্জেল কোথায় আছেন—সে সন্ধান আমার জানতে হবে। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আমার বাবা মিঃ উইন্ডিব্যাঙ্ক ব্যাপারটাকে মোটেই আমল দিচ্ছেন না। পুলিশে খবর দিতে চেয়েছিলাম—উনি রাজি হননি। আপনার কাছেও আসতে দেবেন না। শেষে আমাকে লুকিয়ে আসতে হয়েছে। আপনি আমাকে সন্ধানটা বলে দিন। সামান্য টাইপের কাজ করি আমি, তাছাড়াও একশ পাউন্ড হাতে পাই—সবই আপনাকে দেব।

—আপনাদের পদবী দেখছি আলাদা। সৎ-বাবা?

—হ্যাঁ, বিধবা হয়েই মা ওঁকে বিয়ে করেছিলেন। আমার চেয়ে মোটে পাঁচ বছর

দু মাসের বড়। মায়ের চেয়ে পনের বছরের ছোট। আমার বাবার ব্যবসা ছিল টটেনহ্যাম কোর্ট রোর্ডে। মিঃ উইন্ডিব্যাঙ্ক মাকে দিয়ে সেই ব্যবসা বিক্রি করে দিয়েছেন। নিজে তিনি নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে মদ বেচেন।

কাকার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি থেকে বছরে সুদ পাই একশ পাউন্ড। তিন মাস অন্তর সুদের টাকাটা মিঃ উইন্ডিব্যাঙ্ক এনে মাকে দেন। আমি টাইপ করে যা পাই তাতেই আমার নিজের খরচ চলে যায়।

—ইনি ডক্টর ওয়াটসন, আমার বন্ধু এবং সহকারী। আপনি সঙ্কোচ করবেন না। একটা বিষয় পরিষ্কার করুন—হসমার এঞ্জেলের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা—

—আমার বন্ধু—গ্যাসফিটারের নাচের আসরে তার সঙ্গে আমার আলাপ। বাড়ির বাইরে বেরুনোটা সৎ-বাবা একদম পছন্দ করেন না। এই নাচের আসরে যাওয়া নিয়েও খুব রাগারাগি হয়—কিন্তু আমি জেদ ধরায় রাগ করে ফ্রান্সে চলে যান। আমি ফোরম্যান মিঃ হার্ডি আর মার সঙ্গে গেলাম নাচের আসরে। সেখানেই আলাপ হল মিঃ হসমার এঞ্জেলের সঙ্গে।

—আচ্ছা! ফ্রান্স থেকে ফিরে এসেও তাহলে খুবই চটাচটি করেছেন?

—সেই ভয় আমারও ছিল। কিন্তু কিছুই বললেন না। আশ্চর্য হয়ে গেলাম ব্যাপারটাকে সহজভাবে মেনে নিতে দেখে।

—মিঃ হসমার কখনো বাড়িতে এসেছিলেন?

—এসেছিলেন একবার। আমিও দুবার তাঁকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম—তবে মিঃ উইন্ডিব্যাঙ্ক ফ্রান্স থেকে ফিরে আসার পর আর বাড়ি আসেন নি—উনি পছন্দ করেন না বলে।

—চিঠিপত্র দিতেন?

—হ্যাঁ, বাড়িতে না এলেও চিঠিপত্রে যোগাযোগ রাখতেন। বলেছিলেন, বাবা ফের ফ্রান্সে গেলে বাড়ি আসবেন।

—আপনাদের বিয়ের কথাবার্তা?

—প্রথমবার বেড়াতে যাওয়ার সময়ে হয়।

—কাজ করেন কোথায়?

—লেডেন হল স্ট্রীটে একটা অফিসের ক্যাসিয়ার উনি—নামটা জানি না। অফিসের ঘরেই থাকেন।

—চিঠিপত্র কোন ঠিকানায় লিখতেন?

—লেডেন হল পোস্ট অফিসের ঠিকানায়। পাছে অফিসের মেয়েরা পেছনে লাগে সেই কারণে বলেছিলেন ওই ঠিকানায় লিখতে। নিজেই গিয়ে নিয়ে আসতেন। টাইপ করে চিঠি লিখতে চেয়েছিলাম উনি রাজি হননি। বললেন, ওটা কৃত্রিম, আমার হাতের লেখার মধ্যেই উনি আমাকে দেখতে পান। ভালবাসা কতটা

গভীর হলে এমন কথা বলা যায়—ভাবুন।

হোমস সাগ্রহে টেবিলে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল—এরকম ছোটখাট ব্যাপার আর কিছু মনে পড়ে?

—মানুষটা খুবই অদ্ভুত। অত লাজুক প্রকৃতি যে রাত না হলে আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরুতেন না। কথা বলেন খুব আস্তে আস্তে। একবার গ্ল্যান্ডের অসুখ হয়েছিল—তার পর থেকেই জোরে কথা বলা বন্ধ। থাকেন খুব ফিটফাট। হৈ চৈ এড়িয়ে থাকেন। নিরালায় থাকতেই ভালবাসেন। চোখের অবস্থাও মনে হয় আমারই মত—রঙীন চশমা পরে থাকেন।

—মিঃ উইন্ডিব্যাঙ্ক ফ্রান্সে যাবার পর কি হল সে কথা এবারে বলুন।

—আমাদের বাড়ি আসতে লাগলেন। সৎ-বাবা ফিরে আসবার আগে এ সপ্তাহেই বিয়েটা সেরে ফেলতে চাইলেন। মা আমার চেয়েও ওকে বেশি ভালবাসতেন।

বিয়ের ব্যাপারে সৎ-বাবার মতামত নেবার কথা উঠলে মা বললেন—উনিই বাবাকে বুঝিয়ে বলবেন। তবুও আমি ফ্রান্সের ঠিকানায় একটা চিঠি দিয়েছিলাম—কিন্তু সে চিঠি তাঁর হাতে পড়েনি। চিঠি পৌঁছবার আগেই তিনি ইংল্যান্ড রওনা হন।

শুক্রবারেই ছিল বিয়ের দিন। উনি আমাকে আর মাকে একটা গাড়িতে তুলে দিয়ে পেছন পেছন এলেন আর একটা গাড়িতে। সেন্ট জেভিয়ার গির্জার সামনে গাড়ি থেকে নেমে দেখি—তাঁর গাড়িতে তিনি নেই। গাড়োয়ানও হতভম্ব। সে নিজের চোখে ভেতরে ঢুকতে দেখেছে তাঁকে। এ ঘটনার পর থেকে আর তাঁকে দেখতে পাইনি।

—এ তো খুব অদ্ভুত ব্যবহার দেখছি—আপনার কি মনে হয় ব্যাপারটা?

—ওঁকে যতটুকু বুঝতে পেরেছি—আমার সম্পত্তির ওপর কোন লোভ তাঁর ছিল না। বিয়ের লোভ দেখিয়ে গির্জা পর্যন্ত হয়রানি করবার মত মানুষ তিনি নন। কিছু একটা বিপদ ঘটেছে নিশ্চয়ই।

আগে প্রায়ই বলতেন—কখন কি ঘটে বলা যায় না—আমি যেন তাঁকে না ভুলি। আমাকে বাইবেল ছুঁইয়ে শপথ করিয়েও নিয়েছিলেন। বিয়ের দিন সকালেও বলেছিলেন, হঠাৎ যদি আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়—আমি যেন শপথ ভুলে না যাই।

তার এ সব কথার কোন মানে খুঁজে পেতাম না আমি। এখন বুঝতে পারছি—হঠাৎ কিছু ঘটে যেতে পারে—এমন একটা আশঙ্কা তিনি করতেন। কিন্তু বিপদটা যে কি ধরনের তা বুঝতে পারছি না।

—এ ব্যাপারে মার মনোভাব কেমন?

—খুব রেগে গেছেন—বলেছেন—এ নিয়ে যেন আর কোন কথা না বলি।

—সৎ-বাবার?

—বাবার কোন তাপ-উত্তাপ নেই। কেবল বললেন—খবর একদিন পাওয়া যাবে। কিন্তু আমি যে একদণ্ডের জন্যও তাঁর কথা ভুলতে পারছি না। বলতে বলতে ভদ্রমহিলার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে এল।

—মিস সাদারল্যান্ড, গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়াল হোমস, আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব কথা দিচ্ছি। আপনি শান্ত হবার চেষ্টা করুন। আর একটা কথা, হসমার এঞ্জেলকে ভুলে যান।

—একথা কেন বলছেন! তাঁর সঙ্গে কি আর দেখা হবে না?

—আমার তাই ধারণা। তবে তার সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আপনাকে জানাতে পারব আশা করছি। আপাততঃ চিঠিপত্র কিছু সঙ্গে থাকলে রেখে যান। আর তাঁকে দেখতে কেমন সেটাও জানিয়ে যান।

মিস সাদারল্যান্ড চারখানা চিঠি টেবিলের ওপরে রাখতে রাখতে বললেন—গত শনিবারের কাগজে ওর জন্য একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম।

—আপনার ঠিকানাটাও দরকার।

—৩১, লায়ন প্লেস, ক্যাম্বার ওয়েল।

—মিঃ উইন্ডিব্যাঙ্কের কারবারের ঠিকানা?

—ফেনচার্চ স্ট্রীটের ওয়েস্ট হাউস অ্যান্ড মারব্যাঙ্ক কোম্পানি।

—ওতেই হবে, ধন্যবাদ। যথাসময়ে খবর পাবেন। তবে আবার বলছি ব্যাপারটা ভুলে যাবার চেষ্টা করুন।

জল ছলছল চোখে করুণভাবে তাকিয়ে বিদায় নিলেন মিস সাদারল্যান্ড।

শরীর টানটান করে হাতপা ছড়িয়ে বসল হোমস। তারপর পাইপে তামাক ঠেসে আগুন ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে বলল, ডাক্তার, এরকম কেস আগেও ঘটেছে—নতুন কিছু নয়, তবে মেয়েটি খুবই সরল বিশ্বাসী—তাই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

বললাম, ঠিকই বলেছ—পোশাকআসাক দেখে প্রথমে অন্যরকম ধারণা হয়েছিল। কিন্তু এখন শ্রদ্ধা হচ্ছে! সরলভাবে যে বিশ্বাস করতে পারে তার মন পবিত্র না হয়ে পারে না।

—সেই কারণেই শপথের কথাটা ভুলতে পারছে না।

—কিন্তু ভদ্রমহিলা টাইপের কাজ করেন, আবার চোখ খারাপ—এ তুমি বললে কি করে প্রথম দর্শনেই। ভদ্রমহিলার মত আমিও কম অবাক হইনি।

হোমস হেসে বলল, ভায়া, মেয়েদের আস্তিন আর পুরুষের ট্রাউজার্সের হাঁটু

আগে দেখি আমি। প্রয়োজনীয় অনেক খবর সেখানেই থাকে। মেয়েটির আস্তিনে বেগনী দাগ সহজেই সকলের নজরে পড়বে—কিন্তু কব্জির ঠিক ওপরে সমান্তরাল দুটো রেখা—আমার নজরে পড়েছিল।

টাইপের টেবিলে কাজ করলে এরকম দাগ দেখা যায়। অবশ্য সেলাই মেসিনেও হয় তবে সে দাগটা তেমন চওড়া হয় না।

নাকের দু' প্যাসনে চশমার দাগ দেখে বুঝেছিলাম চোখ ভাল নয়। এও সেই পর্যবেক্ষণ আর যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণ।

ভদ্রমহিলা ব্যাপারটা নিয়ে এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে বুঝতেই পারেননি বেরুবার সময় দু'রকমের জুতো পরেছেন। বোতামগুলোও ঠিক ঠিক লাগাতে পারেননি। আমার কাছে আসবার জন্য অস্থির ভাবে ছুটতে ছুটতে বেরিয়েছেন।

আর একটা ব্যাপার তোমার নজরে পড়েছে কিনা জানি না—ছেঁড়া দস্তানার ফাঁক দিয়ে আঙুলের কালির দাগ আমার চোখ এড়ায়নি। টাটকা কালির দাগ। বেরুবার আগে একটা চিঠি লিখে এসেছেন। তাড়াহুড়োয় দোয়াতে কলমটা একটু বেশি ডুবিয়ে ফেলেছিলেন। আঙুলের টাটকা দাগটা আজ সকালেই লেগেছিল বলে অত স্পষ্ট হয়ে ছিল।

যাকগে, এবার ভদ্রমহিলার রেখে যাওয়া কাগজপত্র থেকে বিজ্ঞাপনটা পড়ে শোনাও একবার।

টাইম কাগজের বিজ্ঞাপনটা পড়লাম ঃ

হসমার এঞ্জেল—গত চোদ্দ তারিখ থেকে নিখোঁজ। লম্বায় পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, পুরুষালী গড়ন। বর্ণ পাণ্ডুর। সামনে সামান্য টাক আছে। চুলের রঙ কালো, গোঁফ আর জুলপিও কালো। রঙীন চশমা পরেন, ফিসফিস করে কথা বলেন। গায়ে কালো ফ্রককাট, কালো ওয়েস্ট কোট, ধূসর ট্যুইডের ট্রাউজার্স আর সোনার অ্যালবার্ট চেন। পায়ে ইলাস্টিক বুট আর বাদামী চামড়ার পটি। লীডেন হল স্ট্রীটের একটা অফিসে ক্যাসিয়ারের কাজ করেন—

—ব্যস ওতেই হবে ; চিঠিগুলোর ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে বলে উঠল হোমস; চিঠিগুলো মামুলি—তবে একটা বিষয় লক্ষণীয়! সব চিঠিই টাইপ করা—হসমার এঞ্জেল নামটা পর্যন্ত। ঠিকানা নেই, কিন্তু তারিখ আছে—তবে ওতে কিছু যায় আসে না—নামের সইটাই আমার কাছে যথেষ্ট।

—চুক্তি না রাখার মামলায় অস্বীকার করবার মতলবেই সইটা টাইপ করেছে—এই তো?

—না ভায়া—তা নয়। যাইহোক, কাজে হাতে দেওয়া যাক—

—কি ভাবে নামবে বলে ভাবছ?

—দুটো চিঠি লিখতে হবে আগে। লন্ডনের একটা কোম্পানিকে আর মিস্টার উইন্ডিব্যাঙ্ককে। তাঁকে কাল সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করবার কথা লিখতে হবে। দুটো চিঠির জবাব না আসা পর্যন্ত এখন আর কিছু করবার নেই।

হোমসকে আমি চিনি। নিশ্চিন্ত মুখভাব দেখেই বুঝলাম—রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেছে। নতুন করে চিন্তা ভাবনার কাজ শেষ হয়েছে।

রুগী দেখা শেষ করে পরদিন ছটা নাগাদ বেকার স্ট্রীটে উপস্থিত হলাম। আমাকে দেখে খুশি হল। বলল, বুঝলে ওয়াটসন, অসম্ভব সেয়ানা লোক—আইন তার চুল পর্যন্ত ছুঁতে পারবে না।

হোমসের কথা শেষ হতে না হতেই এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকল। বছর তিরিশেক বয়স—দাড়ি গোঁফ কামানো—ফ্যাকাশে রঙ, ধূসর চোখ।

শিষ্টাচার বিনিময়ের পর চেয়ার টেনে বসে বলল, ক্ষমা করবেন, আসতে দেরী হয়ে গেল। মেয়েটা বড্ড জেদী আর আবেগপ্রবণ—সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এভাবে আপনাকে জ্বালাতন করতে আসা ঠিক হয়নি তার।

আমি অনেকবারই বলেছি হসমার অ্যাঞ্জেলকে খুঁজে পাওয়া যাবে না—কিন্তু কোন কথা শুনছে না মেয়েটা।

হোমস শান্ত শীতল কণ্ঠে বলল—আমার বিশ্বাস—লোকটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

কথাটা শুনে উইন্ডিব্যাঙ্ক যেন আঁৎকে উঠল। বলল—তাই নাকি—তাহলে তো খুবই ভাল খবর।

—মিস্টার উইন্ডিব্যাঙ্ক, হাতের লেখার মত টাইপের লেখারও আলাদ আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে। এক একটা মেসিনে এক এক রকম লেখা হয়—টাইপের বৈশিষ্ট্য অনুপাতে। চোট খাওয়া টাইপ, ঘষে যাওয়া টাইপ—খুব নতুন মেসিনে না হলে এই বৈশিষ্ট্যগুলো ঠিকই নজরে পড়ে। আপনার চিঠিটা লক্ষ্য করুন—প্রত্যেকটা E খারাপ R-এর তলায় বসে যাওয়া—ম্যাগনিফাইং দিয়ে দেখলে ওরকম আরও অনেক বৈশিষ্ট্য নজরে পড়বে।

উইন্ডিব্যাঙ্ক নির্বিকার চোখে তাকিয়ে থেকে শুনতে থাকে হোমসের কথা। হোমস বলতে থাকে—এবারে এই চারখানা চিঠির লেখা দেখুন—প্রত্যেকটার E খারাপ— R-এর তলা চোট খাওয়া। এবং আপনার চিঠির হরফের সবকটি বৈশিষ্ট্যই অন্যান্য টাইপে হুবহু রয়েছে।

—বাজে কথা শুনবার মত সময় আমার নেই। ছোকরাকে ধরতে যদি পারেন আমাকে জানাবেন। বলতে বলতে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে পা বাড়ায় উইন্ডিব্যাঙ্ক।

হোমস লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে দরজায় চাবি লাগিয়ে বলল, সংযত হয়ে

বসুন মিঃ উইন্ডিব্যাঙ্ক। লাফালাফি করে সুবিধে হবে না—

রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখে বসে পড়ল উইন্ডিব্যাঙ্ক। বলল, কিন্তু এ কেসে মামলা হয় না, কিছুই করতে পারবেন না।

—জানি, বয়সে বড় মহিলাকে যে লোক টাকার লোভে বিয়ে করে, আর সৎ-মেয়ের টাকা সংসারে খরচ করে—কোন নিষ্ঠুর আচরণ করতেই তার বুক কাঁপে না।

বছরে কড়কড়ে একশ পাউন্ড সুদের টাকা হাতে পায় মেয়েটা। তার বিয়ে হয়ে গেলে সেই টাকাটা হাতছাড়া হবার ভয়। সেকারণে বাড়ি থেকে বেরোতে দেওয়া হত না তাকে। কারো সঙ্গে মিশতে পর্যন্ত দেওয়া হত না।

কিন্তু মেয়েটি জেদী—একদিন নাচের আসরে যাবে বলে জেদ ধরে বসল। মেয়েটির মা আর সৎ-বাবা তখন এক অদ্ভুত ফন্দী আঁটল। সৎ-বাবা ছদ্মবেশ ধরল ; রঙীন চশমা পরে চোখ ঢাকল। নকল গোঁফ দাড়ি আর জুলপি লাগিয়ে মুখের চেহারা গোপন করল। গলা শুনে যাতে চিনতে না পারে সেজন্য অসুখের অছিলায় ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল, একই কারণে মেয়েটির সঙ্গেও দেখা করত রাত্রে।

চোখ খারাপ থাকায় সরল বিশ্বাসী মেয়েটি এই হসমার এঞ্জেলকে ধরতে পারল না। মেয়েটির অন্যের সঙ্গে বিয়ের পথও বন্ধ করা হল কৌশলে তাকে দিয়ে বিয়ের চুক্তি করিয়ে নিয়ে।

মেয়েটির পবিত্র সরল মনে একবারের জন্যও সন্দেহ জাগেনি, কী নিষ্ঠুর খেলা শুরু হয়েছে তাকে নিয়ে। প্রেমের খেলায় নেমে মেয়েটিকে দিয়ে বাইবেল ছুঁইয়ে শপথ করিয়ে নেওয়া হল—অন্য কাউকে যেন সে মনে ঠাঁই না দেয়!

মেয়েটির আবেগপ্রবণ মন এভাবে দীর্ঘদিন মুহ্যমান রাখার উদ্দেশ্যে বিয়ের দিন সকালে এমন আভাসও দেওয়া হল—হঠাৎ কিছু একটা ঘটে যেতে পারে।

বিয়ের খেলায় বিবেকহীন লোকটাকে হুট করে নামতে হত না যদি না ফ্রান্সে যাতায়াতে অসুবিধা হত। হসমার এঞ্জেল গাড়ির এ দরজা দিয়ে ঢুকে ও দরজা দিয়ে গোপনে নেমে গেল—গির্জায় পৌঁছে দেখা গেল গাড়ি ফাঁকা। বলুন, ঠিক ঠিক বলতে পারছি তো?

—ঠিক কি বেঠিক সে আপনিই স্থির করুন। কিন্তু আমি কোথাও আইন ভঙ্গ করিনি। আর আপনি আমাকে আটকে রেখেছেন বে-আইনি ভাবে—এই বুদ্ধিটুকুও আপনার—

দরজার চাবি খুলে দিতে দিতে হোমস বলল—কথাটা ঠিকই বলেছেন—আপনাকে আইন শাস্তি দিতে পারে না। কিন্তু মেয়েটার যে কোন বন্ধু তা পারে। ওই যে ঘোড়ার চাবুকটা দেখছেন—ওটা দিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত

চাবকানো উচিত আপনাকে।

মিঃ উইন্ডিব্যাঙ্ক তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াতেই হোমস দেয়ালে ঝোলানো চাবুকটার দিকে হাত বাড়াল। মুহূর্তের মধ্যে ঘর থেকে তিন লাফে করিডোরে লাফিয়ে পড়ল উইন্ডিব্যাঙ্ক।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই জানলায় ঝুঁকে পড়ে দেখতে পেলাম—চোঁ-চা দৌড়চ্ছে রাস্তা দিয়ে মিঃ উইন্ডিব্যাঙ্ক—পেছনে একবারও না তাকিয়ে।

হোমস চেয়ারে বসে পড়ে হাসতে লাগল দম ফাটা হাসি হো হো করে। হাসতে হাসতে বলল—লোকটা নিজের কাজেই একদিন ধরা পড়ে ফাঁসি কাঠে ঝুলবে। তবে যাই বল—কেসটা বেশ মজার।

বললাম, লোকটাকে ধরলে কি করে তা তো বুঝতি পারছি না।

—খুবই সহজ মামলা। মোটিভ বিচার করেই হেঁয়ালি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। শোন বলছি, এ ব্যাপারে সবচেয়ে লাভ মেয়েটির সৎ-বাবার। তারপর, তাকে আর হসমার এঞ্জেলকে কখনো এক জায়গায় দেখা যায়নি । মিঃ উইন্ডিব্যাঙ্কের অনুপস্থিতিতেই মিঃ হসমারের আবির্ভাব হয়েছে।

ফিসফিস করে কথা বলা, জুলপি আর রঙীন চশমা —এসব ছদ্মবেশ ধরতে কাজে লাগে। হাতের লেখাটা এতই পরিচিত যে সই-এর দুটো শব্দ লিখতেও টাইপ করে লিখতে হল!

সন্দেহগুলো যাচাই করবার উদ্দেশ্যে উইন্ডিব্যাঙ্কের অফিসের ঠিকানায় চিঠি লিখলাম। বিজ্ঞাপনে হসমার এঞ্জেলের মুখে জুলপি, গোঁফ ও রঙীন চশমার কথা আছে। এইসব বাদ দিয়ে চেহারার একটা বর্ণনা খাড়া করে জানতে চাইলাম এই ধরনের কেউ তাদের কোম্পানির ট্রাভেলিং সেলসম্যানের কাজ করে কিনা।

উইন্ডিব্যাঙ্ককেও লিখলাম এখানে আসতে। তার জবাবে যে চিঠি এল তাতে দেখলাম হসমার এঞ্জেলের চিঠির টাইপে যে সব গোলমাল নজরে পড়েছে ওই চিঠিতেও তাই রয়েছে।

কোম্পানির জবাবও পেয়ে গেলাম—জেমস উইন্ডিব্যাঙ্কের চেহারার সঙ্গে আমার বর্ণনা মিলে গেল। ঘরে বসেই ফয়সালা হয়ে গেল মামলা।

—এবার কি করবে? মিস সাদারল্যান্ডের কি হবে?

—কি আর হবে—মেয়েদের ভুল ভাঙাবার কাজটা খুবই বিপজ্জনক ভায়া।



বসকোম ভ্যালী মিস্ট্রী

—দিন দুয়েকের জন্য বসকোম ভ্যালী যেতে পারবে? লেসট্রেড-এর তলব পড়েছে। প্যাডিংটন থেকে সওয়া এগারটায় গাড়ি আছে।

স্ত্রীকে নিয়ে প্রাতঃরাশ করতে বসে হোমসের এই টেলিগ্রামটা পেলাম। হোমসের ব্যাপারে স্ত্রীর উৎসাহের অভাব হয় না। সুতরাং ঝটিতি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে যথাসময়ে স্টেশনে উপস্থিত হলাম।

হোমস আমার প্রতীক্ষাতেই ছিল। অতঃপর একসঙ্গেই ট্রেনে চেপে বসলাম।

কামরাটা ফাঁকা—যাত্রী বলতে আমরা দুজন। একগাদা কাগজ খুলে নিয়ে বসল বন্ধুবর। মাঝে মাঝে কীসব টুকে নিতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পর কাজ শেষ হলে কাগজের তাড়া বাঙ্কের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার দিকে ঘুরে বসল।

—যে কেস খুব সহজ বলে মনে হয়—জটিলতা তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। এই কেসটাও মনে হয় খুব সহজ—কিন্তু আসলে খুবই গোলমেলে। অভিযোগটা আনা হয়েছে ছেলের বিরুদ্ধে—পিতৃহত্যার অভিযোগ। রীতিমত খুনের মামলা—কিন্তু তলিয়ে দেখার মত অনেক বিষয় রয়েছে—শোন তাহলে।

হু হু শব্দে হাওয়া কেটে ছুটে চলেছে ট্রেন। নির্জন কামরায় মুখোমুখি বসে হোমসের বিবরণ শুনতে লাগলাম।

হোমস বলতে লাগল—বসকোম ভ্যালীর সবচেয়ে বড় জায়গীরদার হলেন জন টার্নার। ভদ্রলোক অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন। অনেক টাকা রোজগার করে এনে জমিজমা কিনে এখন চাষবাস করছেন।

অস্ট্রেলিয়ায় থাকতে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল চার্লস ম্যাকার্থি নামে একজনের সঙ্গে। এখানে তিনি মিঃ টার্নারের নিকটতম প্রতিবেশী—টার্নার একটা গোলাবাড়ি ভাড়া দিয়েছেন তাকে। বন্ধুর তুলনায় অবস্থাপন্ন হলেও তিনি সহজভাবে মেলামেশা করতেন।

দুজনেই বিপত্নীক। টার্নারের এক মেয়ে, ম্যাকার্থির এক ছেলে—দুজনেরই বয়স আঠার। এদের দুজনের কেউই প্রতিবেশীদের সঙ্গে বড় একটা মেলামেশা করতেন না। টার্নারের বাড়িতে কাজের লোক ছ'জন—ম্যাকার্থির দু'জন।

গত সোমবার ৩রা জুন বিকেল তিনটে নাগাদ ম্যাকার্থি বসকোম হ্রদে যান। যাবার সময় চাকরকে বলে যান—কার সঙ্গে নাকি দেখা করার কথা আছে। তারপর আর তিনি বাড়ি ফেরেননি।

গোলাবাড়ি থেকে হ্রদের দুরত্ব সিকি মাইল। যাওয়ার পথে দু'জন দেখেছে ম্যাকার্থিকে। একজন এক বুড়ি—অন্যজন বাগানের মালি। ম্যাকার্থির অনেকটা পেছনে তার ছেলে জেমসকেও যেতে দেখা গেছে—জেমসের হাতে বন্দুক ছিল।

বনের মধ্যে সেই সময় ফুল তুলছিল মালির মেয়ে—ব্যাপারটা তারও চোখে পড়েছে। দুজনে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল—ছেলেকে খুবই মারমুখো মনে হচ্ছিল।

ভয় পেয়ে মেয়েটা দৌড়ে এসে মাকে সব ঘটনা বলতে শুরু করেছে এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে জেমস বলল—তার বাবা হ্রদের ধারে মরে পড়ে আছে।

জেমসের তখন বিহ্বল অবস্থা। হাতে বন্দুক নেই। মাথাও টুপিশূন্য—আস্তিনে কাঁচা রক্তের দাগ। জেমসের সঙ্গে হ্রদের ধারে গিয়ে দেখা যায় ম্যাকার্থির মৃতদেহ পড়ে রয়েছে মাটিতে।

খুব ভারী ভোঁতা ধরনের কোন অস্ত্র দিয়ে মেরে মাথার খুলি ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আঘাত করলে যে রকমটা হতে পারে আঘাতটা সে-রকমের। বন্দুকটাও পাওয়া গেছে খানিকটা তফাতে ঘাসের ওপরে।

অতঃপর ছেলেকে গ্রেপ্তার করে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়েছে। টার্নারের মেয়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লেসট্রেডকে দিয়ে তদন্ত করাচ্ছে। হালে পানি না পেয়ে শেষমেশ লেসট্রেড আমার শরণ নিয়েছে।

—কিন্তু ঘটনা যা তাতে তো বোঝা যাচ্ছে জেমসই দোষী।

—না ভায়া—ওভাবে ভাসা ভাসা দেখলে হবে না। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ছাড়াও বিচার করবার মত বিষয় অনেক রয়েছে এ কেসে।

লেসট্রেডের চোখে পড়েনি এমন অনেক কিছু আমার চোখে পড়তে পারে। যেমন ধর—একটা উদাহরণ দিচ্ছি—তোমার শোবার ঘরের জানালাটা যে ডান দিকে লেসট্রেডের হয়ত এ ব্যাপারটা নজর এড়িয়ে যাবে—কিন্তু আমার চোখে ধরা পড়েছে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—সত্যিই তো, জানালাটা ডান দিকেই—কিন্তু জানলে কি করে?

—তোমার অভ্যাসগুলোর সঙ্গে আমার যে পরিচয় রয়েছে। মিলিটারিতে থাকার ফলে প্রতিদিন দাড়ি কামানো তোমার অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। এই সব মাসে রদ্দুরে দাঁড়িয়ে কামাও—কিন্তু দেখছি দাড়ি সেভাবে কামানো হয়নি। তার মানে যে জানালায় দাঁড়াও সেখানে রোদ থাকে না সকালে—সেকারণেই ব্যাপারটাও আমার নজরে পড়েছে।

খুঁটিয়ে দেখলে এরকম গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু আবিষ্কার হয়ে পড়ে ভায়া—এ কেসেও সে সুযোগ আছে।

—কি রকম শুনি?

—প্রথমেই নজরে আসছে ছেলের বক্তব্য। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অকুস্থল থেকে গোলাবাড়িতে ফিরে আসার পর। সেই সময়ে সে নাকি বলেছে—সে জানত যে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে এবং তার পরেই বলেছে খুন সে করেনি।

ভায়া পাগলকে পাগল বললেই ক্ষেপে যায়—গ্রেপ্তারের সময় মেজাজ দেখানোই অপরাধীর সাধারণ লক্ষণ। কিন্তু সেরকম কিছু না করে সোজা কথাটা সে সোজা ভাবেই বলতে চেয়েছে। অর্থাৎ তার সঙ্গে কথা কাটাকাটির পরেই বাপ খুন হয়েছে—স্বাভাবিক ভাবে সকলেই বলবে—খুনী সেই। কিন্তু ছেলেটা যে নির্দোষ এখনি হলপ করে বলতে পারি।

—কিন্তু পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি তো সম্পূর্ণই তার বিরুদ্ধে।

—তা হতে পারে। আর আমার কাজও তো সেখানেই। এই দেখো—গ্রেপ্তারের পর ঘটনা সম্পর্কে ছেলের জবানবন্দী, সে বলেছে : তিন দিন পর যখন বাড়ি ফিরলাম তখন বাবা বাড়ি ছিলেন না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বাবা গাড়ি করে ফিরলেন। গাড়ি থেকে নেমেই আবার হন হন করে বেরিয়ে গেলেন। কোন দিকে গেলেন বুঝতে পারলাম না। খানিক পরে আমিও বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়লাম—হ্রদের পাড়ে খরগোস শিকার করব বলে।

পথে মালির সঙ্গে দেখা হল। মালি বলেছে—আমি বাবার পেছনে পেছনে নাকি যাচ্ছিলাম। কথাটা সে ঠিক বলেনি। কেন না, আমি জানতামই না বাবা আমার সামনে আছেন।

হ্রদের কাছাকাছি হতে একটা কু-ডাক শুনতে পেলাম। শব্দটা আমার পরিচিত।

বাবা ওভাবে আমাকে ডাকেন—আমিও বাবাকে ডাকি।

আমি হ্রদের ধারে এগিয়ে গিয়ে দেখি বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে যেন অবাক হলেন—রেগে গিয়ে তেড়ে এলেন। বাবার মেজাজ খুবই উগ্র। আমি তাই কথা না বাড়িয়ে বাড়ির পথ ধরলাম।

কিছুদূর এগিয়েছি এমন সময় পেছনে বিকট চিৎকার শুনতে পেলাম। দৌড়ে গিয়ে দেখি বাবা মাটিতে পড়ে রয়েছেন—সাংঘাতিক ভাবে জখম হয়েছে মাথাটা। বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরলাম। দু একটা কথা যেন কি বলবার চেষ্টা করলেন—বুঝতে পারলাম না—মনে হল (RAT) ইঁদুর সম্পর্কে কিছু। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাবা মারা গেলেন।

কাছেই বাড়িটা মিঃ টার্নারের। ছুটে গিয়ে সব কিছু জানালাম। আমি ভাল করেই জানি বাবার শত্রু কেউ নেই। বন্ধুও বিশেষ নেই অবশ্য। তবুও বাবা এভাবে খুন হলেন কী করে বুঝতে পারলাম না?

ওয়াটসন, এরপর করোনারের জিজ্ঞাসার উত্তরে কথাগুলো তুমি শোন :

করোনার জিজ্ঞেস করে—(RAT) ইঁদুর সম্পর্কে বাবা কি বলছিলেন—বুঝতে পেরেছিলে।

—না—মনে হয় ভুল বকছিলেন।

—বাবার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয় কি নিয়ে?

—সে কথা বলব না। তার সঙ্গে এ ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নেই।

—সেটা বিচারের দায়িত্ব কোর্টের। না বললে তোমার ক্ষতি হবে।

—কিছু যায় আসে না।

—তুমি বলেছ, কু-ডাক দিয়ে বাবা তোমাকে ডাকতেন। কিন্তু তুমি যে বাড়ি ফিরেছ তা তো তিনি জানতেন না। তাহলে ডাকলেন কেন?

ঘাবড়ে গিয়ে জেমস জবাব দিল—তা বলতে পারব না।

—পেছনে চিৎকার শুনে তুমি বাবার কাছে ছুটে এসেছিলে—সেই সময় সন্দেহজনক কিছু দেখেছিলে?

দু এক মিনিট চিন্তা করে জেমস জবাব দেয়—আমার তখন পাগলের মত অবস্থা। কোনদিকে খেয়াল করবার মন ছিল না। তবে মনে হচ্ছে সেই সময় যেন বাঁদিকে ধূসর রঙের কি একটা পড়ে ছিল। অনেকটা আলখাল্লার মত। তবে বাবার পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সেটা আর চোখে পড়েনি।

—মিঃ টার্নারের বাড়ি যাওয়ার সময়?

—তার আগেই দেখলাম সেটা নেই।

—জিনিসটাকে তোমার কি বলে মনে হয়?

—কাপড়ের মত কিছু—বাবার মৃতদেহের বেশ খানিকটা দূরেই ছিল।

—কত দূরে মনে হয়?

—প্রায় বার গজ তফাতে।

—বন থেকে কত দূরে?

—একই রকম হবে।

—তুমি থাকতে থাকতেই জিনিসটা উধাও হয়ে গেল—তুমি কিছুই জানতে পারলে না?

—আমি সেদিকে পেছন করে বসেছিলাম।

জেরার বিবরণ পড়া শেষ করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হোমস আমার দিকে তাকাল। বললাম—করোনার ঠিক ঠিক পয়েন্টেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। বাবা তাকে বাড়ি ফিরে আসতে দেখেনি—তাহলে ডাকল কেন? দ্বিতীয়তঃ ঝগড়ার বৃত্তান্ত চেপে যাওয়া। তারপর, মরবার আগে ইঁদুর (RAT) সম্বন্ধে কিছু বলতে চেয়েছিলেন—ছেলে মানেটা কিছু বুঝতে পারেনি।

হোমস সহাস্যে বলল—পয়েন্টগুলো বড় রকমের অসঙ্গতি তা ঠিক। কিন্তু যে মিথ্যে বলে সে সন্দেহের বীজ থাকতে পারে এমন অসঙ্গতি রেখে কখনো কথা বলে না। আর পুরো ব্যাপারটা বানিয়ে বলার মত কল্পনাশক্তি যদি ছেলেটার থাকত স্বচ্ছন্দেই সে তিনটে কাল্পনিক গল্প শুনিয়ে দিতে পারত। আসলে এই অসঙ্গতি গুলোই ছেলেটা যে মিথ্যে বলেনি তার প্রমাণ। যাইহোক—সুইনডনে পৌঁছে যা করবার করা যাবে।

রস শহরে পৌঁছলাম যথাসময়ে।

আমাদের জন্য সরাইখানায় ঘর ঠিক করে স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল ইন্সপেক্টর লেসট্রেড। ঘরে পৌঁছে চা খেতে খেতে লেসট্রেড বলল, গাড়িও ঠিক করে রেখেছি—এখুনি চলুন, অকুস্থলে যাওয়া যাক। মেয়েটা আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে।

লেসট্রেডের কথা শেষ হতে না হতেই একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল সরাইখানার দরজায়। ঘরে ঢুকল পরমা সুন্দরী এক তরুণী। চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। আমাদের দুজনের ওপর একপলক চোখ বুলিয়েই ঠিক চিনতে পারল হোমসকে। বলল, আপনাকে দেখে এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম। এইটুকু বয়স থেকে জেমসকে আমি জানি। ও নির্দোষ—কখনোই খুন করতে পারে না। আমার কথা আপনি অবিশ্বাস করবেন না। ওর জবানবন্দীটা নিশ্চয় পড়েছেন—আপনার কি মনে হয়নি ও নির্দোষ?

উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় একনিঃশ্বাসে বলে গেল মেয়েটি।

হোমস বলল, হ্যাঁ, সেই রকমই মনে হয়েছে।

লেসট্রেড-এর দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাচ্ছিল্যের সুরে বলল মেয়েটি—আমার কথা খাটল তো! মিঃ হোমস ঠিক কথাই বলেছেন, জেমস নির্দোষ।

লেসট্রেড কি বলতে যাচ্ছিল, মেয়েটি আবার বলে উঠল—বাবার সঙ্গে ঝগড়ার কারণটা জেমস কেন বলতে চায়নি জানেন, প্রসঙ্গটা ছিল আমাকে নিয়ে। জেমসের বাবার ইচ্ছে আমার সঙ্গে ছেলের বিয়েটা হোক। কিন্তু দুজন ছেলেবেলা থেকে ভাইবোনের মত মানুষ হয়েছি। তাই প্রায়ই এ নিয়ে বাপছেলেতে ঝগড়া হত।

হোমস জিজ্ঞেস করল—তোমার বাবার মত ছিল বিয়েতে?

—না তাঁরও মত নেই এ বিয়েতে।

কথা বলতে বলতে সুন্দর মুখটা লাল হয়ে উঠল মিস টার্নারের।

—তোমার বাবার সঙ্গে কাল একবার দেখা করতে যাব ভাবছি।

—বাবা তো অসুস্থ—বছর দুই থেকেই। তার ওপর এই আঘাতটা বড্ড বেজেছে বাবাকে। ভিক্টোরিয়ায় থাকতেই তো বন্ধুত্ব দুজনের।

হোমস সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল—সোনার খনির কাজে ছিলেন?

—হ্যাঁ। টাকা রোজগার করেছেন ওখানেই।

—খবরটা জানিয়ে ভাল করলে, আমার কাজে লাগবে।

—জেলখানায় জেমসের সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করতে যাবেন? ওকে বলবেন, আমি জানি ও কোন দোষ করেনি।

—বলব, অবশ্যই বলব।

—আমি আর অপেক্ষা করব না। আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতেই ছুটে এসেছিলাম—বাবার অবস্থা মোটেই ভাল নয়।

বলতে বলতে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল মিস টার্নার।

লেসট্রেড গুম হয়ে বসে ছিল। গম্ভীর গলায় বলল, মেয়েটাকে মিথ্যে আশা দেওয়াটা কি ঠিক কাজ হল মিঃ হোমস! জেমসের মুক্তি পাবার কোন আশাই তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।

হোমস হেসে বলল, জেমসকে খালাস করতে পারব আমার বিশ্বাস। চল জেলখানায় একবার তার সঙ্গে দেখা করে আসি। অনুমতি পাওয়া যাবে তো?

—কেবল আপনি আর আমি দেখা করতে পারব।

—ওয়াটসন, তাহলে বেরুচ্ছি আমরা, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ফিরে আসব।

সঙ্গে গিয়ে ওদের ট্রেনে তুলে দিয়ে এলাম। ঘরে ফিরে এই নিঃসঙ্গ সময়টা বই পড়ে কাটাব ভেবেও মন বসাতে পারলাম না। মনটা কেবলই খুনের রহস্যে

ঘোরাফেরা করতে লাগল। ছেলেটা কি সত্যিই নির্দোষ? কিন্তু পারিপার্শ্বিক তথ্যাদি সবই ওর বিরুদ্ধে। হোমসের সিদ্ধান্ত ছেলেটা নির্দোষ। হোমসের যুক্তি-বিচার অভ্রান্ত বলেই আমি বিশ্বাস করি। বাবার কাছ থেকে সরে এসে বাড়ি মুখো হবার সময় থেকে আরম্ভ করে আবার চিৎকার শুনে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই ভয়াবহ ঘটনাটা ঘটেছিল। আর ছেলেটি যখন বাবার দিকে মুখ করে বসে ছিল সেই সময়েই কেউ সেখানে এসে নিঃশব্দে পেছন থেকে ধূসর জিনিসটা সরিয়ে নিয়ে যায়। কাজটা কি তাহলে খুনীরই? জিনিসটাই বা কি? আর প্রাণ যাবার মুহূর্তেই বা ইঁদুর ইঁদুর (RAT) বলে বিড়বিড় করলেন কেন মিঃ ম্যাকার্থি? বিশেষ কিছু কি বলতে চেয়েছিলেন ভদ্রলোক ছেলেকে? সব কটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে কেমন জট পাকিয়ে যেতে লাগল।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কি ভাবে যে সময় কেটে গেছে বুঝতেই পারিনি। হোমস ঘরে ঢুকতে যেন আত্মস্থ হলাম।

—দেরি হয়ে গেল হে। লেসট্রেডকে শহরেই ছেড়ে এলাম। আমাদের একবার অকুস্থলে যাওয়া দরকার। বৃষ্টি না নামে আবার সেই ভয়ই করছি।

—জেলখানায় জেমসের সঙ্গে দেখা হল?

—হল, কিন্তু হতাশ হলাম। কথাবার্তা শুনে প্রথমে মনে হল বুঝি খুনীকে আড়াল করবার চেষ্টা করছে। পরে দেখলাম তা নয়, নিজেই খুব ঘাবড়ে গেছে। খুব চৌকস ছেলে নয়—মনটা সরল। দেখতেও সুদর্শন্।

—মিস টার্নারের মত মেয়েকে বিয়ে করতে যে চায় না তাকে বুদ্ধিমান আমিও বলতে পারি না।

—ভায়া যা ভাবছ তা নয়। ব্যাপার আছে। একটা মর্মস্পর্শী ঘটনা রয়েছে এর পেছনে। জেমস ছোকরা স্কুল বোর্ডিং-এ থাকবার সময়ে ব্রিস্টলের একটা হোটেলের মেয়ের পাল্লায় পড়ে। বুঝতেই পারছ ওরকম নরম ছেলে—রেজেস্ট্রী বিয়েটা গোপনেই সেরেছে। কিন্তু বাপকে বা অন্য কাউকে খুলে বলতে পারেনি কিছু। এদিকে বাপ ক্রমাগত চাপ দিয়ে চলেছে মিস টার্নারকে বিয়ে করবার জন্য। বাপের কাছে ধমকও কম খাচ্ছে না এ জন্য। হ্রদের ধারে হাতপা ছুঁড়ে বাবার কথারই প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সত্যি কথাটা বলতে পারছে না, তাহলে পরমুহূর্তে বাবা বাড়ি থেকে বার করে দেবে।

তিন দিন ব্রিস্টলে স্ত্রীর সঙ্গে কাটিয়ে বাড়ি ফিরেছে সবে—তখনই খুন হয়ে গেল বাবা। এদিকে হয়েছে আর-এক কাণ্ড। কাগজে খুনের বিবরণ পড়ে মেয়েটি বুঝতে পেরেছে—ফাঁসির দড়ি তার গলায় ঝুলছে। নিজে থেকেই তাই চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, তার আগের স্বামী বর্তমান। সুতরাং জেমসের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। বিপদ বুঝে নিজে থেকেই কেটে পড়েছে মেয়েটি।

—হৃদয়বিদারক ঘটনা সন্দেহ নেই! কিন্তু বুঝতে পারছি না খুনটা তাহলে করল কে? জেমসকেই নির্দোষ বলছ তুমি কি করে?

—দুটো ব্যাপার নিয়ে চিন্তা কর তাহলে আমার সিদ্ধান্তটা যাচাই করতে পারবে। মিঃ ম্যাকার্থি জানতেন না যে ছেলে ব্রিস্টল থেকে ফিরে এসেছে। তাহলে তিনি কু-করে ডাকলেন কেন? আর হ্রদের ধারেও তিনি গিয়েছিলেন অন্য কারুর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি জানতেন ছেলে এ তল্লাটেই নেই। এ পর্যন্ত পৌঁছান গেছে—দেখা যাক।

সকালেই গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হল লেসট্রেড। তার গাড়িতেই গোলাবাড়ি আর হ্রদের দিকে রওনা হলাম আমরা।

পথে যেতে যেতে লেসট্রেড বলল, মিঃ টার্নার এ ধকলটা কাটিয়ে উঠতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না। ডাক্তার তো আশা এক রকম ছেড়েই দিয়েছেন।

হোমস জিজ্ঞেস করল—বয়স হয়েছে বুঝি?

—তা কম হয়নি, ষাট তো বটেই। তবে বিদেশে থাকার সময়ে শরীরের ওপরে অত্যাচার করেছেন যথেষ্ট। এমনিতেই দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন—এবারে বন্ধুর শোকে একেবারে ভেঙে পড়েছেন। দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব—বন্ধুর জন্য করেছেনও যথেষ্ট। অতবড় গোলা বাড়িটা—ভাড়া পর্যন্ত নেন না।

হোমস চিন্তিতভাবে যেন স্বগতোক্তি করল—খবরটা ভাল—কাজে লাগবে মনে হচ্ছে।

—বন্ধুর জন্য অনেক করেছেন ভদ্রলোক—এখানকার সব লোকেই তা জানে।

হোমসের চোখ সহসা শাণিত হয়ে ওঠে। বলে—লেসট্রেড, একটা ব্যাপার কি কখনো চিন্তা করে দেখেছ—যে বন্ধুর এত উপকার করলেন মিঃ টার্নার—তার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী নন একেবারে। অথচ দীর্ঘদিনের বন্ধু মিঃ ম্যাকার্থি—নিজেই বিয়ের কথা সমানে বলে যাচ্ছেন। আর একটা কথা, মেয়েটি মিঃ টার্নারের সম্পত্তির ভাবী মালিক। কি মাথায় ঢুকছে কিছু?

লেসট্রেড তাচ্ছিল্যের সুরে বলল—আসল ঘটনা নিয়েই হিমসিম খাচ্ছি—উটকো ব্যাপারে মাথা গলাবার সময় কোথায়?

হোমস গম্ভীর ধারাল সুরে বলল, তা বটে—তুমি তো আবার আসল ব্যাপারের কারবারী—

শ্লেষটা ধরতে পেরে লেসট্রেড তপ্তকণ্ঠে বলে উঠল—স্বীকার করছি, আপনার চিন্তাধারা একটু ভিন্ন রকমের হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে এই নিয়ে যা ভাবছেন তা কিন্তু নয়।

হোমস বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, এই তো গোলাবাড়ি এসে গেছে—চল নামা যাক।

দোতলা বেশ বড়সড় গোলা বাড়ি। সর্বত্র শোকের ছাপ। হোমস গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল। ঝি বেরিয়ে আসতে হোমস তার কাছে দু'জোড়া বুট জুতো চাইলো। মৃত্যুর সময়ে মিঃ ম্যাকার্থির পায়ে যে বুট জোড়া ছিল সেইটে আর তার ছেলে' জেমসের এক জোড়া।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জুতো নিয়ে এসে ঝি হোমসের হাতে দিল। পকেট থেকে ফিতে বার করে নানান রকমের মাপ নিল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। তারপর জুতো ফেরত দিয়ে রওনা হল হ্রদের দিকে।

ততক্ষণে শিকারী কুকুরের মত তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি ফুটে উঠেছে হোমসের চোখে!

মাঠ পার হয়ে হ্রদের ধারের জঙ্গলে উপস্থিত হল। জলা জায়গা—অসংখ্য পদচিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ফুটে আছে। ইস্পাত-কঠিন চোখ মাটির দিকে নিবদ্ধ রেখে পর্যবেক্ষণ শুরু করল। কখনো গুটি গুটি পা ফেলছে—কখনো দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে। মাঠটাও চক্কর দিয়ে এল। কৌতুকের দৃষ্টি নিযে লেসট্রেড দেখছে হোমসের কাণ্ডকারখানা।

বসকোম হ্রদ তেমন কিছু নয়—বড়সড় একটা দীঘিই বলা চলে। এক দিকে মিঃ টার্নারের বাড়ি, একদিকে মিঃ ম্যাকার্থির গোলাবাড়ি। হ্রদের চারপাশে আবছা ঘাসজঙ্গল আর জলাজমি। এই ঘাসজমির ওপরেই মৃতদেহটা পড়ে ছিল। হোমস জায়গাটাকে ঘিরে কেবল চক্কর দিচ্ছে। একবার লেসট্রেড-এর দিকে ফিরে বলে উঠল—তুমি এখানে এসেছিলে কি করতে—এই দেখো তোমার জুতোর ছাপ—মাড়িয়ে চটকে অন্য ছাপগুলোর বারোটা বাজিয়ে গেছ—এইতো—পাওয়া গেছে—একেবারে আলাদা একজোড়া দেখছি। বলতে বলতে ভিজে মাটির ওপর বর্ষাতি বিছিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। আতস কাচ হাতেই ছিল। মাটির ওপরকার ছাপ পরীক্ষা করতে করতে নিজের মনে বিড়বিড় করতে লাগল—এইতো ছেলেটার জুতোর দাগ। দুবার যাতায়াতের চিহ্ন স্পষ্ট। একটা ছাপে গোড়ালির দাগ প্রায় পড়েইনি। চেটো ডেবেছে বেশি—টেনে দৌড়েছে। ছোকরা দেখছি সত্য কথাই বলেছে—বাপের চিৎকার শুনে ছুটে এসেছে। এই তো মিঃ ম্যাকার্থির বুটের ছাপ—পায়চারী করছিলেন। এই তো বন্দুকের কুঁদোর দাগ। এখানেই তাহলে বাপবেটার কথা হচ্ছিল! কিন্তু একি—আবার সেই পায়ের ছাপ কেন—একবার এল একবার গেল—কিন্তু আবার ঘুরে এসেছে দেখছি—আচ্ছা—আলখাল্লাটা নিতে এসেছিল তাহলে—কিন্তু এল কোনদিক থেকে?

ঝট করে উঠে দাঁড়াল হোমস। একেবারে তন্ময় অবস্থা—আশেপাশে কেউ যে আছে বোধ হয় ভুলেই গেছে একেবারে। পরিচিত গন্ধ পেয়ে ব্লাড হাউন্ড যে ভাবে নাক নামিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছোটে হোমসও কুঁজো হয়ে সেভাবে মাটি দেখতে

দেখতে দৌড়াতে লাগল। পেছন পেছন আমরাও ছুটলাম। ঘাসজমির প্রান্তে বনের ধারে পৌঁছে আচমকা মাটিতে সটান শুয়ে পড়ে আতস কাচ ঘুরিয়ে মাটি পরীক্ষা করতে লাগল। বাঁ হাতে শুকনো পাতা সরিয়ে ধুলোর মত খানিকটা কি নিয়ে খামের মধ্যে রাখল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুখের চেহারাই যেন পাল্টে গেল। উজ্জ্বল চকচকে হয়ে উঠল চোখজোড়া। আশপাশ দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। শ্যাওলার মধ্যে পড়েছিল একটা এবড়োখেবড়ো পাথর। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে গেল বড় রাস্তা পর্যন্ত। ফিরে এসে বলল, আমার কাজ শেষ, তোমরা এগোও। ডান হাতের বাড়িটাই তো মিঃ টার্নারের তাই না? বাড়ির সরকারের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। একটা চিঠি লিখে আসতে হবে।

আমরা গাড়ির কাছে আসতে আসতেই হোমস ফিরে এল। গাড়ি ছুটল শহরের দিকে।

শ্যাওলায় পড়ে থাকা পাথরটা হোমস হাতে করে নিয়ে এসেছিল। লেসট্রেডের হাতে তুলে দিয়ে বলল, এই ধর খুনের হাতিয়ার।

লেসট্রেড অবাক হয়ে হোমসের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কোন দাগ তো দেখছি না। কী করে বুঝবো এটা দিয়ে খুন করা হয়েছে?

—না তা নেই। কিন্তু এটা যেখানে ছিল, তার তলায় ঘাস ছিল—অন্য কোথাও থেকে তুলে এনে ফেলা হয়েছে। মৃতের খুলিতে যে চোট ছিল—এই পাথর দিয়েই তা সম্ভব।

লেসট্রেড যেন কথাটা মেনে নিতে পারল না। তার গলার স্বর শুনেই বোঝা গেল। বলল—কিন্তু খুনটা করল কে?

—তাহলে শুনে নাও—খুনী মাথায় বেশ ঢ্যাঙা। ন্যাটা, ডান পা টেনে চলে! পায়ে ছিল মোটা সোলের শিকারের বুট। ধূসর আলখাল্লা তার গায়েই ছিল। নলে ভারতীয় চুরুট লাগিয়ে খায়—পকেটে ভোঁতা পেন্সিল কাটা ছুরি রাখে। আর নিশ্চয় বেশি কিছুর দরকার হবে না।

লেসট্রেড হোমসের তদন্ত পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত। তবু যেন মেনে নিতে পারছে না হোমসের কথাগুলো। নিজের তদন্তের সিদ্ধান্ত যে ভুল তাহলে তা প্রমাণ হয়ে যায়। জেদ ধরে বলল—এসব গালগল্প তো আদালতে গ্রাহ্য হবে না মশায়। আমাদের কারবার প্রমাণ নিয়ে কল্পনা নিয়ে নয়।

হোমস বলল, তাহলে আর কি—তুমি তোমার পথেই চল। আমার কাজ শেষ, সূত্র তোমাকে যা দেবার দিয়ে দিলাম। এ তল্লাটে লোকজন বিশেষ নেই—খুঁজলে আশা করি সহজেই পেয়ে যেতে পার। আমরা আজই লন্ডনে ফিরে যাচ্ছি।

—সে কী, তদন্তের কাজ শেষ না করেই ফিরে যাবেন?

—বললাম যে, আমার কাজ শেষ। নাও, তোমার আস্তানা এসে গেছে।

লেসট্রেড নেমে গেল। আমরা ফিরে এলাম সরাইখানায়।

খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম একরকম নিঃশব্দেই। হোমস চিন্তামগ্ন। চুরুট ধরাল। ধোঁয়া উদগীরণ করতে করতে বলল, এই মামলার দুটো আশ্চর্য ব্যাপার তোমাকে আগেই শুনিয়েছি—নিশ্চয় মনে আছে। একটা হল 'কু' ডাক। আর দ্বিতীয়টা—মরবার আগে RAT (ইঁদুর) শব্দটা বলা। এবারে শোন—অস্ট্রেলিয়ায় একজন আর একজনকে এই চালু পদ্ধতিতেই ডাকে। মিঃ ম্যাকার্থি জানতেন ছেলে তল্লাটে নেই। তাহলে যাকে ডেকেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার এই পদ্ধতি তারও জানা। দুজনের পরিচয় সেখানেই। তিনি দেখাও করতে গিয়েছিলেন তার সঙ্গে। ছেলেকে ডাকেননি।

—আর RAT (ইঁদুর) শব্দটা?

এবার পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে টেবিলে বিছিয়ে ধরল হোমস। বলল—এটা হল ভিক্টোরিয়া কলোনীর ম্যাপ। ব্রিস্টলে কাল চিঠি লিখে আনিয়েছি।

হোমস ম্যাপেব এক জায়গায় চাপা দিয়ে বলল—কি আছে পড়তো—

—ARAT

হাত তুলে নিয়ে বলল—এবারে?

—BALLARAT

—মিঃ ম্যাকার্থি মৃত্যুর আগে এই নামটাই উচ্চারণ করেছিলেন। ছেলে কেবল শেষেরটুকুই শুনতে পায়—নামটা খুনীর বলেই আমার বিশ্বাস।

—আশ্চর্য!

—হ্যাঁ, আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার আছে। ধূসর আলখাল্লা—ওটা গায়ে চাপিয়ে ব্যালারাট নামের এক অস্ট্রেলিয়াবাসী পেছন থেকে পাথর হাঁকিয়ে খুনটা করেছে। এ তল্লাট তার নখদর্পণে—কেন না লেকে পৌঁছনোর রাস্তা মাত্র দুটো। একটা গোলাবাড়ি থেকে—আর একটা মিঃ টার্নারের বাড়ি থেকে।

—তাইতো—ঠিকই বলেছ। কিন্তু খুনী যে এক পায়ে খোঁড়া সেটা জানলে কি করে?

—পায়ের ছাপ মেপে, পরীক্ষা করে খুনীর দেহের বিবরণ ইত্যাদি পাওয়া গেছে। ডান পায়ের ছাপ সব সময় আলতো ভাবে মাটি ছুঁয়ে গেছে। খুব চাপ পড়েনি। পা টেনে চলার দরুনই এমন হয়েছে।

—আর সে যে ন্যাটা—সেটা কি করে বললে?

—খুলির বাঁ দিক ঘেঁষে লেগেছিল চোটটা। বাঁ হাতে পাথরটা হাঁকড়েছিল খুনী। বাপছেলের ঝগড়ার সময়ে সে লুকিয়ে ছিল ছাদের আড়ালে। সে-সময় তার হাতে ছিল ভারতীয় চুরুট। ছাই পাওয়া গেছে। ১৪০ রকম তামাকের ছাই আমি আলাদা

করে দেখেই চিনতে পারি। একসময় এ নিয়ে প্রবন্ধও লিখেছিলাম তুমি জান। চুরুটের গোড়াটা কুড়িয়ে পেয়ে দেখলাম—ওতে দাঁতের কামড়ের দাগ নেই। নিশ্চয় নলে লাগিয়ে খেয়েছে। যে ছুরি দিয়ে কেটেছে সেটা ছিল ভোঁতা—কাটাটা ছিল অসমান।

—বুঝতে পেরেছি এবারে। কিন্তু তাহলে তো খুনী হচ্ছে—

ঠিক এই সময় দরজা খুলে ঘরে ঢুকল হোটেলের চাকর। তার পেছনে একজন আগন্তুক। বলল—মিঃ টার্নার।

পা টেনে টেনে ঘরে ঢুকলেন ভদ্রলোক। বয়সের ভারে কাঁধ ঝুলে পড়েছে। সারা মুখে বলির রেখা। দাড়িতে জট. মোটা জটিল ভুরু। শক্তিমান চেহারা। কিন্তু মুখ পাংশুল—ঠোঁট আর নাকের খাঁজ নীল হয়ে এসেছে। রক্তহীনতার লক্ষণ স্পষ্ট।

হোমস বলল—বসুন। চিঠিটা আমিই রেখে এসেছিলাম।

—আপনি লিখেছেন—কেলেংকারী যদি এড়াতে চাই তাহলে যেন আপনার সঙ্গে দেখা করি।

হোমস আগের মতই শান্ত সংযত কণ্ঠে বলল, তাই। মিঃ ম্যাকার্থির খুনের ব্যাপারটা আমি জেনেছি।

কথাটা শুনে দুই করতলে মুখ লুকিয়ে কঁকিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ টার্নার! স্খলিত স্বরে বললেন, কিন্তু বিনা অপরাধে জেমসকে শাস্তি পেতে আমি দেব না। ঠিক করে রেখেছি তা হলে খোলা খুলিভাবে সব জানাব। মেয়েটার জন্যই এতদিন মুখ খুলতে পারিনি। আমার গ্রেপ্তার হওয়ার কথা শুনলে ও সইতে পারবে না।

—কিন্তু মিঃ টার্নার, এতদূর জল না-ও গড়াতে পারে।

চমকে উঠে মিঃ টার্নার বললেন—তার মানে—আপনি কি বলতে চাইছেন?

—আপনি নিশ্চয় জানেন, আমি সরকারের নুন খাই না। কেবল আপনার মেয়ের পীড়াপীড়িতে এ কেসে নাক গলাতে হয়েছে। তার মত আমিও চাই—নির্দোষ জেমসের গায়ে যেন আঁচড় না পড়ে।

—মিঃ হোমস, আমি রোগগ্রস্ত—বুঝতে পারছি আয়ুও শেষ হয়ে এসেছে। মৃত্যুটা বাড়িতে হোক—জেলে যেন না মরি।

হোমস ততক্ষণে কাগজ কলম টেনে নিয়েছে। বলল, আপনি ঘটনাটা বলে যান আমি লিখে নিচ্ছি। সাক্ষী ওয়াটসন। জেমসকে যদি কোন ভাবেই রক্ষা করা সম্ভব না হয় কেবল তখনই প্রকাশ করব এই স্বীকারোক্তি—তার আগে নয়—আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।

—মিঃ হোমস, আপনি দেখবেন, অ্যালিস যেন এই ঘটনা শুনে কষ্ট না পায়। মামলা শেষ হওয়া পর্যন্ত নিশ্চয় আমি থাকব না। দয়া করে আপনি লিখে নিন।

—এই ম্যাকার্থি লোকটা ছিল জ্যান্ত শয়তান। তবু বন্ধু সাজিয়ে রাখতে হয়েছিল। গত বিশ বছর ধরে সে আমার জীবন অতিষ্ট করে তুলেছে। তার আসল পরিচয় কেউই জানে না।

যৌবনে অসৎ সংসর্গে মিশে অনেক কুকর্ম করেছি। ছ'জনের একটা দল গড়েছিলাম। ডাকাতি, লুঠতরাজ, ছিনতাই এসবই ছিল আমাদের কাজ। ব্যালারাটের কুখ্যাত জ্যাকের নাম শুনলে লোকে শিউরে উঠত।

একদিন একটা সোনা ভর্তি গাড়ি লুঠ করি। ছজন পাহারাদারের চারজনকেই আমরা খতম করি। তারপর ড্রাইভারের কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে গাড়ি দাঁড় করালাম। সেই সুযোগে সে আমাকে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছিল। সেই সময় যদি তার মাথাটা গুঁড়িয়ে দিতাম তাহলে আজ এই পরিস্থিতির সামনে দাঁড়াতে হত না আমাকে।

এই ড্রাইভারই ছিল ম্যাকার্থি। লুঠ করে প্রচুর সোনা পেয়েছিলাম প্রত্যেকে। ঠিক করলাম সারাজীবনের মত বন্দোবস্ত হয়ে গেছে—আর কুকর্ম নয়—এবার সৎ ভাবে জীবন যাপন করব। দেশে ফিরে এসে জমি জায়গা কিনে বসবাস শুরু করি। বিয়ে করলাম—মেয়ে হল। জীবন ভালই কাটছিল। সহসা স্ত্রী অকালে মারা গেলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ওই মেয়ের মুখ চেয়েই ছন্নছাড়া হয়ে যাইনি। নইলে আবার হয়তো অন্ধকারের জীবন শুরু হত।

এই সময়েই একদিন শহরের পথে দেখা হয়ে গেল ম্যাকার্থির সঙ্গে। দীনহীন অবস্থা। আমি বিত্ত প্রতিপত্তি নিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত তখন। ভয় দেখিয়ে সে আমার সবচেয়ে ভাল জমি বিনা ভাড়ায় ভোগ করতে লাগল। যখন তখন টাকার জন্য এসে দাঁড়াত। পুলিশে খবর দেবার হুমকি দিত। জীবন দুঃসহ হয়ে উঠল। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সব সহ্য করতে হত। ক্রমে অ্যালিস বড় হল। সব কিছু বুঝতে শিখল। সুযোগ বুঝে ম্যাকার্থিও মেয়েকে সব জানিয়ে দেবার হুমকি দিয়ে নিগ্রহের মাত্রা বাড়িয়ে চলল। আমার প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। মেয়ে তার বাপের দুষ্কর্মের কথা জানবে—এর চাইতে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে? শয়তানটা একদিন অ্যালিসকেই চেয়ে বসল।

আমি বুঝতে পারছিলাম—ওর উদ্দেশ্য আমার সর্বস্ব গ্রাস করা। আমি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছি সে খবরও সে জানত। কিন্তু লোকটার নোংরা রক্ত আমার রক্তের সঙ্গে মিশবে এ চিন্তা ছিল আমার কাছে অসহ্য। তাই এবারে রুখে না দাঁড়িয়ে উপায় রইল না। জেমস নিষ্পাপ শান্ত ছেলে। তার সম্পর্কে কোন বিতৃষ্ণা নেই আমার। কিন্তু সে তো শয়তান ম্যাকার্থিরই ছেলে।

জানতাম, একবার যখন মুখ থেকে বার করেছে—শেষ না দেখে আমাকে নিষ্কৃতি দেবে না। তাই ঠিক করলাম—শেষ বোঝাপড়া এবারেই করতে হবে।

হ্রদের পাড়ে দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা হল। গিয়ে দেখি ছেলের সঙ্গে তর্ক হচ্ছে ম্যাকার্থির—প্রসঙ্গটা আমার মেয়েকে নিয়ে। বিয়ে করবার জন্য নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছে ছেলেকে। আড়ালে দাঁড়িয়ে চুরুট টানতে টানতে সবই শুনতে পাচ্ছিলাম। ম্যাকার্থির নীচ কথাবার্তা শুনে রক্তে আগুন ধরে গেল। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, এই শয়তান যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে আমাকে। আমার তো আয়ু শেষ হয়ে এসেছে—কিন্তু যে কদিন বাঁচব—শান্তিতে বাঁচতে চাই। ঠিক করলাম—ওকে আর ছেড়ে রাখা যায় না। হয় ও থাকবে নয় আমি থাকব।

জলা জমিতে পাথরের অভাব নেই। পেছন থেকে পাথর হাঁকড়ে খুন করলাম ওকে। চিৎকার শুনে জেমস আসবার আগেই পালিয়ে গেলাম। কিন্তু আলখাল্লাটা ফেলে গিয়েছিলাম—তাই আবার ফিরে আসতে হল।

স্বীকারোক্তি লেখা শেষ করে হোমস টার্নারকে দিয়ে সই করিয়ে নিল। তারপর বলল, মিঃ টার্নার, আপনার বিচারটা ওপরওলার আদালতেই হোক—এই আমি চাই। তাই এখানকার আদালতে এটা পেশ করবার ইচ্ছে আমার নেই। কেবল যদি দেখি নির্দোষ জেমসের সাজা কিছুতেই ঠেকানো যাচ্ছে না, তাকে বাঁচাবার শেষ উপায় হিসাবে এই স্বীকারোক্তি আমি কাজে লাগাব। তদ্দিন এটা আমার কাছেই থাকবে।

বুক খালি করে নিঃশ্বাস ছেড়ে মিঃ টার্নার বললেন—আমি বাঁচলাম। এবারে শান্তিতে চোখ বুজতে পারব।

বলতে বলতে পা টেনে টেনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন বৃদ্ধ।

টার্নারের ইচ্ছাই পূর্ণ হল শেষ পর্যন্ত। তার স্বীকারোক্তি আর আদালতে পেশ করবার দরকার হয়নি। অন্যান্য প্রমাণের জোরেই জেমসকে খালাস করে আনল হোমস।

মিঃ টার্নার এখন পরলোকে। তার মেয়েকে নিয়ে সুখে শান্তিতে ঘরকন্না করছে ম্যাকার্থির ছেলে জেমস। আজও তারা জানে না, কী ভয়াবহ কুটিল মেঘ জমে উঠেছিল তাদের ভাগ্যের আকাশ ঘিরে।



ফাইভ অরেঞ্জ পিপ্‌স্‌

রহস্য মীমাংসার অসাধারণ সহজাত ক্ষমতার অধিকারী শার্লক হোমস, চুলচেরা যুক্তি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণী ক্ষমতা প্রয়োগ করে অত্যন্ত দুরূহ জটিল মামলাও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জলের মতো সহজ ও সরল করে আনতে পারে। তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি নিজেই। কিন্তু তথাপি বিগত ১৮৮০ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে যে সব রহস্য সমাধানের দায়িত্ব সে নিয়েছে—তার মধ্যে কয়েকটিতে তার ক্ষমতা ব্যর্থ হয়েছে। কেসগুলি অমীমাংসিতই থেকে গেছে শেষ পর্যন্ত। আবার কতকগুলি মামলার সমাধান ঘটেছে আংশিক ভাবে।

শেষোক্ত পর্যায়ের কেসগুলোর মধ্যে একটি খুবই চমকপ্রদ। আজও পর্যন্ত ঘটনাচক্রের রহস্য পুরোপুরি স্পষ্ট হয়নি। ভবিষ্যতে হবে বলেও মনে হয় না।

সেটা ১৮৮৭ সালের ঘটনা। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিক। বৃষ্টি আর ঝড়ের তাণ্ডব চলেছে সকাল থেকে। বউ বাপের বাড়ি—সুতরাং কয়েক দিনের জন্য বেকার স্ট্রীটে এসে আস্তানা নিতে হয়েছে।

চুল্লির ধারে বসে আছি দুজনে। আমি একটা বই পড়বার চেষ্টা করছি। এমন সময় দরজার ঘণ্টা বাজিয়ে ঘরে এসে ঢুকল বছর বাইশের এক যুবক।

গুরুতর সমস্যায় না পড়লে এমন ঘোর দুর্যোগের দিনে কেউ বেকার স্ট্রীটে

পা দেয় না। হোমস আর আমার মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় হল।

—আসুন। বলে হোমস আগন্তুককে আসন দেখিয়ে দিল।

রুচিসম্মত পোশাকের বেশ ফিটফাট যুবক। চোখ উদ্বিগ্ন। মুখ ফ্যাকাশে। দুশ্চিন্তার ছাপ মুখে স্পষ্ট।

ভেজা ছাতা ও জলঝরা বর্ষাতি আংটায় ঝুলিয়ে রেখে যুবক বসল। মুখে সলজ্জ হাসি টেনে কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই হোমস বলে উঠল—দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল থেকে আসছেন দেখছি।

—আজ্ঞে ঠিকই ধরেছেন—হর্সহ্যাম থেকে আসছি। মেজর প্রেনডেগাস্ট-এর মুখে আপনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে ছুটে এসেছি। উনি বললেন, আপনি কখনো হার মানেন না।

হোমস হেসে বলল, কিছু অতিরঞ্জন হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত মোট চারবার হেরেছি। তিনবার পুরুষের কাছে—একবার একটি মহিলার কাছে।

—জিতেছেন অনেক বেশিবার। আমার কেসেও নিশ্চয়ই জয়ী হবেন—এই বিশ্বাস নিয়েই এসেছি। অদ্ভুত এক রহস্যের মধ্যে পড়েছি—আমাদের পরিবারে এমন ঘটনা ঘটবে কখনো ভাবতে পারিনি।

নড়ে চড়ে বসে হোমস বলল—খুবই কৌতূহলোদ্দীপক মনে হচ্ছে—শোনা যাক আপনার কাহিনী।

চেয়ার টেনে নিয়ে আগুনের সামনে বসল যুবকটি। তারপর বলতে আরম্ভ করল—আমার নাম জন ওপেন'শ। আমার বাবারা দু'ভাই। জোসেফ আমার বাবা—আর কাকার নাম এলিয়াস। যে মামলা নিয়ে এসেছি তার জের চলছে বাবা কাকার আমল থেকেই। কভেন্ট্রিতে বাবার সাইকেলের টায়ারের ব্যবসা ছিল। ভাল পয়সা রোজগার করেছেন এই কারবারে। পরে মোটা টাকায় কারবার বেচে দিয়ে অবসর জীবনযাপন করছিলেন।

কাকা আমেরিকায় সৈন্য বিভাগে ছিলেন। কর্নেল হয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষ হলে ফ্লোরিডায় কিছুকাল বসবাস করার পর সত্তর সাল নাগাদ ফিরে আসেন হর্সহ্যামের সাসেক্সে। জমিজমা কিনে বসবাস শুরু করেন। আমেরিকায় থাকাকালীন টাকা করেছিলেন, কিন্তু প্রচণ্ড নিগ্রো বিদ্বেষের জন্য সেখানে থাকতে পারেন নি। নিগ্রোদের ভোটাধিকার তিনি সমর্থন করতেন না। খুবই বদমেজাজী মানুষ—কারুর সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। এমনকি বাবার সঙ্গেও দেখা করতে আসতেন না।

মদ তামাকের নেশা ছিল রীতিমত। সেই নিয়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকতেন। কদাচিৎ কখনো বাড়ির পাশের মাঠে বেড়াতে যেতেন।

আমাকে খুবই স্নেহ করতেন কাকা। ইংল্যান্ডে আসার কয়েক বছর পরে বাবাকে বলে আমাকে কাছে নিয়ে রেখেছিলেন। আমিই ব্যবসাপত্তর দেখতাম। বাইরের

লোকের সঙ্গেও কথাবার্তা আমাকেই বলতে হত। বছর ষোল বয়সের মধ্যেই রীতিমত কর্তাব্যক্তি বনে গিয়েছিলাম আমি। আমার হাতেই সব চাবিটাবি থাকত। সর্বত্র ছিল অবাধগতি—কেবল চিলেকোঠার চাবি কাকা রেখে দিয়েছিলেন। চাবির ফোকরে উঁকি দিয়ে দেখেছিলাম—ঘরে স্তূপীকৃত তোরঙ্গ আর কাগজপত্রের ডাঁই।

১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের এক সকালে কাকার সঙ্গে বসে আছি, এমন সময় একটা চিঠি এল কাকার নামে। ভারতবর্ষ থেকে লেখা চিঠি পণ্ডিচেরী পোস্ট অফিসের ছাপ ছিল তাতে। খামের মুখ ছিঁড়তেই ভেতর থেকে পাঁচটা শুকনো কমলা বীচি পড়ল টেবিলের ওপরে। আর কিছু নেই।

ব্যাপারটা রসিকতা বলেই মনে হল আমার। কিন্তু কাকার মুখ মুহূর্তে ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে গেল। আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠলেন—সর্বনাশ! KKK—আর রক্ষে নেই—এবারে পাপের সাজা পেতেই হবে। মৃত্যু এগিয়ে আসছে।

কাকা কাঁপতে কাঁপতে নিজের ঘরে চলে গেলেন। আমি খামটা তুলে নিয়ে দেখলাম—খামের মুখের কাছে লাল কালির K অক্ষরটা তিনবার লেখা।

কাকার অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কমলা বীচি আর অক্ষরের মধ্যে এমন কি রয়েছে যার জন্য কাকা এমন ভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন বুঝতে পারছিলাম না। ব্যাপারটা জানবার জন্য ওপরে যাচ্ছিলাম, দেখলাম কাকা ওপর থেকে নেমে আসছেন। হাতে জংধরা পুরনো চাবি আর একটা পেতলের বাক্স। চিলেকোঠা খুলেছিলেন বুঝতে পারলাম। আমাকে দেখেই বললেন, এবারে আমি টেক্কা দেব ওদের। তুমি উকিল ফোর্ডকে ডাকতে পাঠাও।

উকিল এলে কাকার ঘরে আমারও ডাক পড়ল। দেখলাম—চুল্লির ঝাঁঝরির ওপর অনেক কাগজপোড়া ছাই পড়ে আছে। সেই পেতলের বাক্সটা ডালাখোলা অবস্থায় পাশেই পড়ে আছে। K অক্ষরটা ডালার ওপর তিন বার খোদাই করা। খামের ওপরে ওই লেখাটা দেখেই কাকা মৃত্যুভয়ে শিউরে উঠেছিলেন।

কাকা লেখাপড়া করে সমস্ত সম্পত্তি বাবার নামে দিয়ে দিলেন। বললেন—পরে সব তুমিই পাবে। তবে যদি বোঝ শান্তিতে ভোগ করতে পারছ না—তখন সবচেয়ে বড় শত্রু যে তাকে দিয়ে দিও।

সাক্ষী হিসেবে উইলে সই দিলাম বটে, অজ্ঞাত ভয় সেদিন থেকে মনের কোণায় বাসা বাঁধল। কাকার মধ্যেও অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল। সারাক্ষণ ঘরবন্দী হয়ে রইলেন। নেশা করা বেড়ে গেল। কেমন খিটখিটে হয়ে গেলেন। অল্পেতেই চেঁচামেচি করতে আরম্ভ করতেন। বলতেন—কারো ভয়ে কাবু হবার পাত্র তিনি নন—কারোর পরোয়া করেন না। দারুণ শীতেও কাকা ঘেমে যেতেন। বুঝতে পারতাম অপরিসীম ভয়ে ক্রমশই কাবু হয়ে পড়ছেন।

একদিন রাতে এই রকম চেঁচামেচি করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আর ফিরলেন না। বাগানের ডোবাটায় মাত্র দু'ফুট জলের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন দেখা গেল পরে। শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। জুরীরা সব শুনে রায় দিলেন—ব্যাপারটা আত্মহত্যা। আমি কিন্তু এই রায় মেনে নিতে পারলাম না। আমার সন্দেহ রয়ে গেল। কাকার মৃত্যুর পর উইল অনুসারে কাকার সম্পত্তি আর ব্যাঙ্কের হাজার চোদ্দ পাউন্ড বাবা পেলেন।

হোমস কথার মাঝপথে জিজ্ঞেস করল—এমন অদ্ভুত কাহিনী আগে কখনো শুনিনি। আচ্ছা, চিঠিটা কবে এসেছিল মনে আছে? তার কতদিন পরে এই মৃত্যু বা আত্মহত্যার ঘটনাটা ঘটেছিল?

—চিঠি এসেছিল—১৮৮৩ সালের মার্চের ১০ তারিখ। কাকা মারা গেছেন—২রা মে রাত্রে। ঠিক সাত সপ্তাহ পরে।

এরপর আমি আর বাবা চিলে কোঠাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। ডালা খোলা পেতলের বাক্সটা পাওয়া গেল। তিনটে K খোদাই করা তাতে। তার নিচে লেখা—পত্র, স্মারকলিপি, নিবন্ধ, রসিদ ইত্যাদি। কিন্তু কোন কাগজই বাক্সে নেই। কাকা হয়তো সবই পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। ঘরে তেমন কিছু আর পাওয়া গেল না।

এর পরের ঘটনা ঘটল ১৮৮৫ সালে। বাবার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছি। এমন সময়ে একটা খাম এল বাবার নামে। চিঠি খুলেই বাবা হতভম্ব। সেই পাঁচটা কমলাবীচি—খামের ওপরে সেই তিনটে K অক্ষর, তার নিচে লেখা রয়েছে ঃ সূর্যঘড়ির ওপরে কাগজগুলো রাখবে। বাবার সারা মুখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বললেন—সূর্যঘড়ি বাগানে একটা আছে বটে—কিন্তু কাগজপত্র তো কিছু নেই। বাবা পরে সামলে উঠলেন। খুব একটা আমল দিলেন না চিঠিটাকে।

চিঠিটা এসেছিল ডাণ্ডি থেকে। আমি পুলিশে খবর দিতে চাইলে বাবা বললেন—সব ছেলেখেলা ব্যাপার—পুলিশকে ডেকে লোক হাসাবার দরকার নেই। কিন্তু আমি যেন কেমন একটা অমঙ্গলের আভাস পেতে লাগলাম। সেদিন থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখলাম বাবার ওপর।

চিঠি পাওয়ার তিনদিন পরে বাবা তার ছেলেবেলার বন্ধু মেজর ফিবার্ডির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। দ্বিতীয় দিনে মেজরের বাড়িতেই বাবা মারা যান। শিকারে গিয়ে খাদ থেকে পড়ে মৃত্যুটা ঘটে। জুরীরা বললেন—দুর্ঘটনা। কিন্তু আমার মন বারবার বলতে লাগল বাবা খুন হয়েছেন। কিন্তু কারা কিসের জন্য আমাদের ঘিরে এমন ষড়যন্ত্র পাকিয়ে চলেছে বুঝতে পারলাম না। বাবার মৃত্যুর পর অভিশপ্ত সম্পত্তি আমার হাতে এল। বাবার রহস্যজনক মৃত্যুর পর একবছর আট মাস কোন উপদ্রব ছিল না। কমলাবীচির আতঙ্ক ফিকে হয়ে এল। নিশ্চিন্তে রয়েছি। কিন্তু কাল সকালেই আমিও পেলাম সেই খাম। এই দেখুন।

যুবক জন ওপেন'শ পকেট থেকে একটা খাম বার করে তার ভেতর থেকে

পাঁচটা শুকনো কমলাবীচি তেলোতে নিয়ে দেখাল। বলল—লন্ডনের পুব অঞ্চলের ডাকঘরের ছাপ রয়েছে খামের ওপরে। ভেতরে তিনটে K—আর লেখা—কাগজপত্র সূর্যঘড়ির ওপরে যেন থাকে।

হোমস সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, চিঠি পেয়ে কি করলেন?

—কি করতে পারি বলুন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কেবল বুঝতে পারছি—এবারে আমার পালা—

হোমস উত্তেজিতভাবে বলে উঠল—এভাবে চুপ করে থাকা আপনার উচিত হয়নি। যদি বাঁচতে চান গা-ঝাড়া দিয়ে উঠুন।

—পুলিশের কাছে গিয়েছিলাম, তারা ব্যাপারটাকে কারুর ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দিল।

—বোকার দল। ওরা ওরকমই বলে।

—তবে একজন পুলিশ দিয়েছে। বাড়ি পাহারার জন্য।

হোমস এবারে রীতিমত রেগে উঠল—চিঠি পাওয়ার পর দু'দুটো দিন বেকার কাটালেন। সঙ্গে সঙ্গে এলেন না কেন? শমন যে একেবারে ঘাড়ের ওপর। আচ্ছা, ব্যাপারটা আন্দাজ করার মত কোন সূত্র-টুত্র দিতে পারেন?

জন পকেট থেকে একটা নীল কাগজের টুকরো টেবিলে রাখল। বলল, কাগজপত্র পোড়াবার সময় এই টুকরোটা হাওয়ায় উড়ে মেঝের কোণে পড়েছিল বোধ হয়। ছাইয়ের মধ্যে এইরকম লালচে কাগজের আরো আধপোড়া টুকরো চোখে পড়েছিল।

কাগজটার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম দুজনে। মনে হল খাতার পাতা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে—ওপরের দিকে লেখা—১৮৬৯। তার তলায়—

৪ঠা।। হাডসনের মত একই আছে। এসেছিল।

৭ই।। ম্যাকাউলি, প্যারামোর আর জন সোয়েনকে বীচি পাঠানো হল।

৯ই।। ম্যাকাউলি সাফ।

১০ই।। জন সোয়েন সাফ।

১৩ই।। প্যারামোরকে দেখে এলাম। ঠিক আছে।

হেঁয়ালি ভরা কাগজটা ফিরিয়ে দিল হোমস। বলল, শুনুন, যা বলছি তাই করুন। নষ্ট করবার মত সময় নেই। এখুনি বাড়ি গিয়ে একটা কাগজে লিখবেন—সব কাগজপত্র কাকা পুড়িয়ে ফেলেছেন—কেবল এইটে পাওয়া গেছে। লেখা কাগজটার সঙ্গে নীল চেক কাগজটা পেতলের বাক্সে ভরে সূর্যঘড়ির ওপরে রেখে আসবেন। এই মুহূর্তে করার আর কিছু দেখছি না। আগে নিজে বাঁচুন—পরে বাপ-কাকার মৃত্যু-রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাবেন। আপনার মাথার ওপরে বিপদের খাঁড়া ঝুলছে। আর দেরি করবেন না—কী করে ফিরবেন?

—ট্রেনে।

—রাস্তায় যদিও লোক থাকবে তবু ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। সঙ্গে হাতিয়ার কিছু আছে।

—আছে।

—চমৎকার। নটা এখনো বাজেনি, ট্রেন পেয়ে যাবেন। কাল থেকে আপনার কাজ শুরু করব। রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে লন্ডনে—এখানে থেকেই সব করব।

—ঠিক আছে। পরে এসে বাক্সের খবরটা আপনাকে জানিয়ে যাব।

বিদায় নিয়ে চলে গেল জন ওপেন'শ।

আগুনের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল হোমস। তারপর বলল—ওয়াটসন, সাইন অব ফোর মামলার কথা মনে আছে? এও তেমনি এক ভয়ংকর কেস।

আমি বললাম, কিন্তু ব্যাপারটা কিছুই যে মাথায় আসছে না আমার।

—ভায়া—যুক্তির শৃঙ্খল ভাঙলেই তলায় পৌঁছানো যায়। যুক্তিবিদ্যাটা সেকারণেই অত্যন্ত উঁচু দরের আর্ট বলে আমি মনে করি। আর দরকারী সব জিনিস মগজে রাখতে না পারলে এ আর্টে দক্ষ শিল্পী হওয়া যায় না। মার্কিন বিশ্বকোষের K খন্ডটা তাক থেকে নামাও। এবারে বোসো—ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করা যাক। জনের কাকা কর্নেল ওপেন'শ আমেরিকায় ছিলেন—কিন্তু হঠাৎ করে চলে এলেন কেন? আবার—এসে ইংলন্ডের পল্লী অঞ্চলে নির্জনে বসবাস শুরু করলেন। লোকজনের সঙ্গে মিশতেন না—বাড়ি ছেড়ে বেরুতেন না। কিন্তু কেন? নিশ্চয় কারুর ভয়ে? তাহলে ভয়টা কি ধরনের? চিঠিগুলো থেকেই সেটা আঁচ করা যেতে পারে। এবারে পোস্ট অফিসগুলোর ছাপ মনে করবার চেষ্টা কর। প্রথম চিঠি পণ্ডিচেরীর, দ্বিতীয়টা ডাণ্ডি থেকে লেখা। তৃতীয়টা পুব লন্ডনের।

— K অক্ষরটা থেকে কি আন্দাজ করছ তুমি?

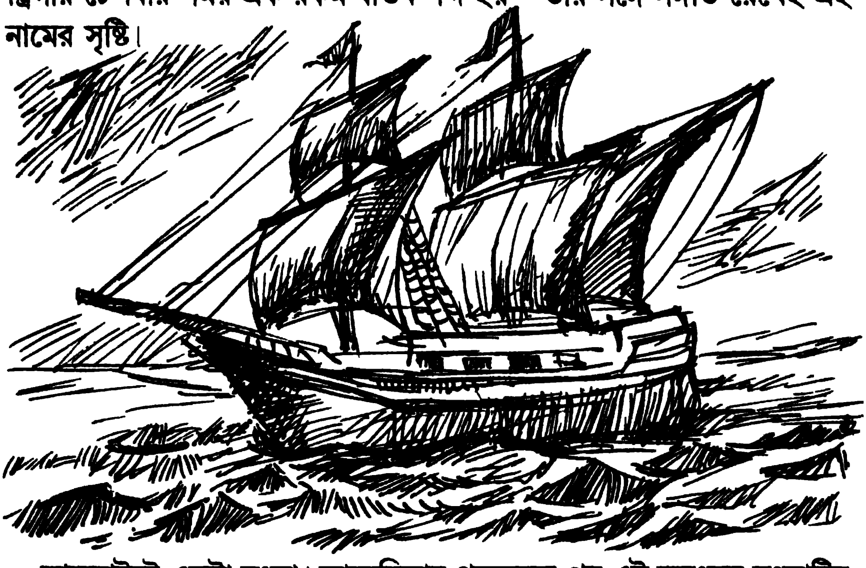
—সবকটা জায়গাই জাহাজঘাটা। জাহাজে বসে চিঠিগুলো লেখা হয়েছে। এইতো বেরিয়ে গেল একটা সূত্র। এবারে আরো দেখ—পণ্ডিচেরী থেকে হুমকি দেবার পর খুন করতে সময় লেগেছে—সাত সপ্তাহ। কিন্তু ডাণ্ডি থেকে হুঁশিয়ারী আসার পর খুনটা হয়েছে তিন দিনের মাথায়। কি পরিষ্কার হয়েছে?

—তাহলে কি বলতে চাইছ পত্রলেখকের আসতে সময় লেগেছে?

—তাই। চিঠিও এসেছে একই পথে। হুমকি যে দিয়েছে সে এসেছে পালতোলা জাহাজে—যা চিঠি বওয়া জাহাজের চেয়ে আস্তে চলে। চিঠি এসেছে কলে চলা জাহাজে। একারণেই বুঝতে পারছি জনের জীবন বিপন্ন। শেষ চিঠিটা এসেছে পুব লন্ডন থেকে। সময় একেবারে নেই।

—সর্বনাশ! কিন্তু এত সমস্ত কিছুর কারণটা কিছু অনুমান করতে পেরেছ?

—সেই কাগজপত্র। হুঁশিয়ারী আর খুন—চিহ্ন প্রমাণ না রেখে পর পর এমন দু'দুটো খুন কখনো একজনের পক্ষে সম্ভব নয়। দলটা রীতিমত ভারী। এরা বুদ্ধিমান, ধনবান এবং একগুঁয়ে। পিতলের বাক্সের কাগজপত্রগুলো তারা ফিরে চায়। যার কাছেই থাকুক না কেন। আর তিনটে K অক্ষর কোন মানুষের নামের আদ্যক্ষর নয়—নিশ্চিত একটা সংস্থার নাম। বলতে বলতে মার্কিন বিশ্বকোষের পাতা মেলে ধরল হোমস। বলল, এই দ্যাখো—কু ক্লু ক্স ক্ল্যান—আগ্নেয়াস্ত্রের ট্রিগার টেপবার সময় এক রকম ধাতব শব্দ হয়—তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই নামের সৃষ্টি।



ডাকসাইটে একটা সংস্থা। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের পর এই ভয়ংকর সংস্থাটির পতন ঘটে। এদের উদ্দেশ্য ছিল—যে সব নিগ্রো ভোটাধিকার চায় তাদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা। যাকে তারা খুন করতে বা দেশ থেকে তাড়াতে চাইত—আগে হুমকি পাঠাতো—কখনো কমলাবীচি তরমুজবীচি বা ওকগাছের পাতার চিহ্ন পাঠিয়ে। যারা এসব হুমকির তোয়াক্কা করত না তাদের সরাসরি সরিয়ে দেওয়া হত পরপারে। অনেক চেষ্টা করেও এই ভয়ংকর সংস্থাটিকে দমন করা যায়নি। তবে ১৮৬৯ সালে সংস্থাটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যায়। তারপর থেকে মাঝে মধ্যে এদের নাম শোনা গেছে।

বিশ্বকোষ বন্ধ করে হোমস বলল—এবার মেলাতে থাক—কর্নেল ওপেন'শ আমেরিকা ছেড়ে চলে আসেন ১৮৬৯—৭০ সালে। আর সংস্থাটি ভেঙ্গেছে ১৮৬৯ সালে। তাছাড়া জনের মুখে শোনা গেছে—নিগ্রোদের ভোটাধিকার সমর্থন করতেন না বলে তিনি আমেরিকায় বসবাস করতে পারেন নি। তাহলে কি পাওয়া যাচ্ছে—তিনি নিজেও এই সংস্থার মধ্যে ছিলেন এবং কোন কারণে সংস্থার

অনেকের নামধামের নথিপত্র নিয়ে ইংল্যান্ডে পালিয়ে এসেছিলেন। নিশ্চয় ও-দেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির নামধাম রয়েছে ওই কাগজপত্রে। তারাই রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে কাগজপত্র উদ্ধারের চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে।

—তাহলে আমরা যেটা দেখলাম ওটাও কি সেই নামের একটা তালিকা?

—হ্যাঁ, ডায়েরীর পাতা, খুন আর হুমকির একটা রেকর্ড। ওয়াটসন—, আজকের মত ক্ষ্যামা দাও। এবারে একটু বেহালাটা নিয়ে বসতে দাও। এই জঘন্য আবহাওয়া আর তার চাইতেও জঘন্য মানুষ জাতটাকে কিছুক্ষণ ভুলে থাকা যাবে।

সকালে আকাশের মেঘ অনেকটা হাল্কা হয়েছে। সূর্যের ম্লান মুখ দেখা যাচ্ছে। প্রাতঃরাশের টেবিলেই হোমস ঘোষণা করল—আজ থেকেই হাত দিচ্ছি ওপেন'শর কেসটায়। লন্ডন শহর থেকেই শুরু করা যাক।

সদ্য-আসা প্রভাতী কাগজটার পাতা ওল্টাতেই নজরে পড়ল খবরটা। শিউরে উঠল সর্বশরীর।

কাল রাতে ওয়াটরলু ব্রীজের ওপর থেকে একজন জলে পড়ে যায়। প্রহরারত কনস্টেবল শব্দ পেয়ে জলের ধারে ছুটে যায়। কিন্তু নদীতে লোক নামিয়েও মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায় নি। পরে জল-পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে। পকেটের একটা খাম থেকে জানা যায় মৃত ব্যক্তির নাম—জন ওপেন'শ, বাড়ি হর্সহ্যামের কাছে। পুলিশ অনুমান করছে—শেষ ট্রেন ধরবার জন্য ছুটতে গিয়ে অন্ধকারে পথ হারিয়ে নদীর পাড়ে চলে আসে—সেখানেই পা হড়কে জলে পড়ে যায়। মৃতের দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

খবরটা শুনতে শুনতে হোমসের মুখের ভাব ক্রমশঃ কালো, কঠিন হয়ে ওঠে। ভেতরে প্রচণ্ড আলোড়ন চলছে বুঝতে পারলাম। চেয়ারে শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারল না। উঠে অস্থির ভাবে পায়চারী শুরু করল—ক্রমাগত হাত মুঠো করছে আর খুলছে।

পায়চারী করতে করতেই বলতে লাগল—উঃ! সবকিছু জানবার পরও শেষ মুহূর্তে ওভাবে পথে ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি। আমার কাছে বাঁচতে এসেছিল—কিন্তু আমি নিজেই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলাম তাকে। পেছনে লোক লেগেই ছিল। ব্রিজের ওপর থেকে ভুলিয়ে নদীর ধারে নিয়ে গিয়েছিল—কিন্তু—ঠিক আছে। ওয়াটসন, আমি ছাড়ব না এদের। চললাম।

আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার অবকাশ না দিয়েই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সারাদিন ডাক্তারি নিয়ে কাটল। হোমস ফিরে এল রাত দশটায়। ক্ষুধায় অস্থির হয়ে শুকনো রুটি জলে ভিজিয়ে গিলতে লাগল। বলল, খবর আছে হে।

শয়তানগুলোকে কব্জায় আনা গেছে। আমিই এবার হুমকি পাঠাব এদের। বদলা নেব রীতিমত।

খাওয়া শেষ করে একটা কমলা লেবুর খোসা ছাড়িয়ে কোয়া বার করল। তারপর পরপর পাঁচটা বীচি একটা খামে ভরল। ভেতরের ভাঁজে লিখল—জে. কা. কে পাঠাচ্ছে শা. হো।

খামের মুখ এঁটে ওপরে লিখল—ক্যাপ্টেন জেমস কালাহাউন ; লোনস্টার জাহাজ, স্যাভানা, জর্জিয়া।

বলল, জাহাজঘাটায় নেমেই হাতে পাবে—ভয়ে উৎকণ্ঠায় শয়তানটা ওপেন'শদের মতই আধমরা হয়ে পড়বে দেখো।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কালাহাউন লোকটা কে হে? কোথায় পেলে ওই নাম?

—পালের গোদা। দলবল সুদ্ধ এবারে জালে তুলব।

বলতে বলতে এক তাড়া কাগজ দেখাল আমাকে। নাম আর তারিখের লম্বা তালিকা। —দিনটা কেটেছে এর পেছনে—ফাইল আর দলিল ঘেঁটে। ১৮৮৩ সালের জানুযায়ী আর ফেব্রুয়ারীতে পণ্ডিচেরীতে যেসব পালতোলা জাহাজ নোঙর ফেলেছিল তার একটার নাম ছিল—লোন-স্টার—যুক্তরাষ্ট্রের একটা রাষ্ট্রের নামে নাম। ১৮৮৫ সালের জানুয়ারীতে সেই জাহাজই নোঙর ফেলেছিল ডাণ্ডিতে। একরকম নিঃসন্দেহ হয়ে খোঁজ নিলাম লন্ডন বন্দরে। দেখলাম, এখানেও উপস্থিত লোন-স্টার। ছুটলাম জাহাজঘাটায়। কিন্তু গিয়ে শুনলাম সকালেই রওনা হয়েছে স্যাভানার দিকে মানে কাজ শেষ করে দেশে ফিরছে।

সাগ্রহে বললাম—তারপর?

—স্যাভানায় টেলিগ্রাম পাঠালাম। যথারীতি পুলিশ ওঁৎ পেতে থাকবে। আমার চিঠি যাবে কলের জাহাজে—ওদের পালতোলা জাহাজের অনেক আগেই পৌঁছে যাবে। খবর নিয়ে জেনেছি খালাসীসহ জাহাজের সব লোকজনের মধ্যে ক্যাপ্টেন কালাহাউন আর তার দুজন সহকারীই কেবল আমেরিকার লোক। কাল রাতে এই তিনজন জাহাজে ছিল না। ওপেনশ'কে খুনের অভিযোগে তিন মূর্তিকে ধরবার জন্য পুলিশ প্রস্তুত হয়েই থাকবে।

আমাদের আশা কিন্তু পূর্ণ হল না। কুচক্রী কালাহাউন স্যাভানায় পৌঁছাবার আগেই ওপরওয়ালার অমোঘ দণ্ড নেমে এল তার জাহাজের ওপর। হোমসের পাঠানো পাঁচটা কমলা বীচি কোন দিনই আব তার হাতে পৌঁছাল না। দুর্ধর্ষ সামুদ্রিক ঝড়ে অতল সমুদ্রে তলিয়ে গেছে লোন-স্টার। উত্তাল ঢেউয়ের মাথায় লোন-স্টার নাম লেখা বিধ্বস্ত একটা খোল ভেসে ছিল কেবল। তাই থেকেই জানা গেল ঘটনাটা।



ম্যান উইথ দ্য টুইসটেড লিপ

সময়টা ১৮৮৯ সালের জুন মাস। রাত হয়েছে—বিছানায় যাবার তোড়জোড় হচ্ছে। এমন সময় মুখে কালো ওড়না চাপিয়ে কেট হুইটনি এসে উঠল আমাদের বাড়িতে। স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

আমার স্ত্রীর অনেক দিনের বন্ধু কেট হুইটনি। দুজনে একই ক্লাশে পড়ত—ওর স্বামী প্রচণ্ড নেশাখোর। আফিমের রস মিশিয়ে তামাক খাওয়া ধরে মজে ছিল। আমি ওদের পারিবারিক চিকিৎসক। অনেক বলে বুঝিয়েও ভদ্রলোকের নেশা ছাড়াতে পারিনি।

কাঁদতে কাঁদতে কেট বলল, আজ দু'দিন বাড়ি ফেরেননি উনি। নিশ্চয় বার অব গোল্ডে পড়ে আছেন। আমি এখন কি করি!

বার অব গোল্ড এক ভয়ংকর নেশার আড্ডা। দুনিয়ার যত কুলি মজুর নিচু শ্রেণীর লোক সস্তায় নেশা করতে যায় সেখানে। কেট সেখানে যেতে ভরসা পাচ্ছে না, তাই এসেছে আমাদের কাছে।

বুঝিয়ে সুজিয়ে কেটকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। তারপর একটা ভাড়াটে গাড়ি নিয়ে হাজির হলাম বার অব গোল্ড-এ। জায়গাটা লন্ডন ব্রীজের পুব দিকে জেটির পাশে একটা সংকীর্ণ অন্ধকার গলির মধ্যে।

নেশার আড্ডায় ঢুকে দেখলাম এক কদর্য নারকীয় পরিবেশ। নিচু ছাদ—লম্বা ঘর। আফিং-এর বাদামী ধোঁয়ায় আলো যেন কোন রকমে চোখ মেলে আছে। সারি সারি লোক এখানে সেখানে এলিয়ে পড়ে আছে। ঘোলাটে নিষ্প্রাণ চোখ। আগুনের টুকরোর মত চারদিকে আফিং পুড়ছে। যে যার মনে বকবক করে যাচ্ছে—অর্থহীন বকুনি।

যথাসম্ভব দৃষ্টি বুলিয়ে খুঁজতে লাগলাম চারদিকে কেটের স্বামীকে। চোখে পড়ল এককোণে জ্বলন্ত কাঠকয়লার সামনে একজন রোগা লম্বা চেহারার বুড়ো—মুঠিতে চিবুক আর হাঁটুতে অলস হাত রেখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে আগুনের দিকে।

একজন চাকর আফিমের নল এনে ধরল সামনে। সরিয়ে দিলাম হাত বাড়িয়ে। খুঁজতে খুঁজতে কেটের নেশাখোর স্বামীটিকে পাওয়া গেল এক জায়গায়। আমাকে দেখে অবাক হল যেন। বলল—ওয়াটসন যে। আমি কথা না বাড়িয়ে ওকে টেনে নিয়ে বাইরে চললাম। এমন সময় হঠাৎ জামায় টান পড়ল। কে যেন ফিস ফিস করে কানের কাছে বলল—এগিয়ে গিয়ে তাকাও।

চমকে উঠলাম—কিন্তু দু'পা এগিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখলাম সেই বুড়ো পিঠকুঁজো লোকটা তেমনি তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। দু'হাঁটুর মাঝে আফিমের নল।

আড়াল করে দাঁড়াতেই আর একদফা চমক লাগল। দেখলাম কোথায় বুড়ো—সে জায়গায় সিদে হয়ে বসে আছে বন্ধুবর শার্লক হোমস। হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। চোখের ঘোলাটে ভাব, কপালের গভীর ভাঁজ—সারা দেহের বার্ধক্য—সব যেন ভোজবাজির মত চোখের পলকে পাল্টে গেছে।

ইশারায় এগিয়ে আসতে বলে হোমস আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেল। নেশাখোরদের ভিড়ে গা মিশিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল—বন্ধুটাকে বিদায় কর। গাড়োয়ানকে দিয়ে স্ত্রীকে খবর পাঠিয়ে দাও—আজ রাতটা আমার সঙ্গেই কাটাবে।

আমার হতভম্ব অবস্থা। এই নেশার আড্ডায় হোমসকে এভাবে দেখতে পাব ভাবিনি। কিন্তু ওর কথার অন্যথা করিনি কখনো। তাছাড়া এই নৈশ অভিযানের সম্পর্কে কৌতূহলও জেগে উঠল।

বাইরে এসে কেট-এর স্বামীকে গাড়িতে বসিয়ে দিলাম। স্ত্রীকে খবর দেবার কথাটা ও গাড়োয়ানকে বুঝিয়ে বলে দিলাম।

একপাশে সরে দাঁড়িয়েছি সবে। দেখি নেশার আড্ডা থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে আসছে হোমস।

নিঃশব্দে পাশাপাশি হেঁটে দুটো রাস্তা পার হয়ে এলাম। পিঠের কুঁজটা ঝেড়ে

ফেলে সিদে হয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে হোমস বলল, ভায়া ভেবো না যেন কোকেন ছেড়ে আফিম ধরেছি। তুমি এখানে এসে জুটেছ কি জন্যে?

—এক বন্ধুকে খুঁজতে এসেছি।

—আমি এসেছি এক শত্রুর সন্ধানে।

—সে আবার কোন শত্রু?

—স্বমূর্তিতে তাকে খোঁজায় ঝুঁকি ছিল। লস্করটা শাসিয়ে রেখেছিল। ছদ্মবেশ নিয়েই আসতে হয়েছিল সে-কারণে। এবাড়ির পেছনেই পলের জেটি—ভয়ঙ্কর এক মানুষ খুনের জায়গা এটা। রাতের অন্ধকারে কত লাশ যে এখানকার চোরা দরজা গলে পাচার হয়ে যায় কেউ তার হিসেব রাখে না। নেভিল সিনক্লেয়ারের লাশও নিশ্চয় এখান দিয়ে পাচার হয়ে গেছে।

বলতে বলতে মুখে আঙুল দিয়ে শিস দিয়ে উঠল হোমস। পর মুহূর্তেই আর একটা শিসের শব্দ ভেসে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে এক ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল সামনে।

গাড়িতে উঠে বসে হোমস বলল—চল, সিডার্সে আমি যে ঘরে আছি, সেখানে একটা খাট খালি পড়ে আছে—তোমার অসুবিধে হবে না।

অবাক হয়ে বলি—সিডার্সে উঠেছ নাকি?

—মিঃ সিনক্লেয়ার যে ওখানেই থাকেন। তদন্ত করছি ওখান থেকেই। উঠে পড়। জন, এবারে তুমি বিদায় নিতে পার—এই ধর—আধ ক্রাউন। কাল এগারোটায় এসো।

হোমস নিজেই চাবুক হাতে চালকের আসনে বসল। আঁকাবাঁকা অন্ধকার রাস্তা ধরে টগবগিয়ে ছুটে চলল গাড়ি।

নিঃশব্দে মুখে কুলুপ এঁটে শহর থেকে বার করে নিয়ে এল গাড়ি। তারপর বলল, ওয়াটসন, তোমার মত সহযোগী দরকার সব সময়েই। বিশেষ করে তুমি যখন জীবনীকারও বটে। কিন্তু ভায়া আমি বড্ড মুশকিলে পড়েছি যে। ভদ্রমহিলাকে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারছি না। সূত্র পেয়েছি অনেক—কিন্তু জট খুলতে পারছি না।

আমি হতাশ কণ্ঠে বললাম—এভাবে বললে কি জবাব দেওয়া যায় বলতো? কিছুই তো আমি জানি না। ব্যাপারটা খুলে বল।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ বটে। শোন তাহলে। নেভিল সিনক্লেয়ার নামে এক অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক ১৮৮৪ সালের মে মাসে লীতে এসে বাড়ি কিনে বসবাস শুরু করেন। কিছুদিন পরে তিনি ওই এলাকারই একটি মেয়েকে বিয়ে করেন। দুটি বাচ্চাও হয়। ব্যবসা সূত্রে প্রতিদিন সকালে ভদ্রলোককে লন্ডনে যেতে হয়। বিকেল পাঁচটা চোদ্দর গাড়িতে আবার ফিরে আসেন। সজ্জন মানুষ। পাড়ায় সুনাম আছে।

ব্যাঙ্কেও মোটামুটি টাকা আছে। বয়স সাঁইতিরিশের কোঠায়।

গত সোমবারেও ভদ্রলোক যথারীতি লন্ডন গেছেন। যাবার সময় বলে গেছেন—ছেলের খেলনার বাড়ি তৈরির জন্য একবাক্স চৌকো কাঠ নিয়ে ফিরবেন। ভদ্রলোক বেরিয়ে যাবার পরেই একটা টেলিগ্রাম এল—একটা দামী পার্শেল এসেছে। জাহাজঘাটা থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। মিসেস সিনক্লেয়ার নিজেই লন্ডন গিয়ে পার্শেল ছাড়ালেন। জাহাজ কোম্পানির অফিস থেকে যখন বেরুলেন তখন বেলা চারটে পঁয়তাল্লিশ। তোমার সঙ্গে যেখানে দেখা হল—জায়গাটা তার কাছেই।

জাহাজঘাটা জায়গাটা মোটেই ভাল নয়। ভদ্রমহিলা গাড়ির সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। এমন সময় একটা ভারি চাপা চিৎকার শুনতে পেলেন। চোখ তুলতেই তার নজরে পড়ল, একটা দোতলা বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে তার স্বামী হাত নাড়ছেন—কি যেন বলতে চাইছেন। মুখ চোখে ভয়ার্ত ভাব। গায়ে ওভারকোট আছে কিন্তু বামদিকের কলার নেই। আফিং-এর আড্ডাটা—যেখান থেকে আমরা বেরুলাম, সেই বাড়িটারই তলায়।

দৃশ্যটা দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন মিসেস সিনক্লেয়ার। বুঝতে পারলেন স্বামী নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছেন। তাকে দেখতে পেয়ে নিশ্চয় সাহায্য চেয়ে চিৎকার করে উঠেছেন। দিশাহার হয়ে তিনি ছুটে গেলেন কিন্তু বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারলেন না। সিঁড়ি থেকেই সেই বদমাস লস্করটা আর একজন সঙ্গীকে নিয়ে তাকে বাড়ির বাইরে বার করে দেয়।

এর পরে রাস্তা থেকে পুলিশ নিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু দোতলায় উঠে দেখা গেল সেখানে থাকে একজন কদাকার পঙ্গু লোক। লস্কর আর সেই পঙ্গুটি বলল, সিনক্লেয়ার বলে কেউ নাকি থাকে না সেখানে। এই সময়ে মিসেস সিনক্লেয়ারের নজরে পড়ে—টেবিলের ওপরে পড়ে আছে একবাক্স কাঠের চৌকো ব্লক। বাড়ি ফেরার সময় এই খেলনাটাই নিয়ে যাবার কথা ছিল মিঃ সিনক্লেয়ারের।

পুলিশ এবারে তল্লাশি শুরু করল। দেখা গেল বাড়ির পেছনেই টেমস নদী। একটা জানালা সেই দিকেই—জানালার গরাদে কাঁচা রক্তের দাগ। শোবার ঘরে পাওয়া গেল মিঃ সিনক্লেয়ারের ঘড়ি, টুপি, মোজা, জুতো—কিন্তু মানুষটা কোথাও নেই।

লস্করটার আচরণ সন্দেহজনক। আগের ইতিহাসও বিশেষ সুবিধার নয়। সেই সিঁড়ির মুখে মিসেস সিনক্লেয়ারের পথ আটকেছিল। বিকৃতাঙ্গ কদাকার ভাড়াটে সম্পর্কে কোন খবরই সে রাখে না। মিঃ সিনক্লেয়ারের জামাকাপড় কিভাবে ওখানে এল তাও সে জানে না।

কুৎসিতদর্শন ভাড়াটে লোকটা আসলে একজন পেশাদার ভিখিরি। রাস্তার মোড়ে রোজ টুপি পেতে বসে। লোকটার মুখজোড়া একটা ভীষণ কাটার দাগ। চামড়া গুটিয়ে যাওয়ার ফলে ওপরের ঠোঁটটা ঠেলে উঠে গেছে ওপরের দিকে। চকচকে কালো চোখ। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ওখানে বসে ভালই রোজগার করে সে। ওয়াটসন, খেয়াল রেখো—এই লোকই ভাড়া থাকে আফিম-এর আড্ডার দোতলায়। মিঃ সিনক্লেয়ারকে সেখানেই শেষবারের মত দেখা গেছে। লোকটা সামান্য খুঁড়িয়ে চলে, কিন্তু শরীর স্বাস্থ্য বেশ ভাল। নাম হিউবুন।

ভিখিরি হিউবুনকে ঠিক সময়ে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তার আগেই লস্করটার সঙ্গে তার শলাপরামর্শ হয়ে গেছে। সে জানাল—বুনের আঙুল কেটে গিয়েছিল, সেই রক্তই লেগেছে তার জানালার হাতায়—জানালার গরাদে। মিঃ সিনক্লেয়ার নামে যাকে ভদ্রমহিলা দেখছেন বলে বলছেন—সেরকম কেউ তার ঘরে কখনো আসেনি। ভদ্রমহিলা ভুল দেখে চেঁচাচ্ছেন।

জোয়ারের জল নেমে গেলে কাদার ওপর পাওয়া গেল মিঃ সিনক্লেয়ারের কোটটা। কিন্তু ডেড বডি পাওয়া গেল না। আর শুনলে আশ্চর্য হবে কোটের পকেটে পাওয়া গেল একরাশ খুচরো পয়সা। ওগুলোর জন্যেই ভারী কোটটা জলে ভেসে যেতে পারেনি—কাদায় গেঁছে ছিল।

কিন্তু গোল পাকিয়ে উঠল কোটটা পাওয়া যাবার পর। কোট সমেত মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হল জলে—আর জামা জুতো মোজা পাওয়া গেল ওপরের ঘরে। ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় মনে হচ্ছে না? এমনটা হবে কেন? একটা সম্ভাবনার কথা ভাবা যেতে পারে কেবল—যেমন—মৃতদেহটা আগে জানালা দিয়ে জলে ফেলেছে বুন। তারপর ভিক্ষের পয়সা দিয়ে কোটটা ভারি করেছে—এমন সময় নিচে চেঁচামেচি শুনে কোটটা জানালা দিয়ে ফেলে দিয়েছে জলে যাতে কাদায় আটকে থাকে। পরে অন্য কাপড় চোপড় শোবার ঘরে লুকিয়ে রাখে। কষ্ট-কল্পিত হলেও এছাড়া অন্য কিছু এক্ষেত্রে ভাবা যায় না।

বুন এখন হাজতে। লোকটা খুবই শান্ত স্বভাবের ভিখিরি। আজ পর্যন্ত তাকে কোন উল্টোপাল্টা কাজ করতে দেখেনি কেউ। অথচ মৃতব্যক্তির সমস্ত প্রমাণ তার ঘরেই। মিঃ সিনক্লেয়ার ওখানে ওই আফিমের আড্ডায় কেন যে গেলেন বুঝে উঠতে পারছি না। সব মিলিয়ে এক রহস্যের গোলকধাঁধা। থই পাচ্ছি না ভায়া।

কথা বলতে বলতে গাড়ি পৌঁছে গেল সিডার্সে—একটা বড় বাড়ির সামনে। স্বর্ণকেশী এক ভদ্রমহিলা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। গাড়ি থেকে দুজনকে নামতে দেখে অস্ফুটে হর্ষধ্বনি করে উঠেছিলেন। তারপরই আমাকে দেখে আর হোমসের ভাবলেশহীন মুখ দেখে বিমর্ষ হয়ে গেলেন।

এগিয়ে এসে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন—কোন খবর পেলেন মিঃ হোমস?

—এখনো পাইনি দেবার মত কিছু।

হোমস আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল। আমরা খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

আচমকা জিজ্ঞেস করলেন মিসেস সিনক্লেয়ার—মিঃ হোমস, আমি সব কিছুর জন্যই মনকে প্রস্তুত করে নিয়েছি। আপনি আমাকে সোজাভাবে একটা কথা বলুন। আমার স্বামী কি বেঁচে আছেন?

হোমস থতমত খেয়ে গেল। চেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিয়ে বসল।

—কি মনে হয় আপনার তিনি কি মারা গেছেন?

—মনে হয় সেরকমই একটা কিছু ঘটেছে।

—খুন হয়েছেন?

—অতটা নিশ্চিন্ত হয়ে বলা যায় না। তবে হতেও পারে।

—কবে মারা গেছে বলে মনে করেন?

—গত সোমবার।

মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে ভদ্রমহিলা যেন একসঙ্গে উচ্চারণ করলেন—তাহলে আজকে তার কাছ থেকে এ চিঠি পেলাম কি করে বলতে পারেন?

সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে চেয়ার থেকে ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠল হোমস। চিৎকার করে ওঠে—বলছেন কি আপনি?

হাসতে হাসতে মিসেস সিনক্লেয়ার এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দেন হোমসের দিকে। আমি এগিয়ে পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

গ্রেভস এন্ড ডাকঘরের ছাপ—তারিখ সেই দিনেরই। মোটা ধ্যাবড়া হাতের লেখা খামের ওপরে।

মিসেস সিনক্লেয়ার বললেন—ওটা আমার স্বামীর হাতের লেখা নয়। ভেতরের লেখাটা তিনিই লিখেছেন।

খামটা উল্টেপাল্টে দেখে হোমস বলল, চিঠি ছাড়াও খামে করে অন্য একটা কিছুও পাঠানো হয়েছে মনে হচ্ছে।

—আংটি। আমার স্বামীর।

চিঠিটা পড়ল হোমস ঃ ডিয়ার, কিছু ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। একটা ভুল হয়ে গেছে—এই যা। শুধরাতে একটু সময় লাগবে। ধৈর্য ধর।—নেভিল।

চিঠিটা পেন্সিল দিয়ে লেখা হয়েছে। এই লেখাটা তাহলে আপনার স্বামীর?

—আমার কোন সন্দেহ নেই।

—আজকের ডাকে ফেলা চিঠি—কিছুটা যেন আলোর আভাস পাচ্ছি।

—নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন।

—পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হয়ে একথা এখনো বলা যায় না। হাতের লেখা

সহজেই নকল করা যায়। আংটিও হাত থেকে খুলে নেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া, চিঠিটা হয়তো আগেই লিখেছিলেন—ডাকে ফেলা হয়েছে আজকে। এর মধ্যে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে।

—না মিঃ হোমস, অতবড় সর্বনাশ হলে আমার মন নিশ্চয় জানতে পারত। ওর কিছু হলে আমি ঠিক জানতে পারি। অনেকবার এমন ঘটনা ঘটেছে।

—তা হতেই পারে। মেয়েদের মন খুবই বিচিত্র। কিন্তু চিঠি যিনি লিখতে পারেন তার ফিরে আসতে বাধা কোথায় বুঝতে তো পারছি না। আচ্ছা, দু-একটা কথা আবার পরিষ্কার করে নিই আপনার কাছ থেকে। সেই বাড়িটার দোতলায় আপনি ওঁকে জানালা দিয়ে দেখেছিলেন তাই না?



—হ্যাঁ—জানালা খোলা ছিল।

—তাহলে আপনাকে নাম ধরে না ডেকে কেবল চেঁচিয়ে উঠলেন কেন? চিৎকারটা কি বিপদে পড়ে সাহায্য চাওয়ার মত?

—সেরকম ভাবেই হাত নেড়েছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল কেউ যেন পেছন থেকে টেনে সরিয়ে নিল।

—ঘরে ঢুকে কাউকে দেখতে পাননি তো?

—বিকৃত চেহারার সেই লোকটা ছিল।

—আচ্ছা। ওই বাড়ির নিচতলার আফিমের আড্ডায় উনি আগে যেতেন?

—কক্ষনো না।

কথা ওখানেই শেষ করল হোমস। গম্ভীর মুখে চলে এল শোবার ঘরে। খাটের ওপর আয়েস করে বসল। অনেকখানি তামাক সামনে সাজিয়ে নিল। বুঝলাম—সারারাত ধোঁয়া ওড়াবে আর ঘটনার জট ছাড়াবে।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখলাম একই ভাবে বসে আছে হোমস। সামনের তামাকের স্তূপ উধাও। বলল, চল ভায়া, একটু বেরিয়ে আসি।

গলার স্বর শুনে বুঝতে পারলাম—সমস্যা আয়ত্বে এসেছে।

তখনো বাড়ির কেউ জাগেনি। জুতো মোজা পরতে পরতে হোমস নিজে থেকেই বলে উঠল—সমস্যার জট ছাড়িয়ে এনেছি। খুবই বিচিত্র কেস। গোড়ায় বড্ড ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলাম।

বাইরে এসে গাড়ি নিয়ে ছুটলাম লন্ডন অভিমুখে। থানায় পৌঁছে ইন্সপেক্টর ব্রাডস্ট্রীটের ঘরে ঢুকল হোমস। বলল—হিউবুনের সঙ্গে একবার দেখা করা যাবে?

—নিশ্চয়ই। খুব শান্ত আসামী—কিন্তু মশায়, বড্ড নোংরা।

সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে হোমস—কি করছে?

—করছে না কিছু। কিন্তু কিছুতেই মুখের তেলকালি মোছাতে পারলাম না। কোনমতে হাতদুটো ধোয়ানো হয়েছে।

—চলুন যাওয়া যাক।

ইন্সপেক্টরের পেছনে পেছনে হাজতখানায় এলাম আমরা। দু'পাশে সারিবদ্ধ দরজা। একটা দরজার ওপর থেকে তক্তা সরিয়ে ইন্সপেক্টর বলল—আসামী ঘুমুচ্ছে এখনো।

দেখলাম আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমুচ্ছে ভিখিরি হিউবুন। কী কদর্য বীভৎস মুখ। চোখ থেকে থুৎনি পর্যন্ত একটা গভীর ক্ষত চিহ্ন। ওপরের ঠোঁট উল্টে ফাঁক দিয়ে তিনটে দাঁত বেরিয়ে আছে। গা শিউরে ওঠে ওদিকে তাকালে। একমাথা জ্বলজ্বলে লাল চুল—কপাল আর মাথা ঢেকে রেখেছে। গায়ে রঙীন সার্ট আর ছেঁড়া কোর্ট।

বীভৎস মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ব্যাগ খুলে একটা বিরাট স্পঞ্জ বার করল হোমস। ফিসফিস করে বলল ইন্সপেক্টরকে—আস্তে আস্তে দরজাটা খুলুন, দেখবেন যেন সাড়া পেয়ে জেগে না ওঠে।

নিঃশব্দে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিল ইন্সপেক্টর। ঘরে ঢুকে কোণের জলপাত্রে স্পঞ্জ ডোবালো হোমস। তারপর আচমকা ঘুমন্ত বন্দীর মুখে সেটা চেপে ঘসতে লাগল। সেই সঙ্গে চিৎকার করে বলতে লাগল, আসুন ইন্সপেক্টর, আলাপ করিয়ে দিই। ইনিই নিখোঁজ মিঃ নেভিল সিনক্লেয়ার।

যেন ম্যাজিক দেখাল হোমস চোখের সামনে। স্পঞ্জের ঘষায় বন্দী ভিখিরির মুখের ওপর থেকে যেন একটা খোসা উঠে গেল। দগদগে কাটার দাগটা মিলিয়ে গেল। হেঁচকা টানে উঠে এল লাল পরচুলাটাও। খাঁটি ভদ্রলোকের একটা নিখুঁত চেহারা। লজ্জায় মাথা নত করে রইল ভদ্রলোক। পরক্ষণেই আর্ত চিৎকার করে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল।

স্তম্ভিত ইন্সপেক্টর বলে উঠল—সত্যিই তো, ইনিই নেভিল সিনক্লেয়ার, ছবিতে এই চেহারাই দেখেছি।

কথাটা শুনেই বিছানা ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন নেভিল সিনক্লেয়ার। বললেন, আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকতে পারে না আপনাদের।

সহাস্যে হোমস বলল, অভিযোগ নিশ্চয় আছে। সেটা স্ত্রীকে ঠকানোর। তাঁকে সব খুলে বলা উচিত ছিল আপনার।

—সে উপায় ছিল না মশায়, ছেলেমেয়েরা জেনে ফেললে মুখ দেখাতাম কি করে?

—এখন তো সবই জানাজানি হয়ে যাবে। তবে একটা উপায় আছে, থানায় একটা এজাহার দিন। ইন্সপেক্টর ইচ্ছে করলে আদালত পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়াতে নাও দিতে পারেন। আপনিও ছাড়া পেয়ে যাবেন।

করুণ স্বরে বলে উঠলেন সিনক্লেয়ার, সবই বলব। ছেলেমেয়েদের কানে এসব কথা উঠলে সেটা হবে মৃত্যুর সামিল। শুনুন তবে—লেখা-পড়াটা শিখেছিলাম ভাল ভাবেই। নানান পেশায় জীবন কেটেছে। অভিনয় করেছি, সাংবাদিকতাও করেছি। এই সুবাদে অনেক দেশ ঘুরে বেড়িয়েছি। ভিখিরিদের নিয়ে একটা প্রবন্ধ লেখার ফরমাস পেয়ে ছিলাম। তাদের নাড়ি নক্ষত্র জানবার উদ্দেশ্যে ভিখিরির ছদ্মবেশ নিয়ে ভিড়ে গেলাম দলে। অভিনয় জানতাম বলে ছদ্মবেশটা নিখুঁত হয়েছিল। সারাদিন ভিক্ষে করে বেড়ালাম। দিনের শেষে রোজগারের পয়সা গুনতে গিয়ে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। মাত্র সাত ঘণ্টায় রোজগার দাঁড়িয়েছে ছাব্বিশ শিলিং চার পেনি। ব্যাপারটা রীতিমত অবিশ্বাস্য কিন্তু আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাই আমাকে বাঁচিয়ে দিল এক সময়। দেনার দায়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু পঁচিশ পাউন্ডের দেনা শোধ করেছিলাম মাত্র দশ দিনের ভিক্ষের টাকায়। এর পর থেকেই পুরোপুরি ভিক্ষে বৃত্তি গ্রহণ করলাম। টাকা রোজগারের এমন সহজ পথ সহজে ছাড়া যায় না। আত্মসম্মানের খুঁতখুঁতে ভাবটা প্রথমে দু'চার দিন ছিল। পরে সবই ঠিক হয়ে গেল। প্রতিদিন বাড়ি থেকে বেরোতাম অফিসের পোশাকে ভদ্রলোক সেজে। আফিমের আড্ডার দোতালায় ভিখিরির সাজ নিতাম। বিকেল হলে ভিক্ষে শেষ করে ওখান থেকেই

আবার ভদ্রলোক সেজে বেরুতাম। বাড়ির লস্করটার মুখ বন্ধ রেখেছিলাম পয়সা দিয়ে।

এই ভাবেই ভিক্ষের টাকায় বাড়ি কিনলাম। বিয়ে করে সংসারী হলাম। ছদ্মবেশ এতই নিখুঁত হত যে, সহজে লোকের সহানুভূতি কুড়োতে পারতাম। আমার রোজগার এখন বছরে সাতশ পাউন্ড।

কিন্তু গত সোমবার দিনেই দুর্ভাগ্যবশতঃ সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। ভিখিরির সাজ ছেড়ে সবে ভদ্রলোক সাজছি। এমন সময় জানালা দিয়ে রাস্তায় স্ত্রীর ওপর দৃষ্টি পড়ল। এদিক ওদিক তাকিয়ে কাকে খুঁজছে—এসময়ে ওকে এভাবে দেখব আশা করিনি। ভড়কে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠি। সঙ্গে সঙ্গে জানালা থেকে সরে এসে, লস্করকে বললাম—স্ত্রীকে যেন ওপরে উঠতে না দেয়।

নিচে যখন চেঁচামেচি চলছে আমি তখন ফের ভিখিরি সাজছি। বউ ধরতে পারবে না জানতাম। কিন্তু পাছে পুলিশের হাঙ্গামা হয় সেই ভয়ে খুচরো পয়সায় ভারী করে ফেলে দিলাম নদীর জলে। কিন্তু অন্য জামাকাপড় সরাবার সময় পেলাম না। এসে হাজির হল পুলিশ। গ্রেপ্তার হবার আগেই স্ত্রীর নামে একটা চিঠি লিখে লস্করটার হাতে দিয়ে দিই। সেই সঙ্গে চিঠিতে পুরে দিয়েছিলাম হাতের আংটিটা। ভেবেছিলাম, ওটা পেলে ও আশ্বস্ত হবে।

—কিন্তু চিঠি তো উনি পেয়েছেন কালকে।

—সেকি! সর্বনাশ, তাহলে তো বেচারীর সাতটা দিন খুবই দুর্ভাবনার মধ্যে কেটেছে।

ইন্সপেক্টর বলল, লস্করের পেছনে পুলিশ যে লেগে ছিল, চিঠি ফেলবার সুযোগ পায়নি তাই কালকে হয়তো কাউকে দিয়ে ডাকঘরে পাঠিয়েছিল। যাই হোক, এমন খেল জীবনে দেখিনি। হিউবুন হওয়া আর চলবে না আপনার। যদি জন্মের মত এ কাজ ছাড়বেন বলে কথা দেন তাহলে ব্যাপারটা আমি এখানেই চেপে দিতে পারি।

—শপথ করছি।

ইন্সপেক্টর বলল, মিঃ হোমস, সত্যিই আপনার জুড়ি নেই। এমন জটপাকানো রহস্যটার সমাধান কী করে করলেন বুঝতে পারছি না।

হোমস হাসতে হাসতে বলল—কি করে আর। এক আউন্স তামাককে ধোঁয়া বানাতে হয়েছে এজন্য। চল ওয়াটসন ফেরা যাক।

থানা থেকে বেরিয়ে এলাম দুজনে। রাস্তায় জেগে উঠেছে তখন প্রভাতী চাঞ্চল্য।



অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ব্লু কারবাঙ্কল

বড়দিনের দিন দুই পর শুভকামনা জানাতে গেছি হোমসের আস্তানায়। ঘরে ঢুকে দেখি শতছিন্ন পশমের একটা টুপী পরীক্ষায় নিমগ্ন হয়ে আছে বন্ধুবর। হাতের কাছে তামাক, পাইপ, সদ্য-পড়া খবরের কাগজের ডাঁই—আতস কাচ আর সন্না।

আমার সাড়া পেয়ে মুখটা তুলেই বলল—আরে বোস বোস। ব্যাপারটা কিছু সামান্য মনে করো না ভায়া। তবে অপরাধ-টপরাধের ব্যাপার নয় এবারে। কিন্তু বড্ড বিদঘুটে।

আমি বসতে বসতে বললাম—তার মানে রহস্যময় কিন্তু আইনসিদ্ধ। এর আগে এরকম তিনটে কেস লেখা হয়েছে।

—সেই ইউনিফর্ম পরা দারোয়ান পিটারসনকে মনে আছে তো? টুপিটা সেই আবিষ্কার করেছে। কিন্তু এর মালিক কে—কোথায় থাকে কিছুই জানা যায়নি।

সে এক ভারী মজার ব্যাপার ডাক্তার। শোন বলছি, বড়দিনের দিন ভোরবেলা পিটারসন টটেনহ্যাম রোড ধরে ফিরছিল। এমন সময় দেখে তালঢ্যাঙা এক মাতাল একটা সাদা রাজহংসী কাঁধে নিয়ে যাচ্ছে। আচমকা কতগুলো ষণ্ডামার্কা লোকের

সঙ্গে লোকটার কি নিয়ে বচসা বেঁধে যায়। বচসা থেকে শুরু হয়ে যায় হাতাহাতি। লাঠির ঘায়ে মাতালটার টুপি ছিটকে পড়ল। সেও তখন লাঠি তুলে নিয়েছে মারবার জন্য। কিন্তু তার হাতের লাঠির খোঁচা লেগে পাশের দোকানের জানালার কাচ গেল ভেঙে। ষণ্ডামার্কা লোকগুলো ততক্ষণে ছেঁকে ধরেছে হাঁসওয়ালাকে। পিটারসন দৌড়োল লোকটাকে উদ্ধার করবার জন্য। এদিকে ইউনিফর্মপরা পিটারসনকে দৌড়ে আসতে দেখে পুলিশ ভেবে লোকগুলো ভয়ে ছিটকে পালিয়ে গেল। রাজহাঁসটা পড়ে রইল রাস্তায়। বেচারা পিটারসন কি করে, কোলে তুলে নিল হাঁসটাকে। তুলে নিল টুপিটাও। হাঁসটার পায়ে ছোট একটা কার্ডে লেখা—মিসেস হেনরী বেকারের জন্য।

টুপির লাইনিং-এ H.B. অক্ষর দুটো সুতো দিয়ে লেখা। পিটারসন টুপি আর হাঁস নিয়ে কোথায় আর যাবে ফেরত দিতে। সোজা চলে এল আমার কাছে। ও জানে ছোট বড় সব সমস্যারই সুরাহা আছে আমার এখানে। হাঁসটা দু'দিন বহাল তরিয়তেই ছিল আমার কাছে—আজই নিয়ে গেছে। এতক্ষণে বোধহয় সেদ্ধ হচ্ছে উনুনে। টুপিটা আমি রেখেছি মালিককে ফেরত দেবার জন্যে। ঠিকানাটা হাতড়ে বেড়াচ্ছি টুপির মধ্যে।

—তুমি টুপির মধ্যে ঠিকানা খুঁজছ—যা নয় তাই বোঝালেই হল?

বলতে বলতে টুপিটা তুলে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলাম। কালো রঙ-এর আমুলি ফেল্ট টুপি, গোলগাল শক্ত। কিন্তু জীর্ণ আর ধুলি মলিন। লাল লাইনিং-এ H.B: অক্ষর দুটো একপাশে লেখা। দু-এক জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে—আলনায় রাখতে গিয়ে অমনটা হয়েছে বোধহয়। নানান রকমের দাগ সর্বত্র—কালি বুলিয়ে সেসব দাগ ঢাকবার চেষ্টাও হয়েছে। বয়সও বেশ হয়েছে টুপিটার—ইলাস্টিক ছিঁড়ে গেছে। টুপি যাতে সহজে নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্য একটা ঢাকনাও লাগানো হয়েছে। হোমসের আতস কাচ নিয়েও পরীক্ষা করলাম—কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। হতাশ হয়ে ফিরিয়ে দিলাম হোমসের হাতে।

—নাঃ, ঠিকানা উদ্ধার করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

হোমস সহাস্যে বলল, আমার পরীক্ষাপদ্ধতি জেনেও কিছু উদ্ধার করতে পারলে না? আসলে সবই দেখতে পাচ্ছ কিন্তু মনের যুক্তি দিয়ে সাজাতে পারছ না।

বলতে বলতেই কেমন আত্মমগ্ন হয়ে পড়ল। নিবিড় চোখে নিরীক্ষণ করতে করতে বলল—শোন তাহলে—বছর দু'তিন আগে লোকটার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল—এখন টানাটানি চলছে। মাথা খাটানোর কাজ—আগে হিসেব করে চলার অভ্যাস ছিল। নীতিনিয়ম মানত—এখন আর সে বালাই নেই। খুব সম্ভব মদ

ধরেছে—নৈতিক অধঃপতনও ঘটেছে—তার ফলে বউয়ের ভালবাসা হারিয়েছে—বিষয় সম্পত্তি যা ছিল তাও গেছে। আর শুনবে? হদ্দ কুঁড়ে লোকটা, ঘরকুনো স্বভাবের। চুলের রঙ ধূসর, লাইম ক্রীম মাখে। দিন কয়েক হল চুল কেটেছে, মাঝবয়সী। হালে আত্মসম্মান বিষয়ে কিছুটা চেতনা ফিরে এসেছে—সম্ভবতঃ বাড়িতে গ্যাসের ব্যবস্থা নেই।

আরও কিছু হয়তো বলে যেত হোমস, বাধা দিয়ে আমি বললাম, ভায়া, প্রমাণের সুযোগ নেই তাই ঠাট্টাটা ভালোই জুড়েছ। লোকটা যে মাথা খাটিয়ে খায় টুপি দেখে তুমি বুঝলে কি করে?

টুপিটা মাথায় চাপাল হোমস—কপাল ছাড়িয়ে নাক পর্যন্ত নেমে এল। বলল—কি দেখছ? মাথার সাইজ যার এত বড় বুদ্ধি খাটিয়ে খাবার মত মগজ তার কম হবে কেন?

—বেশ, কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারগুলো? সম্পত্তি খুইয়েছে সেটাই বা জানলে কি করে?

—শোন তাহলে পর পর বলে যাচ্ছি। বছর তিনেক আগে এই ফ্যাশানের টুপি খুব চালু হয়েছিল। দামী টুপি রীতিমত। কিন্তু টুপির অবস্থা দেখে কি বোঝা যাচ্ছে? তিন বছরে আর একটা টুপি কেনার সঙ্গতি হল না। ভাল অবস্থায় দামী টুপি কিনেছিল, অবস্থা পড়ে যাওয়ায় টুপি আর কিনতে পারেনি। কি ভায়া মিলছে? এবারে শোন—ঢাকনাটা দেখছ তো—ধুলো আর হাওয়া থেকে টুপি রক্ষা করবার জন্যই ওটা লাগানো হয়েছিল। হিসেব—দূরদৃষ্টি থাকার লক্ষণ ওটা। ইলাস্টিকটা ছিঁড়ে আছে—তার মানে সেই হিসেবী বুদ্ধি এখন ঢিলে হয়ে গেছে। স্বভাবও যে ঢিলেঢালা হয়ে এসেছে এ থেকেই তা বোঝা যায়। আর অত দাগ টুপিতে—কালি বুলিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করেছে—তার মানে আত্মসচেতনতা হালে কিছুটা ফিরে এসেছে। টুপির ভেতরে ঘামের দাগ। যারা হাতে কাজ কম করে, মাথা খাটায় বেশি তাদের টুপির ভেতরটা এভাবে ঘামে। ভায়া, যে স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা পায়, তার টুপিতে রোজ বুরুশ পড়ে—ধুলো জমে চামাটি ধরে যায় তখনই যখন টুপির ধুলো ঝাড়া হয় না। স্ত্রীর ভালবাসা হারাবার মোক্ষম লক্ষণ ওটাই।

আমি বললাম, আদৌ বিয়ে করেছে কিনা তাই বা কে জানে।

—হাঁসের ডান পায়ে টুকরো কাগজটা তাহলে ঝুলিয়ে নিতো না হে। এবার বাড়ির গ্যাসের ব্যাপারটা শোন। টুপির ওপর পাঁচ জায়গায় চর্বি-মোমের দাগ রয়েছে। এক হাতে টুপি আর একহাতে জ্বলন্ত মোম নিয়ে বাড়িতে চলাফেরা করেছে মানুষটা—গ্যাসের আলো থাকলে চর্বি-মোমের দরকার হাত না।

এরপর বন্ধুবরের বুদ্ধির তারিফ না করে আর থাকি কি করে? হোমসের বুদ্ধির সঙ্গে টক্কর দেওয়া কোনদিনই সম্ভব হল না আমার।

আমার উচ্ছ্বাসের জবাবে হোমসের কথা আর শোনা হল না। দড়াম করে আচমকা দরজা খুলে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল পিটারসন। দুজনেই চমকে উঠলাম আমরা।

—আরে, কী ব্যাপার পিটারসন?

রুদ্ধশ্বাসে বলল পিটারসন, স্যার সেই হাঁসটা। গলার থলিতে আটকে ছিল—বউ বার করে এনেছে। বলে হাতের মুঠি খুলে ধরল সামনে। দেখলাম, মটর দানার মত আশ্চর্য উজ্জ্বল নীলচে একটা মণি। আলো পড়ে যেন ঠিকরে উঠল। হোমস ঝুঁকে পড়ল মণিটার ওপর। আঁৎকে উঠে আমি বললাম—মরেছে, সেই নিখোঁজ রত্নটা মনে হচ্ছে? কাউন্টেস অব মোরকারের নীলকান্ত পদ্মরাগ?

সপ্রশংস দৃষ্টিতে হোমস মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে—ধরেছ তো ঠিক। টাইমস কাগজে কদিন ধরেই বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ছে। মণিটার জন্য হাজার পাউন্ড পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে।

শুনেছি কাউন্টেস অর্ধেক সম্পত্তিও দিতে রাজি মণির জন্য। তাহলে আসল দামটা হিসেব কর।

গুম হয়ে গিয়ে থপ করে চেয়ারে বসে পড়ল পিটারসন। ততক্ষণে পুরনো কাগজের ডাঁই থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে এসেছে হোমস। বলল—মণিটা চুরি গিয়েছিল। খবরের কাগজেও বিবরণটা বেরিয়েছিল। শোন পড়ছি—

হোটেল কসমোপলিটানে বহুমূল্য মণি লুঠ।

ঘটনাটা ঘটে এমাসের ছাব্বিশ তারিখে কসমোপলিটান হোটেলে। কাউন্টেস অব মোরকার নীলকান্ত পদ্মরাগ মণি চুরির অপরাধে পুলিশ ইতিমধ্যেই ছাব্বিশ বছর বয়স্ক প্লাম্বার জন হর্নারকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনার বিবরণ লিখেছে—চুল্লির একটা শিক ঢিলে হয়ে গিয়েছিল বলে হোটেল পরিচালক জেমস রাইডার খবর দিয়ে আনেন হর্নারকে। হর্নার কাজ শুরু করার কিছুক্ষণ পরে তিনি অন্য কাজে চলে যান। কিন্তু ফিরে এসে দেখেন হর্নার অদৃশ্য, আলমারীর কপাট ভাঙা, একটা গয়নার বাক্স ডালা খোলা অবস্থায় পড়ে আছে টেবিলে। সঙ্গে সঙ্গে খবর যায় পুলিশে। ইন্সপেক্টর ব্রাডস্ট্রীট পরে হর্নারকে গ্রেপ্তার করেন। গ্রেপ্তারের সময় চুরির অপরাধ অস্বীকার করে হর্নার চেঁচামেচি ধস্তাধস্তি করে। লোকটি চুরির দায়ে আগেও একবার জেল খেটেছে। ঘটনার বিবরণ শুনে বিচারপতি হর্নারকে উচ্চতর আদালতে সোপর্দ করেন। বিচারের সময় হর্নারের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা গেছে। অনুতাপে মর্মাহত হয়ে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

হাতের কাগজ সরিয়ে রেখে গম্ভীর মুখে হোমস বলল—পুলিশ আর আদালতের খবরে বিশেষ কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু ব্যাপারটা রীতিমত রহস্যময় ভায়া। হোটেল থেকে চুরি যাওয়া নীলকান্ত পদ্মরাগ রাজহাঁসের পেটে

গেল কি করে? আর বেচারী হেনরী বেকার ওরকম বদখত শ্রীহীন টুপি মাথায় দিয়ে সেই হাঁস ঘাড়ে করে বয়ে চলেছিল কেন?

বলতে বলতে হোমস কাগজ পেন্সিল টেনে নিয়ে একটা বিজ্ঞাপনের খসড়া তৈরি করল এভাবে—

গুজ স্ট্রীটের মোড়ে একটা রাজহংসী আর একটা পশমের টুপি পাওয়া গেছে। মিস্টার হেনরী বেকার মশায় আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ২২১ বি বেকার স্ট্রীটে এসে নিয়ে যেতে পারেন।

বিজ্ঞাপন লেখা শেষ করে বলল—সব কটা সান্ধ্য দৈনিকেই ছাড়ব বিজ্ঞাপনটা। মিস্টার বেকারের বন্ধু-বান্ধবের চোখে পড়লেও উনি ঠিক জানতে পারবেন। পিটারসন, মণিটা আপাততঃ আমার কাছেই রইল। তুমি বরং একটা ভাল দেখে রাজহাঁস কিনে দিয়ে যেও—

হতভম্ব পিটারসন চলে গেল। হোমস এবারে মণিটাকে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। বলল—ওয়াটসন, এ বড় গুরুত্বপূর্ণ মণি। দেখ, সামান্য একটা কার্বনের ডেলা মাত্র, ওজনে মাত্র চল্লিশ গ্রেন কিন্তু বছর কুড়ি বয়সের মধ্যেই কত ইতিহাস তৈরি করে ফেলল। দক্ষিণ চীনের অ্যাময় নদীর তীরে পাওয়া গিয়েছিল একে। সাধারণত পদ্মরাগ মণি চুনির মত লাল হয়, কিন্তু এর বর্ণ নীল—তাই নীলকান্ত। একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বলতে পার। আর এর মধ্যেই দুটো খুন, একবার অ্যাসিড নিক্ষেপ, একটা আত্মহত্যা এবং বেশ কয়েকটা ডাকাতির ঘটনা এই মণির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। আপাততঃ ইনি আমার সিন্দুকেই বন্দী থাকুন। পরে কাউন্টেসকে খবর পাঠানো যাবে।

—চুরি করল হর্নার, বয়ে নিচ্ছিলেন হেনরী বেকার—এর মধ্যে সত্যিকার দোষী কে কি করে বুঝবে?

—দেখা যাক—আগে তো বিজ্ঞাপনের জবাবটা আসুক। তবে মনে হয় হেনরী বেকার নির্দোষ। জানতেন না হয়তো—যাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তার পেটে অমন কাণ্ড ঘটে আছে।

আমার রোগী দেখার তাড়া ছিল। বেকার স্ট্রীটে আর বেশিক্ষণ সময় দিতে পারলাম না। সন্ধ্যাবেলা আসব বলে বেরিয়ে এলাম।

সন্ধ্যা নাগাদ বেকার স্ট্রীটে পৌঁছে দেখি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন স্কচ টুপি পরা লম্বা মত এক ভদ্রলোক। দুজনে একসঙ্গেই উঠে এলাম হোমসের ঘরে।

উষ্ণ কণ্ঠে অভ্যর্থনা জানাল হোমস—বসুন মিঃ হেনরী বেকার। এই যে—টুপিটা আপনারই তো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ অশেষ ধন্যবাদ।

কৌতূহল ছিল গোড়া থেকেই—হোমস অনেক কথাই শুনিয়েছে আমাকে

টুপি দেখে। খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। দোহারা চেহারার মানুষ, গোলাকার কাঁধ—মাথাটা রীতিমত বড়সড়—বুদ্ধিদীপ্ত প্রশস্ত মুখ। থুৎনিতে ছুঁচলো ধূসর-বাদামী দাড়ি। নাক আর থুৎনি ঈষৎ লালচে—হাত কাঁপছে। কোটের কলার তুলে দিয়ে গলা পর্যন্ত বোতাম এঁটেছেন। বোঝা যাচ্ছে ভেতরে শার্ট নেই। কব্জি খুবই সরু। কাটা কাটা স্বরে বাছবিচার করে কথা বলার অভ্যাস। শুনলেই বোঝা যায়—পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ শিক্ষিত মানুষ।

চকচকে চোখে তাকিয়ে হোমস বলল, আপনার হয়ে বিজ্ঞাপনটা শেষ পর্যন্ত আমাকেই দিতে হল।

—মশায়, বিজ্ঞাপনে খরচ করবার পয়সা কোথায়? যখন ছিল অনেক খরচ করেছি—এখন অযথা করতে বুকে লাগে। আমি তো ভেবেছিলাম যণ্ডামার্কা লোকগুলো হাঁস আর টুপি হাতিয়ে নিয়ে পালিয়েছে।

—আপনার হাঁস কিন্তু আর নেই—পেটে চালান হয়ে গেছে—

চমকে যেন লাফিয়ে উঠলেন হেনরী বেকার—সে কী মশায়!

—তবে বদলি হাঁস পাবেন—ওই যে দেখুন, আর চান তো আপনার হাঁসের পালক, পা, গলার থলি দিতে পারি, রেখে দিয়েছি।

বলতে বলতে চোখের কোণে আমার দিকে তাকাল হোমস।

প্রসন্ন হেসে হেনরী বেকার বললেন—ওসব রেখেছেন বৃথাই—আমি নিয়ে কি করব। টাটকা পাখিটা পেলেই আমি খুশি।

হোমস রাজহাঁসটা ভদ্রলোকের হাতে তুলে দিয়ে বলল, আপনার হাঁসটা অবশ্য আরও সরেস ছিল—খানদানী হাঁস। কোথা থেকে কিনেছিলেন দয়া করে বলবেন?

টুপি আর হাঁস বগলদাবা করে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললেন হেনরী বেকার, মিউজিয়মের কাছে আলফা ইনের মালিক উইন্ডিগেট একটা রাজহংসী ক্লাব খুলেছিল। ফি হপ্তায় কয়েক পেনি করে চাঁদা জমা দিয়ে বড়দিনে পেয়েছিলাম এই হাঁস।

হেনরী বেকার বিদায় হলে হোমস বলল—ভায়া, কি বলেছিলাম, ভদ্রলোক নির্দোষ। কিছুই জানে না। ওয়াটসন, রাত বেশি হয়নি চল একটু ঘুরে আসা যাক।

সেই শীতের রাতে ডাক্তারপাড়া ঠেঙিয়ে হোমস আমাকে নিয়ে উপস্থিত হল আলফা ইন সরাইখানায়। দু'গেলাস বীয়ারের হুকুম দিয়ে হোমস হাঁসের প্রশংসা শুরু করল মালিকের কানের সামনে। বলল, এই মাত্র হেনরী বেকারের মুখে আপনার সুখ্যাতি শুনে এলাম। খুব ভাল একটা হাঁস নাকি নিয়ে গিয়েছিল আপনার কাছ থেকে।

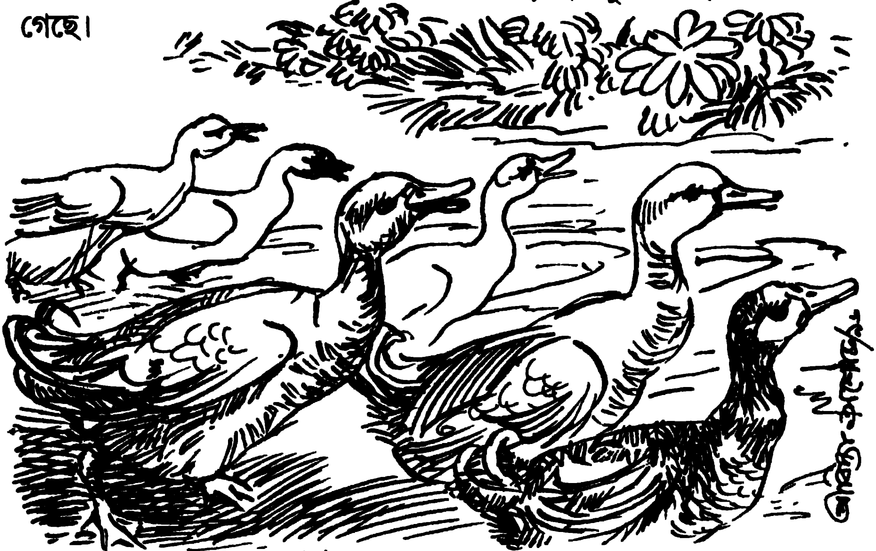
—ওঃ হো হ্যাঁ হ্যাঁ। বাইরের এক দোকান থেকে কিনে এনেছিলাম ওই হাঁস।

—কোথায় সে দোকান?

—দু ডজন হাঁস কিনেছিলাম—কভেন্ট গার্ডেনের ব্রেকিন রিজের কাছ থেকে।

কথা আর বাড়াল না হোমস। বীয়ারটা কোন রকমে শেষ করে বেরিয়ে হাঁটা শুরু করলাম কভেন্ট গার্ডেন মার্কেটের দিকে।

বেশ বড়সড় দোকানের মালিক ব্রেকিন রিজ। খুঁজে বার করতে কষ্ট হল না। দশাসই চেহারা। দোকান বন্ধ করার তোড়জোড় করছে। হাঁসের ব্যাপারে আলফা ইন-এর মালিকের নাম করতেই বলল, মনে পড়েছে—দু'ডজন হাঁস কিনে নিয়ে গেছে।



সঙ্গে সঙ্গে হোমস বলে উঠল, চমৎকার হাঁস। জোগাড় করেছিলেন কোত্থেকে?

অমনি তেড়েফুঁড়ে উঠল লোকটা। অনেকেই নাকি একই প্রশ্ন করে আজ জ্বালাতন করেছে তাকে। যাই হোক, হোমসের সঙ্গে কৌশলে পেরে ওঠে সাধ্য কি তার। বলল, কারা আপনাকে বিরক্ত করছে জানি না, তবে একজনের সঙ্গে আমার বাজি হয়েছিল—হাঁসটা পাড়াগাঁয়ের না শহরের এই নিয়ে। আমি বলেছি পাড়াগাঁয়ের, তাই যাচাই করতে আপনাকে বিরক্ত করতে আসা।

কথা শুনেই রাগ জল হয়ে গেল লোকটার। হেসে বলল—খাস লন্ডন শহরের হাঁস মশায়—আপনিই হেরে গেছেন।

—অসম্ভব। বেশ, একগিনি বাজি রইল।

—বলছেন? তবে দেখুন।

বলতে বলতে একতাড়া খাতা খুলে ফেলল। তারপর সগর্বে দেখিয়ে দিল—২২ ডিসেম্বর ১১৭ নম্বর ব্রিক্সটন রোডের মিসেস ওকশটের কাছ থেকে সাড়ে সাত শিলিং দিয়ে দু'ডজন হাঁস কিনেছে। সেই হাঁস বেচেছে উইন্ডিগেটকে।

নিজের চোখেই ঠিকানাটা দেখে নিল হোমস। বিরস মুখে একটা গিনি বের

করে দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

ওর মুখে তখন আর হাসি ধরে না। বলল—বাজির নেশায় যে বাজি মাৎ করা যাবে লোকটার ওরকম জুলপি আর পকেটের রুমালের কোণা দেখেই বুঝেছিলাম। এবারে চল—মিসেস ওকশটের কাছ থেকে ঘুরে আসা যাক। কিন্তু ব্যাপারটা কেমন হল—আমি ছাড়াও দেখছি অনেকেই হাঁসের ঠিকানা খুঁজে বেড়াচ্ছে হন্যে হয়ে।

হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ঘুরে তাকিয়ে দেখি দোকান থেকে বেরিয়ে এসে ঘুঁসি উঁচিয়ে গাঁক গাঁক করে চেঁচাচ্ছে ব্রেকিন রিজ। নিরীহ চেহারার একটা খর্বকায় মানুষ দাঁড়িয়ে আছে সামনে মুখ গোঁজ করে। ব্রেকিন রিজ সমানে চেঁচিয়ে চলেছে—হাঁস তো মশায় আপনার কাছ থেকে কিনিনি। মিসেস ওকশটকে নিয়ে আসুন—বলতে হয় তাঁকেই যা বলবার বলব।

ইঁদুরের মত মুখ করে ক্ষুদে লোকটা মিন মিন করে বলল—আপনি বুঝতে পারছেন না আমার কথাটা। হাঁসের চালানে আমার হাঁসটাও মিশে গিয়েছিল।

—তার আমি কি জানি—ওসব কথা মিসেস ওকশটকে শোনান গিয়ে। বলে এমন হামলে উঠল যে লোকটা মানে মানে কেটে পড়তে বাধ্য হল।

—যাক বাঁচা গেল। কষ্ট করে আর ব্রিক্সটন রোডে যেতে হল না। ওয়াটসন, শিগগির পা চালাও।

লম্বা পা ফেলে লোকটার কাছাকাছি গিয়ে পিঠে হাত রাখতেই চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা।

—কে আপনি?

—আমার নাম শার্লাক হোমস। যে খবর লোকে অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারে না, আমি তা জেনে ফেলি। ওটাই আমার পেশা। ব্রেকিন রিজের কাছে যার সন্ধান করছিলেন তা আমি জানি।

—আপনি জানেন?

—জানি। আলফা ইন থেকে মিঃ হেনরী বেকার যে রাজহাঁসটি নিয়েছিলেন সেটি সরাইওলা উইন্ডিগেট কিনেছিল ব্রেকিন রিজের কাছ থেকে।

—ওঃ বাঁচালেন—কি হয়রানিই করল লোকটা এই কথাটা বলতে। আপনি আমার ব্যাপার সব জানেন?

—জানি বৈকি। চলুন আমার বাড়ি। কিন্তু আপনার নামটা—

—জন রবিনসন।

—ওটা নয়—আসল নামটা জানতে চাইছি।

যেন থতমত খেয়ে গেল খর্বকার লোকটি। বলল, জেমস রাইডার।

—মনে পড়েছে—হোটেল কসমোপলিটানের পরিচালক। এই তো গাড়ি—চলুন ওঠা যাক।

একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেছে যেন জেমস রাইডার। গাড়িতে উঠে বসল। নিঃশব্দে। চোখে মুখে স্পষ্ট ভয় আর আশা যুগপৎ ছায়া ফেলেছে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেকার স্ট্রীটে পৌঁছে গেলাম। ঘরে ঢুকে জুত করে চেয়ারে বসে হোমস বলল, আপনি একটা সাদা হাঁসের সন্ধান করছেন, তাই না মিঃ রাইডার, হাঁসটার লেজের দিকে কালো ডোরা কাটা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। লাফিয়ে উঠল জেমস রাইডার।

—এই ঘরেই ছিল। পাখির মত পাখি বটে। মরবার পরেও একটা নীল ডিম পেড়ে গেছে। একটা দামী রত্ন।

বলতে বলতে সিন্দুক খুলে নীলকান্ত পদ্মরাগ তুলে দেখাল হোমস।

কোন কথা নেই রাইডারের মুখে। নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তির মত যেন শরীরটা নিথর হয়ে আছে চোখের ওপরে।

ধীর কণ্ঠে হোমস বলল—কি হল মিঃ রাইডার, মুখে কথা নেই কেন? কিন্তু বলতে হবে যে অনেক কথা। খেল কিন্তু এখানেই শেষ আপনার! এবারে কবুল করুন তো—কাউন্টেসের নীলকান্ত পদ্মরাগের সন্ধান পেলেন কি করে আপনি?

—কাউন্টেসের পরিচারিকা ক্যাথরিন কুশাক বলেছিল।

—আচ্ছা। তাহলে তো দেখছি মগজটা নেহাৎ ফেলনা নয়—পাক্কা শয়তান হবার মত সব উপাদানই ওতে রয়েছে। বেচারা হর্নারের পুরনো দুষ্কর্মের কথা আপনি নিশ্চয়ই জানতেন। তাই বেছে বেছে তাকেই কাজে লাগিয়েছেন। ইচ্ছে করেই কাউন্টেসের ঘরের চুল্লির শিক গোলমাল করে ডেকে এনেছিলেন হর্নারকে। সে বেরিয়ে যেতেই গয়নার বাক্স ভেঙে মণি সরিয়ে চেঁচামেচি করে লোক জড় করেছিলেন। মণি চুরি না করেও চোরের দায়ে ধরা পড়ল হর্নার।

আচমকা চেয়ার থেকেই দু'হাত দিয়ে হোমসের পা জড়িয়ে ধরল রাইডার।

—আমাকে বাঁচান স্যার। জীবনে আর অমন কাজ করব না—শপথ করছি।

কঠিন কণ্ঠে হোমস বলল—উঠে বসুন। আগে সব শুনি ঘটনাটা তারপর কি করা যায় দেখব। এখন বলুন—মণিটা হাঁসের পেটে পাচার হল কি করে। আর হাঁসটাই বা দোকানে চালান হল কেমন করে?

—সবই বলব স্যার, কিছু মিথ্যা বলব না। মণিটা পকেটে পুরে ইস্তক বড় দুর্ভাবনায় ছিলাম। বাড়ি নিতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। পুলিশ বাড়ি তল্লাসি করলে পেয়ে যাবে। ব্রিক্সটন রোডে বোনের বাড়ি। ওকশটকে বিয়ে করেছিল সে। হাঁস মুরগী পুষে বিক্রি করে। মনে তোলপাড় দুশ্চিন্তা নিয়ে বোনের বাড়ি গিয়ে উঠলাম। পায়ের কাছে একটা হাঁসকে হেঁটে চলতে দেখে বুদ্ধিটা এল মাথায়। অনেক দিন আগেই বোন বলেছিল বড়দিনে আমাকে একটা হাঁস উপহার দেবে। ফন্দিটা মাথায় খেলে যেতেই ল্যাজে কালো ডোরাকাটা একটা হাঁসকে ধরে মণিটা

ঠেলে দিলাম গলায়। গিলে ফেলল কোঁৎ করে। কিন্তু এমন প্যাঁক-প্যাকানি জুড়ে দিল যে বোন ছুটে এল। সেই ফাঁকে হাত ফসকে হাঁসটা হাঁসের দলে মিশে গেল। বোনকে বড়দিনের হাঁসের কথাটা এই সময় মনে করিয়ে দিলাম। বলল—বেশতো—পছন্দ করে একটা হাঁস নিয়ে যাও। আমি ফেরার সময় হাঁসটাকে ধরে বাড়ি নিয়ে এলাম। কিন্তু পেট কেটে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাথরটা কোথাও পেলাম না। বুঝলাম সর্বনাশ হয়েছে। অন্য হাঁস ভুল করে ধরে নিয়ে এসেছি। আসলটা বোনের বাড়িতেই রয়ে গেছে। তক্ষুণি ছুটলাম বোনের বাড়ি। কিন্তু ততক্ষণে বোনের সব হাঁস চালান হয়ে গেছে—কভেন্ট গার্ডেন মার্কেটের ব্রেকিন রিজের দোকানে।

ল্যাজে কালো ডোরাকাটা হাঁসটার কথা জিজ্ঞেস করলাম বোনকে। বোন বলল—দেখতে হুবহু একরকমের দুটো হাঁস ছিল চালানের হাঁসের মধ্যে। আমার তখন মাথায় বাজ। ছুটে এলাম কভেন্ট গার্ডেনে। খোঁজ নিয়ে জানলাম ব্রেকিন রিজ হাঁস বেচে দিয়েছে—কিন্তু কাকে বেচেছে তা কিছুতে বলতে চাইছে না। সারাদিন ঘুরে ঘুরে এসে বহুবার জিজ্ঞেস করেছি—বারবার হাঁকিয়ে দিয়েছে। লোকটা বেজায় অভদ্র—নিজেরাই তো চোখের সামনে তার ব্যবহারটা দেখলেন। কিন্তু যে জিনিসটার জন্য একটা নির্দোষ মানুষকে দোষী বানিয়েছি—সেটা একবার চোখে পর্যন্ত ভাল করে দেখতে পেলাম না।

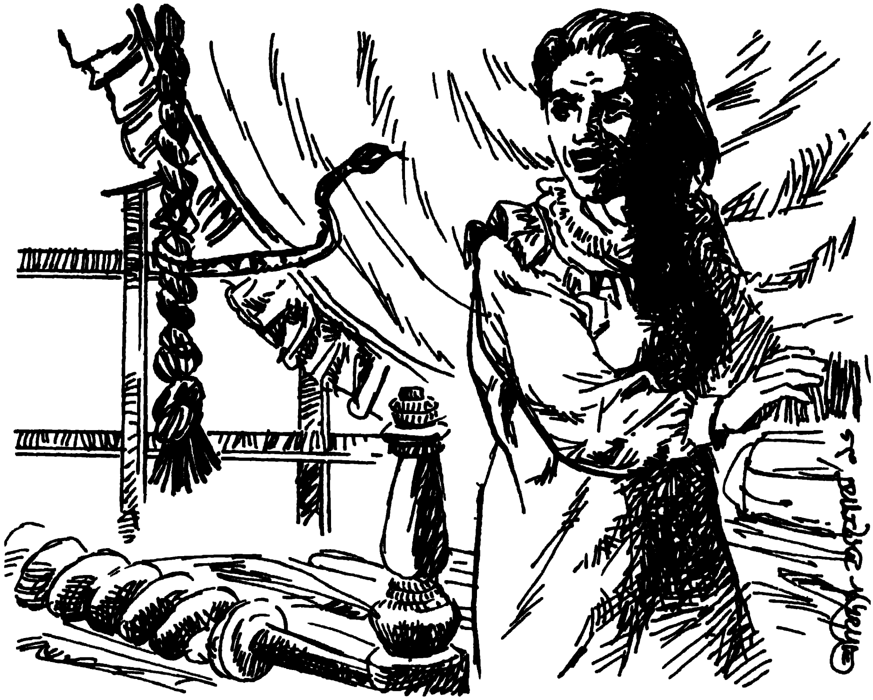
বলতে বলতে গলা ধরে এল জেমস রাইডারের। দু'হাতে মুখ গুঁজে ডুকরে কেঁদে উঠল।

সহসা নিস্তব্ধ হয়ে গেল ঘর। কারুর মুখে কোন কথা নেই। টেবিলের কোণে আঙুলে ঠুকে বাজনা বাজাতে লাগল হোমস।

তারপর তড়াক করে উঠে গিয়ে দরজা খুলে হেঁকে উঠল—বেরোও—বেরোও ঘর থেকে।

গদগদ ভঙ্গীতে মুখ তুলে তাকাল রাইডাব। তারপর দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নিচে।

দরজা বন্ধ করে টেবিলে ফিরে এল হোমস। পাইপটা তুলে নিয়ে বলল—ওয়াটসন, আমি পুলিশের মাইনে করা চাকর নই। তাই আসল চোরকে হাতে পেয়েও ক্ষমা করলাম। কিন্তু দেখ, নাক গলিয়েছিলাম কিসে আর শেষ হল কোথায়। কর্তব্যের খাতিরে এতদূর পর্যন্ত ছুটতে হল। লোকটা আর হর্নারের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে যাবে না—ছাড়া পেয়ে যাবে হর্নার। আর আমার কাছ থেকে যে ব্যবহার পেল—এর ফলে জীবনে আর ওরকম দুষ্কর্ম করবে না। জেলে পাঠালে কিন্তু ফলটা উল্টো হত। সমাজে আর একটা দাগী চোরের সংখ্যা বাড়ত—নিশ্চিত।



অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য স্পেকলড ব্যান্ড

গত আট বছরে সত্তরটা মামলার সমাধান কবেছে হোমস। এর প্রতিটিই ছিল আশ্চর্য রকমের জটিল, অদ্ভুত আর উদ্ভট বকমেব। যে মামলায রহস্য যত বেশি, সমাধানের আনন্দও সে তাতে বেশি পায়। প্রতিটি মামলাতেই সান্নিধ্যে থেকে তার বিচিত্র তদন্তপদ্ধতি, বিশ্লেষণী ক্ষমতা আর যুক্তিব খেলা দেখবাব সুযোগ আমার হয়েছে। অতগুলো মামলাব মধ্যে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর হল স্টেকমোবান বয়লটদের ব্যাপারটা।

১৮৮৩ সালের এপ্রিল মাস সবে পড়েছে। সাত সকালে ঘুম থেকে তুলে বসার ঘরে নিয়ে গেল হোমস। কালো ওড়নায় মুখ ঢেকে বসেছিলেন একজন মহিলা। আমাদের দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। প্রাথমিক পরিচয় পর্ব সেরে স্থির হয়ে আমরা বসেছি। মুখ থেকে ওড়না সরিয়ে মহিলা বললেন—মিঃ হোমস, ভয়ে এখনো আমার হাত পা কাঁপছে। আপনি ছাড়া আমাকে সৎপরামর্শ দেবার আর কেউ নেই।

তাকিয়ে দেখলাম—উদ্বেগে আতঙ্কে মহিলার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চোখে ভীতিবিহ্বল চাহনি।

হোমস এক পলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল—শান্ত হয়ে বসুন। ভয় কী? বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন দেখছি কাকভোরে। রিটার্ন টিকিটটা দস্তানায় গোঁজা দেখা

যাচ্ছে। একঘোড়ায় টানা হাল্কা গাড়িতেই তো এসেছেন দেখছি। রাস্তাও খুব খারাপ।

হতভম্ব হয়ে এক মিনিট তাকিয়ে রইলেন মহিলা।

মৃদু হেসে হোমস বলল, জামার পাঁচ সাত জায়গায় কাদার দাগ লাগিয়েছেন। এক ঘোড়ায় টানা গাড়িতে কোচোয়ানের বাঁ পাশে বসলে ওই ভাবে কাদা ছিটোয় গায়ে।

—ঠিকই বলেছেন আপনি। অনেকটা পথ ভাঙতে হয়েছে আমাকে। মিঃ হোমস, আর কিছু দিন এভাবে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব। আমাকে আপনি বাঁচান। এখুনি টাকাকড়ি আপনাকে দিতে পারব না। দু-এক মাসের মধ্যেই আমার বিয়ে হয়ে যাবে। তখন আপনার পাওনা মিটিয়ে দিতে আমার কোন কষ্ট থাকবে না।

—আপনার কেসটাই তো এখনো শোনা হল না।

—কতগুলো উদ্ভট দুর্বোধ্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি। বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে। যাঁর কাছে সঠিক পরামর্শ পাব মনে করেছিলাম তিনি এক কথায় উড়িয়ে দিচ্ছেন সব। ভাবছেন উদ্ভট কল্পনার রোগে ভুগছি আমি। অসহায় বোধ করে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

আমার নাম হেলেন স্টোনার।

স্টেকমোরানের বনেদী পরিবার রয়লটদের শেষ বংশধর আমার সৎ-বাবা। প্রতাপ প্রতিপত্তি এককালে যথেষ্ট ছিল এই পরিবারের। এখন সবই গেছে। থাকার মধ্যে আছে দু'শ বছরের পুরনো বাড়িটা আর কয়েক একর জমি।

আমার সৎ-বাবা ভাগ্য ফেরাবার জন্য গিয়েছিলেন কলকাতায়। ডাক্তারী করে রোজগারও ভালই করেছিলেন। একদিন রাগের মাথায় খাস চাকরকে এমনভাবে মারধোর করেন যে বেচারী শেষ পর্যন্ত মারাই যায়। অনেক হুজ্জোত গেছে এই নিয়ে। ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে হয়নি বটে তবে জেল খাটতে হয়েছে অনেক দিন। জেল থেকে বেরিয়ে ইংলন্ডে চলে আসেন।

আমার নিজের বাবা ছিলেন ভারতবর্ষে। বেঙ্গল আর্টিলারির মেজর স্টোনার আমার বাবা। আমরা দুই বোন—জুলিয়া আর আমি। আমরা যমজ। আমাদের দু'বছর বয়সে বাবা মারা যান। মা তখন বিয়ে করেন ডাঃ রয়লটকে। ভারতবর্ষেই বিয়েটা হয়েছিল ওঁদের।

বাবা মায়ের জন্য যা রেখে গিয়েছিলেন—তা থেকে বছরে হাজার পাউন্ড মত আয় হয়। মা সৎ-বাবাকে সব টাকাই উইল করে দিয়েছিলেন। একটা সর্ত ছিল—আমাদের বিয়ের পর কিছু টাকা দুই বোনকে দিতে হবে।

বছর আষ্টেক হল আমরা ইংল্যান্ডে ফিরে আসি। কিছুদিন পরেই ট্রেন

অ্যাক্সিডেন্টে মা মারা যান। সৎ-বাবার ইচ্ছা ছিল লন্ডনে প্র্যাকটিস করবেন। কিন্তু মা মারা যাবার পর মন পাল্টে ফেললেন। চলে এলেন স্টেকমোরানে পিতৃপুরুষের পুরনো ভিটেতে।

অনেক দিন পর বাবা ফিরে আসতে প্রতিবেশিরা খুশিই হয়েছিল। কিন্তু বাবার ব্যবহারে তারা বিরূপ হয়ে উঠল। মানুষটা খুবই বদমেজাজী। তাছাড়া দীর্ঘদিন গরমের দেশে থেকে মেজাজ হয়ে গিয়েছিল আরও তিরিক্ষে। অকারণে লোকের সঙ্গে লেগে যেত। কয়েক দিন আগে গাঁয়ের কামারকে পাঁচিলের ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন নদীর জলে। এমনি কয়েকটা ঘটনা পুলিশ কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। তাছাড়া প্রতিবেশীদের কারো সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। কিন্তু যাযাবর বেদেদের সঙ্গে দিব্যি ভাব জমাতেন। নিজেদের ফাঁকা জমিতে তাদের থাকতে দিতেন। মাঝে মাঝে তাঁদের তাঁবুতে গিয়ে থাকেন—ঘুরে বেড়ান ওদের সঙ্গে। একটা অদ্ভুত শখ বাবার। ভারতবর্ষের জন্তু জানোয়ার পুষতে ভালবাসেন। একটা চিতাবাঘ আর একটা বেবুন পোষেন—বাগানেই দুটোকে ছেড়ে রাখেন। ভয়ে তল্লাটের কেউ আমাদের বাড়ির পাশ মাড়ায় না। কোন চাকরবাকর বাড়িতে থাকতে চায় না। বাড়ির কাজকর্ম আমরা দুই বোনে মিলেই করতাম। জুলিয়ার বিয়ে থা হয়নি। আমার মতই তারও চুলে পাক ধরেছিল—তিরিশ বছর বয়সে মারা যায়—সে-ও হল দু'বছর। তার মৃত্যুটাও অদ্ভুত। সবই বলছি আমি একে একে।

বাবার শাসনে আমাদের জীবনে সুখ শান্তি বলে কিছু ছিল না। কোথাও বেরুতে পারতাম না—কারুর সঙ্গে মিশতে পারতাম না। আমাদের এক মাসি আছেন—বিয়ে থা করেননি—হ্যারোতে থাকেন। কেবল তার কাছেই মাঝে মধ্যে গিয়ে থাকতাম—একঘেয়েমী কাটাবার জন্য।

বছর দুই আগে বড়দিনের সময়ে মাসির ওখানেই নৌ-দপ্তরের এক রিটায়ার্ড মেজরের সঙ্গে জুলিয়ার বিয়ে ঠিক হয়। স্টেকমোরানে ফিরে আসার পর বিয়ের কথাটা সৎ-বাবাকে জানানো হয়। শুনে তিনি ভাল মন্দ কিছুই মন্তব্য করেননি। বিয়ের দিন পনের আগে—একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটে—তাতেই মারা যায় জুলিয়া।

চোখ মুদে যেন ধ্যানস্থ হয়ে হোমস কথা শুনছিল। অর্ধনিমিলিত চোখে হঠাৎ বলে উঠল—বলে যান—কোন কিছু বাদ দেবেন না।

—হ্যাঁ, মিঃ হোমস, সবকথা বলব বলেই তো ছুটে এসেছি এত দূরে। আমাদের বাড়িটা দু'শ বছরের পুরনো—সেকেলে জমিদার বাড়ি। ভেঙ্গে পড়েছে—একটা অংশে কোনমতে থাকা যায়। নিচ তলায় তিনটে পাশাপাশি ঘরে আমরা তিনজনে থাকি। সামনে টানা বারান্দা। তিনটে ঘরেরই জানালার পাশে ঘাস ছাওয়া লন। প্রথম ঘরটায় থাকেন সৎ-বাবা। তার পরেরটা জুলিয়ার। তৃতীয়টায় থাকি আমি।

ঘরগুলোতে দরজা একটা করে—বারান্দার দিকে—একঘর থেকে আর এক ঘরে যাবার দরজা নেই। বসবার ঘর আছে—সেটা বাড়ির মাঝের অংশে।

যে রাতে দিদি মারা যান সেদিনের কথা কোনদিন ভুলতে পারব না আমি। সেদিন বাবা একটু তাড়াতাড়িই শুতে যান। ঘরে গিয়ে খুব কড়া চুরুট খেতে লাগলেন। গন্ধ সইতে না পেরে জুলিয়া নিজের ঘর ছেড়ে আমার ঘরে চলে আসে। কদিন পরেই ওর বিয়ে। সেই নিয়ে দুজনে খানিক গল্পগুজব করি। রাত এগারটা নাগাদ নিজের ঘরে যাবার আগে আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—হেলেন, তুই কি রাতে শিস দিস? কদিন ধরে রোজ রাতে শিসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

আমি বললাম, শিস দেবার বদ অভ্যাস আমার নেই। নিশ্চয় বেদেদের কাণ্ড। আর আমার যা ঘুম—একবার বিছানায় উঠলে আর হুঁশ থাকে না।

জুলিয়া ঘরে ফিরে গিয়ে দরজায় তালা দিল। বাগানে চিতাবাঘ আর বেবুন ঘুরে বেড়ায়। তাই আমরা বরাবরই রাতে দরজায় তালা দিয়ে শুই।

আমি কিন্তু সে-রাতে বিছানায় গিয়েও ঘুমুতে পারছিলাম না। কেমন একটা অস্বস্তিতে কেবলই ছটফট করছিলাম। কোথায় যেন অশুভ কিছু একটা ঘটছে—এমনি একটা অজানা আতঙ্ক যেন সূক্ষ্ম ভাবে মনের মধ্যে ছায়া ফেলে ছিল। অথচ বুঝতে পারছিলাম না। রাতটা ছিল দুর্যোগময়। ঝড়ের মাতন চলছে বাইরে—থেকে থেকে বৃষ্টির ঝাপটা লাগছে জানালায়। সেই ঝড় বাদলের শব্দের মধ্যেই সহসা শুনতে পেলাম, পাশের ঘরে জুলিয়া ভয়ে চিৎকার করছে। বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে করিডরে বেরিয়ে এলাম। ঠিক সেই সময়ে একটা শিসের শব্দ কানে হল। পরক্ষণেই ঝনঝনাৎ শব্দ—ধাতব কিছু পড়ে গেলে যেমন শব্দ হয় করিডর দিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ল বোনের ঘরের দরজা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে—জুলিয়া বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে। ভয়ে বিকট হয়ে গেছে মুখের চেহারাটা—শরীরটা যেন টলছে। দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গেই লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। আমাকে দেখে চিৎকার করে বলল—জুলিয়া—ডোরাকাটা পটি—ফুটকি দাগওয়ালা পটি। বলতে বলতে সৎ-বাবার ঘরের দরজার দিকে আঙুল তুলে দেখাল। কিন্তু আর কোন কথা বেরুল না ওর মুখ দিয়ে। ছুটে গিয়ে সৎ-বাবাকে ডাকলাম। ড্রেসিং গাউন গায়ে চড়িয়ে উনি বেরিয়ে এলেন বাইরে। কিন্তু ততক্ষণে জুলিয়া বেহুঁশ হয়ে গেছে। তার মুখে ব্রান্ডি দেওয়া হল—বাবাও ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করলেন—কিন্তু জুলিয়ার জ্ঞান আর ফিরল না। মারা গেল ওই অবস্থাতেই।

—জুলিয়ার পরনে পোশাক কি ছিল? জিজ্ঞেস করল হোমস।

—শোওয়ার পোশাকই ছিল। আর বাঁহাতে ছিল দেশলাই—ডানহাতে একটা পোড়া কাঠি।

— পয়েন্টটা কাজে লাগবে, গুরুত্বপূর্ণ। দেশলাই জ্বালিয়ে শেষ মুহূর্তে ব্যাপারটা দেখবার চেষ্টা করেছিলেন, মৃত্যু সম্পর্কে করোনার কি বলেছিলেন?

—মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয় করতে পারেননি। তবে এ সম্পর্কে সৎ-বাবাকে নিয়ে লোকের মধ্যে কানা ঘুষো আছে। কুখ্যাত হয়ে গেছেন গোটা তল্লাটে। ঘটনাটা খুবই রহস্যময়। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। লোহার মোটা গরাদওলা জানালাও বন্ধ ছিল ভেতর থেকে। খড়খড়িও। দেয়াল মেঝে সবই নিরেট। মারা যাবার সময় জুলিয়া একাই ছিল ঘরে। ওর শরীরে জোর-জবরদস্তির কোন চিহ্নও পাওয়া যায়নি। এসব কথা আমার সাক্ষ্যে আমি বলেছি।

—কোন রকম বিষ দেওয়া হয়েছিল কিনা—

—না, ডাক্তারেরা দেখেছেন—কোনরকম বিষ পাননি।

—মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

—জুলিয়া সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিল বুঝতে পেরেছিলাম। তার থেকেই হয়তো স্নায়ু বিকল হয়ে মৃত্যুটা হয়েছে। কি দেখে যে ভয়টা পেল বুঝতে পারছি না।

—আচ্ছা—বাগানে জিপসীরা থাকতো বলেছিলেন না—

—ওরা তো সব সময়েই আছে—তখনো ছিল জনাকয়েক।

—ডোরাকাটা ফুটকি দাগওয়ালা পটি আপনার বোন যা বলছেন—সেটা কি হতে পারে?

—জিপসীরা ওই রকম রুমাল মাথায় বাঁধে। কি জানি—ও কথাটা কেন বলল—ভয়ে প্রলাপও বকতে পারে।

হোমস গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ল। বুঝলাম মিস হেলেনের ধারণার সঙ্গে সে একমত নয়। বলল—ব্যাপারটা খুবই জটিল। যাইহোক তার পরের ঘটনা বলে যান।

—জুলিয়ার মৃত্যুর পর আমি নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম। দুটো বছর কাটল এভাবেই। মাসখানেক আগে আমারও বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল। সৎ-বাবা জানেন—কিন্তু কোন আপত্তি করেননি। খুশি হয়েছেন কিনা তাও বুঝতে পারিনি। দিন দুয়েক আগে বাড়ির পশ্চিম দিকে মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। আমার শোবার ঘরের দুটো দেওয়াল ফুটো করা হয়েছে। বাধ্য হয়ে বোনের ঘরেই শুতে হচ্ছে আমাকে। বোনের সেই খাটে শুচ্ছি—কিন্তু একদম ঘুমোতে পারছি না। ছটফট করে রাত কাটছে। কাল গভীর রাতে সেই শিসের শব্দ কানে এল। জুলিয়ার মারা যাওয়ার রাতে ওরকম শিস শুনেছিলাম। ভয়ে আতঙ্কে খাট থেকে নেমে পড়লাম। রাতটা জেগে কাটালাম। রাতের অন্ধকার ফিকে হতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এলাম আপনার কাছে।

—ঠিকই করেছেন। কিন্তু মিস স্টোনার—আপনি তো সবকথা খুলে বলেননি। সৎ-বাবার অনেক কীর্তিই চেপে গেছেন।

বলতে বলতে হেলেন স্টোনারের কব্জির ওপর থেকে জামার কাপড় সরিয়ে দিল হোমস। দেখলাম স্পষ্ট হয়ে আছে কালসিটে দাগ।

—বুঝতে পারছি—লোকটা জানোয়ারেরও অধম।

লজ্জায় মাথা নিচু করে রইল মিস স্টোনার। কিছুক্ষণ পরে হোমস বলল, রহস্য খুবই জটিল। সময়ও নেই। যা করবার দু-একদিনের মধ্যেই করতে হবে। আপনাদের বাড়িটা আজই পরীক্ষা করে দেখা দরকার—আপনার সৎ-বাবাকে না জানিয়ে সেটা কি করা সম্ভব হবে?

—তা হবে—উনি আজ শহরে আসবেন।

—তাহলে আজ বিকেল নাগাদ আমরা দুই বন্ধু আপনার বাড়ি যাব। ওই কথাই রইল।

মিস স্টোনার বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

হোমস আমার দিকে ঘুরে বলল—ওয়াটসন, কিছু বুঝতে পারছ?

—বিষম এক হেঁয়ালী ছাড়া তো কিছু মনে হচ্ছে না। জুলিয়া মারা যাওয়ার সময়ে তার ঘরে তো কেউ ছিল না—তাহলে মৃত্যুটা হল কেন? ভয়টাই বা পেল কেন?

—ডোরাকাটা ফুটকি দাগওয়ালা পটির কথা বলে গেছে জুলিয়া। শিসের শব্দও শোনা গেছে সেই রাতে।

—কিন্তু কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

—ভায়া, ঘটনাগুলো পর পর সাজাও। সৎ-মেয়ের বিয়ে ঠিক হবার কিছুদিন পরেই ঘটল দুর্ঘটনাটা। বিয়েটা আটকালে আর্থিক দিক থেকে ডাক্তারই লাভবান হচ্ছে। জিপসীদের সঙ্গে তার দহরম মহরম—রাতে শিসের শব্দ। ডোরাকাটা পটির কথা বলতে বলতে মিস স্টোনারের অজ্ঞান হয়ে যাওয়া—ঝনঝনাৎ শব্দ। শব্দটা ধাতব। খড়খড়ি বন্ধ করার জন্য লোহার খিল ফেলার আওয়াজও হতে পারে। সবকটা ঘটনা এভাবে সাজিয়ে গেলে সূত্র একটা ঠিক মিলে যাবে।—ওকি—ওয়াটসন—

এক ঝটকায় দরজা খুলে পাহাড়ের মত বিশাল দেহ নিয়ে ঘরে ঢুকল এক বৃদ্ধ। মূর্তিমান শয়তান যেন—এমনি চেহারা। বলিরেখায় চিত্র বিচিত্র মুখ রোদে পুড়ে হলদে হয়ে এসেছে। আগুনের ভাঁটার মত চোখ দুটো ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। সরু খাড়া নাকের ডগা ফুলে ফুলে উঠছে সেই সঙ্গে। হাতে একটা চাবুক। ভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে যেন তাড়া করে এসেছে কারুর পেছনে। ঘরে ঢুকেই হাতের চাবুক নাড়তে নাড়তে হুঙ্কার ছাড়ল আগন্তুক—শার্লক হোমসটা কে?

—আমিই। ধীরে শান্ত স্বরে বলল হোমস—কিন্তু আপনি?

—আমি স্টেক মোরানের ডাক্তার গ্রাইমসবী রয়লট। আমার সৎ-মেয়ে এখানে এসেছিল—কি বলে গেল?

হোমসের নির্বিকার দৃষ্টি জানালার বাইরে ছিটকে পড়ল—উঃ বড্ড ঠাণ্ডা আজ বাইরে—

—মেয়েটা এসেছিল কেন? হুংকার ছাড়ল বৃদ্ধ।

—ক্রকাস ভালই ফুটবে এবারে। নিরুত্তাপ স্বর হোমসের।

—স্কাউন্ড্রেল—এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে? দু'পা এগিয়ে এসে নাকের ডগায় চাবুক নাড়তে নাড়তে বলল—তোমাকে আমার জানতে বাকি নেই—পরের ব্যাপারে নাকগলানো তোমার স্বভাব।

বিগলিত হাসি ছড়িয়ে পড়ল হোমসের সারা মুখে।

—স্কটল্যান্ডইয়ার্ডের ঘুঘু—আমার কথাটা শুনে রাখ—আমি সব জানি—মিস স্টোনার এখানে এসেছিল—কিন্তু সাবধান। আমাকে ঘাঁটিও না বলে দিলাম—তাহলে—

বলতে বলতে আগুন খোঁচানর লোহার ডাণ্ডাটা থাবার মত বিশাল বাদামী হাতে তুলে বাঁকিয়ে ফেলল। তারপর ছুঁড়ে দিল ফায়ারপ্লেসে—হিংস্র জিঘাংসা ভরা দৃষ্টিতে হোমসকে দগ্ধ করে হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হেসে ফেলল হোমস। বলল, আমার চেহারাটা ওরকম দানবের মত নয় বটে। তবে লোকটা আর এক মিনিট দাঁড়িয়ে গেলে আমার কব্জির জোরটাও দেখে যেতে পারত।

বাঁকানো ইস্পাতের ডাণ্ডাটা তুলে হোমস এক ঝটকায় আগের মত সোজা করে দিল। তারপর বলল—লোকটার স্পর্ধা কম নয়। আমাকে সরকারী ডিটেকটিভ বলে গালি দিল! ভালই হল। আমার উৎসাহটা বাড়িয়ে দিয়ে গেল লোকটা। কিন্তু মেয়েটার ওপরে না অত্যাচার হয়।

প্রাতঃরাশ সেরে কিছুক্ষণ পরেই হোমস বেরিয়ে গেল। ফিরে এল দুপুর নাগাদ—একতাড়া কাগজ হাতে নিয়ে। বলল—ওয়াটসন—মিস স্টোনারের মায়ের উইলের কপি দেখে এলাম। আগে বছরে আয় হত ১০০ পাউন্ড। এখন দাঁড়িয়েছে ৭৫০ পাউন্ড। বিয়ে হলে মেয়েরা প্রত্যেকে পাবে ২৫০ পাউন্ড করে। বুঝতেই পারছ ডাক্তার লোকটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। সময় এগিয়ে আসছে—বিকেলের প্রস্তুতি নাও ভায়া। রিভলভারটা সঙ্গে নিও। লোহার ডাণ্ডা বাঁকানো লোক—বুঝতেই পারছ।

স্টেকমোরানে পৌঁছে গেলাম ঠিক সময়ে। মিস স্টোনার আমাদের

প্রতীক্ষাতেই ছিলেন।

আমাদের দেখে হাসি মুখে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন—ডক্টর রয়লট লন্ডন গেছেন। সন্ধ্যার আগে ফিরছেন না।

—হ্যাঁ, দেখা হয়েছে আমাদের সঙ্গে। বলে সকালের ঘটনাটা শোনাল হোমস। শুনে মুখ শুকিয়ে গেল মিস স্টোনারের।—দেখুন তাহলে, লোকটা কী প্রকৃতির।

—ভয় পাবেন না। ও জানে না, কে লেগেছে এবারে ওর পেছনে। তেমন বুঝলে আপনাকে মাসির বাড়ি রেখে চলে আসা যাবে। চলুন ঘরটা দেখে আসা যাক। বলল হোমস।

বিশাল একটা ভগ্নস্তূপ যেন বাড়িটা। একদিকের বাসযোগ্য অংশটায় ভারা বেঁধে রাজমিস্ত্রীদের কাজ চলছে। মিস্ত্রীদের কাউকে চোখে পড়ল না। টানা একটা বারান্দার ওপর পাশাপাশি তিনটে ঘর। শেষ ঘরটার দেওয়াল ভাঙা। মাঝের ঘরটাতেই মিস স্টোনার রাতে ছিলেন। সেই ঘরের লনের দিকের জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল হোমস। তারপর লেন্স দিয়ে পরীক্ষা করল অনেকক্ষণ। ভেতর থেকে হুড়কো দিয়ে খড়খড়ি আটকানো। পরে বাইরে থেকে টানাটানি করে জানালা খুলবার চেষ্টা করল। কিন্তু, জানালা খোলা গেল না। পেছন ঘুরে এবারে ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল। সাদাসিদে ঘর। আসবাবপত্র নামমাত্র। দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে একটা সরু খাট, সিন্দুক, ড্রেসিংটেবিল আর চেয়ার। নিবিষ্ট ভাবে ঘরটা নিরীক্ষণ করল হোমস। যেন মনের পর্দায় ছবি তুলে নিল। কড়িকাঠের কাছ থেকে একটা দড়ি ঝুলে আছে—বিছানার পাশে—প্রায় বালিশের কাছাকাছি।

হোমস দড়িটার কথা জানতে চাইল। মিস স্টোনার বললেন, ঘণ্টার দড়ি—হাউসকীপারের ঘর পর্যন্ত গিয়েছে।

—পুরনো দেওয়ালের এই ঘরের সবকিছুই তো দেখছি পুরনো—পোকায় খাওয়া—সে তুলনায় দড়িটা অনেক নতুন মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ—বছর দুই হল লাগান হয়েছে।

আতস কাচ হাতে ধরাই ছিল। হোমস এবারে মেঝের ওপর উপুড় হয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। মেঝের প্রত্যেকটা ফাটা, দেওয়ালের চিড়—তক্তা—তন্ন তন্ন করে দেখল। তারপর গেল খাটের কাছে। দেওয়ালের ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত বার কয়েক চোখ বোলাল—খাটটাকে দেখল। আচমকা ঘণ্টার দড়ি ধরে মারল টান। আশ্চর্য ঘণ্টা বাজল না।

—ব্যাপারটা খুব মজার দেখছি। হাউস কীপারের ঘরের তারের সঙ্গে এই দড়ির কোন সংযোগ নেই। ঘুলঘুলির ওপরের হুকের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে।

—আশ্চর্য, লক্ষ্যই করিনি এতদিন।

—মানসিক চাপ থাকলে এসব দিকে সহজে দৃষ্টি পড়ে না। দেখুন, আরও

মজার ব্যাপার আছে এ ঘরে। রাজমিস্ত্রীরা এমন বোকার মত কাজ করে—কখনো দেখিনি—হাওয়া যাতায়াতের জন্য পাশের ঘরের দেওয়ালে ঘুলঘুলি বানিয়েছে। বরং বাইরের দেওয়ালে বানালে খোলা বাতাস সহজে ঘরে আনা যেত। মিস স্টোনার, ব্যাপারটা খুবই চমকপ্রদ। এই নকল ঘণ্টার দড়ি—স্রেফ ধোঁকা দেবার জন্য। তারপর—এই ঘুলঘুলি—যা হাওয়া যাতায়াতের জন্য তৈরি হয়নি স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। চলুন, ডাক্তারের ঘরটা একবার দেখা যাক।

পাশের ঘরটাই ডাক্তারের—তুলনায় একটু বড়। আসবাবপত্র একই রকম।

দেয়াল ঘেঁষে একটা ক্যাম্পখাট, তাক ভর্তি বই—যন্ত্রশিল্প বিষয়ের বই-ই বেশি। খাটের পাশে আরাম-চেয়ার, দেওয়ালের পাশে কাঠের মামুলি চেয়ার একটা, একটা গোল টেবিল আর বড় একটা লোহার সিন্দুক।

স্থির দৃষ্টিতে তন্ময় হয়ে দেখল সবই হোমস। পরে সিন্দুকটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল—কি আছে ওতে?

—বাবার নিজের কাগজপত্র—অনেক দিন আগে একবার দেখেছিলাম।

—ভেতরে বেড়াল-টেড়াল কিছু নেই তো?

—সেকী—বেড়াল থাকতে যাবে কেন?

—না ডালার ওপর এক ডিস দুধ পড়ে আছে তো—তাই বললাম।

—বেড়াল নেই বাড়িতে—চিতা আর বেবুন আছে।

—তা বটে—কিন্তু চিতার তো দুধ রোচে না। বলতে বলতে কাঠের চেয়ারটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে লেন্স দিয়ে চেয়ার পরীক্ষা করতে লাগল। পরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বোঝা গেল—কিন্তু ওয়াটসন—ওটা কি—

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি একটা কুকুর-মারা ছোট চাবুক বিছানার কোণে ঝুলছে—ডগায় একটা ফাঁস বাঁধা।

বললাম—ফাঁসটা কেন বুঝতে পারছি নাতো।

—হ্যাঁ, বৈশিষ্ট্য ওটাই। দেখ, বুদ্ধিমান লোক যদি পাপ কাজে নামে তাহলে তার কাজকর্মই হয় আলাদা। চলুন মিস লনে যাওয়া যাক।

লনে এসে গম্ভীর মুখে অনেকক্ষণ পায়চারী করল হোমস। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—মিস স্টোনার—আমার সাহায্য আপনি চেয়েছেন কিন্তু আমি যা বলব, তাই করতে রাজি আছেন তো?

—এছাড়া আমার বাঁচবার তো আর কোন পথ নেই মিঃ হোমস।

—তাহলে শুনুন—আজকের রাতটা আপনি আপনার পুরনো ঘরেই কাটাবেন। আমরা রাত কাটাবো আপনার ঘরে। শিসের শব্দ ব্যাপারটা আমার আগে জানা দরকার। আচ্ছা, বাগানের শেষে রাস্তার ওপাশে দেখা যাচ্ছে, ওটা নিশ্চয় গাঁয়ের সরাইখানা?

—হ্যাঁ।

—ওখান থেকে মনে হচ্ছে আপনার জানালা দেখা যায়। ঠিক আছে। আমরা ওখানেই থাকব। ডাক্তার ফিরে আসার পর মাথা ধরার অছিলায় আপনি ঘরে ঢুকে পড়বেন। যখন বুঝবেন পাশের ঘরে উনি শুয়ে পড়েছেন, তখন নিঃশব্দে জানালা খুলে পাশে বাতিটা রাখবেন—ওটাই সংকেত—তারপর দরকারী জিনিসপত্র নিয়ে আপনার পুরনো ঘরে চলে যাবেন।

বেলা পড়ে এসেছে। আমরা আর অপেক্ষা না করে সরাইখানায় এসে ওপরতলার একটা ঘর বেছে নিলাম। পোড়ো প্রাসাদে মিস স্টোনারের ঘর এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়।

বেশিক্ষণ আমাদের অপেক্ষায় থাকতে হল না। দেখলাম বসবার ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। ডাক্তার রয়লট ফিরে এসেছে তাও বুঝতে পারলাম। গাড়োয়ানের সঙ্গে চেঁচামেচি কানে এলো।

সরাইখানার অন্ধকার ঘরের জানালায় বসে সবই লক্ষ্য করছি আমরা। সহসা হোমস বলে উঠল—ওয়াটসন, আজ রাতের অভিযানে কিন্তু বিপদ আছে—ভেন্টিলেটারটা লক্ষ্য করে দেখেছ তো?

—ওতো ছোট্ট ফুটো মাত্র—ইঁদুরও গলতে পারবে কিনা সন্দেহ।

—ওই ফুটো দিয়েই কড়া চুরুটের গন্ধ জুলিয়ার ঘরে ঢুকত।

—তাতে হলোটা কি?

—ভায়া—মাথা খেলাও। ভেন্টিলেটার তৈরি হল, দড়ি ঝোলান হল—পরে বিছানায় শুয়ে একজন মারা গেল—বিছানাটাও যেন এসবের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে পাতা হয়েছে।

—কি বোঝাতে চাইছ?

—খাটের চারটে পায়াই মেঝেতে পোঁতা—অর্থাৎ খাট নড়াচড়া করবার উপায় নেই। ঝোলানো দড়ির তলাতেই বিছানা রাখতে হবে সেই রকম ব্যবস্থা।

এবারে যেন রহস্য খানিকটা বুঝতে পারছি। একটা যোগসূত্র ধরা পড়ছে। বললাম—ঠিকই বলেছ—একটা কুটিল ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যাচ্ছে যেন।

—ভায়া—বিদ্যে এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধি এই দুয়ের সংযোগ না ঘটলে ডাক্তার হওয়া যায় না। আর তারা যখন কোন ষড়যন্ত্র করে তাতে ফাঁক থাকে না।

ক্রমে রাত বাড়তে লাগল। রাত নটা নাগাদ সামনের জীর্ণ প্রাসাদ অন্ধকারে মিশে গেল। ভেতরের কোন নড়াচড়া আর বাইরে থেকে বোঝার উপায় রইল না।

ক্রমে ঘড়ির কাঁটা এগারটার ঘর স্পর্শ করল। সামনের স্তূপীকৃত অন্ধকারে

একটা উজ্জ্বল আলোর রেখা জেগে উঠল।

সংকেত স্পষ্ট। লাফিয়ে উঠে হোমস বলল—মাঝের ঘরের আলো—ওয়াটসন চল।

বাগানে ঢুকে জুতো খুলে পা টিপে টিপে এগুতে লাগলাম দু'জনে। বাড়িতে বেবুন আর চিতাবাঘ ছাড়া থাকে মনে পড়ল। বুক কেঁপে উঠল ভয়ে। কিন্তু নিরাপদেই আমরা ঘরে এসে ঢুকতে পারলাম।

ঘরে ঢুকে খড়খড়ি বন্ধ করে বিছানায় উঠে বসল হোমস। পাশে রাখল মোমবাতি আর দেশলাই। হাতে একটা সরু বেত। আমি রিভলভার হাতে নিয়ে চেয়ারে বসলাম। একটু পরেই ঘরের বাতি নিবিয়ে দিল হোমস।

নিঃসীম অন্ধকারে ডুবে গেল ঘর। নিঃশব্দে সময় কাটতে লাগল আমাদের। দূরের গির্জায় পনের মিনিট অন্তর ঘণ্টা বেজে চলেছে। খড়খড়ির বাইরে একবার ঘর-ঘর আওয়াজ পাওয়া গেল। চিতার গলার আওয়াজ। বাড়ি টহল দিচ্ছে জানোয়ারটা।

উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর শঙ্কায় ভরা সেই ভয়াবহ রাতের প্রতীক্ষার স্মৃতি ভুলবার নয়।

রাত তিনটের ঘণ্টা বেজেছে কিছুক্ষণ আগে। আচমকা মাথার ওপরের ভেন্টিলেটারে আলোর ঝিলিক চোখে পড়ল। নাকে ভেসে এল তেল আর ধাতু তেতে ওঠার গন্ধ। নিশ্চয় লণ্ঠন জ্বলছে পাশের ঘরে। চোরালণ্ঠন। হাঁটাচলার একটা মৃদু শব্দ কানে এল। তারপর কোন সাড়াশব্দ নেই।

প্রায় আধঘণ্টা কাটল একই ভাবে। পোড়া গন্ধটা যেন আর একটু ঘন হয়েছে। সহসা সোঁ সোঁ-শব্দ—কেটলি থেকে স্টীম বেরিয়ে গেলে যেমন শব্দ হয় ঠিক সেরকম শব্দ।

শব্দটা কানে যেতেই হোমস বিছানা থেকে ছিটকে নেমে পড়ল। ফস করে দেশলাই ঘষে আলো জ্বালল। তারপর হাতের বেতটা দিয়ে সপাং সপাং করে ঝুলন্ত দড়িটায় ঘা মেরে যেতে লাগল, চাপা গলায় চেঁচাতে লাগল· –ওয়াটসন, দেখ—তাকিয়ে দেখ।

অন্ধকার ঘরে হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠায় চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যেই ঝাপসা ভাবে চোখে পড়ল—হোমস পাগলের মত বেত হাঁকড়ে চলেছে—আতঙ্কে বিভীষিকায় মুখের চেহারা হয়ে উঠেছে বীভৎস। যেন অন্য কারো মুখ—হোমসের নয়।

একটা শিসের শব্দ কানে এল।

ততক্ষণে বেত হাঁকড়ানো বন্ধ করে ভেন্টিলেটারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হোমস।

কয়েকটা মুহূর্ত। সহসা নিশীথ রাতের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল—বীভৎস বিকট এক ভয়ার্ত আর্তনাদে। যেন মরণ-হাহাকার।

মুহূর্তের জন্য যেন শরীরের রক্ত জমে গেল আমাদের। নিঃশ্বাস আটকে গেল বুকে। শরীর অবশ করে সেই বুকফাটা আর্তনাদের রেশ ক্রমে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল। ফিরে এল নিশীথ রাতের শীতল স্তব্ধতা।

রুদ্ধশ্বাসে বললাম—এ আর্তনাদ কার?

—পাশের ঘরে। রিভলভার তৈরি রাখ। চল।

বাতি জ্বালিয়ে করিডরে বেরিয়ে এলাম আমরা। ডাঃ রয়লটের দরজায় পর পর দুবার টোকা মারল হোমস। কোন সাড়া পাওয়া গেল না। হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকল অবশেষে। উদ্যত রিভলভার হাতে আমি রইলাম পেছনে।

ঘরের ভেতরে এক ভয়াবহ দৃশ্য অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। টেবিলের ওপর জ্বলছে একটা ধোঁয়াচ্ছন্ন লণ্ঠন। শাটারটা অর্ধেক খোলা। আলোর রেখা ছিটকে গিয়ে পড়েছে সিন্দুকের ওপর। টেবিলের পাশে চেয়ারে উপবিষ্ট ডাঃ রয়লট, গায়ে লম্বা ড্রেসিং গাউন। সেই কুকুরমারা ছোট্ট চাবুকটা—যেটার ডগায় ফাঁস লাগানো দেখে বিকেলে অবাক হয়েছিলাম—ডাক্তারের কোলের ওপরে রয়েছে সেটা। চিবুক ওপরে তোলা—কড়িকাঠের দিকে চোখ—চোখে স্থির ভয়াবহ দৃষ্টি। কপাল ঘিরে একটা অদ্ভুত পটি—ছিট বাদামি ডোরাকাটা পটি। খুব আঁট করে মাথায় বেড় দিয়ে রাখা হয়েছে পটিটা। আমাদের ঘরে ঢোকার পরেও ডাক্তারের শরীরে নড়াচড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

—এই তো সেই ফুটকি দাগ দেওয়া ডোরাকাটা পটি। বলতে বলতে এক পা এগিয়েছি কি এগুইনি, অমনি নড়ে উঠল মাথার পটিটা—আপনা থেকে। দেখতে দেখতে সরসর করে বেড়টা খুলে গিয়ে—একটা চ্যাপ্টা মাথা বেরিয়ে এল তলা থেকে। শিউরে উঠে ছিটকে এলাম পেছনে—একটা অদ্ভুত আকৃতির সরীসৃপ।

চেঁচিয়ে উঠে হোমস বলল, সর্বনাশ! অ্যাডার সাপ—ভয়ঙ্কর বিষধর। ভারতীয় বিষধর সরীসৃপ। ডাক্তার আর বেঁচে নেই। ছোবল মারার দশ সেকেন্ডের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। নিজের পাতা ফাঁদেই শেষ পর্যন্ত মরতে হল কুচকী ডাক্তারকে। যাক—আমাদের বেশি হ্যাপা পোয়াতে হল না। দাঁড়াও, সাপটাকে এভাবে তার ডেরায় পাঠানো যাক। পরের কাজ হবে—মিস স্টোনারকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া!

বলতে বলতে ঝট করে ডাক্তারের কোল থেকে চাবুকটা তুলে নিল। তারপর সরীসৃপটার গলায় ফাঁস আটকে টেনে নিয়ে সিন্দুকটার মধ্যে পুরে দিল। পাল্লা টেনে বন্দী করল সাপটাকে।

পরের দিন বাড়ি ফেরার পথে হোমসের ব্যাখ্যা শোনা গেল।

—জানলা দরজা বন্ধ—নিরেট দেয়াল আর মেঝে—তবু একটা মানুষ খুন হয়ে গেল ঘরের ভেতরে। মৃত্যুর কারণও ডাক্তাররা নির্ণয় করতে পারল না। গোড়ায় এই ব্যাপারগুলো নিয়ে বেশ ভাল রকমের গোলমালে পড়ে গেয়েছিলাম। জিপসী আর জিপসীদের মাথায় বাঁধা চিত্র-বিচিত্র পাগড়ির বিষয়টাও কম বিভ্রান্তিকর ছিল না। কিন্তু—ভেন্টিলেটারটাই অন্ধকারে আলোর সন্ধান দেয় আমাকে। বুঝতে পারি ভেতর থেকে টেনে বন্ধ করা জানালা দিয়ে যখন ঘরে কিছুর ঢোকা সম্ভব নয় তখন ওই ঘুলঘুলিই একমাত্র পথ যা দিয়ে কিছু একটা বেরিয়ে আসে। আর সেটাকে বিছানা পর্যন্ত নামিয়ে আনার জন্যই ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে দড়িটা।

ডাক্তারী শাস্ত্রটা জানা থাকায় ডাক্তার এমন বিষের সন্ধান বার করতে পারলেন রাসায়নিক পরীক্ষায় যার অস্তিত্ব ধরা যায় না। আর সেই বিষ শরীরে ঢুকে মৃত্যু ঘটালে—মৃত্যুর কারণ ধরা পড়বে না। ডাক্তার জিপসীদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে সাপটাকে জোগাড় করেছিল। তারপর একটা ভাল অভ্যাসে অভ্যস্ত করে নিয়েছিল—শিস দিয়ে ডাকলেই দুধের লোভে বেরিয়ে আসত সাপটা। তারপর ঘুলঘুলির দড়ি বেয়ে নেমে আসত বিছানায়। অন্ধকারে সাপের গায়ে পা দিয়েই মারা পড়েছে জুলি। শিসের শব্দ যবে থেকে কানে গেছে—সেদিন থেকেই বিছানায় নেমেছে সাপ। কিন্তু কামড়ায় নি।

অনুমানটা যাচাই করে নেবার জন্য ঢুকলাম ডাক্তারের ঘরে। চেয়ার পরীক্ষা করে বুঝলাম—ডাক্তার তাতে উঠে দাঁড়ায়। এছাড়া ঘুলঘুলি নাগালে পাওয়া সম্ভব নয়। লোহার সিন্দুক—আর তার ওপর এক প্লেট দুধ দেখে আমি সন্দেহমুক্ত হলাম। ফাঁসওলা চাবুকটার কার্যকারীতাও আর বুঝতে কষ্ট হল না।

ধাতব ঝনঝনাৎ শব্দ—আসলে সিন্দুকের ডালা বন্ধ করবার শব্দ। সাপটাকে সিন্দুকে চালান করে দিয়ে সিন্দুক বন্ধ করেছিল ডাক্তার। সাপটা ঝোলানো দড়ি বেয়ে খাটের ওপরে নেমে আসত—সেটাকে ফিরতি পথে চালান করে যার জিনিস তার কাছে ফেরত পাঠাবার উদ্দেশ্যেই বেতটা সঙ্গে এনেছিলাম। অন্ধকার ঘরে খাটের ওপরে বসে থেকে ফোঁস ফোঁস শব্দ কানে যেতেই বেত হাঁকড়াতে শুরু করেছিলাম। বাধা পেয়ে সাপটা ফিরে গিয়ে যাকে সামনে পেয়েছে তার গায়েই ছোবল বসিয়েছে। কুচক্রী ডাঃ গ্রাইমসবী রয়লটের মৃত্যু এ ভাবেই হল শেষ পর্যন্ত। ওয়াটসন, এই করুণ মৃত্যুর পেছনে আমার পরোক্ষ হাত আছে ঠিকই—কিন্তু তার জন্য আমার বিবেক কখনোই কাতর হবে না।



অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ইঞ্জিনীয়ার্স থাম্ব

আমি নিজে দুটি অদ্ভুত মামলা নিয়ে এসেছিলাম হোমসের কাছে। মামলা দুটোর মধ্যে সবচেয়ে নাটকীয় আর চমকপ্রদ হল মিঃ হেথার্লির এই বুড়ো আঙুল সংক্রান্ত ঘটনাটি।

১৮৮৯ সালের কথা। সবে বিয়ে করে সংসার নিয়ে গুছিয়ে বসেছি। ডাক্তারী শুরু করেছি পুরোদমে। আমার চেম্বার প্যাডিংটন স্টেশনের কাছেই। আমার রোগীদের মধ্যে রেলের কর্মচারী অনেকেই ছিল। গার্ড ভদ্রলোকের দীর্ঘদিনের কঠিন ব্যামো সারিয়ে দিয়েছিলাম। সুযোগ পেলেই তিনি সকলের কাছে শত মুখে আমার প্রশংসা শুরু করতেন।

একদিন এই ভদ্রলোকই এক রোগী নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, নতুন রোগী। তাই নিজেই নিয়ে এলাম। আমার কাজ শেষ হল—এবারে চলি।

কনসাল্টিং রুমে ঢুকে দেখি—বয়স পঁচিশের এক যুবক টেবিলের পাশে বসে—একটা হাতে রক্ত ভেজা রুমাল জড়ানো।

আমার টেবিলের ওপরেই যুবকটি তার কার্ড রেখে দিয়েছিল—চোখে পড়ল—

মিঃ ভিক্টর হেথার্লি
হাইড্রলিক ইঞ্জিনীয়র
১৬এ, ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট (চারতলা)

—সুপ্রভাত ডাক্তার। এই অসময়ে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। কাল রাতে একটা অ্যাকসিডেন্টে পড়েছিলাম। ভোরের ট্রেনে এসে স্টেশনে ডাক্তারের খোঁজ করছিলাম। এক ভদ্রলোক এখানে নিয়ে এলেন। আমার আঙুলটা—

বলতে বলতে হাতের রক্তমাখা রুমালের পটি খুলে ফেলল। শিউরে উঠলাম হাতের দিকে তাকিয়ে। ভয়াবহ ব্যাপার। হাতের চারটে আঙুল ঠিকই আছে। বুড়ো আঙুলটার জায়গায়—স্পঞ্জের মত দগদগে মাংস আর হাড় বেরিয়ে আছে, মনে হচ্ছে ভারী কোন অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে অথবা ছিঁড়ে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে আঙ্গুলটা।

ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে বললাম, রক্তপাত যথেষ্টই হয়েছে মনে হচ্ছে।

—অনেক রক্ত বেরিয়েছে। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখি তখনও রক্ত ঝরছে। তাই রুমাল দিয়ে কব্জি পেঁচিয়ে ধরে—গাছের সরু ডাল দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ করেছি।

—চমৎকার! ডাক্তারদের মত কৌশলেই রক্ত বন্ধ করেছেন আপনি।

—হাইড্রলিক্স আমার বিষয়, ডাক্তার, তরল পর্দাথের গতি-বিজ্ঞান আমি জানি। আঙুলটা দেখুন আপনি।

—এরকমটা হল কি করে? কি রকম অ্যাকসিডেন্টে পড়েছিলেন?

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ভদ্রলোক বললেন—ডাক্তার, যা ঘটেছে তা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না—অ্যাকসিডেন্ট—খুনের চেষ্টা এসব কিছুই নয়—কিন্তু এসবের চাইতেও ভয়ানক কিছুর মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে আমাকে।

ক্ষতস্থান ভাল করে ধুয়ে মুছে ব্যান্ডেজ করে দিলাম।

দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণাটা সামলে উঠে ভদ্রলোক বললেন—এখুনি পুলিশকে গিয়ে সব খবর জানাতে হবে। কিন্তু, জানি কোন কাজ হবে না—রহস্যের তল খুঁজে পাবে না পুলিশ।

এর পরেই মিঃ হেথার্লিকে নিয়ে হাজির হই হোমসের বেকার স্ট্রীটের আস্তানায়।

তখনো পর্যন্ত হোমসের প্রাতঃরাশ খাওয়া হয়নি। এক সঙ্গেই খেলাম তিনজনে। তারপর হেথার্লি তার কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করলেন।

—আমি একজন তরুণ হাইড্রলিক ইঞ্জিনীয়ার। সাত বছর একটা কোম্পানিতে কাজ করেছি। পরে চাকরি ছেড়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করি।

ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটে অফিস করে বসেছি বছর দশেক হল—কিন্তু বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারছি না। বাবা মারা যাবার পর সামান্য যা পয়সা কড়ি হাতে

পেয়েছিলাম দিনে দিনে সবই ফুঁকে যেতে লাগল। ব্যবসা রাখব কি গুটিয়ে ফেলব এই দোনামনায় দিন কাটাচ্ছি।

গতকাল কর্নেল লাইস্যান্ডার স্টার্ক নামে এক ভদ্রলোক এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। রোগাপটকা চেহারা। কথায় পরিষ্কার জার্মান টান। ভদ্রলোক প্রথমে এসেই নাটকীয় ভঙ্গীতে কথা শুরু করলেন। বললেন, আমি অত্যন্ত গোপনীয় একটা কাজ নিয়ে এসেছি। আপনার কাজে দক্ষতা অভিজ্ঞতা রয়েছে—তার চেয়েও বড় ব্যাপার যেটা তা হল—আপনার কাছে গোপনীয়তা রক্ষিত হবে। ঝঞ্ঝাটমুক্ত ব্যাচেলর বলেই এটা আপনার কাছে আশা করা যায়।

বললাম—আপনি নির্ভয়ে আপনার কথা বলতে পারেন। বাইরের কেউ জানতে পারবে না।

ভদ্রলোক পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হতে পারছিলেন না যেন। পরে মনঃস্থির করে নিয়ে বললেন—একঘণ্টার সামান্য একটা কাজ—কিন্তু বিনিময়ে এক রাতে পঞ্চাশ গিনি রোজগার—আপনি রাজি তো?

ভদ্রলোকের রকম সকম দেখে আমি ততক্ষণে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছি। বললাম, কাজের বিনিময়ে দক্ষিণাটা লোভনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু কাজটা কি সেটাই তো জানতে পারছি না।

শেষ পর্যন্ত জানা গেল—একটা হাইড্রলিক স্ট্যাপিং মেসিন বিগড়েছে। গোলমালটা কোথায়—তাই আমাকে দেখিয়ে দিয়ে আসতে হবে। যেতে হবে আইফোর্ডে—আজ রাতেই।

আমি রাজি হলাম। ভদ্রলোক রীডিং স্টেশনে আমার জন্য গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবেন। সেখান থেকে তার গাড়িতে চেপে যেতে হবে সাত মাইল ভেতরে।

আমার ওই অবস্থায় পঞ্চাশ গিনি রোজগারের এই সুযোগ হাতছাড়া করাটা বোকামীর কাজ হবে। কিন্তু এটাও মনে এল একটা সাধারণ কাজে এত গোপনীয়তার কি কারণ থাকতে পারে। ভদ্রলোককে বললাম, এবারে পরিষ্কার ভাবে খুলে বলুন—ঠিক ঠিক আমার কাজটা কি। নির্ভয়েই বলুন।

ভদ্রলোক আমাকে বোঝালেন—সাজিমাটি জিনিসটা খুবই দামী। ইংলন্ডের দু'এক জায়গা ছাড়া পাওয়া যায় না। রীডিং স্টেশন থেকে মাইল দশেক ভেতরে ছোট্ট একটা জায়গা কিনেছেন ভদ্রলোক—সেই জমিতেই সাজিমাটির স্তর পাওয়া গেছে। ডাইনে বাঁয়ে প্রতিবেশীদের জমিতেও রয়েছে সাজিমাটি। সোনার চাইতেও দামী জিনিস, প্রতিবেশীরা তার খবরও রাখে না। তাই তিনি ঠিক করলেন, নিজের জমির সাজিমাটি তুলে বিক্রি করবেন—আর সেই টাকা দিয়ে প্রতিবেশীদের জমিও একে একে কিনে নেবেন। এই উদ্দেশ্যেই গোপনে মাটি

তুলবার জন্য একটা হাইড্রলিক প্রেস কিনেছেন। আশপাশের কেউ কিছু জানে না। আমাকেও অনুরোধ জানালেন—একথা যেন কেউ জানতে না পারে।

আমি কর্নেলকে বললাম—সাজিমাটি তুলতে হলে তো গর্ত খুঁড়ে তুলতে হবে—তার জন্য হাউড্রলিক প্রেসের দরকার হল কেন?

কর্নেল বললেন, এ ব্যাপারে তাদের একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে। মাটি তুলে সঙ্গে সঙ্গে ইঁট বানিয়ে বাইরে চালান করে দেওয়া হয়।

ভদ্রলোকের কথাবার্তা শুনে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ভদ্রলোক আমাকে মাঝরাতে আস্তানায় নিয়ে যেতে চাইছেন—পারিশ্রমিকও দিতে চাইছেন দশগুণ—কিছু একটা যে গোপন করছেন আমার কাছে তা বুঝতে পারছি—কিন্তু ব্যাপারটা আঁচ করে উঠতে পারছি না। যাইহোক রাতের ট্রেন ধরে আইফোর্ড পৌছালাম সাড়ে এগারটার পর। ফাঁকা স্টেশন। প্ল্যাটফর্মে আমি ছাড়া দ্বিতীয় লোক নেই। কর্নেল বাইরে আমার জন্য গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। দেখতে পেয়েই যেন টেনে তুলে নিলেন।

হোমস জানতে চাইল—এক ঘোড়ায় টানা গাড়ি?

—হ্যাঁ।

—খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল ঘোড়াটাকে?

—না, না, বেশ তাজা চকচকে ঘোড়া।

—রঙটা নজর করেছিলেন?

—হ্যাঁ, তামাটে রঙ-এর ঘোড়া।

—বেশ, তারপর কি হল?

—রাস্তা খুবই খারাপ। লাফাতে লাফাতে ছুটতে লাগল গাড়ি। ও ভাবেই প্রায় ঘণ্টাখানেক ছুটল গাড়ি। কর্নেল বলেছিলেন স্টেশন থেকে সাত মাইল—কিন্তু আমার মনে হল—পথ দশ বার মাইলের কম নয়। কর্নেল গাড়িতে বসে আমাকেই দেখছিলেন। তখনো তার মনে শঙ্কা আর সন্দেহ ঘোরা ফেরা করছিল। গাড়িতে কোন কথাই হল না। একসময় কাঁকড় বিছানো পথের ওপর দিয়ে এসে গাড়ি থামল। গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটা ভাল করে দেখার সুযোগও পেলাম না। আমাকে ঝটপট বাড়িতে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ভেতরে কোন আলো ছিল না। আমরা অন্ধকারের মধ্যে দু'কদম হাঁটবার পর দেখলাম—এক মহিলা লণ্ঠন হাতে এগিয়ে এলেন। মহিলাকে এককথায় রীতিমত রূপসী বলা চলে। পরনে দামী পোশাক। বিদেশী ভাষায় কর্নেলকে কি যেন জিজ্ঞেস করলেন। ছোট্ট একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে জবাব দিলেন কর্নেল। আশ্চর্য হয়ে গেলাম—কর্নেলের জবাব শুনেই ভদ্রমহিলা এমন ভাবে আঁৎকে উঠলেন যে আর একটু হলে হাতের লণ্ঠনটা খসে পড়ে যেত। কর্নেল ফিসফিস

করে কী বলে তাকে ঘর থেকে এক রকম ঠেলেই বার করে দিলেন।

পাশের একটা ঘরে আমাকে বসতে দেওয়া হল। গোল একটা টেবিলের ওপরে কয়েকটা জার্মান বই। কর্নেল লণ্ঠনটা একটা হারমোনিয়ামের ওপরে রেখে বললেন, আপনি বিশ্রাম নিন, আমি এখুনি আসছি।

টেবিলের বইগুলো নাড়াচাড়া করে দেখলাম—সব কবিতার বই—কেবল দুটো বিজ্ঞানের। আইফোর্ড থেকে দশ বারো মাইল এসেছি বুঝতে পারছিলাম—কিন্তু কোন দিকে তা বোঝার উপায় ছিল না। উঠে গিয়ে জানালাটা খুলতে গেলাম—কিন্তু পারলাম না—আড়াআড়ি খিল দিয়ে আঁটা খড়খড়ি। বাড়িটা একেবারে শুনশান—কেবল একটা সেকেলে ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল ভেতর থেকে।

ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল। হঠাৎ নিঃশব্দে খুলে গেল দরজাটা। ঘরে ঢুকলেন সেই সুন্দরী মহিলাটি। ঠোটের ওপর আঙুল তোলা—আমি যেন কোন কথা না বলি তার ইঙ্গিত ভয়ার্ত মুখে। চকিত দৃষ্টি ফেলে বারবার পেছন তাকাতে লাগলেন। তার অবস্থা দেখেই আমার বুক কেঁপে উঠল আতঙ্কে। দু'পা এগিয়ে এসে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বললেন—বৃথা আশায় বসে থাকবেন না। এই দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। এখুনি। বলতে বলতে হাত জোড় করলেন মহিলা।

আমি এসেছি বিকল মেসিন সচল করে দিতে। তখনো পর্যন্ত মেসিন দেখা হল না। ভদ্রলোক বসিয়ে রেখে ওপরে গেছেন। এখুনি হয়তো আসবেন। তার মধ্যে মহিলার এই নাটকীয় হাবভাব—কথা। ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত লাগল আমার কাছে। মনে হল মাথায় কিছু দোষটোষ আছে তার। আমি তার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগলাম।

মহিলা পুনরায় কাকুতি ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি হলে এতক্ষণে পালাতাম।

এমন সময় দরজা বন্ধ করার শব্দ পেলাম ওপরে। সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে শব্দ শুনলেন মহিলা, তারপরেই অস্ফুটে আর্তনাদ করে চকিতে নিঃশব্দে ঘরের বাইরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। পরক্ষণেই ঘরে ঢুকলেন কর্নেল। বেঁটে মোটা এক ভদ্রলোক সঙ্গে। আলাপ করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের নাম মিঃ ফার্গুসন, কর্নেলের ম্যানেজার আর সেক্রেটারী। দেখলাম কর্নেল খুবই সতর্ক। সন্দিগ্ধ ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—দরজাটা বন্ধ করে গেছিলাম না?

বললাম, হ্যাঁ, গুমোট লাগছিল বলে খুলে দিয়েছিলাম।

কর্নেল আর কিছু বললেন না। কি বুঝলেন কে জানে। এর পর আমাকে নিয়ে চললেন মেসিন ঘর দেখাতে। এমন তাড়াহুড়ো করতে লাগলেন যে মাথায় টুপিটা

পর্যন্ত পরবার আবকাশ পেলাম না।

ল্যাম্প হাতে কর্নেল চললেন আগে আগে পথ দেখিয়ে—আমি আর ফার্গুসন তার পেছনে। গোলকধাঁধার মত গুলিঘুঁজি পথ। ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে একসময় ওপরে উঠলাম—বুঝতে পারলাম। ওপর তলায় কোথাও কার্পেট বা আসবাবপত্র কিছু চোখে পড়ল না। দেয়ালও পলস্তারা খসা। ছাতলা পড়া। মহিলার কথায় তখন হেসেছিলাম মনে মনে—কিন্তু দেখলাম একটা কাজ হয়েছে অন্ততঃ তার কথায়—মনে প্রচ্ছন্ন ভাবে একটা সন্দেহ উঁকি দিয়েছে। আপনা থেকেই দৃষ্টি সতর্ক হয়ে উঠেছে।

ওপরে এসে একটা ছোট্ট নিচু দরজা খুলে আলো নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন কর্নেল। পেছন পেছন আমিও ঢুকলাম। ফার্গুসন রইলেন বাইরে। ছোট্ট চৌকোনা ঘর। কর্নেল বললেন—আপনার কাজটা এখানেই। আমরা এখন হাইড্রলিক প্রেসের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছি। পায়ের তলা ধাতুর তৈরি, মাথার ওপরকার ছাদটা হল পিস্টনের তলার দিক। এখন কেউ মেসিন চালিয়ে দিলে—কয়েক টন চাপ নিয়ে ওপরের ছাদ হু হু করে নেমে আসবে—চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে যাব দুজনে। মেসিনটা আগের মত চলছে না—শক্তি কমে গেছে। গলদটা কোথায়—সেটুকু আপনি বলে দিয়ে যান।

কর্নেলের হাতের ল্যাম্পটা নিয়ে মেসিন পরীক্ষা করলাম। বিশাল দানবাকৃতির মেসিন। বাইরে গিয়ে হাতল চেপে মেসিন চালু করলাম। সোঁ সোঁ আওয়াজ শুনেই বুঝলাম—কোথাও লিক রয়েছে—সেজন্যেই শক্তির ঘাটতি দেখা দিয়েছে। লক্ষ্য করে দেখলাম—পাশের একটা সিলিন্ডার থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা রবারের পটি শুকিয়ে গেছে—ফলে ড্রাইভিং রড ঠিকমত কাজ করছে না। কর্নেলকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম পরিষ্কার করে। মেসিনের আকৃতি দেখেই কেমন সন্দেহ হয়েছিল। এবারে ভেতরে ঢুকলাম ব্যাপারটা একটু পরখ করে দেখবার জন্য। আমার সেই কৌতূহল যে কাল হয়ে দাঁড়াবে কে জানত। ভেতরে ঢুকে দেখলাম—দেওয়াল কাঠের—কিন্তু মেঝে একখানা বিরাট লোহার পাত দিয়ে তৈরি। মেঝেতে ধাতুর স্তর লেগে রয়েছে। সাজিমাটি চেপে ইঁট বানানোর ব্যাপারটা যে নিছকই গল্প—এই ধাতুর স্তরই তার প্রমাণ। ধাতুটা কি হতে পারে খুঁটিয়ে দেখছি। এমন সময় পেছনে বিরক্তিসূচক শব্দ শুনে ফিরে দেখি—মাথা হেঁট করে আমার কাণ্ড দেখছেন কর্নেল। বললেন—ও কি করছেন?

জানি না কি করে বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে—আপনার সাজিমাটির নমুনা দেখছি। সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে গেল কর্নেলের মুখ। একলাফে বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিলেন। পাল্লায় লাথি মেরে চেঁচাতে লাগলাম আমি। সহসা হাতল টেপার শব্দ সেই সঙ্গে জল বেরিয়ে যাওয়ার সোঁ সোঁ আওয়াজ কানে এল।

মেসিন চালিয়ে দিয়েছে কর্নেল। তাকিয়ে দেখলাম কালো ছাদটা ঝাঁকি মেরে নিচে নেমে আসছে। মেঝেয় পরীক্ষা করবার সময় ল্যাম্পটা নামিয়ে রেখেছিলাম। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দু'হাতে চাপ দিয়ে পাল্লা খুলবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোন ফল হল না। এদিকে ছাদ নেমে এসেছে মাথার ওপর। এভাবে থাকলে মিনিট খানেকের মধ্যেই একটা মাংস পিণ্ডে পরিণত হব। পাগল হয়ে যাবার মত অবস্থা হল আমার। দাঁড়িয়ে থাকব না শুয়ে পড়ব মেঝেতে বুঝতে পারছি না। অনিবার্য মৃত্যু চেপে বসছে কাঁধের ওপর। এমন সময় চোখে পড়ল—কাঠের দেয়াল একটু একটু করে ফাঁক হয়ে গেল—বাইরে হলদে আলোর আভা। চকিতে লাফ দিয়ে পড়লাম—ফাঁকটা দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম—ঝন ঝনাৎ শব্দে ল্যাম্পটা গুঁড়িয়ে গেল।

সেই সুন্দরী মহিলাটি অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। একহাতে ল্যাম্প আর একহাতে আমার কব্জি ধরে টানছেন তিনি। আমি পড়ে আছি একটা সংকীর্ণ গলির পাকা মেঝের ওপরে। বললেন—শিগগির উঠুন, এখুনি এসে পড়বে ওরা।

এবারে আর দ্বিরুক্তি করলাম না। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ছুটলাম তার পেছনে! গলিঘুঁজি পেরিয়ে ছুটছি। পেছনে দুজন পুরুষের উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার শোনা যেতে লাগল। ভদ্রমহিলা দরজা খুলে ঢুকিয়ে দিলেন একটা শোবার ঘরে। সামনেই জানালা খোলা। চাঁদের আলো পড়েছে ঘরের ভেতরে। ভদ্রমহিলাও ঘাবড়ে গেছেন। বললেন—এদিকে আর পথ নেই। জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ুন। বাইরে দ্রুত পায়ের শব্দ কানে এল। এক মুহূর্ত দেরি না করে জানালার গোবরাট ধরে বাইরে ঝুলে পড়লাম। ততক্ষণে হাতে একটা কসাইয়ের ছুরি নিয়ে ছুটে ঘরের ভেতরে ঢুকলেন কর্নেল। ভদ্রমহিলা তাকে আঁকড়ে ধরে চিৎকার করে উঠলেন—ফ্রিৎস—তুমি কথা দিয়েছিলে আগের বার—আর হবে না বলে ছিলে—এঁকে ছেড়ে দাও উনি কাউকে কিছু বলবেন না।

—এলিজ তুমি সরো। অনেক বেশি জেনে ফেলেছে এই লোক—আমাদের সবাইকে শেষ করে ছাড়বে। বলতে বলতেই কোপটা পড়ল।

সবে আমি গোবড়াট থেকে হাত তুলতে যাচ্ছি। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে তীব্র একটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠল সমস্ত শরীর। ঝপ করে পড়ে গেলাম নিচের বাগানে। উঠেই ঝোপঝাড় ভেঙ্গে দৌড়তে লাগলাম। ছুটতে ছুটতেই ব্যথার জায়গায় হাত দিলাম— দেখি আঙুলটা নেই। মাথা ঘুরে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। টলে পড়ে গেলাম ঝোপের মধ্যে। জ্ঞান যখন ফিরল দেখি ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। অবাক হয়ে গেলাম দেখে—আমি পড়ে আছি—বড় রাস্তার পাশের ঝোপের ধারে৷ খানিক দূরে রেল স্টেশন। খুব একটা পথ তো ছুটে আসিনি। কিন্তু আশেপাশে অনেক দূর পর্যন্ত কোথাও ঘরবাড়ি চোখ পড়ল না। গত রাতের বাগিচাঘেরা সেই

বাড়িটা। যেন একটা ভৌতিক কাণ্ড। হাতটা টন টন করে ব্যথা করছে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্তও ঝরছে। রুমাল পেঁচিয়ে টলতে টলতে স্টেশনে এসে উঠলাম। একটা কুলিকে সামনে দেখতে পেয়ে কর্নেল লাইসেন্ডার স্টার্ক এর কথা জিজ্ঞেস করলাম। বলল, এই নামে সে কাউকে চেনে না।

সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে এলাম লন্ডনে। রেলের এক ভদ্রলোকই নিয়ে এলেন ডক্টর ওয়াটসনের কাছে। তাঁর মুখেই আপনার কথা শুনলাম। সবই বললাম—পুলিশের কাছে যাব ভেবেছিলাম—কিন্তু আপনি বলুন এবারে কি করব।

অদ্ভুত এক রোমাঞ্চকর কাহিনী যেন শুনলাম। কি বলব—কোন কথা জোগাল না মুখে।

হোমস তড়াক করে উঠে গিয়ে তাক থেকে মোটা খাতাটা পেড়ে নিয়ে এল। খবরের কাগজের কাটিং সেঁটে রাখা হয় খাতাটায়। খাতাটা উল্টে বলল—একটা বিজ্ঞাপন পড়ে শোনাচ্ছি—একবছর আগে বেরিয়ে ছিল।

....ন তারিখে তরুণ হাইড্রলিক ইঞ্জিনীয়ার মিঃ জেরেমিয়া হেলিং রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়েছেন। রাত দশটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফিরে আসেননি। তারপর শরীরের পোশাক ইত্যাদির বিবরণ রয়েছে। সূত্রটা তো পাওয়া গেল। একবছর আগে কর্নেল একবার মেসিন সারাই করেছিলেন। এ সম্পর্কে এটা তার দ্বিতীয় অপরাধ।

—ভদ্রমহিলা তাহলে এর কথাই বলেছিলেন। কিন্তু কর্নেল তার কথা রাখেনি।

—ভয়ঙ্কর রকমের মরিয়া লোক এই কর্নেল বোঝা যাচ্ছে। ঠাণ্ডা মাথায় পথের কাঁটা সরাতে ওস্তাদ। কিন্তু কাল রাতের পর অনেকটা সময় পেয়ে গেছে কর্নেল। আমাদের সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। চলুন স্কটল্যান্ডইয়ার্ডে আগে যাওয়া যাক—সেখান থেকে দল বেঁধে আইফোর্ড রওনা হব। বলল হোমস।

ঘণ্টা তিনেক পরেই ট্রেনে চেপে বসলাম আমরা। আমাদের তিনজনের সঙ্গে ইন্সপেক্টর ব্র্যাডস্ট্রীট আর একজন সাদা পোশাকের পুলিশকে নেওয়া হল। ব্র্যাডস্ট্রীট একটা সামরিক মানচিত্র বিছিয়ে নিয়ে বসেছে। আইফোর্ডকে কেন্দ্র করে কম্পাস দিয়ে দশ মাইল ব্যাসার্ধের একটা বৃত্ত আঁকল। জিজ্ঞেস করল, মাইল দশেকই তো বলেছিলেন?

—ওরকম হবে—গাড়িতে আধঘণ্টা লেগেছিল। বললেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠখোয়ানো ইঞ্জিনীয়ার।

—উরিব্বাস, অজ্ঞান অবস্থায় অতটা পথ নিয়ে এসেছিল?

—আবছা মত মনে পড়ছে—কারা যেন বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আমাকে। কিন্তু

অজ্ঞান অবস্থায় পেয়েও ছেড়ে দিল কেন বুঝতে পারছি না।

হোমস বলল—সবই বোঝা যাবে। এই মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে—যাবার সময় আপনাকে রীতিমত ধোঁকা দিয়েছিল। জানালা বন্ধ থাকায় বুঝতে পারেননি।

বলতে বলতে বৃত্তের ঠিক মাঝখানটা দেখিয়ে বলল—বাড়িটা এইখানে। স্টেশন থেকে মাইল দুয়ের দূরত্বে। মনে করে দেখুন—ঘোড়া সম্পর্কে বলেছিলেন—বেশ তাজা চকচকে ঘোড়া দেখেছিলেন আপনি। খারাপ রাস্তায় বারো মাইল দৌড়লে ঘোড়ার চেহারা অমন চকচকে থাকে না। আপনি ছ'মাইল গেছেন ছ'মাইল এসেছেন।

ব্র্যাডস্ট্রীট বলল—দলটার কাজ কারবার এবারে খানিকটা আন্দাজ করতে পারছি।

হোমস বলল, মিঃ হেথার্লি যে মেসিনটা দেখে এসেছেন—রুপোর নকল হিসেবে খাদমিশানো যে ধাতু দরকার হয়—সেই ধাতু তৈরি হয় ওই মেশিনে।

—ঠিকই ধরেছেন আপনি। ব্র্যাডস্ট্রীট লাফিয়ে উঠে বললে, নকল আধক্রাউন মুদ্রায় বাজার ছেয়ে গেছে। যে দলটা ব্যবসাটা চালু করেছে—রীডিং পর্যন্ত তাদের হদিস পেয়েছি। এবারে ঠিক কব্জা করতে পারব।

আমাদের মনেও ছিল একই আশা। কিন্তু অতি আশায় ছাই পড়ে বলে কথা আছে—আমাদের তাই হল। আইফোর্ড স্টেশনে যখন ট্রেন ঢুকছে—তখনই নজরে পড়ল পুঞ্জ পুঞ্জ কাল মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে।

প্ল্যাটফর্মে নেমেই স্টেশান মাস্টারকে জিজ্ঞেস করল ব্র্যাডস্ট্রীট—ও মশায়, বাড়ি পুড়ছে বলে মনে হচ্ছে?

—হ্যাঁ রাতে আগুন লেগেছে।

—বাড়িটা কার বলুন তো?

—ডক্টর বেচারের।

—ভদ্রলোক কি জার্মান? খুব রোগা—খাড়া লম্বা নাক?

স্টেশান মাস্টার হেসে উঠে বলল—না মশাই—জাতে খাঁটি ইংরেজ। তবে বাড়িতে একজন বিদেশী রোগী থাকতেন—পেটরোগা মানুষ।

স্টেশনে সময় নষ্ট না করে ঝটপট একটা গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হলাম আগুনের কাছে। বিরাট একটা বাড়ি জানালা দরজা সমেত দাউ দাউ পুড়ছে। দমকল বাহিনীর লোক আগুন বাগে আনবার চেষ্টা করে চলেছে।

চেঁচিয়ে উঠল হেথার্লি—এই তো সেই বাড়ি। কাঁকর বিছানো এই পথেই গাড়ি থেকে নেমেছিলাম। ঐতো গোলাপ ঝোপ—এর মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলাম। ওপরের ওই জানালা থেকেই নিচে লাফ দিয়ে পড়েছিলাম।

পাশেই দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে দেখছিল হোমস বাড়িটা। বলল—আপনি

আঙুলের বদলা শোধটা একবারে খারাপ নেননি। যে ল্যাম্পটা মেসিন ঘরে রেখে এসেছিলেন—গুঁড়িয়ে যাবার পর তা থেকে তক্তায় আগুন ধরে যায়। আপনার পেছন নিতে গিয়ে সেদিকে আর খেয়াল দিতে পারেনি কেউ। আগুন ছড়িয়ে পড়ে আয়ত্বের বাইরে চলে গিয়েছিল। বেগতিক দেখে সব ফেলে পালিয়েছে। এতক্ষণে ওরা আমাদের নাগালের বাইরে।

হোমস ঠিকই বলেছিল। খবর নিয়ে জানা গেল—সেই দিনই ভোরের দিকে একজন চাষীর চোখে পড়েছিল—ভারী ভারী বাক্সে বোঝাই একটা গাড়ি রীডিং স্টেশনের দিকে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সেই গাড়ির কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। একরোখা নৃশংস সেই জার্মান অথবা ইংরেজের সন্ধানও করতে পারেনি হোমস—অনেক মাথা খাটিয়েও।

বাড়িটার আগুন নেভাতে অনেক কসরৎ করতে হয়েছে দমকল বাহিনীকে। ওপর তলার জানলার গোবরাট থেকে তারা আবিষ্কার করেছিল একটা মানুষের আস্ত বুড়ো আঙুল। সন্ধ্যে নাগাদ যখন আগুন আয়ত্বে এল ততক্ষণে ছাদ ধসে পড়েছে। দানবাকৃতির সেই অভিশপ্ত মেসিনটাও পুড়ে ছাই হয়েছে। বাড়ির বাইরের দিকে পাওয়া গেল কিছু নিকেল আর টিন। তবে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না একটি মুদ্রাও।

হোমস খুঁজে খুঁজে বাগানের নরম মাটিতে দু'জোড়া পায়ের ছাপ আবিষ্কার করল। তা থেকেই পরিষ্কার বোঝা গেল—হাইড্রলিক ইঞ্জিনীয়ার হেথার্লি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন কি ভাবে আর কারা তাকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল বড় রাস্তায়। দু'জোড়া পায়ের ছাপের একজোড়া বেশ বড় মাপের আর একজোড়া খুব ছোট। অর্থাৎ মহিলাটি আর ফার্গুসন নামের ইংরেজ ভদ্রলোক ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এসেছিলেন তাকে। নিশ্চয় ওই নরম মনের মহিলাটিই অনুরোধ করে তাকে রাজি করিয়েছিলেন।

ফেরার পথে ট্রেনে বসে তরুণ ইঞ্জিনীয়ার আক্ষেপ করে বললেন—কাজটা ভালই হল দেখছি—পঞ্চাশটা গিনির লোভে পড়ে বুড়ো আঙুলটাই খুইয়ে গেলাম।

হোমস হেসে বলল—ভবিষ্যৎ জীবনে অভিজ্ঞতাটা আপনার কাজে লাগবে। সেটাই বড় লাভ।



অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য নোব্‌ল ব্যাচেলার

আমার বিয়ের কয়েক সপ্তাহ আগের ঘটনা এটা। ঝড়-বাদলের দিন। শরীরটা কেমন ম্যাজমেজ করছে সকাল থেকেই। আগুনের পাশে চেয়ারে পা তুলে বসে সেদিনের ডাকে আসা হোমসের চিঠিগুলো দেখছি। একটা সুন্দর খামে মনোহারী মনোগ্রাম দেখে আকৃষ্ট হলাম। খামটা খুলবার আগেই বৈকালিক ভ্রমণ শেষ করে বাড়ি ফিরে এল হোমস। খামটা এগিয়ে দিয়ে বললাম—খুব খানদানি পত্রলেখক মনে হচ্ছে দেখ তো ব্যাপারটা কি।

চিঠিটা খুলে হোমস সহাস্য মুখে বলে উঠল—অনুমান করেছ ঠিক। কাজটাও জবরদস্ত।

—খুব উঁচু মহলের কেউ নাকি?

—তা তো বটেই, ইংলন্ডে উঁচু মহলে যে কজন ভাগ্যবান আছেন তাদের একজন।

—তাহলে তো তোমাকে অভিনন্দন জানাতে হয়।

—ওয়াটসন—তুমি তো জান মক্কেলের আর্থিক বা সামাজিক অবস্থাটা নয়—তাদের সমস্যাটাকেই আমি বড় করে দেখি। লর্ড সেন্ট সাইমনের বিয়ের ব্যাপারটা খবরের কাগজে নিশ্চয় তোমার চোখে পড়েছিল?

—ওরে সর্বনাশ—সে তো দারুণ ব্যাপার। লর্ডের বিয়ে এবং তারপর বিয়ে ভাঙার কাহিনী পল্লবিত হয়ে এখনো লোকের মুখে মুখে ঘুরছে। দারুণ ইন্টারেস্টিং।

—চিঠিটা লর্ড সেন্ট সাইমন নিজেই লিখেছেন। পড়ে শোনাচ্ছি শোন—

প্রিয় মিঃ শার্লক হোমস,

আপনি ব্যস্ত মানুষ জানি, তবুও অনুরোধ জানাচ্ছি অন্য কাজ থাকলে বাতিল করে কাল বিকেলে বাড়ি থাকবেন। আমার বিয়ের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। চারটে নাগাদ আসব। স্কটল্যান্ডইয়ার্ডের মিঃ লেসট্রেড নিজে রহস্য যবনিকা উন্মোচনের চেষ্টা করছেন। তিনিই পরামর্শ দিয়েছেন—আপনিও যদি এ সম্পর্কে চিন্তা করেন তাহলে সমস্যার সুরাহা হতে পারে।

আপনার বিশ্বস্ত
সেন্ট সাইমন

পড়া শেষ করে চিঠিটা উল্টেপাল্টে দেখে বলল—চিঠিতে গ্রসভেনর ম্যানসন ডাকঘরের তারিখ পড়েছে—পালকের কলমে লেখা চিঠি—লর্ড মশাই চিঠি ভাঁজ করতে করতে ডান হাতের কড়ে আঙুলে একফোঁটা কালিও লাগিয়ে ফেলেছেন। সময় তো দেখছি হয়ে এল। তিনটে বাজে এখন। চারটেয় দর্শন দেবেন লিখেছেন। দাঁড়াও দাঁড়াও—

বলতে বলতে এগিয়ে ম্যান্টলপিস থেকে লাল মলাটের একটা বই পেড়ে আনল। পাতা উল্টে বলল—এই তো—পাওয়া গেছে—ডিউক অব ব্যালমোরালের দ্বিতীয় পুত্র লর্ড রবার্ট ওয়ালসিংহ্যাম দ্য ভেরে সেন্ট সাইমন। বয়সটা যথার্থই খারাপ— একচল্লিশ—বিয়েরই বয়স। কলোনী শাসনব্যবস্থায় আন্ডার সেক্রেটারী ছিলেন। ওর পিতৃদেব ছিলেন পররাষ্ট্র দপ্তরে সেক্রেটারী। ধমনীতে বইছে খানদানী প্লানটাজেনেট রক্ত—বিয়ের সূত্রে তাতে মিশেছে—টিউডর রক্ত। নাঃ—বিশেষ একটা কিছু পাওয়া গেল না এ থেকে। ওয়াটসন, খবরের কাগজে কি দেখেছো—শোনাও একবার।

কয়েক সপ্তাহ আগে মর্নিং পোস্ট কাগজের ব্যক্তিগত কলমে প্রথম নোটিশটা ছাপা হয়েছিল। বার করে পড়লাম ঃ

গুজব শোনা যাচ্ছে—সানফ্রানসিসকো নিবাসী মিঃ অ্যালয়সিয়াম ডোরানার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে—ডিউক অব ব্যালমোরালের দ্বিতীয় পুত্র লর্ড রবার্ট সাইমনের।

হোমস বলল—কাঠখোট্টা খবর।

বললাম—গত সপ্তাহের শেষের দিকে যে খবরটা বেরিয়েছে সেটা শোন ঃ

বিয়ের বাজারে এখন খোলা নীতির দাপট। অবাধে তাই দেশের জিনিস পাচার

হয়ে যাচ্ছে বিদেশে। বৃটেনের খানদানি পরিবারে বউ হয়ে আসছে সাগর পারের সুন্দরীরা। এই ক্ষেত্রে সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটাচ্ছেন লর্ড সেন্ট সাইমন। শিগগিরই চিরকুমার নাম ঘুচিয়ে তিনি পাণিপীড়ন করছেন ক্যালিফোর্নিয়ার ধনপতির কন্যা সুন্দরী হ্যাটি ডোরানার। আশা করা যাচ্ছে যৌতুকের অংক ছয় সংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে। ডিউক অব ব্যালমোরালের ভাঁড়ারের দুর্বলতার সংবাদ দেশ সুদ্ধ লোক জানে। গত ক'বছর ধরে নিজস্ব ছবি বিক্রি করে সংসার টেনে চলেছেন ভদ্রলোক। বার্চমুরের একটুকরো সম্পত্তি ছাড়া লর্ড সেন্ট সাইমনের কপালে কিছু জোটেনি! কাজেই এই বিয়ের ফলে সেন্ট সাইমন যে বর্তে যাবেন তা বলাই বাহুল্য।

এর পরে মর্নিং পোস্ট জানিয়েছে ঃ

বিয়েতে জনা ছয়েক অন্তরঙ্গ বন্ধু কেবল নিমন্ত্রিত হবেন। বিয়ের পর ল্যাঙ্কাস্টার গেটের বাড়িতে বর-কনেকে নিয়ে যাবেন মিঃ ডোরান।

দু'দিন পরে গত বুধবারে আর একটা খবর আছে এ সম্পর্কে ঃ বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। বর কনে হনিমুনে যাবেন লর্ড ব্যাকওয়াটারের বাড়িতে। ভায়া—কনে অদৃশ্য হবার আগে পর্যন্ত এই হল যাবতীয় খবরাখবর।

—অদৃশ্য? অদৃশ্য হলেন কবে? জিজ্ঞেস করল হোমস।

—বিয়ের ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে। খুবই নাটকীয় ঘটনা—সচরাচর এমনটি ঘটতে দেখা যায় না।

—ঠিকই বলেছ। কনে বিয়ের আগে অদৃশ্য হয়ে যায়—এমন ঘটনা আছে—হনিমুনের সময়েও অনেকে পিটটান দেয়। কিন্তু এরকমটা—এর আগে—একটু খোলসা করে শোনাও তো ভায়া।

বললাম—গতকাল সকালের কাগজে যে নিবন্ধটা বেরিয়েছে সেটার শিরোনাম—বিয়ের আসরে কাণ্ড চমৎকার। এবারে লেখাটা শোন ঃ

লর্ড সেন্ট সাইমনের বিয়ের ব্যাপারটা এখন অলিগলিতে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাছি উড়ছে ভন ভন করে।

মোট ছ'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে সেন্ট জর্জ চার্চে সম্পন্ন হয় বিয়েটা। পরে গির্জা থেকে বেরিয়ে ল্যাঙ্কাস্টার গেটে মিঃ ডোরানার বাড়িতে সকলে যান। এই সময়েই হাঙ্গামাটা বাধায় মিস ফ্লোরা মিলার নামে এক নর্তকী। লর্ড সাইমনের ওপর নাকি তারও দাবী আছে। নর্তকীটি বাড়ির মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

হাঙ্গামাটা শুরু হবার আগেই অবশ্য লেডী সাইমন বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলেন। পরে প্রাতঃরাশও খেতে বসেন। তারপর হঠাৎ শরীর খারাপ লাগছে বলে উঠে পড়েন। কিছুক্ষণ পরে মিঃ ডোরান মেয়ের ঘরে গিয়ে দেখেন ঘর শূন্য।

কনের পরিচারিকা বলেছে, কোট আর টুপি নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেছেন

লেডি সাইমন। মিঃ ডোরান তখনই পুলিশে খবর দেন। লেডী সাইমনের এই আকস্মিক অন্তর্ধানের পেছনে নর্তকী মিস ফ্লোরা মিলারের হাতে আছে—এই সন্দেহে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। আরও তদন্ত চলছে। হোমস, এই হল মোদ্দা ব্যাপার। বল এবার কি বুঝলে।

—খুবই কৌতূহলোদ্দীপক মামলা ভায়া। কোন প্রলোভনেও এ মামলা আমি হাতছাড়া করতে রাজি নই। ওই শোন দরজায় ঘণ্টা বাজছে—খানদানি মক্কেল মশাই এসে গেলেন মনে হচ্ছে।

একটু পরেই ভারী পা ফেলে ঘরে ঢুকলেন লর্ড সাইমন। কেমন একটু কোলকুঁজো হয়ে হাঁটেন। ফলে যা বয়েস তার তুলনায় বয়স্কই মনে হয়। টুপি খোলার পর দেখা গেল কেশ-বিরল মাথায় সাদার ছোপ। চলাফেরায় অভিজাত ছাপ। সাজগোজেও আভিজাত্যের ছাপ।

শিষ্টাচার বিনিময়ের পর লর্ড বললেন, মিঃ হোমস, আমি জানি অনেক মামলা নিয়েই আপনাকে মাথা ঘামাতে হয়েছে। কিন্তু আমি যে মহলের লোক সে-মহল থেকে মনে হয় আপনার প্রথম মক্কেল আমি।

হোমস হেসে বলল—তা যদি বলতে হয়, তাহলে বলা চলে আমার দর বরং কমেছে। কেননা, এর আগে যিনি এসেছিলেন, তিনি একটা দেশের রাজা।

—বলেন কি—কোথাকার রাজা?

—স্ক্যান্ডিনেভিয়ার।

—তাঁরও কি বউ নিখোঁজ হয়েছিল?

—মাফ করবেন। গোপনীয়তা রক্ষা করা আমার পেশার ধর্ম। বরং আপনি খবরের কাগজের এই খবরটার সম্পর্কে বলুন। যা প্রকাশিত হয়েছে তা কি সত্যি?

লর্ড সাইমন কাগজের অন্তর্ধান বিষয়ের লেখাটার ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন—এরা যথাযথ সংবাদই ছাপিয়েছে।

—বেশ, তাহলে কয়েকটা বিষয় আগে আমাকে জানতে দিন।

—বলুন।

—মিস হ্যাটি ডোরানকে প্রথম কবে দেখেন?

—একবছর আগে।

—দেখাটা কোথায় হয়?

—সানফ্রান্সিসকোয়।

—যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

—তখনই কি বিয়ের কথাটা পাকাপাকি হয়?

—না।

—তবে বন্ধুত্ব নিবিড় হয়েছিল?

—বলতে পারেন। পরস্পরকে ভাল লাগত।

—মিস ডোরানের বাবা শুনেছি খুব বড়লোক।

—প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ে বড়লোক বলতে যে কজন আছেন—তিনি তাদের পকেটে পুরে রাখতে পারেন।

—আচ্ছা। কিন্তু এত টাকা উনি করলেন কি করে?

—দু'হাতে টাকা রোজগার করেছেন খনির কাজে। বছর কয়েক আগে পর্যন্ত একরকম নিঃস্বই ছিলেন। সোনার খোঁজ পাবার পর রাতারাতি ফুলে ফেঁপে ওঠেন।

—আপনার স্ত্রী সম্পর্কে কিছু বলুন—অর্থাৎ তাঁর স্বভাব চরিত্র কেমন?

—সোনার খোঁজ পাবার আগে পর্যন্ত আমার শ্বশুরমশাইকে খনি নিয়েই মেতে থাকতে হয়েছে। পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরেছেন—তাঁবুতে রাত কাটিয়েছেন। তাঁর বড়লোক হওয়ার আগে পর্যন্ত জীবনের কুড়িটা বছর বাবার সঙ্গেই থেকেছেন আমার স্ত্রী। ফলে একরকম প্রকৃতির কোলেই তিনি মানুষ হয়েছে। শিক্ষালাভও সেইখানেই। রীতিমত ডানপিটে মেয়ে—প্রচণ্ড স্বাধীনচেতা—প্রকৃতিও দুর্দান্ত—সবরকমের সংস্কারমুক্ত। তবে আবেগপ্রবণ। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল তার অন্তরের আভিজাত্য ও মর্যাদাবোধ। তার ওই সম্পদই আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। আমি জানি—মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে তিনি নিজেকে বলি দিতেও কুণ্ঠা বোধ করবেন না।

—কোন ফটো আছে?

—হ্যাঁ, সঙ্গেই এনেছি। বলে একটা লকেট এগিয়ে দিলেন লর্ড। লকেটের মধ্যে হাতীর দাঁতের ওপর পরমাসুন্দরী এক তরুণীর মুখশ্রী শিল্পীর দক্ষ হাতের স্পর্শে যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে লকেটটা ফিরিয়ে দিল হোমস।

—লন্ডনে দেখা সাক্ষাতের পর আপনাদের অন্তরঙ্গতা নতুন করে আরম্ভ হয়?

—ওর বাবা ওকে ওই কারণেই লন্ডনে নিয়ে এসেছিলেন। যথাসময়ে কথাবার্তা চূড়ান্ত হবার পর বিয়েও হয়ে যায়।

—যৌতুকের টাকাকড়ির ব্যাপারটা একটু বলুন।

—ওসব নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

—খুব ভাল কথা। আচ্ছা, বিয়ের আগের দিন আপনার দেখা হয়ে ছিল মিস ডোরানের সঙ্গে?

—হয়েছিল।

—কিরকম মনে হয়েছিল দেখে?

—খুবই হাসিখুসি আর উচ্ছল ছিলেন। আগে অমনটি কখনো দেখিনি।

—বিয়ের দিন—বিয়ের আগে সকালের দিকে মেজাজ কেমন ছিল?

—কোনই গোলমাল ছিল না। খুবই ভাল মেজাজে ছিলেন—বিয়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত একই রকম ছিলেন।

—তারপরেই বোধ হয় একটু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছিলেন?

—হ্যাঁ—মনে হচ্ছে তাই—কেমন একটু অস্থিরতা লক্ষ্য করেছিলাম যেন। তবে তেমন নজরে পড়বার মত নয় অবশ্য।

—নজরে পড়বার মত না হলেও—তাঁকে কি রকম দেখছিলেন—কোন অবস্থায়—খুলে বলুন।

—ব্যাপারটা মনে পড়েছে। বিয়ের সময় বেদীর দিকে যাবার সময়ে ফুলের তোড়াটা ওর হাত থেকে পড়ে যায়। এক ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ সেটি তার হাতে তুলে দেন। তোড়াটা জখম হয়নি। কিন্তু কথাটা জিজ্ঞেস করতেই জবাব দিলেন—কেমন একটু অসংলগ্ন ভাবে। বাড়ি ফেরার সময়ে গাড়ির মধ্যেও মনে হল কেমন একটু উত্তেজনার ভাব রয়েছে মনে।

—বাইরের লোকজন তাহলে গির্জার ভেতরেও ঢুকেছিল?

—তা ঢুকেছিল—গির্জা খোলা থাকলে যা হয়—কাউকে তো ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া যায় না।

—ভদ্রলোকটি কি আপনার পরিচিত?

—কী যে বলেন মশাই!

—লেডী সাইমনের বন্ধু হয়তো।

—ভাল করে তাকিয়ে দেখবারও দরকার মনে করিনি—নিতান্তই সাধারণ শ্রেণীর—বন্ধুত্বের প্রশ্নই আসে না ওরকম চেহারার মানুষের সঙ্গে।

—তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে—লেডী সাইমন গির্জায় গিয়েছিলেন মনের আনন্দ ও উচ্ছলতা নিয়ে—কিন্তু বেরিয়ে এসেছিলেন—মন ভার করে।

—অনেকটা তাই।

—বাড়ি ফিরে কি করলেন?

—ঝিয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তার নাম অ্যালিস—আমেরিকান মেয়ে—বাপের বাড়ি থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন।

—ঝি হলেও তার সঙ্গে সখীত্বের সম্পর্ক?

—হ্যাঁ। ব্যাপারটা আমাদের সমাজে বিদঘুটে—কিন্তু আমেরিকায় কেউ কিছু মনে করে না।

—ঝিয়ের সঙ্গে কতক্ষণ কথা বলেছিলেন?

—কতক্ষণ আর, মিনিট খানেক হবে।

—কিছু শুনতে পেয়েছিলেন?

—মনে হল দেহাতী ভাষায় কিছু বলছিলেন লেডী সাইমন। তবে জাম্পিং ও ক্লম শব্দ দুটো কানে এসেছিল। মানে কিছু বুঝতে পারিনি।

—কথা শেষ করে উনি কি করলেন?

—প্রাতঃরাশের টেবিলে গেলেন।

—আপনার হাতে হাত রেখে?

—না। টেবিলে মিনিট দশেক বসেছিলেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন—আর আসেননি।

—ঝি-এর বক্তব্য থেকে জানা যায়—লেডী সাইমন ঘরে গিয়ে কোট আর টুপি নিয়ে বেরিয়েছেন।

—হ্যাঁ—এর কিছুক্ষণ পরেই হাইডপার্কে ফ্লোরা মিলারের সঙ্গে তাকে হাঁটতে দেখা গেছে। এই ফ্লোরা মিলারই আমাদের বাড়ি ঢোকার মুখে হাঙ্গামা জুড়েছিল।

—ফ্লোরা মিলার শুনেছি নর্তকী। তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক সম্পর্কে কিছু বলুন।

পলকের জন্য ভুরু কুঞ্চিত হল। পরে লর্ড সাইমন বললেন—সম্পর্ক তেমন কিছু বলবার মত নয়। বছর কয়েক সামান্য যোগাযোগ ছিল। নেহাতই আদরের বান্ধবী! জানেন তো মেয়েদের উচ্চাশার লাগাম নেই। আমার বিয়ের সংবাদ পেয়ে নানান কথা জানিয়ে বিতিকিচ্ছিরি সব চিঠি লিখতে শুরু করে। ব্যাপারটাকে খুব একটা আমল দিইনি প্রথমে। পরে সন্দেহ হয়েছিল বিয়ের সময় কোন গণ্ডগোল পাকাতে পারে। করলও তাই। শ্বশুর বাড়িতেও ঢুকবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আগে থেকেই দরজায় দুজন সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন করেছিলাম। তারাই ওকে বের করে দেয়।

—লেডী সাইমন এসব ব্যাপার জানতে পেরেছিলেন?

—না।

—অথচ তাঁর সঙ্গেই ফ্লোরা মিলারকে হাইড পার্কে দেখা গেল!

—ব্যাপারটা সন্দেহজনক। মিঃ লেসট্রেড-এর ধারণা, ফ্লোরাই ষড়যন্ত্র করে সরিয়েছে লেডি সাইমনকে।

—আপনার কি ধারণা?

—ফ্লোরাকে আমি জানি। একটা সামান্য মাছি মারতেও তার ভয়—এমন একটা ষড়যন্ত্র পাকানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। ফ্লোরা নির্দোষ।

—হৃদয় ঘটিত ব্যাপারে মানুষকে অনেক অসম্ভব কাজ করতেও দেখা গেছে। মেয়েদের ঈর্ষা বড় ভয়ঙ্কর।

—আমার ধারণাটা অবশ্য অন্যরকম। হঠাৎ করে সমাজের উঁচু মহলের একজন হয়ে গিয়ে মনে হয় মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেননি লেডী সাইমন।

—বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন বলতে চাইছেন?

—তাই। আমার ধারণা, অনেক সাধ্য সাধনায় অনেকে যা পায়নি—তা অতি সহজে তিনি পেয়েছিলেন—

হোমস হেসে বলল, এবারে আর একটা বিষয় জানা দরকার। আপনাদের প্রাতঃরাশের টেবিলে বসে জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখা যায় কি?

—হ্যাঁ—রাস্তার উল্টো দিক আর পার্কের খানিকটা দেখা যায়।

—আচ্ছা—ঠিক আছে। আপনাকে আর কষ্ট দেব না—আমিই পরে খবর জানাব আপনাকে।

—মিঃ হোমস, এই রহস্যভেদ কি সম্ভব হবে? উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন লর্ড।

—রহস্যভেদ? তা হয়ে গেছে—

—সেকি? এর মধ্যেই? তাহলে বলুন আমার স্ত্রী কোথায়।

—জানতে পাবেন—খুব শিগগিরই।

—কী জানি—বুঝতে পারছি না—কতদূর কি সম্ভব হবে।

বলতে বলতে নিরাশ ভঙ্গীতে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন লর্ড।

হোমস হাসতে হাসতে বলল, বুঝলে ওয়াটসন, লর্ড মশাইয়ের ঠিক প্রত্যয় হল না আমার কথায়। কিন্তু ভদ্রলোকের ঘরে ঢোকার আগেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল আমার কাছে।

—এমন ভাবে বলছ যেন—

—ভায়া—সমস্যার সুরাহা আমি বড্ড ঝটপট করে ফেলি—এই আমার দোষ। তবে এ ধরনের কেস আমার কাছে নতুন নয়—আরে একী! —লেসট্রেড তুমি! বোস। নাও চুরুট ধরাও।

সরকারী গোয়েন্দা লেসট্রেড ঘরে ঢুকল আচমকা। হাতে একটা কালো ক্যানভাস ব্যাগ—পরনে পশমী জ্যাকেট আর গলাবন্ধ। চেহারাটা হয়েছে নাবিকদের মত দেখতে।

চোখে কৌতুক খেলিয়ে তরল কণ্ঠে বলল হোমস—কি ব্যাপার লেসট্রেড,—অমন বিষণ্ণ লাগছে কেন?

—হয়রানির একশেষ হচ্ছি মশাই। সেন্ট সাইমনের বউকে খুঁজতে গিয়ে দেখুন গায়ের কাপড় পর্যন্ত ভিজিয়েছি।

—সে কি! কী করে?

—সার্পেনটাইনে জাল ফেলেছিলাম—যদি লেডী সাইমনের ডেড বডি পাওয়া যায়।

—বল কি হে। উচ্চাহাস্য করে বলল হোমস, ট্রাফালগার স্কোয়ারে জাল

ফেললে মনে হয় কাজটা আরও সহজ হত।

—আপনি রসিকতা করছেন?

—ওসব জল আর জালের সঙ্গে এ রহস্যের কোন সম্পর্ক নেই হে—বৃথাই নাকের জলে চোখের জল মেশাচ্ছ—

—মনে হচ্ছে যেন অনেক কিছু জেনে বসে আছেন! কিন্তু পরিশ্রমটা আমি বৃথাই করেছি মনে করবেন না—এই দেখুন।

বলে এক হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ থেকে বার করে আনল—জলে চুপসনো মেয়েদেব পোশাক, জুতো, মালা, ওড়না। তারপর একটা আংটিও বার করে দেখাল লেসট্রেড।

—বলুন তাহলে এগুলো সব মিথ্যে?

হোমস তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে দেখছিল আর ক্রমাগত ধোঁয়া উগড়ে যাচ্ছিল। এবারে জিজ্ঞেস করল—এসব কি জাল ফেলে তোলা সম্পত্তি?

—জলে ভাসছিল—দারোয়ানের চোখে পড়ায় তুলে এনেছি। বিয়ের পোশাক—এজন্যই ডেড বডির সন্ধানে জাল ফেলতে হয়েছিল। আপনি যাই বলুন না কেন—এ সমস্ত কিছুর পেছনে যে ফ্লোরা মিলারের কুচক্র কাজ করেছে আমি তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

—তোমার দেখাটা ঠিক হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।

—আপনি ওই আনন্দেই থাকুন। এই পোশাকেই আমার কথার প্রমাণ রয়েছে।

—কি রকম?

—বিয়ের পোশাকের পকেটে কার্ডের বাক্সে একটা চিরকূট পাওয়া গেছে—এই দেখুন—পরিষ্কার লেখা রয়েছে ঃ দেখা করো, এখুনি।

এফ. এম. এইচ.

ফ্লোরা মিলার চিঠিখানা নিশ্চয় গির্জায় ঢোকার মুখেই পাচার করেছিল—তারপর—

তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই চিঠিখানা হাতে নিল হোমস। কিন্তু চোখ বুলিয়েই মুখের ভাব পাল্টে গেল ওর।

—কি হল মশায়—খুব যে উদাসীনতা দেখাচ্ছিলেন এতক্ষণ? ওকি—উল্টোদিক দেখছেন কেন?

—উল্টো কোথায়? ওটাই তো সোজা দিক।

—আপনি দেখছি বড্ড আবোল তাবোল করে ফেলছেন আজ—লেখাটা তো এপিঠে।

—জানি—আমি দেখছি ওপিঠে লেখা খরচের বিলটা। তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি লেসট্রেড—সত্যিই একটা কাজের জিনিস উদ্ধার করতে পেরেছ।

চকিতে বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আমার চোখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে লেসট্রেড বলল, ও তো আগেই নজরে পড়েছে আমার। ৪ঠা অক্টোবরের একটা খরচের হিসাব। ঘর ভাড়ার জন্য আট শিলিং, প্রাতঃরাশের জন্য আড়াই শিলিং, ককটেল বাবদ এক শিলিং, লাঞ্চের খরচ আড়াই শিলিং—আর শেরি মদের জন্য—আট পেন্স—এসবই তো লেখা—

—ওর মধ্যেই তো রয়েছে সব কিছু। তাছাড়া নামের আদ্যক্ষরগুলোও কাজে লাগবে।

—দূর মশাই। তখন থেকে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাচ্ছেন—হাত পা গুটিয়ে বসে কাজ না থাকলে মানুষ ওই করে। বাজে বকবক করবার সময় নেই আমার—চললাম—

বলতে বলতে ভেজা কাপড় জামা বাক্সে পুরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লেসট্রেড। হাসতে হাসতে হোমস চেঁচিয়ে বলল—ওহে, শুনে যাও, লেডী সাইমন নামে যাঁকে খুঁজছো—ও নামে কেউ নেই।

পরক্ষণেই ঝটিতি ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে নিয়ে তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নিচে।

রাত নটায় ফিরল হোমস। বেশ কিছুক্ষণ আগে দোকান থেকে লোকজন এসে খাবার টেবিলে নৈশভোজ সাজিয়ে দিয়ে গেছে। টাকা পয়সা নাকি হোমসই মিটিয়ে দিয়ে গেছে।

বন্ধুবর ঘরে ঢুকল বেশ খোশ মেজাজে। খুশিতে চকচক করছে চোখ। বলল—বাঃ খাবার দিয়ে গেছে দেখছি।

—হ্যাঁ—পাঁচজনের খাবার দিয়ে গেছে। অতিথি আছে নাকি কেউ?

—হ্যাঁ। লর্ড সেন্ট সাইমন আসতে পারেন।

কথা শেষ হতে না হতেই ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলেন লর্ড।

—এই যে মিঃ হোমস—আপনার চিঠি পেয়েই ছুটে এলাম—কিন্তু যা লিখেছেন—এসব কি সত্যি?

—তাই তো মনে হয়।

—সর্বনাশ। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন, এ যে চূড়ান্ত অপমানের ব্যাপার—ডিউকের কাছে মুখ দেখাব কি করে আমি।

—কি করা—দুর্ঘটনা যে এভাবেই ঘটে। ঝোঁকের মাথায় নিরুপায় হয়ে কাজটা করে ফেলেছেন ভদ্রমহিলা।

—মিঃ হোমস, আপনি বুঝতে পারছেন না—আমার যে মাথা হেঁট করে ছাড়লেন মহিলা।

—ভদ্রমহিলার এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। ওই তো—ওঁরাও এসে

গেলেন মনে হচ্ছে। আমি একজন আইনবিদের সঙ্গে পরামর্শ করে এসেছি—এ ব্যাপারে যা করবার উনি করে দেবেন—আসুন—আসুন।

ঘরে ঢুকলেন একজন ভদ্রমহিলা—পেছনে এক ভদ্রলোক। ওদের দেখেই চেয়ার থেকে ছিটকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন লর্ড সাইমন।

হোমস বলল—আলাপ করিয়ে দিই—মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ফ্রান্সিস হে মুল্টন—মিসেস অবশ্য আপনার অপরিচিত নন।

মিসেস মুল্টন ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন লর্ডের সামনে। তারপর তার বিরস মুখের দিকে তাকিয়ে মিনতির সুরে বললেন, রবার্ট, আমাকে ক্ষমা কর। তোমাকে বলে যাওয়া উচিত ছিল আমার—কিন্তু ফ্রাঙ্ককে দেখার পর আমি আর আমার মধ্যে ছিলাম না।

লর্ড কথা না বলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

মিস্টার মুল্টন কৌতুকোচ্ছল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন লর্ডের দিকে! ভদ্রলোক বেশ চটপটে, ধারাল মুখচ্ছবি, রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে গায়ের রঙ।

মিসেস মুল্টন বললেন—রবার্ট, আমার কথা শুনলেই তুমি আমার অসহায় অবস্থাটা বুঝতে পারবে। শোন তাহলে বলছি। ১৮৮৪ সালে ম্যাক স্কোয়ারে ক্যাম্প ফেলেছিলেন বাবা। জায়গাটা রকি পাহাড়ের ধারে।

বাবা ওখানে খনির কাজ নিয়ে মেতে ছিলেন। ওই ক্যাম্পেই ফ্রাঙ্কের সঙ্গে আলাপ। কিছুদিনের মধ্যেই ঠিক করলাম আমরা বিয়ে করব। ইতিমধ্যে বাবা সোনা পেয়ে গেলেন—দিন দিন অবস্থা ভাল হতে লাগল। আর কিছুই না পেয়ে ফ্রাঙ্ক দিনকে দিন নিঃস্ব হতে লাগল। অবস্থা দেখে বাবা আর, বিয়েতে মত দিতে পারলেন না। আমাকে নিয়ে ফ্রিস্কোয় চলে এলেন। কিন্তু গোপনে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হল না। বিয়েটাও সেরে নিলাম একদিন। কিন্তু ঠিক হল—ফ্রাঙ্কের অবস্থা না ফেরা পর্যন্ত বিয়ের কথাটা বাবাকে জানাবো না। আমি রয়ে গেলাম বাবার কাছে—ও বেরিয়ে পড়ল ভাগ্যান্বেষণে। বেশ কিছুদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। ইতিমধ্যে নানা জায়গা থেকে ফ্রাঙ্কের কয়েকটা খবর পেলাম। শেষ খবরটাই মারাত্মক। রেড ইন্ডিয়ানদের হাতে কয়েকজন অভিযাত্রীর সঙ্গে ফ্রাঙ্কও প্রাণ হারিয়েছে। কোনরকম খবরাখবর করবার উপায় ছিল না আমার। একটা বছর ছটফট করে কাটালাম। বুঝতে পারলাম, সত্যিই আর ও ফিরে আসবে না। চিন্তায় চিন্তায় শরীর ভেঙ্গে পড়ল। বাবা কিছু বুঝতে না পেয়ে যত বড় বড় ডাক্তার দেখাতে লাগল। এই সময়েই লর্ড সাইমনের সঙ্গে দেখা হল। বাবা লন্ডনে ফিরে এলেন। বিয়ে ঠিক হল। বিয়ের দিন বেদিতে উঠতে যাওয়ার সময়ে সহসা দেখতে পেলাম—ফ্রাঙ্ক দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির গোড়ায়। মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। ফ্রাঙ্কের চেহারা ভুল হবার নয়—পাদ্রীর বিয়ের মন্ত্র কিছুই কানে ঢুকল না।

শরীর টলতে শুরু করেছিল—এমন সময় ফ্রাঙ্ক ইশারায় শান্ত থাকবার কথা জানাল। দেখলাম একটা কাগজে চিঠি লিখছে।

বেদী থেকে নামবার সময় ইচ্ছে করে ফুলের তোড়া ফেলে দিলাম। ও সেটা তুলে দিল—সেই সঙ্গে চিঠিটাও। ফ্রাঙ্ক আমার স্বামী—তার নির্দেশ পেলাম চিঠিতে—এর পর আমাকে কি করতে হবে। বাড়ি ফিরে অ্যালিসকে সব জানালাম। তারপর কোট আর টুপি নিয়ে পালিয়ে গেলাম। ওই অবস্থায় বাড়ি ভর্তি লোকের মধ্যে লর্ডকে কিছু বলা সঙ্গত মনে হয়নি—ভেবেছিলাম পরে সব খুলে বলব।

মিস্টার মুল্টন বললেন—বিয়ের খবরটা কাগজেই চোখ পড়েছিল—গির্জার ঠিকানাটা ওখানেই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে আসি।

মিসেস মুল্টন বললেন, ফ্রাঙ্ক চেয়েছিল, ফিরে গিয়ে সবাইকে সব কথা জানিয়ে আসি। কিন্তু ভয়ে লজ্জায় তা আমি পারিনি। ঠিক করলাম, দূরে কোথাও চলে যাব। বাবাকে কেবল একটা লাইন লিখে জানালাম—আমি বেঁচে আছি। যেন চিন্তা না করে। ফ্রাঙ্ক আমার জামাকাপড় আংটি নিয়ে যেন কোথায় ফেল এল। কালকেই প্যারিস রওনা হব ঠিক করেছিলাম আমরা। কিন্তু এর মধ্যে কি করে এই ভদ্রলোক ঠিকানা সংগ্রহ করে বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন।

ভদ্রমহিলা বিনীত ভঙ্গীতে হোমসকে দেখিয়ে বললেন—তিনিই বোঝালেন—না বলে চলে আসাটা অন্যায় হয়েছে। তার ওপর কিছু না জানিয়ে একেবারে চলে যাওয়াটা খুবই খারাপ কাজ হবে। উনিই বললেন, যাতে আমি সব খুলে বলতে পারি—লর্ড সাইমনের সঙ্গে সেভাবে নিরালা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেবেন। তাই ফ্রাঙ্ককে নিয়ে এভাবে ছুটে এসেছি। রবার্ট—আমার অবস্থাটা বিবেচনা করে ক্ষমা করো, আমাকে নীচ মনে করো না।

লর্ড সাইমনের কিন্তু মুখভাবের পরিবর্তন ঘটল না। মিসেস মুল্টনকে তিনি ক্ষমা করতে পারলেন না। বললেন—ওসব কথা থাক। মিঃ হোমস আমি চলি।

—লর্ড সাইমন, খেয়ে যাবেন না—

—ধন্যবাদ মিঃ হোমস—

বলতে বলতে গম্ভীর ভাবে অভিবাদন জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন লর্ড সেন্ট সাইমন।

অতঃপর আমরা চারজনেই বসলাম খাবার টেবিলে।

অতিথিরা চলে যাবার পরে হোমসের মুখে তার তদন্তের বিবরণ শুনতে বসলাম।

বলল—যে মামলা গোড়ায় যত বেশি দুর্বোধ্য মনে হয়—শেষে সেটাই তত

সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এ মামলার সূত্র বলতে কিছুই তেমন ছিল না। কিন্তু লর্ড মশাইকে জেরা করে দুটো ব্যাপার বার করতে পেরেছিলাম। প্রথমটা হল বিয়েতে ভদ্রমহিলার অনিচ্ছা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ—বিয়ের পরে পরেই তার মধ্যে ভাবান্তর দেখা দিয়েছে। চিন্তা করে দেখলাম, মাঝখানে তাহলে এমন কিছু ঘটেছে যার ফলে তার মনে ভিন্ন ভাব দেখা দিয়েছে। কিন্তু কি ঘটতে পারে? নিশ্চয়ই তাহলে এমন কাউকে নজরে পড়েছে যার ফলে বিয়ের প্রতি মন বিরূপ হয়ে উঠেছে। আর তা যদি হয় তাহলে সে লোক তার স্বামী নয় পূর্ব-প্রণয়ী। ভদ্রমহিলা লন্ডনে নতুন। দীর্ঘকাল অমেরিকাতেই কেটেছে তার! অনুমান করলাম, তার স্বামী বা পূর্ব-প্রণয়ীর আমেরিকান হওয়াই স্বাভাবিক। এই সূত্রটা হাতে আসতেই গির্জার সেই সাধারণ চেহারার মানুষটি নজরে এল। ফুলের তোড়া সেই তুলে দিয়েছিল। তার পর থেকেই ভদ্রমহিলার মনের পরিবর্তন ঘটে যায়। ঘরে ফিরেই বাপের বাড়ির ঝি-এর সঙ্গে সবার আগে কথা বললেন। লর্ড মশাই শুনতে পেলেন জাম্পিং এবং ক্লেম—কথাটা। কিন্তু মানে কিছু বুঝতে পারেননি। আমেরিকার খনি অঞ্চলের দেহাতী ভাষায় এই কথাটার মানে হল—যার দাবি আগে সেই আগে নেবে। এরপর আর কোন কিছুই ঘোলাটে থাকবার কথা নয়। উঠে পড়ে লাগলাম ঠিকানা জোগাড় করবার জন্য। এ ব্যাপারে লেসট্রেড আমাকে সাহায্য করেছে—যদিও সেটা নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা। তবুও ওর কাছ থেকে সূত্রটা পাওয়া না গেলে আমি খুবই আতান্তরে পড়তাম—যে চিরকূটটা দেখাল—তার পেছনে লেখা খরচের হিসাব দেখে বুঝলাম কোন হোটেলের বিল। কিন্তু খাবার দাবার আর ঘর ভাড়ার খরচাটা খুবই চড়া—বড়সড় হোটেল ছাড়া অমন হবার কথা নয়। নামের আদ্যক্ষরও পাওয়া গিয়েছিল চিরকূটে। ফলে ভদ্রলোকের পাত্তা করতে আর কোন বাধাই থাকল না।

—খুবই কৌতূহলোদ্দীপক মামলা যাই বল। তবে লর্ড সাইমন কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোটেই ভাল ব্যবহার করতে পারলেন না। ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে নিতে পারলে ভাল হত। বললাম আমি।

হেসে হোমস বলল, ভায়া, বউ আর যৌতুক একসঙ্গে হাতছাড়া হলে মন আর উদার থাকে না। লর্ড সাইমনের দোষ নেই। ভদ্রলোককে সেই দিক থেকেই বিচার করা উচিত। যাক, অনেক হয়েছে—তুমি শুয়ে পড়—আমি বেহালাটা নিয়ে একটু বসি—মনের নিরানন্দ ভাবটা না হলে কাটবে না সহজে।



অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য বেরিল করোনেট

ফেব্রুয়ারী মাস। সবে সকাল হয়েছে। বরফ-পিচ্ছিল পথে তখনো লোকজন নামেনি। এমনি সময়ে জানালা দিয়ে নজরে পড়ল—পাগলের মত ছুটতে ছুটতে একটা লোক এই বাড়ির দিকেই আসছে। লোকটার চেহারা এবং কাপড় চোপড় দেখে অবস্থাপন্ন বলেই মনে হয়। কিন্তু অঙ্গভঙ্গী আর চলা পাগলের মত—কখনো দৌড়চ্ছেন, কখনো হাঁটছেন—অনবরত হাত পা ছুঁড়ছেন—আর কি যেন বকবক করছেন।

বাড়ি কাঁপিয়ে সদর দরজার ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। কিছু পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলেন। ঘরে ঢুকে দিশাহারার মত দেয়ালে মাথা কুটতে লাগলেন ভদ্রলোক।

—অত অস্থির হলে কি আর বিপদ কাটে—শান্ত হয়ে বসুন।

টেনে চোয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল হোমস, ব্যাপারটা কী খুলে বলুন।

—মশায়, এখনো পাগল হয়ে যাইনি কেন বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছেন না—কলঙ্কের আর অবধি থাকবে না। সমাজের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত একজন মানুষকেও অপদস্থ হতে হবে আমার জন্য।

—আপনার পরিচয়টা বলুন দয়া করে।

—পরিচয়—আর বাকি থাকল না কিছু। আমি আলেকজান্ডার হোল্ডার, থ্রেডনীডল স্ট্রীটের হোল্ডার অ্যান্ড স্টিভেনশন ব্যাঙ্কের সিনিয়র পার্টনার।

ভদ্রলোকের পরিচয়টাই কৌতূহল বাড়িয়ে তুলল। লন্ডন শহরের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্কের অংশীদারের নামটা খুবই পরিচিত। কিন্তু এমন কি বিপদে পড়লেন ভদ্রলোক যার জন্যে এমন উন্মত্তের মত হয়ে উঠেছেন। আমরা দুজনেই উন্মুখ হয়ে তাকালাম ব্যাঙ্কার ভদ্রলোকের মুখের দিকে।

—মিঃ হোমস—ব্যাপারটা বড় সাংঘাতিক—আমার জন্য একজন গণ্যমান্য মানুষের মাথা হেঁট হয়ে যেতে বসেছে। ছুটে পুলিশের কাছে গিয়েছিলাম। তাদের কাছে আপনার নাম শুনেই পড়িমরি করে ছুটে চলে এসেছি। আপনি তো জানেন, লাভ বাড়াবার জন্য আমাদের নানাভাবে টাকা খাটাতে হয়। অনেক খানদানী লোক দামী দামী জিনিস আমাদের কাছে গচ্ছিত রেখে টাকা ধার নেন। মাপ করবেন—নামটা এখন উচ্চারণ করব না—

ভদ্রলোক ইংল্যান্ডে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। গোটা পৃথিবীর লোক তাঁকে চেনে। গত কাল সকালে তিনি আমার কাছে এসে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড ধার চাইলেন। টাকাটা তিনি অনায়াসেই বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে ধার করতে পারতেন। কিন্তু মান মর্যাদার কথা ভেবে তা করতে পারেন নি। ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী টাকা ধার করতে হলে উপযুক্ত কিছু গচ্ছিত রাখতে হয়। মশাই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্পদ বিখ্যাত পান্না-মুকুটের কথা কে না জানে। ভদ্রলোক সেই পান্না-মুকুট গচ্ছিত রাখলেন। উনচল্লিশটা মস্ত আকারের পান্না বসানো ওতে। তাছাড়া রয়েছে প্রচুর সোনা। ভদ্রলোক বললেন—চারদিন পর—সামনের সোমবার সুদসমেত টাকাটা আপনাকে ফিরিয়ে দেব। তবে খেয়াল রাখবেন—এই মুকুট জাতীয় সম্পত্তি। একটা পান্নাও যদি খোয়া যায় দুনিয়ার কোথাও আর তেমনটি খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুতরাং ব্যাপারটার গোপনীয়তা সে ভাবেই রক্ষা করবেন।

পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড তিনি নিয়ে চলে গেলেন। আমি মুকুটটা প্রাইভেট ভল্টেও রাখতে ভরসা পেলাম না। ব্যাঙ্ক ডাকাতি যখন তখন হচ্ছে আজকাল। দিন কয়েকের জন্য নিজের হেফাজতে রাখব বলে তাই ওটা সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে এলাম। আপনাকে সবই খুঁটিয়ে বলছি শুনুন।

আমি বিপত্নীক। একমাত্র ছেলে আর্থার। বাড়িতেই থাকে। কিন্তু কি বলব, লজ্জায় নিজেরই মাথা কাটা যায় বলতে। ছেলেটা কুসঙ্গে পড়ে অকালে বখে গেছে। যেমন গোঁয়ার তেমন উড়নচণ্ডী। রেস, জুয়া কিছুই বাদ নেই। বদ সংগীর সংখ্যা নেই তার—তার মধ্যে স্যার জর্জ বার্নওয়েল লোকটা একের নম্বর—যদিও বয়েসে তার থেকে অনেকই বড়। ছেলের মতিগতি দেখে ওকে আমি কারবারে বিশ্বাস করে নিয়ে যেতে পারি না। বাড়িতে সুখের পায়রা হয়ে আছে—খায় দায়

আর দু'হাতে টাকা ওড়ায়।

আমার এক বাপ-মা মরা ভাইঝি মেরী—সেও থাকে বাড়িতে। অমন গুণী শান্ত সুশীল মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না। বাড়িতে আমার নিজের মেয়ের মতই মানুষ হয়েছে। মেরীকে দুবার বিয়ে করতে চেয়েছিল আর্থার কিন্তু ও রাজি হয়নি। বিয়েটা হলে অবশ্য আর্থার দুদিনেই সোজা হয়ে যেত। মেরী সে ক্ষমতা রাখে। কিন্তু এখন আর সেসবের কোন সম্ভাবনাই নেই।

—বাড়িতে আর কে কে আছে? চাকরবাকরদের সম্পর্কে—

—চাকরবাকর বলতে তিনজন ঝি। এদের মধ্যে লুসি পার বলে মেয়েটিকে নিয়েই যত ভাবনা। কাজকর্মে ভাল মেয়েটি—দেখতেও ভাল। ফলে দিন রাত কয়েকটা ছোকরা বাড়ির বাইরে ঘুরঘুর করে।

—বাড়িতে মুকুটটার কথা কেউ জানতে পেরেছিল?

—বাড়িতে খাবার টেবিলে বসে মুকুটের কথাটা আমিই বলেছিলাম। আর্থার আর মেরীকে। তবে যিনি বাঁধা রেখে গেছেন তাঁর নামটা বলিনি।

—তারপর?

—লুসি পার কথা শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। মুকুটটা আমার আলমারিতে রেখেছি জানতে পেরে আর্থার বলেছিল—চুরি না হয়ে যায় আবার। পুরনো আলমারী—ছেলেবেলা আমি গুদোম ঘরের চাবি দিয়ে অনেকবারই খুলেছি ওই আলমারী। ওরকম ভাবেই কথা বলে আর্থার। রাত্রে আর্থার আমার কাছে এসে ক্লাবে দেবার জন্য দুশ পাউন্ড ধার চাইল। কয়েক দিনের মধ্যে আরও দু'বার টাকা দিয়েছি। তাই গালাগাল করে হাঁকিয়ে দিলাম। ও বলল, ক্লাবে টাকাটা না দিতে পারলে মুখ থাকবে না, যে করেই হোক, আমাকে টাকাটা জোগাড় করতেই হবে।

ও চলে যাবার পরে আলমারী খুলে মুকুটটা একবার ভাল করে দেখে নিলাম। তারপর নিজেই ঘুরে ঘুরে বাড়ির সব দরজা জানালা পরীক্ষা করে দেখলাম। হল ঘরে ফিরে এসে দেখি—জানালা খুলে কি দেখছে মেরী। আমি আসতেই জানালা বন্ধ করে দিয়ে বলল—এই মাত্র লুসি দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকল। নিশ্চয় কারু সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। দিন দিন ওর অভ্যাসটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

দেখলাম লুসি ঘরে চলে গেল। আমিও নিজের ঘরে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম।

মুকুটটার ব্যাপারে মনটা উদ্বিগ্ন ছিল। তাই রাতে ভাল ঘুম হল না। রাত দুটো নাগাদ একটা শব্দ পেয়ে চমকে উঠলাম। মনে হল কোথায় যেন একটা জানালা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল। কান পেতে রইলাম। শুনতে পেলাম—পাশের ঘরে যেন কেউ পা টিপে টিপে হাঁটছে। খাট থেকে নেমে ছুটে গেলাম পাশের ঘরে। গ্যাসের আলোয় দেখতে পেলাম—মুকুটটা হাতে নিয়ে গায়ের জোরে বাঁকানোর চেষ্টা

করছে আর্থার। পরনে সার্ট আর প্যান্ট। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। চমকে উঠল আর্থার। অমনি হাত ফসকে মুকুটটা মেঝেতে পড়ে গেল। তুলে নিয়ে দেখি তিনটে পান্না সমেত একটা কোণ উধাও। আমার মাথায় তখন আগুন জ্বলে উঠল। গালাগালি করলাম ওকে যাচ্ছেতাই ভাবে। কিন্তু চোর বলতেই অভিমানে ফেটে পড়ল। পান্না তিনটে ও নাকি চুরি করেনি। পুলিশে দেবার ভয় দেখালাম। পুলিশের কথা শুনে বলল, তুমি যখন আমার কথা বিশ্বাস করছ না তখন আর একটা কথাও মুখ থেকে বার করতে পারবে না। দেখি পুলিশ কি করে চুরির কিনারা করে।

আমাদের চেঁচামেচি শুনে মেরী ছুটে এল ঘরে। পান্না-মুকুট আর আর্থারকে দেখে চিৎকার করে উঠল। তারপরেই অজ্ঞান হয়ে গেল। চাকরবাকররাও এল। ওদের দিয়েই পুলিশকে খবর দিলাম। থানা থেকে ইন্সপেক্টর আসতে আর্থার বলল, বাবা, সত্যিই তুমি আমাকে পুলিশে দেবে! আমি বললাম, পান্না-মুকুট জাতীয় সম্পত্তি। তুমি আমার ছেলে বলে তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না। চুরির তদন্ত প্রকাশ্য ভাবেই হোক। তখন ও মিনতি করে বলল পাঁচ মিনিটের জন্য আমাকে একটু বেরোতে দাও—তোমার ভালই হবে এতে। কিন্তু আমি ওকে বাইরে যেতে দিতে রাজি হলাম না। একজন সম্ভ্রান্ত লোকের মানসম্মান মুকুটটার সঙ্গে জড়িত। চুরির ব্যাপার নিয়ে দেশময় হৈ চৈ পড়বে—আমার মুখে চুনকালি পড়বে—এসব বলে ওকে অনুরোধ করলাম—চুরির মাল কোথায় রেখেছে যেন বার করে দেয়!

আর্থার গুম হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। তারপর আর একটি কথাও বলল না। বুঝলাম—সঙ্গদোষে ছেলেটা একেবারে দাগী অপরাধী হয়ে উঠেছে। পুলিশকে বললাম তাদের কর্তব্য করতে। তারা সমস্ত বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজল। কিন্তু পান্না তিনটির হদিস পাওয়া গেল না। ভয় দেখানো হলো আর্থারকে। কিন্তু একটা কথাও তার পেট থেকে বার করা গেল না। অগত্যা হাজতে পাঠিয়ে দিলাম ওকে। মিঃ হোমস, থানা থেকে সোজা আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আমাকে আপনি বাঁচান। মুকুটটার জন্য এক হাজার পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছি। তাছাড়া আপনার যথাযথ পারিশ্রমিক আমি দেব—আপনি এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

দু'হাতে মাথা চেপে ধরে ভদ্রলোক গুম হয়ে রইলেন।

হোমস আগুনের দিকে তাকিয়ে ঘটনার বিবরণ শুনছিল। ভুরু কুঁচকে আছে। মুখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। একটু পরে বলল—বাড়িতে, বাইরের লোকের যাতায়াত কেমন আছে?

—বাইরের লোক বলতে আমার পার্টনারের পরিবারের লোকজন আর আর্থারের সেই বন্ধু স্যার জর্জ বার্নওয়েল ছাড়া আর কারুর যাতায়াত নেই। হালে বার্নওয়েল খুব ঘন ঘন আসছেন।

—সামাজিকতার ব্যাপারে বাইরের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ কেমন আপনার?

—ওসব আর্থারই করে। আমি আর মেরী বাড়িতেই থাকি। ও বেরোয় না কোথাও।

—মেরীর যা বয়স—তাতে তো তার এমন ঘরকুনো হয়ে থাকবার কথা নয়। অভ্যাসটা একটু অস্বাভাবিক।

—খুব ভাল মেয়ে মেরী—ভারী শান্ত স্বভাবের। বয়স চব্বিশ বটে কিন্তু সেই তুলনায় খুবই সংযত।

—মুকুট চুরির ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে খুবই আঘাত পেয়েছে মেরী!

—খুবই আঘাত পেয়েছে। আমার অবস্থাটা ও বুঝতে পেরেছে।

—মেরীও কি মনে করে আর্থার দোষী?

—আমাদের দু'জনেরই তাই বিশ্বাস। তাকে পান্নার মুকুট হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দু'জনেই দেখেছি।

—হলেও, ব্যাপারটা তলিয়ে দেখবার মত। মুকুটের অন্য কোথাও চোট লেগেছিল?

—হ্যাঁ, বেঁকে গেছে।

—আর্থার বাঁকা অংশ সিদে করার চেষ্টা করছিল। ঘটনাটা অমনও হতে পারে তো।

—ওটা আমি মনে করি না। যদি সে নির্দোষই হবে—তাহলে বলল না কেন সে-কথা?

—কথাটা অবশ্য ঠিক। দু'একটা মিথ্যা কথা বলেও সে দোষ ঢাকবার চেষ্টা করতে পারত। কিন্তু কোন কথাই বলেনি—এই চুপ করে থাকার ব্যাপারটা লক্ষ্য করবার মত। আচ্ছা যে শব্দ শুনে আপনার ঘুম ভেঙ্গেছিল—শব্দটা কিসের পুলিশ কি তা ধরতে পেরেছে?

—ওরা বলছে ওটা আর্থারের শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করবার শব্দ।

—মজার ব্যাপার! গোপনে রত্ন-মুকুট চুরি করা যার উদ্দেশ্য সে রাত দুপুরে বাড়িসুদ্ধ লোককে জাগিয়ে দেওয়ার মত শব্দ করে দরজা বন্ধ করল? বেশ। নিখোঁজ পান্না তিনটে সম্পর্কে পুলিশের মতামত কি?

—অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হযেছে বলেই ওদের বিশ্বাস। বাড়িতে তল্লাসির বাকি রাখেনি কোথাও। বাড়ির বাগানেও খুঁজেছে।

—একটা কথা আপনাকে বলি শুনুন। কেসটা যতটা সোজা বলে মনে করছেন—আসলে ঠিক তার উল্টো। কেবল একটা পয়েন্ট আপনি নিজে চিন্তা করে দেখুন। আপনার ছেলে খাট থেকে নেমে আপনার ড্রেসিং রুমে ঢুকে আলমারী খুলল তারপর মুকুট বার করে গায়ের জোরে তিনটে পান্না খসিয়ে নিয়ে এমন

জায়গায় লুকিয়ে ফেলল ওইটুকু সময়ের মধ্যে যার সন্ধান পুলিশ বাড়ি বাগান তল্লাসি করেও পেল না? আর আপনার ছেলে এতই নিরেট যে ধরা পড়বার কথাটা বেমালুম এড়িয়ে গিয়ে আবার বাকি ছত্রিশটা পান্না সমেত মুকুটটা নিয়ে আপনার ড্রেসিং রুমে ঢুকে পড়বে? ব্যাপারটাকে অসম্ভব বলে মনে হয়নি আপনার?

—কিন্তু পান্না চুরির উদ্দেশ্য না থাকলে মুকুটটাকে ও এভাবে বার করেই বা আনবে কেন বলুন? কোন উদ্দেশ্য থাকলে সেটা খুলে বলতে পারত।

—প্রশ্নটা এখানেই, বলল না কেন? চলুন আপনার বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসা যাক।

সাদা পাথরের তৈরি সাদামাটা বাড়ি। চৌকোনা। সামনে বরফ ঢাকা লন। দু'দিকে দুটো লোহার ফটক। বাড়ির দু'পাশে দুটো গলি—ডানদিকে আর বাঁ দিকে। বাঁদিকেরটা গেছে আস্তাবলের দিকে। সেদিকে লোকজনের যাতায়াত খুবই কম। ডানদিকের গলি গেছে বাগানের দিকে—বাইরের লোকজনের চলাচল এদিকেই বেশি। হোমস আমাদের এগিয়ে যেতে বলে এই গলি ধরে বাগানে ঢুকল।

মিঃ হোল্ডারের সঙ্গে আমি খাবার ঘরে এসে বসলাম। এমন সময়ে একটি সুন্দরী তরুণী ঘরে ঢুকে মিঃ হোল্ডারের চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ফ্যাকাশে মুখে বিষণ্ণতার ছাপ স্পষ্ট। ঠোঁট শুষ্ক। ভেতরে যে একটা তোলপাড় চলছে মুখ দেখলেই বোঝা যায়। তরুণী মিঃ হোল্ডারের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, কাকা পুলিশ আর্থারকে ছেড়ে দিয়েছে তো?

—কেস ফয়সালা হবার আগে ছাড়াছাড়ির কোন প্রশ্নই নেই।

—কিন্তু আমি জানি আর্থার নির্দোষ।

—নির্দোষ তো মুখে সেকথা বলতে কি হয়েছে?

—অভিমানে অমন চুপ মেরে গেছে ও—পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছ বলে—

—মুকুটটা তো ওর হাতেই দেখেছি—চুরি করবার মতলব না থাকলে মুকুট হাতে নেবে কেন?

—দেখছিল ওটা হাতে নিয়ে। ওকে ছেড়ে দিতে বল কাকা—আর্থার নির্দোষ।

—পান্না তিনটের হদিস আগে হোক—লন্ডন থেকে বড় গোয়েন্দা এসেছেন, এবারেই ঠিক জানা যাবে—কে চোর কে নির্দোষ।

—লন্ডন থেকে ইনিই এসেছেন?

—ইনি সহকারী বন্ধু—উনি পাশের গলি দেখছেন।

—গলিতে কি দেখছেন? বলতে বলতে ভুরু কুঁচকে গেল তরুণীর। ঠিক এই সময়েই ফিরে এল হোমস।

—আপনিই তদন্ত করছেন? আমি জানি আমার ভাই নির্দোষ। পান্না সে চুরি করেনি।

—আমারও তাই বিশ্বাস মিস হোল্ডার। সেজন্যই আপনার কাছ থেকেও দু' একটা কথা জানবার আছে আমার।

বলে পা ঠুকে ঠুকে জুতো থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলে চেয়ারে এসে বসল হোমস। তারপর জিজ্ঞেস করল, মিস হোল্ডার, কাল রাতে আপনি কোন আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন?

—না, কাকার চেঁচামেচি কানে যেতেই ছুটে চলে আসি। তার আগে কিছু শুনতে পাইনি।

—রাতে সব জানালা বন্ধ করা হয়েছিল তো?

—হ্যাঁ।

—আজ সকালেও সব বন্ধ ছিল?

—হ্যাঁ।

—এ বাড়িতে লুসি নামে একটা কাজের মেয়ে আছে—আপনিই কাল রাতে কাকাকে জানিয়েছিলেন—সে বাড়ির বাইরে গিয়েছিল তার কোন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।

—পান্না-মুকুটের কথা কাকার মুখ থেকে শোনার পরই বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল।

—তাহলে তো ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে—মেয়েটি খবরটা জানতে পেরেই তার মনের মানুষকে গিয়ে জানিয়ে আসে—এই দুজনের যোগসাজসেই মুকুটটা চুরি যায়। এই তো আপনার ধারণা?

—ধারণার কথা নয় মিঃ হোমস—আমি নিজের চোখে দেখেছি আর্থার মুকুট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অসহিষ্ণু ভাবে বলে ওঠেন মিঃ হোল্ডার।

হোমস বলল—আর্থারের কথা এখন থাক মিঃ হোল্ডার, মেয়েটি বাড়ি ফিরেছিল কোন দরজা দিয়ে?

—রান্নাঘরের দরজা দিয়ে। দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি—পা টিপে বাড়ি ঢুকছে। অন্ধকারে আবছা ভাবে তার পেছনের লোকটাও চোখে পড়েছিল। বলল মিস হোল্ডার।

—চেনেন তাকে?

—হ্যাঁ। সব্জী বেচে—নাম, ফ্রান্সিস প্রসপার।

—রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল—দরজার একটু বাঁদিক ঘেঁষে? বলল হোমস।

—হ্যাঁ।

—একটা পা কাঠের?

মিস হোল্ডারের সুন্দর ভাবব্যঞ্জক চোখে ভয়ের ছাপ পড়ল। মুখে হাসি টেনে বলল—আপনি জানলেন কি করে?

হোমস কোন উত্তর করল না কথার। উঠে গিয়ে ঘরের জানালাগুলো একে একে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। বড় জানালাটার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাশের সরু গলিটা এখান থেকে দেখা যায়। পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং লেন্স বার করে গোবরাট পরীক্ষা করল অনেকক্ষণ ধরে। ফিরে এসে বলল—চলুন ওপরটা একবার দেখে আসা যাক। তারপর বাইরেটা আর একবার দেখা যাবে।

মিঃ হোল্ডারের ড্রেসিং রুমে উঠে এলাম আমরা। কার্পেট মোড়া ঘর। আসবাবপত্র অতি সাধারণ, আয়না আর আলমারী। আলমারীর তালাটা তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে দেখল হোমস।

—আর্থার বলেছিল গুদোম ঘরের চাবি দিয়ে খুলত তালাটা—এটাই সেই আলমারী?

—হ্যাঁ—এই নিন চাবি।

হোমস চাবি নিয়ে তালা খুলল। বলল—খোলার সময়ে কোন শব্দই হয় না দেখছি—একারণেই আপনি টের পাননি। এই আলমারীতেই তো মুকুটটা রয়েছে?

বলতে বলতে আলমারী খুলে ঝকঝকে সুন্দর রত্নমুকুট বার করে এনে দেখতে লাগল। দেখবার মত মুকুটই বটে। এরকম সাইজের পান্না এর আগে কখনো দেখিনি। মুকুটের একটা কোণ ভাঙা—ওখান থেকেই খসিয়ে নেওয়া হয়েছে তিনটে পান্না।

হোমস দু'পা এগিয়ে এসে বলল—মিঃ হোল্ডার, আর্থার তাহলে এই কোণটাই ভেঙে নিয়েছে বলছেন—আচ্ছা আমি একবার চেষ্টা করে দেখি তো।

আঁৎকে উঠে চোখ কপালে তুলে তাকিয়ে রইলেন ব্যাঙ্কার। হোমস সর্বশক্তি দিয়ে একটা কোণ ভাঙবার চেষ্টা করল কিন্তু ব্যর্থ হল। বলল, ভাঙতে হলে আরও সময়ের দরকার। আমার আঙুলে জোর নেহাৎ কম মনে করবেন না। সাধারণ মানুষের পক্ষে এ জিনিস ভাঙা সহজ কাজ নয়। মিঃ হোল্ডার, যে রকম শক্ত জিনিস—ভাঙবার পরেও শব্দটা কিছু কম হবে না বুঝতেই পারছেন। কিন্তু আপনার খাট থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে এত কাণ্ড ঘটে গেল আর আপনি কিছুই টের পেলেন না? অথচ রাত্রে আপনার গাঢ় ঘুম হয়নি নিজেই বলেছিলেন।

—কিছুই বুঝতে পারছি না মিঃ হোমস।

—মিস হোল্ডার—আপনার কি মনে হচ্ছে?

—কাকার মত আমারও মাথায় কিছু ঢুকছে না।

—আচ্ছা, ছেলেকে যখন দেখেছিলেন তখন তার পায়ে চটি বা জুতো চোখে পড়েছিল?

—না—পরনে কেবল প্যান্ট আর শার্ট দেখেছি।

—ঠিকই আছে, এবার আমি একবার বাইরেটা দেখে আসি। আপনারা বসুন। বেশি লোক গেলে মাটির পায়ের ছাপ সব একাকার হয়ে যাবে।

ঘণ্টা খানেক সময় নিয়ে বাগানের দিকটা পরীক্ষা করল হোমস। ঘরে ঢুকল বেশ উদ্দীপ্ত মুখে। বলল—আর আমার দেখার কিছু নেই মিঃ হোল্ডার। বাকি কাজটা বাড়ি গিয়ে সারব। আপনি কাল সকালে নটা থেকে দশটার মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

—কিন্তু রত্ন তিনটির কোন হদিস কি করতে পারলেন? আর আর্থারের—ওর কি ব্যবস্থা হবে?

—আপনি আসুন—তারপর যা করবার করা যাবে। কিন্তু খরচপাতি যা হয় দেবেন তো?

—আমার সর্বস্ব দিতে রাজি আছি মশায়; আমার মত একজন ব্যাঙ্কারের পক্ষে ব্যাপারটা কত বড় কলঙ্কের আপনি বুঝতে পারছেন না?

—বেশ। তাহলে ওই কথাই রইল। তবে দরকার মনে করলে একবার সন্ধ্যার দিকে আসতে পারি।

কথা শুনেই বুঝতে পারলাম, হেঁয়ালি আর হেঁয়ালি নেই—মীমাংসা একরকম করে এনেছে হোমস।

রাস্তায় যেতে যেতে কোন কথাই বলল না বন্ধুবর। গুম হয়ে রইল। বাড়ি এসে সোজা ঘরে ঢুকল। কয়েক মিনিট পরে যখন বেরিয়ে এল—তখন তার ছদ্মবেশ—পাক্কা একটা লোফারের চেহারা। বলল—শেষবারের মত ব্যাপারটা পরখ করে আসা যাক। একাই যাচ্ছি। দেখি কি হয়। তুমি ততক্ষণে তোমার হাতের কাজ সেরে নাও, চলি।

বলতে বলতে নিচে নেমে গেল হোমস।

ঘণ্টা কয়েক একাই কাটালাম ঘরে এ-বই সে-বই নাড়াচাড়া করে। বিকেলে চা পানের সময়ে ফিরে এল হোমস তুড়ি বাজাতে বাজাতে। হাতে ইলাস্টিক লাগানো এক পাটি জুতো। ঘরের কোণে জুতোটা ছুঁড়ে দিয়ে চা খেতে বসে পড়ল।

—কাজ এখনো শেষ হয়নি ভায়া। যাওয়ার পথে একবার ঢুঁ মেরে গেলাম।

—আবার কোন দিকে যাবে?

—ওয়েস্ট এন্ডের ওদিকে—কয়েক ঘণ্টা দেরি হতে পারে। ব্যাঙ্কারের পাড়া থেকে ঘুরে এলাম। বাড়ি ঢুকিনি অবশ্য। এবারে নিজের পোশাকে বেরুতে হবে। খুবই মজার মামলা হে।

বলতে বলতে চকচকে চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। বুঝলাম কাজের অগ্রগতি অব্যাহত আছে।

চা খেয়ে ধড়াচুড়ো পাল্টে সেই যে বেরুল মাঝরাত পর্যন্ত আর সাড়া পাওয়া গেল না তার। তদন্তে বেরিয়ে অনেক সময়ই এভাবে বাইরে কাটায় ও। তাই শেষ রাতের দিকে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে প্রাতঃরাশের টেবিলেই দেখা হল। বেশ তাজা চেহারা। এক কাপ কফি আর খবরের কাগজ নিয়ে খোশ মেজাজে বসে আছে।

আমাকে দেখে বিশেষ কিছু কবুল করল না। আমিও জিজ্ঞেস করলাম না।

বেলা নটা নাগাদ এলেন মিঃ হোল্ডার। এক রাতের মধ্যেই চেহারা অর্ধেক হয়ে গেছে ভদ্রলোকের। চোয়াল ঝুলে পড়েছে—চুলের সাদা ভাবও যেন বেড়ে গেছে। সমস্ত শরীর জুড়ে অবসাদের ছাপ। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। বললেন, মিঃ হোমস, এমন দুর্বিপাকে কখনো পড়িনি। দু'দিন আগেও আমার মনে সুখ শান্তির অভাব ছিল না। আজ আমি সবদিক থেকেই সর্বহারা হয়েছি। মানসম্মান গেল। আদরের ভাইঝিটা—অতটুকু বয়স থেকে মানুষ করেছি—সেও চলে গেল।

—চলে গেছে?

—হ্যাঁ, কাল রাতে রাগের মাথায় বলে ফেলেছিলাম—আর্থারকে বিয়ে করলে ছেলেটা এমন করে গোল্লায় যেত না। ওই কথাটাই ওর বুকে লেগেছে। বিছানায় শোয়নি সারা রাত, এই দেখুন—এই চিরকুটটা রেখে গেছে।

হোমস হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল। লেখা রয়েছে—

প্রিয় কাকা,

বুঝতে পারছি, আমার জন্যই আজ তোমার এই দুর্বিপাক। তাই এ বাড়িতে থাকা আর উচিত মনে হচ্ছে না আমার। আমি চললাম। জানি না কোন দিন মনের শান্তি ফিরে পাব কিনা। আমার জন্য ভেবো না। খোঁজাখুজির চেষ্টা করো না। পাবে না।

তোমারই আদরের
মেরী

চিঠি পড়া শেষ করে হোমস তাকাল মিঃ হোল্ডারের দিকে। মিঃ হোল্ডার বললেন—শেষ পর্যন্ত মেরী কি আত্মহত্যা করল মিঃ হোমস?

—মোটেই তা নয়। আমাদের জটিল সমস্যার সহজ সমাধান করে দিয়ে গেলেন। এবারে বুঝতে পারবেন—আপনার দুর্গ্রহ ছেড়ে গেল।

—আপনি কী বলতে চাইছেন বুঝিয়ে বলুন মিঃ হোমস। আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। পান্নাগুলোরও তো কোন হদিস করা গেল না।

—মিঃ হোল্ডার, প্রতিটা পান্নার জন্য হাজার পাউন্ড খরচ করতে পারবেন তো?

—এক হাজার কি মশায়—যদি পাওয়া যায়—দশ হাজার করে দিতে এখুনি রাজি।

—অত খরচ করতে হবে না। পুরস্কারের টাকাটা ধরে সব মিলিয়ে ওই হাজারেই হবে। এই নিন কলম—চার হাজারের একটা চেক লিখে দিন।

মিঃ হোল্ডার হতভম্বের মত তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। সবই যেন তার কাছে হেঁয়ালি ঠেকছে। ভ্যাবাচাকা খেয়ে শেষে চেক লিখে দিলেন।

এবারে ডেস্কের ড্রয়ার খুলল হোমস। বার করে আনল তেকোনা সোনায় বসানো তিনটে পান্না। তারপর ছুঁড়ে দিল টেবিলের ওপর।

যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেটা খামচে ধরলেন মিঃ হোল্ডার।

—ওঃ—আমাকে বাঁচালেন মিঃ হোমস। কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব।

—কিন্তু মিঃ হোল্ডার—আর একটা দেনা কিন্তু আপনাকে মেটাতে হবে। সে দেনা আপনার ছেলের কাছে।



—কী বলছেন আপনি—আর্থার তাহলে চুরি করেনি?

—না—কালও বলেছি—সে কথা আজও বলছি, আর্থার কোন দোষ করেনি।

—তাহলে এক্ষুনি চলুন তার কাছে মিঃ হোমস—তাকে বলে আসি।

—আমি গেছিলাম—সব জানে ও। দু-একটা ব্যাপারে জানবার ছিল তা তার কাছ থেকে জেনে নিয়েছি।

—কিন্তু রহস্যটা কি সেটা তো আপনি বলছেন না?

—নিশ্চয় বলব। তবে শুনলে খুবই আঘাত পাবেন। স্যার জর্জ বার্নওয়েল আর আপনার ভাইঝির যোগসাজসেই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে। দু'জনেই একসঙ্গে পালিয়েছে।

—একী বলছেন? এ অসম্ভব।

—অসম্ভব, তবে ব্যাপারটা সত্য। স্যার জর্জ বার্নওয়েলের সঠিক পরিচয় আপনার জানা নেই নিশ্চয়। ইংলন্ডের কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের মধ্যে উনি অন্যতম। নিদারুণ ভাবে নির্দয়—বিবেকহীন মানুষ, জুয়োখেলে সর্বস্ব খুইয়েছেন—বহু মেয়ের সর্বনাশ করেছেন। এবারে তার শিকার হল আপনার ভাইঝি। আপনি জানতে পারেন নি, কিন্তু প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময়ে তাদের দু'জনের দেখা সাক্ষাৎ হত।

অপরিসীম ক্লান্তি হতাশা আর অবিশ্বাস যেন ছেঁকে ধরল মিঃ হোল্ডারকে। ভেঙেপড়া অর্ধস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—আমি যে বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না।

—সেই রাতের ঘটনা শোনাচ্ছি আপনাকে—তাহলেই বুঝতে পারবেন। আপনি শুতে গেছেন মনে করে জানালা খুলে মুকুটের খবরটা আপনার ভাইঝিটিই বার্নওয়েলকে জানিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও চেয়ে বসেন সেটি। কিন্তু সেই সময়েই আপনি ঘরে এসে পড়ায় জানালা বন্ধ করে দাসীর গল্পটা আপনাকে শোনায়।

এর একটু পরেই আর্থার ক্লাবে দেবার জন্য টাকা চায় আপনার কাছে। কথা কাটাকাটির পরে দু'জনেই শুয়ে পড়েন। কিন্তু আর্থারের চোখে ঘুম ছিল না। ক্লাবের টাকার কথা ভেবে ভেবে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল এমন সময় বাইরে পায়ের শব্দ শুনে চুপি চুপি বেরিয়ে এসে দেখে মেরী ঢুকছে আপনার ড্রেসিং রুমে। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এসে গায়ে জামা চড়িয়ে দরজার আড়ালে এসে দাঁড়ায় আর্থার। দেখে আলমারী খুলে মুকুট নিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে মেরী। সেও পেছু নেয়। জানালা খুলে মেরী মুকুটটা পাচার করে দেয় বাইরে। আর্থার আড়ালে দাঁড়িয়ে সবই দেখতে পায়। কিন্তু মেরী নিজের ঘরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত সে লোকটাকে ধাওয়া করতে পারেনি। তারপরেই জানলা খুলে বাইরে লাফ দিয়ে পড়ে। কীর্তিটা যে বার্নওয়েলের আর্থার সেটা জানত না। কিন্তু পরে চিনতে পেরেও ছেড়ে দিল না। ধস্তাধস্তি করে মুকুট ছিনিয়ে নেয়। আর্থারের ঘুসিতে রীতিমত জখম হয়ে পালিয়ে যান বার্নওয়েল। কিন্তু এত কাণ্ড করেও আর্থার মেরীর মুখ চেয়ে কোন রকম চেঁচামেচি করেনি। মেরীকে সে ভালবাসে। কিন্তু আপনার সর্বনাশ হতেও দেয়নি সে।

মুকুট নিয়ে আপনার ড্রেসিং রুমে ফিরে এসে দেখে মুকুট ভাঙা। হাতের চাপ দিয়ে মুকুটের বাঁকা দিকটা সোজা করছে সেই সময়ই আপনি ঘরে ঢুকে চেঁচামেচি শুরু করেছেন। চোর বলে ওকে গালাগাল করতে থাকেন। আপনার সর্বনাশের কথা ভেবেই এত কাণ্ড করে মুকুটটা ফিরিয়ে আনল—আর আপনি বুঝতে না চেয়ে তাকে অপবাদ দিলেন—শেষ পর্যন্ত বাড়িতে পুলিশ ডেকে এনে তাকে

ধরিয়ে দিলেন। প্রচণ্ড অভিমানে তারপর চুপ করে যায় সে—একটি কথাও আর বলেনি—কিংবা নিজেকে অপবাদ মুক্ত করবার জন্য মেরীকেও ধরিয়ে দেয়নি। এই হট্টগোলের সময়েই একবার পাঁচ মিনিটের জন্য বাইরে যেতে চেয়েছিল আর্থার মুকুটের ভাঙা অংশটা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনার জন্য। সে বুঝতে পেরেছিল মুকুট নিয়ে ধস্তাধস্তির সময়েই ভেঙে গিয়েছিল সেটা আর ভাঙা অংশটা পড়ে আছে গলির মধ্যে।

মেরীর কথায় আমিও প্রথমে একটু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। আপনার বাড়ির রান্নাঘরের দরজার পাশে বরফের ওপর পায়ের ছাপও পেয়েছিলাম দুজনের। একজন নারী একজন পুরুষের। কাছে দাঁড়িয়ে গল্প করেছে সেখানে। পুরুষটির আবার একটি পা কাঠের—স্পষ্ট গোল দাগ ছিল বরফের ওপর। লুসি আর তার পুরুষ বন্ধুর গল্পটা তখন সত্যি বলেই মনে হয় আমার। কিন্তু আমার ভুল ভাঙল গলির মধ্যে ঢুকে। আসল ঘটনার সূত্র পেলাম সেখানেই। বরফের ওপর পেলাম দু'জোড়া পায়ের ছাপ—একজনের পায়ে বুট—আর তার বুটের ছাপ মাড়িয়ে দৌড়েছে খালি পায়ে আর একজন। আপনিই বলেছিলেন—আর্থারের পায়ে বুট বা চটি ছিল না। বুঝতে পারলাম—বুটপরা লোকটার পেছনে সে-ই দৌড়েছে। এক জায়গায় দেখলাম বরফের মধ্যে বেশ খানিকটা গর্ত মতন—টানা হ্যাঁচড়টা দু'জনের সেখানেই হয়েছিল বুঝলাম। ফোঁটা ফোঁটা রক্তও পড়ে আছে সেখানে। বুটপরা পায়ের ছাপ এর পরেই একা চলে গেছে—তার পায়ের পাশাপাশি পড়েছে রক্তের ফোঁটা—জখম হয়েই সে ফিরে গেছে তা আর বুঝতে বাকি থাকে না। খালি পা ফিরে এসেছে বাড়ির দিকে—আর্থারের পায়ের ছাপ সেগুলো।

বাড়ির ভেতর থেকে মুকুটটা যে বাইরের কারুর হাতে চালান করা হয়েছিল—এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলাম আপনার বাড়ির জানালার গোবরাট পরীক্ষা করেই। আতস কাঁচে পায়ের চিহ্ন পরিষ্কার ধরা পড়েছিল। পাচারের সময়েই আর্থার দেখে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে পিছু নিয়ে ধরে ফেলে লোকটাকে। ঘুসি মেরে লোকটাকে জখম করে ছিনিয়ে নেয় মুকুট। সেই সময়েই টানাটানিতে একটা কোণা ভেঙ্গে যায়। কিন্তু তখনো বুঝতে পারিনি লোকদুটি কে হতে পারে। আলমারি থেকে মুকুট নামিয়ে আনল কে—বাইরে থেকে সেই মুকুট নিয়ে পালাচ্ছিল যে লোকটা সেই বা কে?

এই বিষয়টা নিয়ে একটু মাথা ঘামাতে হল। পেয়ে গেলাম হদিশ। আপনাকে হিসেব থেকে বাদ রাখলাম প্রথমেই। থাকল আপনার ছেলে। দাসীদের মধ্যে কেউ চুরি করে থাকলে তার নাম গোপন করে সে হাজতে যেত না—নামটা অবশ্যই প্রকাশ করত। তাহলে কার মুখ চেয়ে সে নির্বিবাদে হাজত বাস মেনে নিল? এবারে মিরী এসে গেল দৃশ্যপটে। মেরীকে সে ভালবাসে। তার জন্য হাসিমুখে

হাজতবাস মেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব। তখন মনে পড়ল—রাত্রে শুতে যাব আগে মেরীকে আপনি জানালার সামনে দেখেছিলেন। তারপর, আর্থার আর মুকুট দেখে সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মেরী মুকুটটা কার হাতে চালান করা আপনি বলেছিলেন—বাড়িতে লোকজনের বিশেষ যাতায়াত ছিল না। যে দু'একজন হামেশা আসে তাদের মধ্যে স্যার জর্জ বার্নওয়েল একজন। আর্থারের সঙ্গে দেখা করতে এলেও মেরীর সঙ্গেও তার দেখা সাক্ষাৎ হয়। বার্নওয়েলের কাণ্ডকীর্তি আমার আজানা নয়। মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে যেমন ওস্তাদ তেমনি যে কোন রকম দুষ্কর্মে সিদ্ধহস্ত। তখনই মনে হল বুটের ছাপটা একবার মিলিয়ে নেওয়া দরকার। যদি মিলে যায় তাহলে পান্না তিনটে তার কাছেই রয়েছে।

এর পরে নামলাম নতুন ভূমিকায়। লোফারের ছদ্মবেশ নিয়ে গেলাম স্যার জর্জের বাড়ি। চাকরটার সঙ্গে ভাব জমাতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। তার মুখে খবর পেলাম, আগের রাতে মুখে জখম নিয়ে বাড়ি এসেছেন স্যার জর্জ। চাকরটার পকেটে কিছু গুঁজে দিয়ে তার মনিবের এক পাটি বুট হাত করলাম। নিয়ে চলে এলাম আপনার বাড়ি। বুটের ছাপের সঙ্গে স্যার জর্জের বুট হুবহু মিলে গেল

মিঃ হোল্ডার বলে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে—কাল সন্ধ্যায় একটা লোফারকে গলিতে ঘুরঘুর করতে দেখেছিলাম।

—হ্যাঁ—আমাকেই দেখেছেন। এরপর ফিরে এলাম বাড়িতে। ছদ্মবেশ পাল্টে এবারে স্বমূর্তিতে হাজির হলাম স্যার জর্জের সামনে। আমি জানতাম সহজে ধরা দিতে চাইবেন না। তাই প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলাম। নানা ভাবে বোঝালাম প্রথমে, পরে কড়া কথা, ভয় দেখানো—সবই ব্যর্থ হল। স্বীকার করতে তো চাইলেনই না—উল্টে মারমুখো হয়ে উঠলেন। তখন পিস্তল বার করে সামনে ধরলাম। বললাম, পান্না তিনটে চাই। সঙ্গে সঙ্গে পান্না তিনটের বিনিময়ে তিনহাজার পাউন্ডের টোপও ফেলতে হল। এত টাকার লোভ সামলাতে পারলেন না স্যার জর্জ—কবুল করলেন, মাত্র ছ-শ পাউণ্ডে বিক্রি করে দিয়েছেন পান্না তিনটে। যে কিনেছে তার ঠিকানাটা আদায় করে নিয়ে গেলাম তার কাছে। তিন হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে হাতে পেলাম পান্না তিনটে—তবে কথা দিতে হল—পুলিশী হামলা হবে না। বাড়ি যখন ফিরলাম তখন রাত দুটো।

—মিঃ হোমস, বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ হোল্ডার, আপনার কাছে ঋণ আমার অপরিশোধ্য। আপনার ক্ষমতার তুলনা হয় না। এবার ছেলেটার কাছে একবার যাই—তাকে ভুল বুঝে অনেক কষ্ট দিয়েছি—ক্ষমা চাইতে হবে। হতভাগী মেরীটার জন্য দুঃখ হচ্ছে।

—কিছু করার নেই মিঃ হোল্ডার। স্যার জর্জের কাছেই তার পাপের সাজা পাওনা।